অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছোটগল্পে জীবনচেতনার রূপায়ণ

(Achintyakumar Sengupter Chhotogolpe Jibonchetonar Rupyan)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য প্রণীত অভিসন্দর্ভ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
বি.এ.অনার্স, এম.এ. (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
এম.এ. (ব্রিটিশ কলাম্বিয়া), পিএইচ. ডি. (এডিনবরা)
প্রফেসর সুপারনিউমেরারি
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
মোবাইল- ০১৭১১১৮৬৯৬৩৭

গবেষক
নীলাঞ্জনা সরকার
রেজি: ১২০/২০০২-২০০৩
পুনঃরেজি: ১৬০/২০০৮-২০০৯,
১৬১/২০১২-২০১৩
বাংলা বিভাগ
কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

তারিখ: ৮ই মে ২০১৫, ২৫শে বৈশাখ ১৪২২

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
বি.এ.অনার্স, এম.এ. (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
এম.এ. (ব্রিটিশ কলাম্বিয়া), পিএইচ. ডি. (এডিনবরা)
প্রফেসর সুপারনিউমেরারি

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
মোবাইল- ০১৭১১৮৬৯৬৩৭

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের নীলাঞ্জনা সরকার আমার তত্ত্বাবধানে '*অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছোটগল্পে জীবনচেতনার রূপায়ণ*' বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা সম্পন্ন করেছেন। তাঁর রেজিঃ ১২০/২০০২-০৩, পুনঃ রেজিঃ ১৬০/২০০৮-০৯ এবং ১৬১/ ২০১২-২০১৩। আমার জানা মতে এই অভিসন্দর্ভের কোন বিষয়বস্তু অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা প্রকাশিত হয় নি এবং কোন অংশ ইতোপূর্বে কোন প্রকাশনা, সাময়িকী, পত্রপত্রিকা, বেতার, টেলিভিশন, ইন্টারনেটে প্রকাশিত বা পঠিত হয় নি। এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রির জন্যও উপস্থাপিত হয় নি।

এই অভিসন্দর্ভটি মূল্যায়নের জন্য সুপারিশ করছি।

(ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

অনুবন্ধ

'*অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছোটগল্পে জীবনচেতনার রূপায়ণ*' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ শুরু করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ-এর তত্ত্বাবধানে। গবেষণার বিভিন্ন ধাপে তাঁর সুচিন্তিত নির্দেশনা, অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ অভিমত এ অভিসন্দর্ভ রচনায় সহায়ক হয়েছে। গবেষণা কর্মের সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপরেখা- নির্মাণে তাঁর নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা ছিল আমার অন্যতম শ্রম-উৎস। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা ও ঋণ অপরিসীম।

গবেষণা পরিকল্পনা ও বিষয় মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর মো: সিরাজুল ইসলাম-এর সুচিন্তিত ও প্রাজ্ঞ বিবেচনা আমার অভিসন্দর্ভ রচনাকে সহজতর করে দিয়েছে। অভিসন্দর্ভটির গঠন বিন্যাস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শও তিনি প্রদান করেছেন। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর মুহাম্মদ শাহজাহান মিঞা আমাকে তাৎপর্যপূর্ণ পথনির্দেশ দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ।

গবেষণাকালে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ-সূত্রে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারিবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া রেজিস্ট্রার ভবনের সেকশন অফিসার (শিক্ষা-১) মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক-এর সহায়তার কথা বিশেষভাবে স্মরণ করি।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে যাঁরা আমাকে নিরন্তর উৎসাহ প্রদান করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আমার মা শেলী সরকার ও কনিষ্ঠ সহোদরা শর্মিলা সরকার। নিজের পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেও গবেষণা কর্ম সমাপ্ত করতে যাঁর অবিরত সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা আমাকে অনবসন্ন ও উজ্জীবিত করেছে তিনি আমার স্বামী মো: শহীদুজ্জামান। গার্হস্থ্য দায়িত্ব পালন থেকে প্রায় বিরত রেখে আমাকে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা মুক্ত করতে তিনি সদা সচেষ্ট থেকেছেন। ক্ষুদ্র ধৈর্য দিয়ে নিজেকে অধিকার বঞ্চিত রেখে আমার অভিনিবেশ বাধাহীন রেখেছে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ুয়া স্বপ্নিল নীলাভ্র নক্ষত্র –আমার আত্মজ।

নীলাঞ্জনা সরকার

অবতরণিকা

সাহিত্যের বিবেচনায় একজন সাহিত্যিকের জীবনচেতনার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্যক ধারনা লাভ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বৈশ্বিক জীবনপ্রবাহকে লেখক কোন প্রেক্ষণবিন্দুতে অবলোকন করেন, তার পরিচয় লেখকের সাহিত্যকর্মে নিয়ত পরিকীর্ণ। জীবন-বীক্ষণ ও জীবনানুভবের সেই অসাধারণ বিন্যাসই তাঁর জীবনচেতনার আরেক নাম। সাহিত্যিকের জীবনবোধ ও তাঁর সাহিত্যরীতির বৈশিষ্ট্য মূলত সম্পৃক্ত ব্যক্তির মানসগঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বাংলা ছোটগল্পের বিষয়বৈচিত্র্য ও জীবনবোধের বিশ্লেষণে স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাঁর ছোটগল্প আধুনিক পাঠক সমাজের জন্য নতুন ও অনাবিল আনন্দ-অভিজ্ঞতার জগত উন্মোচন করে। তাঁর সমাজচেতনার গল্প, প্রেমচেতনার গল্প, বাৎসল্যচেতনার গল্প কিংবা অন্যান্য বিষয়ের গল্পের সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ বাংলা ছোটগল্পকে চমৎকারিত্ব প্রদান করেছে। ব্যক্তিমানস এবং কালিক প্রবণতার মিথষ্ক্রিয়ায় অচিন্ত্যকুমারের মনোলোকে তৈরি হয়েছিল শিকড় উন্মূলিত, অনিকেত মনোভাব। দ্বন্দ্বজর্জর ব্যক্তি মানুষের জীবনবোধে নেমে আসে বিচ্ছিন্নতার অন্ধকার, চিত্তযন্ত্রণা, নৈঃসঙ্গ্যপ্রবণতা ও অর্থ-বিত্ত শূন্যতার হাহাকার। বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিক মানুষের অন্তর্লোকে সৃষ্ট জীবনচেতনার বহুমাত্রিক প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর ছোটগল্পে। সমাজে বসবাসরত আধুনিক মানুষের জীবনচেতনা অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পে কীভাবে রূপায়িত হয়েছে আমার অভিসন্দর্ভের তা-ই প্রতিপাদ্য বিষয়।

‘*অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছোটগল্পে জীবনচেতনার রূপায়ণ*’ শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভে উপসংহার ব্যতীত পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে তাঁর শৈশব, শিক্ষাজীবন, সংসারজীবন, কর্মজীবন এবং সমাজ ও মানুষের মিথষ্ক্রিয়ায় লেখক অচিন্ত্যকুমার হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে কল্লোলযুগের অন্যান্য সাহিত্যিকদের সাথে অচিন্ত্যকুমারের তুলনামূলক আলোচনা। সাহিত্যে প্রতিফলিত তাঁদের জীবনবোধ, নৈঃসঙ্গ্যবোধ, সুখানুভূতি, দুঃখবোধ প্রভৃতির সাথে অচিন্ত্যকুমারের জীবনচেতনার সাযুজ্য, প্রভেদ, মতৈক্য এখানে গুরুত্ব পেয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর ছোটগল্পে জীবন-পরিবেশ বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। গল্পের অন্তর্নিহিত বোধ অনুযায়ী এ অধ্যায় মূলত তিনভাগে বিভক্ত। সমাজচেতনা, প্রেমচেতনা, বাৎসল্যচেতনা। অন্যান্য বিষয় নিয়েও তিনি সামান্য আলোচনা করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে তাঁর ভাবের অতিশয়োক্তি, সাহিত্যের পথে পালাবদল, জীবনীসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ অর্থাৎ জীবনচেতনার রূপরূপান্তর বিশ্লেষিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁর ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক পরিপ্রেক্ষিতের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। ছোটগল্পে অচিন্ত্যকুমারের জীবনজিজ্ঞাসা ও শৈলীসূত্রের লিপিবদ্ধ রূপ বর্তমান অভিসন্দর্ভের ‘উপসংহার’।

অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পকে খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে কিছু বিষয় লক্ষ্যযোগ্য হয়ে ওঠে। তাঁর গল্পে প্রেমের আশ্রয়ে মানবজীবনের রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাস, জীবনাকাঙ্ক্ষা, জীবনাবেগ এবং মধ্যবিত্তমানসের আবেগীরূপ উন্মোচিত হয়েছে। প্রেমকে অনুসন্ধান করেছেন প্রত্যক্ষতার সীমানায়। মানুষের আটপৌরে জীবনকে তিনি তাঁর অসাধারণ শিল্পসুষমাময় ভাষায় সাহজিক সারল্যে প্রকাশ করেছেন। গভীর মমত্ববোধ ও নিবিড় ভালবাসায় তাঁর ছোটগল্প হয়েছে কাব্যময় ও চিত্রাত্মক বর্ণনায় সমৃদ্ধ। জীবন ও জগতকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহযোগে। মানুষের জীবনকে সামগ্রিকভাবে অনুধাবন করতে চেয়েছেন অর্থনীতি, দারিদ্র্য, শোষণ, বঞ্চনা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে। যুদ্ধপরবর্তী বৈশ্বিক বিপন্নতার প্রেক্ষাপটে অচিন্ত্যকুমারের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত চরিত্র সমূহ কিভাবে সমাজ থেকে, সংসার থেকে, পরিবার থেকে, চিরন্তন মূল্যবোধ থেকে এবং আন্তঃমানবিক সম্পর্কবন্ধন থেকে হয়ে গেছে বিচ্ছিন্ন, সংযোগশূন্য তা-ই রূপায়িত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পে। জীবনচেতনার যে পরিচয় বিধৃত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পে তার স্বরূপ ও রূপ-রূপান্তর চিহ্নিত করাই এ গবেষণার মূল লক্ষ্য।

সূচিপত্র

অবতরণিকা		
প্রথম অধ্যায়	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাল	৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	কল্লোলের সাহিত্য ও প্রবণতা	২০
তৃতীয় অধ্যায়	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছোটগল্পে জীবনচেতনা	৪৪
	প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ সমাজচেতনা	৪৭
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ প্রেম ও দাম্পত্যচেতনা	১১৯
	তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ বাৎসল্যচেতনা	১৭০
চতুর্থ অধ্যায়	জীবনচেতনার রূপ-রূপান্তর	১৯৬
পঞ্চম অধ্যায়	ছোটগল্পে জীবনচেতনা: প্রাসঙ্গিক পরিপ্রেক্ষিত	২০৬
উপসংহার		২২১
পরিশিষ্ট		২২৫

প্রথম অধ্যায়

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাল

ভূদেব চৌধুরীর ভাষায় 'অচিন্ত্যকুমার জীবনের স্রোতে নিত্য ভাসমান; নীড়ের শান্তি আর সান্ত্বনা তাঁর নয়-তলায় নীল সমুদ্র, মাথার উপরে সুনীল আকাশ, নিরবধি কালের স্রোতে নিরুদ্দেশ জীবন যাত্রার অভিসারে ঢেউ-এর মাথায় মাথায় তার নির্বাধ অভিসার। তাই তিনি সীমার বন্ধনহারা।'[১] কল্লোলযুগের অন্যতম স্রষ্টা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রবীন্দ্রোত্তর কালে বাংলাসাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।'নীহারিকা দেবী' ছদ্মনামে আবৃত এই সৃজনশীল লেখক কল্লোলের শুভসংযোগের সূত্র ধরে যুক্ত হতে থাকলেন একই ভাব প্রবাহের নানা ধারা-উপধারার সঙ্গে। বিদ্রোহের বহ্নিতে বাংলা সাহিত্যকে তিনি দেখালেন নতুন পথ, নতুন পৃথিবী। ১৩৩৬ সালের কার্তিক সংখ্যা 'কল্লোলে' অচিন্ত্যকুমার 'আবিষ্কার' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহবাণী উদ্ধত কণ্ঠে ঘোষণা করে লিখেছিলেন–

'এ মোর অত্যুক্তি নয়, এ মোর যথার্থ অহংকার
যদি পাই দীর্ঘ আয়ু, হাতে যদি থাকে এ লেখনী
কারেও ডরি না কভু; সুকঠোর হউক সংসার,
বন্ধুর বিচ্ছেদ তুচ্ছ, তুচ্ছতর বন্ধুর সরণি।
পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর!
গভীর আত্মোপলব্ধি-এ আমার দুর্দান্ত সাহস,
উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতেছি নব-নর-জন্ম সম্ভাবনা;
অক্ষয়তুলিকা মোর হস্তে যেন রহে অনলস,
ভবিষ্যৎ বৎসরের শঙ্খ আমি-নবীন প্রেরণা!
শক্তির বিলাস নহে, তপস্যায় শক্তি আবিষ্কার,
শুনিয়াছি সীমাশূন্য মহা-কাল-সমুদ্রের ধ্বনি
আপন বক্ষের তলে; আপনারে তাই নমস্কার।
চক্ষে থাক আয়ু-ঊর্মি, হস্তে থাক অক্ষয় লেখনী।'[২]

বৈচিত্র্যমুখী নতুন সাহিত্য-জগৎ সৃষ্টির এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা ইতোপূর্বে এতটা দৃপ্ত প্রত্যয় নিয়ে আর উচ্চারিত হয় নি। এ কবিতায় রবীন্দ্র কাব্যসাহিত্যাদর্শ ও তাঁর সাহিত্যে চিত্রিত জগৎ থেকে অনেক দূরে সরে নতুন সাহিত্যভুবন নির্মাণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়েছে। কল্লোলের সুতীব্র রবীন্দ্রবিরোধিতা অচিন্ত্যকুমারের এই কবিতাকে উপলক্ষ করেই প্রাণময় হয়ে উঠেছিল।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মেধা ও মনন এতই সুদূরপ্রসারী যে তিনি কেবল মাত্র কাব্যবীণার আসরেই তাঁর প্রতিভার সুর-ঝঙ্কার তোলেন নি, উপন্যাস, ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মসাধক, জীবনী, সমালোচনা ও ছোটগল্প-প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর বিচিত্ররূপিনী, নানা শাখাপ্রবাহিনী সৃজন বৈচিত্র্যের শতমুখী নির্দশন রাখলেন। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর মনীষা, জীবনবোধ, ও শিল্পদৃষ্টির ছাপ সুস্পষ্ট ও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। তাঁর রচনাবৃত্ত পরিধি বিস্তারে ব্যাপক ও দিগন্তস্পর্শী। এই অবাধ বিচরণের পেছনে একদিকে যেমন ছিল সাহিত্যিকের বিপুল কল্পনাশক্তির অনন্য প্রতিভা তেমনি অন্যদিকে ছিল তাঁর ব্যক্তিজীবন অভিজ্ঞতার অতুল প্রসার। চিন্তাশক্তির প্রতুলতা, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং গদ্যশৈলীর মধ্যে ভাবনা প্রকাশের কঠিন নিয়মানুগত্যবোধ–যা প্রত্যেক সাহিত্যশিল্পীর পক্ষে প্রয়োজন, সেগুলো তাঁকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। তাঁর কাব্যে, ছোটগল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, কবিতায়, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কীয় গ্রন্থগুলো অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যকেই বহন করছে।

জন্ম ও শৈশব

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ১৯০৩ সালের ১৯ শে সেপ্টেম্বর (২রা আশ্বিন ১৩১০) তারিখে বাংলাদেশের নোয়াখালীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাজকুমার সেনগুপ্ত এবং মাতার নাম হেমলতা দেবী। বাংলাদেশের মাদারীপুর জেলার পালং থানার দাসর্তা গ্রামে রাজকুমার সেনগুপ্তের আদি নিবাস ছিল। মাদারিপুর এক সময় ফরিদপুর জেলার একটি মহুকুমা ছিল। অচিন্ত্যকুমারের পিতা রাজকুমার সেনগুপ্ত নোয়াখালী জেলা সদরে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলেন। এ কাজে তাঁর নামডাক ও পসার ছিল। তিনি দুবার দার পরিগ্রহ করেছিলেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রী বিধুমুখী পাঁচ সন্তানের জননী। তাঁর সন্তানদের নাম: বসন্তকুমার, হেমাঙ্গিনী, সরোজিনী, অক্ষয়কুমার এবং চারুশীলা। দ্বিতীয়া স্ত্রী হেমলতা দেবীর সন্তান সংখ্যা সাতজন। এঁদের নাম জিতেন্দ্রকুমার, স্নেহলতা, সুবর্ণলতা, কনকলতা, অচিন্ত্যকুমার, পবিত্রকুমার ও কল্যাণকুমার। জিতেন্দ্রকুমার কলকাতা হাইকোর্টের খ্যাতিমান আইনজীবী ছিলেন। পবিত্রকুমার চিকিৎসক, তিনি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ফারমাকোলজির অধ্যাপক ছিলেন। কল্যাণকুমার প্রকৌশলী, কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টে কাজ করতেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছেলেবেলা অর্থাৎ তাঁর শৈশব ও কৈশোরজীবন কেটেছে নোয়াখালিতে। এখানকার মধুরস্মৃতি তিনি দীর্ঘজীবনব্যাপী হৃদয়ের মণিকোঠায় লালন করেছেন। নোয়াখালি এবং 'জালছিঁড়া ভাঙন' নদীর ছোট ছোট স্মৃতি তাঁর মনে বহু বছর পরেও ঢেউ তুলত। নগরের একধারে 'ওয়েস্ট এন্ড লজ'- এর কথাও তাঁর স্মৃতিতে অমলিন ছিল। অবারিত মাঠ, শান্ত সুশীতল নদী, ঘরবাড়ি, ফুল ফসলে ভরা প্রকৃতি তাঁর স্মৃতিতে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছিল। নোয়াখালি জেলা স্কুলের ছাত্র অচিন্ত্যকুমার তাঁর শৈশব সম্পর্কে বলেছেন:

'ছোটবেলায় আমার হাঁপানী ছিল। খুব ভুগতাম। সেই সময়ে 'ইসপ্‌স্‌ ফেবল্‌স'-এর গল্পগুলো নিজের খেয়ালেই বাংলায় অনুবাদ করতাম। কবিতায় দিব্যি দাঁড়িয়েছিল সেগুলো। আর একবার শরৎকালের বর্ণনা দিয়ে একটা রচনা লিখে আমার বেশ নাম হয়েছিল স্কুলে। অবশ্য এর পেছনে বাবার সাহায্য ছিল অনেকটা। বাবা আমায় বসে বসে পড়াতেন।'[৩]

অচিন্ত্যকুমারের পিতা রাজকুমার সেনগুপ্ত ১৯১৬ সালে লোকান্তরিত হন। অগ্রজ জিতেন্দ্রকুমার কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন পিতার মৃত্যুর দু'বছর আগে থেকেই। পিতার মৃত্যুর দু বছর পর পর্যন্ত অচিন্ত্যকুমারদের পরিবার নোয়াখালিতে বসবাস করেন। ১৯১৮ সালে পুরো পরিবার নোয়াখালি থেকে কলকাতার ভবানীপুরের বকুলবাগান রোডে জিতেন্দ্রকুমারের কাছে চলে আসে। অচিন্ত্যকুমারও পরিবারের সঙ্গে কলকাতায় আসেন। এসেই আর্থিক অনটনের শিকার হন। কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী অচিন্ত্যর অগ্রজ জিতেন্দ্রকুমার পরিবারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। রূঢ় বাস্তবতা ও আর্থিক টানাপোড়েনের মুখোমুখি অচিন্ত্যকুমার নিজে টিউশনি করে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন:

'দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম সে যুগের অনেক সাহিত্যকারকেই করতে হয়েছে। অচিন্ত্য সেদিক দিয়ে বিশেষ ব্যতিক্রম কিছু নয়। কিন্তু এক জায়গায় সে স্বতন্ত্র এই কারণে যে, সে সংগ্রামেও ক্লান্ত নিঃশেষিত না হয়ে সাহিত্যের জন্য প্রাণ- প্রেরণার উদ্বৃত্ত সে যথেষ্ট বাঁচিয়ে রেখেছে। দামী বই কেনার সংস্থান হয় নি বলে আগাগোড়া সমস্ত বই অচিন্ত্য টুকে তখন সংগ্রহ করেছে জানি, কলেজের খরচা জোগাতে টিউশনি ত করেইছে। তা সত্ত্বেও সাহিত্যরচনায় কিছুমাত্র ভাটা পড়ে নি।'[৪]

নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন-

'তখন আমি এবং আমার বন্ধু প্রেমেন্দ্র মিত্র মোটা মোটা বাঁধানো খাতায় গল্প-কবিতা লিখি। লিখি ফাউন্টেন পেনে নয়-হায়, ফাউন্টেন পেন কেনবার মতো আমাদের পয়সা তখন কোথায়–লিখি বাংলা কলমে, সরু জি মার্কা নিবে। অক্ষর কত ছোট করা যায়, চলে তার অলক্ষ্য প্রতিযোগিতা।"[৫]

কর্মজীবনে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত অচিন্ত্যকুমার পত্র পত্রিকায় লিখে, বই প্রকাশ করে এবং ছাত্র পড়িয়ে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করেছেন। মুনসেফের চাকরি নিয়ে কলকাতা ত্যাগ করার সময় তিনি কলতাকায় স্থায়ীভাবে চলে

আসা বুদ্ধদেব বসুকে তাঁর নিজের টিউশনি দিয়ে যান। তাঁর এই ছাত্রটি ছিলেন পরবর্তীকালে সিগনেট প্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকাশক দিলীপকুমার গুপ্ত।'[৬]

শিক্ষাজীবন

নোয়াখালিতে অচিন্ত্যকুমারের শিক্ষাজীবন শুরু হয়। ১৯১৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি নোয়াখালি জেলা স্কুলে পড়াশুনা করেন। পরিবারের সাথে কলকাতায় এসে অচিন্ত্যকুমার ভবানীপুর অঞ্চলের বিখ্যাত সাউথ সুবার্বান স্কুলে ১৯১৮ সালে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন। স্কুলে ভর্তি হওয়ার দিনের স্মৃতি তিনি চিত্রিত করেন এভাবে-

'ভর্তি হওয়ার দিন দাদার কালো আলপাকার কোট গায়ে দিয়েই যেতে হলো, কোটটা পুরনো, গায়েও একটু বড়– তা হোক, এর চেয়ে ভাল আর জুটবে কোথা থেকে। হেডমাস্টার মশায়ের সপ্তম এডওয়ার্ডের মতো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, আর পোষাকও সে আমলের সাহেবী–কেতার। গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন–
ঠাকুরের নাম কী? ঠাকুর বলতে যে বাবা বোঝায়, তখন কি তা জানতাম? বললাম, আমাদের বাড়িতে ঠাকুর নেই, মা-ই রান্না করেন।'[৭]

তখন পরিবারে যথেষ্ট দারিদ্র্য ছিল। তিন আনা গজের মার্কিন কোরা কাপড়ের জামা গায়ে দিয়ে স্কুলে গেলে সহপাঠীরা সিল্কের জামা বলে ঠাট্টা করেছে, 'বাঙাল' বলে বিদ্রূপ করেছে। পরীক্ষায় ভাল ফল করার পর এই ব্যঙ্গ-পরিহাস বন্ধ হয়। সাউথ সুবার্বান স্কুলের ছাত্র ছিলেন গোকুলচন্দ্র নাগ, কালিদাস নাগের দাদা, পরবর্তীকালে 'কল্লোল' পত্রিকার সহ সম্পাদক। প্রেমেন্দ্র মিত্র অচিন্ত্যকুমারের সহপাঠী ছিলেন। দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হবার পর দুজনের পরিচয় গাঢ় হয়। অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন-

'প্রেমেন আমার স্কুলের সঙ্গী। ম্যাট্রিক পাশ করেছি এক বছর। সাউথ সুবার্বান ইস্কুলে ফার্স্টক্লাসে উঠে প্রেমেনকে ধরি। সে-সব দিনে ষোলো বছর না পুরলে ম্যাট্রিক দেওয়া যেত না। প্রেমেনের এক বছর ঘাটতি পড়েছে। তার মানে ষোলোকলার এক কলা তখনো বাকি।'[৮]

অচিন্ত্যকুমার ও প্রেমেন্দ্র মিত্র দুজনেই ছিলেন ক্লাসের সেরা ছাত্র। স্কুলের বাংলার পন্ডিত রণেন্দ্রগুপ্ত তাঁদের দুজনের লেখার বেশ প্রশংসা করতেন এবং আরো ভালো লেখার জন্য অবিরাম উৎসাহ দিতেন। সেই সময় সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন-

'একদিন দুঃসাহসে ভর করে তাঁর (রণেন্দ্র গুপ্ত) হাতে আমার কবিতার খাতা তুলে দিলাম। তখনকার দিনে মেয়েদের গান গাওয়া বরদাস্ত হলেও নৃত্য করা গর্হিত ছিল, তেমনি ছাত্রদের বেলায় গদ্যরচনা সহ্য হলেও কবিতা ছিল চরিত্রহানিকর। তাছাড়া কবিতার বিষয়গুলিও খুব স্বর্গীয় ছিল না, যদিও একটা কবিতা 'স্বর্গীয় প্রেম' নিয়ে লিখেছিলাম। কিন্তু পণ্ডিত মশায়ের কি আশ্চর্য ঔদার্য! পঙ্গু ছন্দ, অপাঙ্‌ক্তেয় বিষয়, সংকুচিত কল্পনা- তবু যা একটু পড়েন, তাই বলেন চমৎকার। বলেন, ' লিখে যাও, থেমো না, নিশ্চিতরূপে অবস্থান করো। যা নিশ্চিতরূপে

অবস্থান তারই নাম নিষ্ঠা। আর, শোনো'- কাছে ডেকে নিলেন। হিতৈষী আত্মজনের মত বললেন, 'কিন্তু পরীক্ষা কাছে, ভুলো না।'[৯]

১৯২০ সালে সাউথ সুবার্বান স্কুল থেকে অচিন্ত্যকুমার ও প্রেমেন্দ্র মিত্র দুজনই কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন। দুজনই বাংলা পরীক্ষায় 'ভি' পেয়েছিলেন। অচিন্ত্যকুমার পেয়েছিলেন এম.এল.ভি। অর্থাৎ গণিত, ২য় ভাষা, বাংলায় পুরো নম্বরের ৫ ভাগের ৪ অংশ, প্রথম বিভাগ, বয়স তখন ষোল বছর চার মাস। ঐ সময়টা ছিল নন- কোঅপারেশনের বানডাকা দিন, চারদিকে অস্থির উন্মাদনা। সে বছর সাউথ সুবার্বান কলেজে, বর্তমানে আশুতোষ কলেজ, তিনি আই.এ ক্লাসে ভর্তি হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়ির আঙিনা দেখা যায় কলেজের বারান্দা থেকে। অন্য দেশবরেণ্য নেতাদেরও দেখা যায়। কলেজের তখন টলোমলো অবস্থা। অচিন্ত্য এতে অবিচল থাকলেও প্রেমেন্দ্র এতে ভেসে যান। কলেজে পড়ার ফাঁকে শুরু হয় 'প্রবাসী' পত্রিকায় কবিতা পাঠানো। তখন 'প্রবাসী'র সহ-সম্পাদক ছিলেন প্যারীমোহন সেনগুপ্ত। কবিতা প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি খুব কড়া। লেখাগুলো একে একে সব ফেরত আসছে দেখে দুই বন্ধুতে মিলে ঠিক করে, এখন থেকে মেয়েদের নাম লিখে কবিতা পাঠানো হবে। অচিন্ত্যকুমার 'নীহারিকা' ছদ্মনামে সদ্যফেরত একটি কবিতা পাঠালেন 'প্রবাসী'তে এবং তা মনোনীত হয়ে যায়। এই কবিতাটির নাম 'প্রভাতে' (১৩২৮ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন)। এই কবিতাটিকে বলা যেতে পারে অচিন্ত্যকুমারের (ছদ্মনামে অবশ্য) পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম কবিতা।

১৯২২ সালে প্রথম বিভাগে আই.এ পাশ করেন। খুব মেধাবী ছিলেন তিনি। ১৯২২ থেকে ১৯২৪-এর মধ্যে কবিতা, উপন্যাসের পাশাপাশি শুরু হয় গল্প লেখা। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হলো –'নায়ক নায়িকা' (১৩২৯ বঙ্গাব্দ), তার আগে 'প্রাচী' পত্রিকায় বেরিয়েছিল 'নর্দমা' (১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড) যা কথিকা গল্প হিসেবে পরিচিত। ১৯২৩ সালের মে মাসে (১৩৩০ বঙ্গাব্দ, ১লা জ্যৈষ্ঠ) চার বন্ধু মিলে গড়ে তুললেন-'আভ্যুদয়িক সঙ্ঘ'। চার বন্ধু হলেন- শিশিরচন্দ্র বসু, বিনয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্যকুমার। অচিন্ত্যর ভাষায় আভ্যুদয়িক সঙ্ঘের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো 'মনের সুখে সাহিত্যিক গিরির আখরাই দেওয়া। সেই গল্প কবিতা পড়া, সেই পরস্পরের পিঠ চুলকানো। সেই চা, সিগারেট, আর সর্বশেষে একটা মাসিক পত্রিকা ছাপাবার রঙিন জল্পনা কল্পনা।'[১০] তাছাড়া হৈ হুল্লোড় করে দলবেঁধে বেড়াতে যাওয়া, নৌকা বাওয়া, পায়ে হাঁটা প্রতিযোগিতা- এইসব। 'চতুষ্কোণ' নামে একটি সংযুক্ত উপন্যাস এই চার বন্ধু মিলে শুরু করেছিলেন। শিশিরচন্দ্র বসু ও বিনয় চক্রবর্তী অন্যত্র চলে যাওয়ায় উপন্যাসটি শেষ হয় নি। তবে এই একত্র উপন্যাস লেখার কাজটি সফল হয় 'বাঁকালেখা'য়। ছাত্রাবস্থায় সাহিত্যচর্চা এবং কল্লোল এর সাহিত্যিক সভায় নিয়মিত যোগ দিলেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মনোযোগী ও সচেতন।

তিনি খুব ভালো আবৃত্তি করতে পারতেন। সুমথনাথ ঘোষ লিখেছেন–

'রবীন্দ্রনাথের কবিতা, অনেকেই আবৃত্তি করেন, অনেক শুনেছি, কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের কণ্ঠে যে ভাবে কাব্যের অন্তর্নিহিত অনুভূতি রূপসী মূর্তি হয়ে ওঠে এমন আর কখনো শুনিনি। কবিতার মধ্যে থেকে কাব্যের আত্মাকে টেনে এনে যেন তিনি শ্রোতাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন! চিনিয়ে দেন।' [১১]

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন-

'... আমি 'পড়া' ছেড়ে দিয়ে 'লেখা' ধরলাম, আর এ কেমন ধারা ছেলে লেখা এবং পড়া, দু'দিক চালিয়ে যাচ্ছে।... সে যে কলেজের একজন খুব ভাল স্টুডেন্ট –কাউকে সে কথা বুঝতে দেয় নি। রোজ এসেছে 'কল্লোল' অপিসে, সমানে আড্ডা দিয়েছে, তারপর হঠাৎ একদিন সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে খুব ভাল করে এম. এ. আর ল পাস করে গম্ভীর মুখে এসে বসেছে আমাদের কাছে।'[১২]

অচিন্ত্যকুমার সাউথ সুবার্বান কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্সসহ বি.এ পাশ করেন ১৯২৪ সালে। একই বছরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ ক্লাসে ভর্তি হন এবং ১৯২৬ সালে এম. এ পাস করেন। এম. এ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অচিন্ত্যকুমার আইন পড়া শুরু করেছিলেন। ১৯২৯ সালে তিনি আইন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন এখানেই সমাপ্ত হয়।

কর্মজীবন

অচিন্ত্যকুমার কলেজজীবন থেকেই ছাত্র পড়িয়েছেন ও বই প্রকাশ করেছেন শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য। চাকরি পাবার পূর্ব পর্যন্ত এই দুটি কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে চালিয়ে গেছেন। ১৯২৯ সালে ছাব্বিশ বছর বয়সে অচিন্ত্যকুমার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন। নিয়মিত লেখালেখির পাশাপাশি চাকরি খুঁজেছেন তিনি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি এবং আইনের প্রথম শ্রেণির ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে চাকরি যোগাড় করা সহজ সাধ্য হয়ে ওঠেনি। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা তখন কলকাতা হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী; অচিন্ত্যকুমার আইন পেশা বেছে নেবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে পেশায় তিনি ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেন নি।

' পেশা শুরু করতে গিয়েও খরচ কম নয়। বলা বাহুল্য, মোকদ্দমা যোগাড় করবার জন্য প্রায় প্রত্যেক উকিলেরই টাউট থাকে, বিশেষ করে নূতন উকিলদের। তাঁর টাউট তাঁকে উপদেশ দিয়েছিল: নূতন উকিল, খুব ভালো সাজগোজ করবেন। যারা কথা বেচে খায়, দেখেন না তারা কেমন সেজে- গুজে থাকে। -কিন্ত তার জন্য অর্থ কোথায়?

সেই টাউটই একখানা ছোট্ট তক্তপোষ ও একখানা মাদুর কিনে এনে আলিপুর কোর্টের বটতলায় উকিল অচিন্ত্যকুমারের সেরেস্তা বানিয়ে দিয়েছিল। যাই হোক প্রথম মাসে সামান্য কয়েকটি টাকা হাতে এলো। বাড়ি ফিরে মাকে দিতেই তিনি অচিন্ত্যকুমারের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের এক ঐশ্বর্যময় স্বপ্ন দেখেছিলেন হয়তো। বিধাতা

হাসলেন। মাসান্তে টাউট এসে মাইনে চাইল। অচিন্ত্যকুমার উত্তর দিলেন, মাইনে দেব কোত্থেকে? আপনি মামলা নিয়ে আসুন, তার থেকে কমিশন নিন।

অচিন্ত্যকুমার পরদিন কোর্টে গিয়ে দেখলেন, তক্তপোষ ও মাদুর দুটিই উধাও এবং টাউট বেপাত্তা। অন্য উকিল মক্কেল খোঁজে, অচিন্ত্যকুমার টাউট খুঁজে বেড়ান। আরো কিছুদিন বৃথা আনাগোনা করে দৃঢ় চিত্তে বাড়িতে এসে বসলেন অচিন্ত্যকুমার। যদি চাকরি পান তো পাবেন নচেৎ ওকালতিতে এখানেই ইস্তফা।'[১৩]

'কল্লোল' এর সহ সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগের মৃত্যুর পর অচিন্ত্যকুমার ধীরে ধীরে 'কল্লোল' সম্পাদনার দায়িত্বভার অলিখিতভাবে গ্রহণ করেন। তবে এটি নিয়মিত কোন চাকরি ছিল না। ১৯৩০ সালে তিনি কিছুকালের জন্য উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিচিত্রা' পত্রিকায় মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে সহসম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের মন্তব্য : 'কল্লোলে'র শেষ বছরে (১৩৩৬ সালের পৌষ সংখ্যার পর) 'বিচিত্রা'য় চাকরি নিলাম। আসলে প্রুফ দেখার কাজ, নাম সাব-এডিটর। মাইনে পঞ্চাশ টাকা।'[১৪]

১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অচিন্ত্যকুমার অস্থায়ী মুনসেফ পদে চাকরিতে যোগ দেন। বহরমপুরে ছিল তাঁর প্রথম পোস্টিং। দুশো পচাঁত্তর টাকা বেতন ছিল মাসে। স্থায়ী মুনসেফের ছুটিজনিত পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে তিনি মুনসেফ নিযুক্ত হন। ১৯৩১ সালেই একই পদে আবার নিযুক্ত হয়ে তিনি বহরমপুরে যান। সেখানেই তিনি ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত অস্থায়ী মুন্সেফ হিসেবে মাঝে মাঝে কাজ করেছেন।

'১৯৩৪ সনে আবার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। বর্তমান বাংলাদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীসমর সেনের পিতা সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় তখন আমতার (হাওড়া জেলা) মুনসেফ। তিনি বদলি হতে সেই জায়গায় নিয়োজিত হলেন অচিন্ত্যকুমার। এখানে রইলেন দীর্ঘ আড়াই মাস। নীহারকণা দেবীকে নিয়ে ছোট্ট সংসার পাতলেন সেখানে। অবশ্য প্রায় প্রতি সপ্তাহেই কলকাতা।...অস্থায়ী হলেও আমতার পরে তাঁর চাকরি জীবনে আর ছেদ পড়ে নি। পরে ১৯৩৪ সনে তিনি বদলি হয়ে গেলেন সুদূর কুড়িগ্রামে (রংপুর)। সেখান থেকে চাকরিতে স্থায়ী হয়ে ১৯৩৫ সনে বদলি হয়ে যান নেত্রকোণায়...।' [১৫]

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য বলেছেন - 'মুন্সেফি কাজের মধ্য থেকেও অনেক গল্পের খোরাক তিনি সংগ্রহ করেছেন। আসামী, ফরিয়াদীদের চরিত্র, বিভিন্ন মামলার কাহিনী তাঁর লেখার উপাদান হয়ে গিয়েছে। এছাড়া গল্পের সন্ধানে তিনি দরকার পড়লে গুলির আড্ডাতেও যেতে কুণ্ঠিত হন নি।... তাঁর 'কাঠ-খড়-কেরাসিন', 'চাষাভূষা', বা 'সারেঙ'-ই তার প্রমাণ।'[১৬] গৌরীশঙ্কর আরো বলেছেন- 'সরকারী কাজের ব্যাপারে সততা বজায় রাখার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন।' তাঁর এক সহকর্মী তাঁর যোগ্যতার আর এক উদাহরণ দেন -'অচিন্ত্যবাবু আলিপুরে সাবজজ হইয়া আসিলেন। বহু আপীলের শুনানী মুলতুবী ছিল বলিয়া জজসাহেব তাঁহাকে আপীল শুনিবার ভার দিলেন।'[১৭] এই বদলির চাকরি যে তাঁর গল্পের চেহারা বদলে দিচ্ছিল এ সম্পর্কে লেখকের স্বীকারোক্তিও প্রাসঙ্গিক- 'মুনসেফি নিয়ে বাংলাদেশের দূর মফস্বলে, গ্রামে -শহরে, পুরে-গঞ্জে, চৌকিতে-মহকুমায় ঘুরেছি- দু

যুগেরও বেশি– তার কত দৃশ্য, কত শোভা, ঘটনার কত বিচিত্র সম্পদ। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বদলি হয়েছি, নতুন জায়গার দূরত্ব ও চরিত্র ভেবে মন বিষণ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু সেই জায়গায় পৌঁছে দেখেছি, গল্পের কত শত উপাদান। চিরজন্মের যে পরিচিত সেই সাহিত্যের সঙ্গেই সাক্ষাৎকার হয়েছে। দেখেছি শুধু নদী-নালা, খাল-বিল, মাঠ-খেত, গাছ-গাছালি নয়, দেখেছি মানুষ, কত রকমের মানুষ, আর কত তার মহিমা। শুধু শহুরে সভ্য শিক্ষিতেরাই নয়, গ্রামের চাষাভুষা, হাড়ি-মুচি, ডোম-ডোকল, সারেং-খালাসি, মেথর-ধাঙর সবাইকে ডেকে এনেছি সমান পঙ্‌ক্তিভোজে। দেখেছি যা কিছু মানবীয় তাই মাননীয়, তাই প্রাণের পরম আদরের ধন, পরম সন্ধানের বস্তু।'[১৮]

'তিনি একসঙ্গে অনেক রকম লেখা লিখতেন। লেখার জন্য কোন মুডের প্রতীক্ষা করতেন না। লেখা, তিনি বলেন, তাঁর কাছে উপাসনা। লেখা ও লেখার ভাবনা ছাড়া তাঁর আর কোন মুহূর্ত নেই। লিখতে বসার আগে বা পরে কোনো পুজো আহ্নিক ইত্যাদি কিছু করেন না। তবে সব সময় নাম জপে থাকতে চেষ্টা করেন।

১৯৪১ -এ রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর সিগারেট ছেড়ে দেন। কিন্তু তার আগে হেভি স্মোকার ছিলেন। চা সকালে ও বিকালে দু কাপ খান, অসময়ে বাড়তি এক আধ কাপ কখনো এখানে ওখানে জোটে। আর কেনো নেশা নেই।

তিনি দ্রুত লিখতে পারতেন না, ধীরে ধীরে ভেবে ভেবে লিখতেন। তাই তাঁর লেখায় কাটাকুটি কম থাকে। যদি বেশি পরিবর্তনের দরকার মনে করতেন তবে গোটা পৃষ্ঠাটাই ছিঁড়ে ফেলে নতুন করে লিখতে বসতেন।'[১৯]

অচিন্ত্যকুমার ১৯৪৫ সালে বাংলাদেশের পটুয়াখালি এবং ১৯৪৭ সালে মুর্শিদাবাদের কান্দিতে মুনসেফ ছিলেন।[২০] আসানসোলে অবস্থাকালে তিনি ছিলেন সাব-জজ। ১৯৫৭ সালে আলিপুরের জেলা জজ এবং ১৯৫৯ সালে ল' কমিশন স্পেশাল অফিসার হিসেবে তিনি কর্মরত ছিলেন। ১৯৬০ সালে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[২১]

সংসার-জীবন

অচিন্ত্যকুমার নিজেকে গভীরভাবে জড়িয়েছিলেন 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে। তাঁর এই মানস যোগাযোগ কতটা গভীর ও আন্তরিক ছিল তা একটি প্রতিজ্ঞা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি লিখেছেন -

'কল্লোল'-আপিসে একবার একটা গম্ভীর সভা করেছিলাম আমরা।...সেদিন ঠিক হয়েছিল 'কল্লোল'কে ঘিরে একটা বলবান সাহিত্য-গোষ্ঠী তৈরি করতে হবে। যার মধ্য দিয়ে একটা মহৎ প্রেরণা ও বৃহৎ প্রচেষ্টায় বাংলাসাহিত্য শ্রী সম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। একটা কিছু বড় রকমের সৃষ্টি, বড় রকমের প্রজ্ঞা।...দীনেশদাকে ঘিরে সেদিন বসেছিলাম আমরা ক'জন। স্থির করেছিলাম, সাহিত্যিক সিদ্ধিও যোগজ সিদ্ধি- কেউ তাই বিয়ে করব

না।...শুধু তাই নয়, থাকব একসঙ্গে, এক ব্যারাকে, এক হাঁড়িতে ! সকলের আয় একই লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে জড়ো হবে, দর বুঝে নয় দরকার বুঝে হবে তার সমান বাঁটোয়ারা। সুন্দর স্বপ্নের উপনিবেশ স্থাপন করব।' [২২]

বিয়ে না করার এই দুর্দান্ত প্রতিজ্ঞা শেষ পর্যন্ত টেকে নি। তাঁর বিয়ের খবর শুনে বুদ্ধদেব বসু চিঠিতে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তা এ রকম -

'হঠাৎ বিয়ে করে ফেললে যে? আমার আশঙ্কা হয় কি জানো? বিয়ে করে তুমি একেবারে তৈলস্নিগ্ধ সাধারণ ঘরোয়া বাঙালি না বনে যাও। 'গৃহশান্তিনিকেতনের' আকর্ষণ কম নয়, কিন্তু সেটা পার্থিব– এবং কবি প্রতিভা দৈব ও শতবর্ষের তপস্যার ফল। বাঁধা পড়ার আগে এই কথা ভালো করে ভেবে নেবে তো?' [২৩]

১৯৩০ সালের অগাস্ট মাসে সাতাশ বছর বয়সী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সতেরো বছরের মেয়ে নীহারকণাকে বিয়ে করেন। রহস্যচ্ছলে একদা অচিন্ত্যকুমার বলেন, 'ছদ্মনামের 'নীহারিকা দেবী' এবার নীহারকণা হয়ে দেখা দিলেন।' নীহারকণার পিতা উমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন পোস্টাল-সুপারিনটেনডেন্ট। নিরঞ্জন চক্রবর্তী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বিয়ের ঘটনা বর্ণনা করেছেন বিস্তৃতভাবে -

'সরকারি চাকরি হতে অবসর গ্রহণের পরে উমেশবাবু ভাগ্যকুল জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করেন। তাঁর অফিস কলকাতার শোভাবাজারে, ভাগ্যকুলের রায়দের বাড়িতে। সপরিবারে থাকেন বাগবাজারের দিকে গোকুল মিত্র লেনে। নীহারকণা পড়েন বেথুন স্কুলে। অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে বিবাহের পূর্বে তাঁর মোটেই পরিচয় ছিল না। এই দুই পরিবারের মধ্যে একটু সুদূর সম্পর্ক ছিল। অচিন্ত্যকুমারের মা হেমলতা দেবী তাঁর এক জ্যেঠতুতো বোনের মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে উমেশচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে নীহারকণাকে দেখেন। তখন কন্যার বয়স মাত্র দশ। মেয়েটিকে দেখে তাঁর খুব পছন্দ হয়। তখনই হেমলতা দেবী নীহারকণার মাতার নিকটে প্রস্তাব রাখেন যে, অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে কন্যাটিকে খুব মানাবে। কন্যার মা বলেন, ভবিতব্যে থাকলে এ বিবাহ হবে। শেষ পর্যন্ত বিবাহটি হলো। অবশ্য অভিভাবকদের এমন একটি শলাপরামর্শ যে অচিন্ত্যকুমারের শ্রুতিগোচর হয় নি তা নয়। বিবাহের পরে তিনি তাঁর ডাইরী খুলে নববধূকে তাঁর নামটি দেখিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এই সময়েই অচিন্ত্যকুমারের শ্রেষ্ঠ লিরিক কাব্যগ্রন্থ এবং প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অমাবস্যা' প্রকাশিত হয় (জ্যৈষ্ঠ১৩৩৭)।

অচিন্ত্যকুমারের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় সেই গোকুল মিত্র লেনে। পাত্রীপক্ষকে খবর পাঠানো হলো, বরের সাহিত্যিক বন্ধুরা প্রায় ত্রিশজন যাবেন বরযাত্রী হয়ে এবং তাঁদের মধ্যে থাকবেন কাজী নজরুল ইসলাম। কাজী থাকবেন বলে যদি কারো দ্বিধা হয়, তবে যেন ঐ ত্রিশজনের জন্য ভিন্ন বন্দোবস্ত করা হয়। অবশ্য দ্বিধার কোনও প্রশ্ন উঠে নি এবং উমেশচন্দ্র এঁদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্তই করেছিলেন। তৎকালীন 'আধুনিক' সাহিত্যিকদের প্রায় সকলেই বরযাত্রী। নজরুল তো পাত্রীপক্ষের বাড়িতে গিয়ে বরযাত্রীদের জন্য আয়োজিত ঘরটিতে দারুণ আড্ডা জমিয়ে দিলেন এবং অনতিকাল পরেই শুরু হলো গান। ফল হলো এই যে, ছাদনাতলায় রইল শুধু বর, কনে ও পুরোহিত ! অভিভাবকেরা তো তখন অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত।

এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো বৌভাতের দিনেও। নিমন্ত্রিতগণ নববধূকে দেখবেন কি, তাঁদের ভিড় তখন উপচে পড়ছে নজরুল তখন গানে যে ঘরে মত্ত সেখানে। একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছেন তিনি। গাইলেন, 'মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর'। বেশ ক'খানা গানের পরে যখন শুরু করলেন 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' এবং চল্‌রে চল্‌রে চল্' তখন সকলে মিলে কোরাস্ ! এদিকে একা ঘরে একাকিনী নানা-আভরণ-ভূষিতা নববধূর চোখে জল।'[২৪]

ব্যক্তিত্ব সান্নিধ্য

জন্ম ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রিত বিশাল জীবনপ্রবাহে মানুষ বিভিন্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে তার অভিজ্ঞতার সীমানাকে পরিপূর্ণ করে তোলে। এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অচিন্ত্যকুমারের সমগ্র জীবনে বহু ব্যক্তির সান্নিধ্য তাঁর জীবনবোধকে বৈচিত্র্যপিয়াসি ও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছিল।

তিনি চাকরিসূত্রে বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়িয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়েছিলেন। সেখানেও অনেক ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। এই চমকপ্রদ জীবনাভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিত্ব সংস্পর্শ তাঁর সাহিত্যে নানাভাবে চিত্রিত হয়েছে। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে যে-সব সাহিত্যপ্রতিভার সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন :

অজিত চক্রবর্তী, অন্নদাশঙ্কর রায়, অমলেন্দু বসু, অমিয় চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কামিনী রায়, কালিদাস নাগ, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোকুলচন্দ্র নাগ, জগদীশ গুপ্ত, জসীম উদ্‌দীন, জীবনানন্দ দাশ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশরঞ্জন দাশ, কাজী নজরুল ইসলাম, নরেশ সেনগুপ্ত, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বনফুল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, মনীশ ঘটক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মুরলীধর বসু, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, শিশিরকুমার ভাদুরী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাশ, হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং হুমায়ুন কবীর।

চিঠিপত্রের মাধ্যমেও তিনি বিশ্বের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগস্থাপন করেছেন। তাঁরা হলেন - রমাঁ রলাঁ, রলাঁর বোন মাদলিন রলাঁ, জাসিন্তা বেনাভাঁতে, যোয়ান বোয়ার, ন্যুট হামসুন, এইচ. জি. ওয়েলস এবং ইয়েন নেগুচি।

অচিন্ত্যকুমারের অনুভূতিতে প্রথম রবীন্দ্রদর্শন ছিল দেবদর্শন সমতুল্য, তিনি তা ব্যক্ত করেছেন এভাবে– 'ধ্যানে সে মূর্তি ধারণ করলে দেহ মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।...সংসারে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র ব্যতিক্রম, যার বেলায় তোমার কল্পনাই পরাস্ত হবে, ...তাঁর সঙ্গে ক্ষণকালের পরিচয়ই একটি অনন্তকালের ঘটনা।' [২৫]

১৯৬০ সারে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি নিজেকে পুরোপুরি সাহিত্যকর্মে নিয়োজিত করেন। নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই সাহিত্যকর্মী তাঁর সাহিত্যে জীবন অভিজ্ঞতার রূপায়ণ করেন। অবসর গ্রহণের আগে এবং পরে তিনি সৃজনশীল সাহিত্যের পাশাপাশি রচনা করেছেন ভারতীয় ধর্মগুরুদের জীবনীগ্রন্থ। তাঁর রচিত জীবনীসাহিত্যের প্রায় প্রতিটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। এসব রচনা নিছক ধর্মগুরুদের জীবনতথ্যে আকীর্ণ নয়, অচিন্ত্যকুমার এদের প্রকরণে যোগ করেছেন উপন্যাসের রচনারীতি এবং আবেগতরল ভাষা। এগুলোর পাশাপাশি সৃজনশীল রচনা নিয়েও তিনি নিরন্তর ভেবেছেন, লিখেছেন কবিতা, উপন্যাস ও ছোটগল্প। 'জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন নিদারুণ অধ্যবসায়ী। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব থেকেই চোখের অন্ত্রে রক্তক্ষরণের জন্য লেখাপড়া করতে কষ্ট হতো, শেষ পর্যন্ত তা-ও সম্ভব ছিল না। তখনো তিনি নিরস্ত হলেন না। লেখার জন্য লোক রেখে অসুস্থ শরীরেও তিনি কাজ চালিয়ে গেছেন।'[২৬] সব মিলিয়ে বলা যায়, প্রজ্ঞার গাম্ভীর্য ও কথাসাহিত্যের সরসতা, দার্শনিক তথ্য ও কাব্যের বিদ্যুৎচ্ছটা, যুক্তি ও আবেগের ভারসাম্যে গড়া হলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১৯৭৬ সালের ২৯ শে জানুয়ারি (বাংলা ১৩৮৩ সাল) বৃহস্পতিবার রাত ৯:৫৫ মি. তিনি তাঁর ২৩ নং রজনীসেন রোড কলকাতার বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন।

পুরস্কার

সৃজনশীল প্রতিভামাত্রই আত্মপ্রকাশের প্রণোদনায় আকুল। সাহিত্যক্ষেত্রে জীবনব্যাপী যুক্ত থেকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রশংসা ও সুনাম অর্জন করেছেন। সর্বপ্রথম ১৯২৮ সালে তাঁর 'তারপর' নামে গল্পটি 'কুন্তলীন' পুরস্কার লাভ করে। এটি ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ঘটনা, পরের বছর ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯২৯ সালে 'বিদ্যুৎ' গল্পটি পুনরায় 'কুন্তলীন' পুরস্কার লাভ করে। ১৯৬১ সালে তিনি পান 'মতিলাল স্মৃতি সাহিত্য' পুরস্কার। সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি জগত্তারিনী পুরস্কারে ভূষিত হন।[২৭] পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে 'উত্তরায়ণ' কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৭৫ সালে 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৫ সালে 'শরৎচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী নীহারকণা দেবী তাঁর হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেন। এই তালিকা থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, একাডেমিক জগতে এবং সাহিত্যরসিক সমাজে তাঁর জনপ্রিয়তা কতটা ছিল।

তথ্যসূত্র

১. ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা -৭৩, পুনর্মুদ্রণ -১৯৯৯, পৃ:৩৪৪*

২. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *শতবার্ষিকী সংকলন*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, এস.এন.রায় কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১০ পৃ.২৬৪

৩. নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *দ্র. অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী, প্রথম খণ্ড. পৃ:৬০০ উদ্ধৃত*, মাহবুব সাদিক, *অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত*, জীবনী গ্রন্থমালা, প্রথম প্রকাশ- জুন ১৯৯৫, বাএ ৩১৮২, পৃ.১১

৪. প্রেমেন্দ্র মিত্র, *দ্র. 'কথা সাহিত্য' অচিন্ত্যকুমার সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৭৫, পৃ:১৩৫১ উদ্ধৃত*, মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত , পৃ.১২

৫. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *'কল্লোল যুগ', এম.সি সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ৫ম প্রকাশ, ১৩৭২, পৃ:৪ উদ্ধৃত*, মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত, পৃ.১২

৬. সুবীর রায় চৌধুরী, *'কলকাতা দু হাজার' বর্ষ ১ সংখ্যা ৮+৯, কলকাতা*। উদ্ধৃত, মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত , পৃ.১২

৭. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *'কল্লোল যুগ', উদ্ধৃত অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী-১ পৃ:৬০১। উদ্ধৃত*, মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত পৃ.১২

৮. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ, পূর্বোক্ত, পৃ:৮। উদ্ধৃত*, মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত , পৃ.১৩

৯. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *শতবার্ষিকী সংকলন, কলকাতা*-৭৩, এস.এন.রায় কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১০, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, *পৃ.২০৫*

১০. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, কলকাতা পঞ্চম প্রকাশ, বৈশাখ-১৩৭২, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স, পৃ. ১৫ উদ্ধৃত রবিন পাল, *অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত*, ভারতীয় সাহিত্যকার গ্রন্থমালা, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ-২০১০, রবীন্দ্র ভবন, নতুন দিল্লি, পৃ. ৯

১১. সম্পাদক: বিপ্লব চন্দ, অচিন্ত্যনীয়, *'দেউটি'* অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সংখ্যা, ১৩৮১ উদ্ধৃত রবিন পাল, *অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত*, ভারতীয় সাহিত্যকার গ্রন্থমালা, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ-২০১০, রবীন্দ্র ভবন, নতুন দিল্লি, পৃ.১৬

১২. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় *'কথাসাহিত্য' পৃ: ১৩৯১। উদ্ধৃত*, মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত , পৃ.১৩

১৩. নিরঞ্জন চক্রবর্তী, দ্র *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রন্থাগার প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, 'তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থ পরিচয়', পৃ. ৫৯৪ উদ্ধৃত*, মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪

১৪. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ, কলকাতা পঞ্চম প্রকাশ, বৈশাখ-১৩৭২, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স, পৃ.২৮৬ উদ্ধৃত*, মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত , পৃ.১৪

১৫. নিরঞ্জন চক্রবর্তী, দ্র *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থাগার প্রাঃলিঃ, কলকাতা,'তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থ পরিচয়', পৃ.৬৭ উদ্ধৃত*, মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫

১৬. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *জীবনের সমগ্রতা ও অচিন্ত্যকুমার, কথাসাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩৭৫।* উদ্ধৃত রবিন পাল, *অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত*, ভারতীয় সাহিত্যকার গ্রন্থমালা, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ-২০১০, রবীন্দ্র ভবন, নতুন দিল্লি, পৃ.১৩

১৭. যতীন্দ্রমোহন দত্ত, *অচিন্ত্যকুমারের কথা, কথাসাহিত্য।* উদ্ধৃত রবিন পাল, *অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত*, ভারতীয় সাহিত্যকার গ্রন্থমালা, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ-২০১০, রবীন্দ্র ভবন, নতুন দিল্লি, পৃ.১৩

১৮. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *একশ এক গল্প, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, অগ্রহায়ণ ১৪১০, এস.এন.রায় কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা-৮৫ হতে সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত। পৃ. ৪*

১৯. রবিন পাল, *অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত , ভারতীয় সাহিত্যকার গ্রন্থমালা, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশঃ ২০১০, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, পৃ.১৫*

২০. জীবনানন্দ দাশ, *অচিন্ত্যকুমারকে লিখিত চিঠি, অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী-১ পৃঃ৬৮০* উদ্ধৃত, মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

২১. শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ *'সাহিত্যসেবক মঞ্জুষা' সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃঃ৭-৮* উদ্ধৃত, মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫

২২. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ, কলকাতা পঞ্চম প্রকাশ, বৈশাখ-১৩৭২, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স, পৃ.২২৪-২২৫* উদ্ধৃত, মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত , পৃ.১৫

২৩. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ, কলকাতা পঞ্চম প্রকাশ, বৈশাখ-১৩৭২, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স, পৃ.২২৬, বুদ্ধদেব বসুর চিঠি, অচিন্ত্যকুমারকে।* উদ্ধৃত, মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত , পৃ.১৫

২৪. নিরঞ্জন চক্রবর্তী, দ্র *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থাগার প্রাঃলিঃ, কলকাতা,'তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থ পরিচয়', পৃ.৬৭৩-৬৭৪ উদ্ধৃত*, মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭

২৫. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ, কলকাতা পঞ্চম প্রকাশ, বৈশাখ-১৩৭২, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স, পৃ.১২৭,১২৮,১২৯* উদ্ধৃত রবিন পাল, *অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত , ভারতীয় সাহিত্যকার গ্রন্থমালা, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশঃ ২০১০, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, পৃ.১০*

২৬. নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী-৩ পৃঃ ৬৭২* উদ্ধৃত মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত , পৃ. ১৮

২৭. শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, *'সাহিত্য সেবক মঞ্জুষা' সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃঃ ৭ – ৮* উদ্ধৃত মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত ,পৃ. ১৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

কল্লোলের সাহিত্য ও প্রবণতা

বাংলা কথাসাহিত্যে তৃতীয় দশকের তরুণতর সাহিত্যিকরা কাব্য কিংবা গল্প-উপন্যাসে প্রচলিত ধারাকে অতিক্রম করে নতুন এক ধারার সূচনা করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁদের চোখে প্রচলিত সাহিত্য ধারার মহত্তম শিল্পী। এই রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করতে হবে-এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় অনেক লেখক সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। যদিও রবীন্দ্র-উত্তরণের স্বরূপটি তাদের কাছে ছিল অজ্ঞাত তবুও তাঁরা প্রচলিত ধারার বন্ধন থেকে মুক্তি চাইছিলেন। তাঁরা কথাসাহিত্য কিংবা কাব্যধারার নানাক্ষেত্রে দুঃসহ বন্ধনযন্ত্রণা থেকে বন্ধনহীন মুক্তির রোমান্টিক তৃষ্ণা অনুভব করেছিলেন। বন্ধন অসহিষ্ণু এই তরুণদল তারুণ্যের দুরন্ত আবেগে কেবল পুরনো ধারণা ও মূল্যবোধ ভাঙতে চাইছিলেন, যদিও নতুন জীবনপ্রত্যয় বা মূল্যবোধ তখনও তাদের অস্তিত্বের পালে দোলা দেয়নি সুনিশ্চিত ভাবে। এই দ্বিধান্বিত মনস্তত্ব এ যুগের তরুণ-হৃদয়ের যন্ত্রণার অন্যতম প্রধান উৎস। এ যুগের তরুণতর লেখকগোষ্ঠী মুলত 'কল্লোল' (প্রথম প্রকাশ ১৩৩০) 'কালিকলম' (প্রথম প্রকাশ ১৩৩৩) এবং 'প্রগতি' (প্রথম প্রকাশ ১৩৩৫) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্র- উত্তর যুগ প্রবর্তনের প্রতিজ্ঞায় গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছিলেন। এঁদের সঙ্গে ভাবসঙ্গতি ও চিন্তা-মননের দিক থেকে সমকালীন 'উত্তরা', 'আত্মশক্তি', 'ধূপছায়া', 'সংহতি' ইত্যাদি পত্রিকাও উল্লেখযোগ্য। এগুলোর মধ্যে প্রধান পত্রিকা 'কল্লোল'–এর নাম অনুসারে এই লেখকবৃন্দই মূলত 'কল্লোলগোষ্ঠী' নামে পরিচিত হন। এঁরা বাংলা সাহিত্যের এই পর্যায়কে 'কল্লোল যুগ' নামে অভিহিত করেছেন। 'কল্লোলগোষ্ঠী'র অন্যতম বিশিষ্ট লেখক বুদ্ধদেব বসু বলেছেন: 'যাকে কল্লোল যুগ বলা হয় তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।'[১] দরিদ্র জীবনের করুণ অভিজ্ঞতা ও যৌন মনস্তত্ত্ব–রবীন্দ্রনাথের কথা সাহিত্যে মূলত এই দুই বিষয়ের তথাকথিত প্রবল 'অভাববোধ' তরুণ লেখকবৃন্দকে রবীন্দ্রনাথের পথ থেকে দূরে সরিয়ে আনে। কাব্যধর্মিতার দিক থেকে স্বতন্ত্র ধারায় সাহিত্যসৃষ্টির একটি পথ তৈরি হয় রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথকে উহ্য রেখে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দুঃখবাদ, মোহিত লাল মজুমদারের দেহাত্মবাদ এবং কাজী নজরুল ইসলামের প্রদীপ্ত ও উদ্দাম বিদ্রোহী যৌবনধর্মের মধ্য দিয়ে শুরু হয় পথ চলা। এঁদের সকলের কবিতা খুব গভীরভাবে উত্তরসূরীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করুক বা না করুক, সেই দ্বিধান্বিত মনোভাব, সংশয়, নাস্তিক্যবোধ ও বিদ্রোহের বাতাবরণকে এঁরা আরও উত্তপ্ত, উদ্দীপ্ত ও উদ্বোধিত করে তুলেছিলেন সন্দেহ নেই। এই প্রগতিশীল প্রেক্ষাপটের মধ্য থেকেই জন্মলাভ করেছে 'কল্লোল গোষ্ঠী'।'কল্লোলে' প্রকাশিত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বিদ্রোহ বাণী' উচ্চারণের মধ্য দিয়ে এ গোষ্ঠীর সামগ্রিক মনোভাব ধ্বনিত হয়েছে -

'সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ম আলো
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর'।

অচিন্ত্যকুমার নিজেই তাঁর এই ঘোষণাকে 'উদ্ধত কণ্ঠে' উচ্চারিত 'বিদ্রোহ বাণী' বলে স্বীকার করেছেন।[২]

রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত বিভিন্ন ছোটগল্পে (যেমন 'হালদারগোষ্ঠী', 'স্ত্রীর পত্র' ইত্যাদি) প্রচলিত সমাজে যান্ত্রিক হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রবল ঘোষণাকে উচ্চকিত করে তোলেন। এ দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তৃতীয় দশকের 'কল্লোল গোষ্ঠী'র তরুণ সম্প্রদায়ের উগ্র জীবনবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বেপরোয়া বিদ্রোহ চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে অনেকাংশে উদ্দীপনা ও প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন। তথাপি রবীন্দ্রনাথ থেকে ভিন্ন পথে চলতে চাইল তরুণ সমাজ তথা 'কল্লোল গোষ্ঠী'। তাঁরা কবিগুরুকে classical বলে শ্রদ্ধার সুদূর অমরাবতীতে 'নির্বাসিত' করে তারুণ্যপ্রদীপ্ত তরুণগোষ্ঠী প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ ও সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কথাসাহিত্যে তরুণসমাজ তথা 'কল্লোল'- এর এই প্রবণতা সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমারের বক্তব্য স্মরণযোগ্য-

'রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল'। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলেকায়।'[৩]

অবক্ষয় সংশয় ও হতাশাক্লিষ্ট যৌবনধর্মী কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দ 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি', 'ধূপছায়া', 'সংহতি' পত্রিকাতেই গল্প উপন্যাস লিখতে শুরু করেন গত শতকের তৃতীয় দশকে। 'কল্লোলগোষ্ঠী' ভুক্ত লেখকদের মধ্যে প্রধান হলেন-অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু। এ ছাড়াও ছিলেন জগদীশগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, মনীশ ঘটক, গোকুল নাগ, দীনেশরঞ্জন দাস। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 'কল্লোলগোষ্ঠী'র লেখক হলেও তাঁর বিখ্যাত 'কয়লা কুঠি' গল্পগুলো অন্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাছাড়া চিন্তা ও মননের দিক থেকেও তিনি পূর্বোক্ত লেখকদের থেকে অনেক বেশি স্বতন্ত্র।

১৯২৯ সালে 'কল্লোল' এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে 'কল্লোলে'র প্রাথমিক প্রাণোচ্ছলতা ও ফেনিলতা স্তিমিত ও শান্ত হয়ে যায় অনেক খানি। 'কল্লোলে'র সংশয়-হতাশা-অবক্ষয় এবং রবীন্দ্র বিদ্রোহের মানসিকতা বহুলাংশে দূর হয়ে নূতনতর চেতনায় উদ্দীপ্ত হয় তরুণ সমাজ। জীবনের গভীরতর সান্নিধ্যে এসে সাহিত্যের উপকরণ সন্ধান এবং জীবনবোধ ও জগৎকে উচ্ছ্বসিত আবেগময়তায় অস্বচ্ছ না করে মননশুদ্ধ দৃষ্টিতে স্পষ্ট করে নিরীক্ষণ করার প্রয়াস লক্ষ করা যায় গত শতকের চতুর্থ দশকে। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, অন্নদাশঙ্কর, ধূর্জটিপ্রসাদ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যত এই দশকের বিশিষ্ট লেখক। এঁদের মধ্যে প্রথম জীবনে যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'কল্লোলগোষ্ঠী'র সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর 'রসকলি','হারানো সুর,''স্থলপদ্ম' গল্প 'কল্লোলে' ছাপাও হয়েছিল।'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে প্রকাশিত অন্নদাশঙ্করের কয়েকটি চিঠি থেকে জানা যায় যে কল্লোল

গোষ্ঠীর প্রতি তাঁর প্রাণের প্রবল আকর্ষণ ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারাশঙ্কর বা অন্নদাশঙ্কর কেউই চিন্তায়, মননে বা দৃষ্টিভঙ্গীতে 'কল্লোলপন্থী' নন। তাঁরা কল্লোলেতর। বস্তুত, কল্লোলোত্তর।

তবে একথা বলা বাহুল্য যে, 'কল্লোলগোষ্ঠী'র লেখক অর্থে কল্লোল পত্রিকায় যিনিই কিছু গল্প, কবিতা, উপন্যাস বা অন্য কিছু লিখেছেন তাঁকেই বোঝানো হয় না। 'কল্লোল' এক ভিন্নধর্মী বৈচিত্র্যময় ধারা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। 'কল্লোলগোষ্ঠী'র বিশিষ্ট লেখকদের রচনায় জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে নতুনতর কিছু বক্তব্য ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস ছিল। অচিন্ত্যকুমারের কথায় বলতে গেলে : 'সমস্ত দিক থেকে একটা নাড়া দেওয়ার উদ্যোগ।' এই নাড়া দেয়ার উচ্ছল উদ্যম কল্লোল ও ওই ধরনের সমকালীন পত্রিকার যে সব লেখকদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁদেরই কল্লোলগোষ্ঠীর লেখক বলে অভিহিত করা চলে। এই লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও সাহিত্যের প্রবণতা বিচিত্রপথগামী। তার কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষণ বা চিহ্ন নির্দেশ করা না গেলেও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন-

'কল্লোলের' সাধনাই ছিল নতুনত্বের, অনন্যতার। যেমনটি আছে তেমনটিই ঠিক আছে, এর প্রচণ্ড বিরোধিতা। এই দিক থেকে এঁরা নিজেদের প্রগতিশীল মনে করেন। 'কল্লোল' বলতে এই গোষ্ঠীর লেখকরা বুঝতেন, 'উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধাবন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আন্দোলন।' কারণ, আধুনিক মানেই প্রগতিপন্থী। প্রগতি মানেই প্রচলিত নিয়মের অনুসারী না হওয়া।

প্রথাগত সমাজের ধর্মবোধ ও প্রেমবোধ সম্পর্কে আদর্শবাদী চিন্তাধারার অভাবে এক ধরনের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব ও নাস্তিক্য বোধের উদ্ভব হয়। দেখা দেয় প্রচলিত মূল্যবোধ ও কথাসাহিত্যের অন্তর্গত ভাব ও আঙ্গিকগত ভাষার বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতা। এই বিদ্রোহের মনোভাবই রবীন্দ্র বিরোধিতার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল। রবীন্দ্র বিরোধিতার আগে থেকেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল অন্য দেশীয় সাহিত্য ও ভাবধারার প্রচণ্ড অভিঘাত।

এই বিরোধিতার অন্যতম নিদর্শন হল, কথাসাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক সীমার বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য সাধন। উপন্যাস গল্পের কাহিনী, প্লট, নির্মাণশৈলী ও চরিত্র সৃজনের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাবের লক্ষণ প্রকাশ পায়: 'অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতা', 'নিম্নগত মধ্যবিত্তের সংসার', 'কয়লাকুঠি খোলার বস্তি ফুটপাত প্রতারিত ও পরিত্যক্ত এলাকা' ইত্যাদি পূর্বতন সাহিত্যে যে সব বিষয় উপকরণের অপ্রতুলতা ছিল, সেই সব উপকরণ নিয়ে গল্প উপন্যাস রচনায় সর্বাত্মক মনোনিবেশ।

প্রথাগত সমাজের তথাকথিত 'বস্তনিষ্ঠা' বা Realism এর দিকে তীব্র আকর্ষণ। 'ভারতবর্ষ, 'প্রবাসী', 'বসুমতী', 'বঙ্গবাণী' ইত্যাদি সমকালীন পত্রিকায় যে 'বাস্তব' প্রবণতার পরিচয় ফুটে উঠেছিল 'কল্লোল গোষ্ঠী' তাকেই আরও স্পষ্ট করে তোলে। এই বাস্তব প্রবণতার একদিকে, যৌনমনস্তত্ত্বের অসঙ্কোচ তীক্ষ্ণ রূপায়ণ,

অন্যদিকে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের অভাব-অভিযোগজনিত যন্ত্রণাবোধের তীব্র প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ কল্লোলগোষ্ঠীর এই বাস্তবতার দুটি উপাদানকে তিরস্কারের সুরে বলেছিলেন 'লালসার অসংযম' ও 'দারিদ্র্যের আস্ফালন'। এই দুটি বিষয়ের সংমিশ্রণে আধুনিকরা যা প্রস্তুত করেছেন, তাকে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত Realism বলেন নি, বলেছেন 'রিয়ালিটির কারি পাউডার'। এই তথাকথিত বাস্তবতার ধারণা কল্লোল লেখকদের মধ্যে কোথাও তেমন পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি।

কল্লোলপন্থীরা হলেন ভাঙনধর্মী নেতিবাচক তারুণ্যের শিল্পী। প্রচলিত নিয়মকে ভেঙ্গে ফেলার যে উন্মাদনা, অনির্দেশ্য সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার যে দুঃসাহসী মনোভাব তার মূলে আছে রোমান্টিক প্রবণতা। এই রোমান্টিকতার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে ঐ যুগের গল্প উপন্যাসে প্রতিফলিত মধ্যবিত্ত তরুণের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায়। অচিন্ত্যকুমার 'কল্লোলযুগে' বলেছেন 'কল্লোলের সে যুগটাই ছিল সাহসের যুগ, যে সাহসে রোমান্টিসিজমের মোহ মাখানো।' ঐ যুগের গল্পে উপন্যাসে যে রোমান্টিক তরুণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তার সাধারণ রূপটির বর্ণনা প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার বলেছেন, 'আদর্শবাদী যুবক প্রতিকূল জীবনের প্রতিঘাতে নিবারিত হচ্ছে–এই যন্ত্রণা সেই যুগের যন্ত্রণা।' সমাজ নিষিদ্ধ যৌন আকর্ষণ ও যৌনচেতনাকে কথাসাহিত্যে বেপরোয়া ভঙ্গীতে রূপায়িত করার মধ্যেও 'কল্লোলগোষ্ঠী'র লেখক বৃন্দের উদ্দামতার পরিচয় নিহিত। নর-নারীর যৌনচেতনার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন রহস্যের অচেনা অন্ধকার, তার প্রতি সে যুগের তরুণ লেখকদের ছিল প্রচণ্ড রোমান্টিক আকর্ষণ। 'কল্লোল-গোষ্ঠী'র লেখকদের 'বাস্তবতার' চেতনার আড়ালে যে মধ্যবিত্ত সুলভ রোমান্টিক আবেগ রূপায়িত হয়েছে বিশিষ্ট কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'বস্তি জীবন এসেছে, কিন্তু বস্তি জীবনের বাস্তবতা আসেনি–বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তেরই রোমান্টিক ভাবাবেগ।'[৪] বস্তুত এই রোমান্টিকতার রং অনেক জায়গায় প্রকট হয়ে উঠেছে। তার অন্যতম কারণ লেখকদের জীবনবোধ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের জীবন সম্পর্কে ধারণা হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বা স্পষ্ট নয়।

কথাসাহিত্যে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ এসেছে সত্য, অতি সাধারণ মানুষ, দিন মজুর খেটে খাওয়া মানুষ, বেকার মধ্যবিত্ত যুবক, পথের ভিখারী, নগণ্য বস্তিবাসী, কাঙাল, কুলি মজুর, বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী সাহিত্যের বিষয় হয়েছে একথা ঠিক, কিন্তু 'কল্লোলগোষ্ঠী'র লেখকদের রচনায় সামাজিক পটভূমিতে এসব ব্যক্তির সমস্যা তেমন সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত হয়নি। সমাজ নিরপেক্ষ ব্যক্তিনির্ভর গল্পই তাঁদের কল্পনাকে অধিকতর বাঙ্ময় করে তুলেছে। প্রমথনাথ বিশী আধুনিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ সম্পর্কে যা বলেছেন, কল্লোল-কালের 'আধুনিক' সাহিত্য প্রসঙ্গেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য :

'আধুনিকতা যে শুধু দেশ ও জাতিকে মানে না তা নয়, পরিবার-প্রথাকেও সে অস্বীকার করে। অন্তত কাজের বেলায় তাই দেখা যাইতেছে। কাজেই সবটা মিলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, মানুষ মনে মনে যাযাবর হইয়া পড়িয়াছে।'[৫]

যুদ্ধোত্তর কালপর্বের 'কল্লোলগোষ্ঠী'র চেতনায় সমাজসত্তার অস্তিত্ব ক্ষীণ হয়ে গিয়ে ব্যক্তিজনের বহুমাত্রিক রূপ, নানাবিধ সমস্যা, জটিল মনস্তাত্ত্বিক সংকট, সংশয় জিজ্ঞাসা, আবার অন্যদিকে স্বপ্ন-কল্পনা যতই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, কলতাকা শহরের প্রেক্ষাপট তাঁদের সৃষ্টির পক্ষে তত অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। 'কল্লোলগোষ্ঠী'র শিক্ষিত নগরবাসী তরুণ লেখকদের এই গ্রামীণ চেতনায় গাঁথা বৃহৎ দেশের জীবনবোধ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল অল্প, তাঁরা জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন কলকাতা শহরের চারপাশের সীমিত বাস্তব পরিবেশ থেকে আর অনেক বেশি বিদেশি সাহিত্যের উপকরণের সাহায্যে। 'এদের সাহিত্যে সমাজ জীবনের মৌলিক রূপান্তরের বা শ্রেণীসংগ্রামের কোন আলেখ্য নেই। আছে কেবল প্রচলিত মূল্যবোধ ও আদর্শবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা।[৬]

নাগরিক জীবনের পাশাপাশি পল্লীজীবনের চিত্রও একেবারে অনুপস্থিত নয়। ত্রিশের দশকে যখন 'কল্লোলে'র উদ্দীপনা ভাবোচ্ছ্বাস, রোমান্টিক উন্মাদনা ও নগরচেতনার প্রতি প্রবল আসক্তি অনেকটা স্তিমিত, তখন তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, সরোজ রায়চৌধুরী প্রমুখের রচনায় গ্রামবাংলার শাশ্বত নিটোল জীবন আবার কথাসাহিত্যে নূতন সংবেদনা সঞ্চার করেছে।'কল্লোলগোষ্ঠীর সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়, একটা বাস্তব ঐতিহাসিক জীবনালেখ্য, রক্ত মাংসে গড়া জীবন্ত নরনারী, যারা তাদের কালের সমাজের নানা সমস্যার সঙ্গে জড়িত ও সংগ্রামশীল।[৭]

চিরাচরিত সামাজিক জীবনের বাঁধা ছকের কাহিনী ধারা কল্লোলপর্বে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। গল্পরসের আকর্ষণ কল্লোল যুগের তরুণ লেখকদের কাছে হ্রাস পেয়েছে। নারী পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ–রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো'। সাহিত্যের এই নতুন পর্যায়ের পদ্ধতির প্রতি তীব্র আকর্ষণ 'কল্লোলের কালে' ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়েছে।

কল্লোল পন্থী লেখকদের অনেকের মধ্যেই উপরের এই লক্ষণগুলো বিভিন্ন রচনায় নানা আঙ্গিকে প্রকাশ পেয়েছে। এসব লক্ষণ বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক, কল্লোলপন্থী লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যেন একটি স্ব-বিরোধ ভাব ছিল। অনমনীয় উগ্র বাস্তবতা, আবার স্বপ্নময় রোমান্টিসিজম, স্পর্ধিত বিদ্রোহ ও সংগ্রাম, আবার অন্যদিকে করুণ 'ব্যর্থতার মাধুরী', একদিকে প্রচণ্ড আশা, অন্যদিকে অতল নিরাশা। প্রকৃতপক্ষে এ সবই জটিল আধুনিক জীবনবোধের অন্তর্নিহিত দ্বান্দ্বিক রূপেরই প্রকাশ। 'কল্লোল' পত্রিকায় 'কল্লোলে'র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভাবগত স্ববিরোধের ইঙ্গিত আছে: 'এ একটা প্রবাহের বিচিত্র গতি। এরই নাম কল্লোল। এরই নাম আনন্দধারা। এরই নাম আর্তনাদ, এরই নাম বিদ্রোহ, এরই নাম শান্তির কামনা, প্রেমের সন্ধানে যাত্রা।'[৮] 'অচিন্ত্যকুমার

সেনগুপ্ত’ এবং ‘কল্লোল’ এই দুটি নাম একসূত্রে গ্রথিত। তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতির প্রথম ধাপ ছিল ‘কল্লোল’ পত্রিকা। জীবেন্দ্র সিংহরায় লিখেছেন :

‘অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩) কথা যেখানেই বলা হোক না কেন কল্লোলের সবুজ মিছিলে তিনি এক বলদৃপ্ত শক্তি। তাঁর প্রথম লেখা (কয়েকটি কবিতা ‘নীহারিকা দেবী’ ছদ্মনামে ১৩২৮-২৯ সালে প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়) ‘কল্লোলে’ প্রকাশিত হয় নি, কিন্তু তিনি যথার্থভাবে ‘কল্লোলে’ই প্রকাশিত হয়েছেন। বন্ধু সুবোধ দাশগুপ্তের সঙ্গী হয়ে তিনি ‘কল্লোলে’ এসে পৌঁছেছিলেন। ১৩৩১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁর গল্প ‘গুমোট’, ১৩৩৬ সালের পৌষের শেষ সংখ্যায় সন্ধ্যাদীপের শিখার মতো জ্বলে উঠেছিলো তাঁর কবিতা ‘সঙ্কেতময়ী’। এই দুইয়ের মধ্যবর্তীকাল তাঁর পক্ষে অজস্র সৃষ্টি ও অক্লান্ত সংগ্রামের কাল। তিনি দুই হাতে গল্প প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছেন। সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার নামে বিরোধীরা সোরগোল তুলে উপহার দিয়েছেন নিন্দার বিষ, রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে মিলেছে নিন্দা-প্রশংসা দুই-ই। তবু তিনি কখনো ক্ষান্ত হন নি ; কল্লোলের স্রোতাবর্তে নিত্য অবগাহন করে থেকে থেকে জ্বলে উঠেছেন নতুনতর দীপ্তিতে। ‘কল্লোল’ তাঁকে দিয়েছে সাহিত্যিকের মান, তিনি ‘কল্লোল’কে দিয়েছেন স্বনিষ্ঠ প্রাণ।’[৯]

কল্লোলযুগের কয়েকজন ছোটগল্পকারের তুলনামূলক আলোচনা

বাংলা ছোটগল্পের পুরাবৃত্তে মধ্যবিত্ত বাঙালির অবক্ষয়ের প্রবাহ আশ্রয় করে নতুন জীবনাভিজ্ঞতার যে উপকরণ ধীরে ধীরে সঞ্চিত হচ্ছিল তার দ্বিধাহীন স্পষ্ট উৎসারণ চোখে পড়ে কল্লোলগোষ্ঠীর সাধনায়। তারুণ্য সবসময়ই বিদ্রোহী-পন্থী, সে নিজের সৃষ্ট পথেই চলতে ভালবাসে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এই চপল তারুণ্যের কোলাহল শোনা গিয়েছিল কল্লোল (১৯২৩), কালিকলম (১৯২৬), প্রগতি (১৯২৭), সংহতি (১৯২৪), উত্তরা (১৯২৫), বিচিত্রা (১৯২৭) প্রভৃতি পত্রিকায়। পুরনো ধ্যান-ধারণাকে চূর্ণ করে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয় ‘কল্লোল’। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন-‘আজকের দিনে যত নতুন লেখক আছে স্তব্ধ হয়ে, সবায়ের ভাষাই ঐ ‘কল্লোল’।’[১০] কল্লোল-এর ২য় সংখ্যাতে নজরুলের কবিতায় অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় মেলে - ‘আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে / বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার -ভাঙা কল্লোলে’ (সৃষ্টি সুখের উল্লাসে)। বিজয়চন্দ্র মজুমদারও এই সংখ্যায় লিখেছিলেন-‘বিধাতার আইনের উপরে আত্মদম্ভের আইন চাপাইয়া নতুন নতুন বিশ্বামিত্র সাজিয়া তাড়াতাড়ি নতুন সৃষ্টি করিতে চাই।’ কিন্তু এই সৃষ্টি সুখের উল্লাসকে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির যথার্থ মূল্যায়নের দ্বারা জারিত করার ধীরতা তাঁদের খুব কমই ছিল। দীনেশরঞ্জন কল্লোলের প্রথম সংখ্যার (বৈশাখ,১৩৩০) প্রথম রচনা ‘কল্লোল’ শীর্ষক কবিতায় লিখেছিলেন-

'আমি কল্লোল শুধু কলরোল ঘুমহারা দিশাহীন
অজানা জানার নয়নের বারি
নীল চোখে মোর ঢেউ তুলে তারি
পাষাণ শিলায় আছাড়িয়া পড়ি' ফিরে আসি নিশিদিন।'[১১]

কিন্তু আবেগ-অনুভূতি সর্বস্ব দিশাহীনতার ফল যে অপমৃত্যু, এ বোধের উৎকণ্ঠা তাঁদের ছিল না বললেই চলে। 'কল্লোল' পত্রিকার মাধ্যমে উৎসারিত প্রধান যুগমানসিকতার প্রসঙ্গকে নির্দেশ করেছেন অচিন্ত্যকুমার। আর সেই জীবনানুভবই অচিন্ত্য-প্রেমেন-বুদ্ধদেবের লেখনী অবলম্বন করে প্রকটভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। এঁদের মধ্যে সাদৃশ্য কেবল সমকালীনতার, সমানকর্মিতার অথবা ঘনিষ্ঠ সৌহৃদ্যের নয় বরঞ্চ এই তিনজনের অনুভবের মধ্যে যুগের এক অনির্দেশনীয় যন্ত্রণা পুঞ্জিত হয়েছিল।

প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ তরুণ সাহিত্যধর্মের সঙ্গে যুক্ত জগদীশ গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৫৭)গল্পের বিষয়বস্তু ও প্রকরণে ব্যতিক্রম স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। 'কল্লোল যুগ' -এর প্রসঙ্গে জগদীশ গুপ্তের পরিচয় দিয়ে অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন,-'বয়সে কিছু বড় কিন্তু বোধে সমান তপ্তোজ্জ্বল। তাঁরও যেটা দোষ সেটাও ঐ তারুণ্যের দোষ- হয়তো বা প্রগাঢ় প্রৌঢ়তার।'[১২] অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর সাহিত্যকে গুরুত্বের সাথে নিয়েছিলেন। 'জগদীশ গুপ্ত তাঁর যৌবনদীপ্ত দেহমনের সাহস ছড়িয়ে... তরুণ মনের ফসল ফলিয়ে কল্লোলের পৃষ্ঠাতেই আত্মোৎকর্ষের মহড়া দিয়েছেন'।[১৩] তাঁর জীবনদর্শনের তীর্যক, তিক্ত ও অসুস্থ মনোভঙ্গি সাধারণ পাঠক মহলে সমাদৃত ছিলনা বললেই চলে। 'দারিদ্র্যের আস্ফালন' তাঁর রচনায় অনুপস্থিত। 'মিথুন প্রবৃত্তি' তাঁর অন্যতম বিষয় হলেও কল্লোলীয়দের মতো প্রেমতৃষ্ণায় তিনি পিপাসার্ত নন, ভাবোচ্ছ্বাসপ্রবণও নন। নিয়তিবাদ ও দুঃখবাদ জগদীশগুপ্তের মানসে নিত্য বহমান। তাঁর 'গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য কাহিনীর কঠোর দুঃখময়তায়'।[১৪] তিনি 'আগাগোড়া তিক্ত, রুক্ষ ও নৈরাশ্যবাদী। তাঁর লেখা পড়লে আমাদের মূল্যবোধগুলি প্রকাণ্ডভাবে নাড়া খায় এবং আমরা স্বভাবতই অস্বস্তি বোধ করি।'[১৫] মন ভালো করা হাসির কিংবা কৌতুকের কোন বিষয় তাঁর রচনায় প্রায় বিরল। তিনি জীবনের ছোট ছোট খুশি আনন্দ নিয়ে একেবারেই উচ্ছ্বাসপ্রবণ নন আবার জীবন বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞও নন। যদিও তাঁর জীবনাভিজ্ঞতার পরিধি সীমাবদ্ধ ও অভিনবত্বহীন তবুও গভীর অনুভূতিবিন্যাসের গুণে তা অসাধারণ জীবনবোধ সঞ্চার করে পাঠকহৃদয়ে।

জগদীশ গুপ্ত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক তরঙ্গোচ্ছ্বাসে সচেতনভাবে উদাসীন থাকায় পৃথিবীর অনাচার, অবিচারের উৎস সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। অন্যদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সে বিষয়গুলো পরিপূর্ণভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর নির্মিত চরিত্রগুলো পার্থিব সমস্যার মুক্তি খুঁজে পেয়েছে সাম্যবাদী চেতনায় উজ্জীবিত কর্মে। 'ফলে, জগদীশ গুপ্তের রচনায় দুঃখবাদ, নিয়তিবাদ, হতাশা আর বিকারের স্থায়ী রাজত্ব। সেখানে সমাজ যে পরিবর্ত্তন করা যেতে পারে এর সামান্যতম ইঙ্গিত নেই। পরিবর্তে তাঁর গল্পে

অভিশাপ সত্য হয়ে যায় (হাড়), সন্ধ্যেবেলা এলোচুলে খোলাবারান্দায় শোয়া ও বেড়ালের ডাক অশুভ হয়ে ওঠে (শত্রু), যাত্রাপথে শঙ্খচিল না দেখায় নানা বাধা আসে (কার্যকারণ)। এদিক থেকে তিনি নিঃসন্দেহে অনাধুনিক। তবে কি তিনি শুধুই নিন্দাযোগ্য, বর্জনীয়? তা বলা ঠিক হবে না। জীবন সম্পর্কে বক্রদৃষ্টিতে, পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতায় পটুত্বে, চরিত্র রচনায় ঘটনার ঘনঘটার ওপর থেকে গুরুত্ব সরিয়ে 'আঁতের কথা'র দিকে নজর দেওয়ায়, সর্বোপরি ঋজুকঠিন প্রকাশভঙ্গিতে তিনি তো স্পষ্টতঃ আধুনিক।'[১৬]

জগদীশের 'চার পয়সায় এক আনা' 'উর্মিলার মন, মনোভৃঙ্গ গুঞ্জরিল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলঙ্কিত সম্পর্ক, 'ফাঁসি, প্রভৃতি গল্পকে মনে করিয়ে দেয়। জগদীশ ও মানিক দুজনই একই যুগবৈশিষ্ট্য দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন বলেই তাঁদের আগ্রহ ধাবিত হয় নির্মিত চরিত্রের মানসিক স্তরের পরম্পরাকে চিত্রিত করার দিকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা একই পথে আর হাঁটেন নি। একজন অদৃষ্টের বন্ধনে বন্দী হলেন আর একজন চলেছেন আলোর রাজপথে। এ প্রসঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণযোগ্য- 'জগদীশবাবুর বিষয় হলো মানুষের নিঃসহায়ত্ব, আর যাত্রারম্ভের মুহূর্তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয় ছিল মানুষের নিরুপায়ত্ব।...দুইই মানুষের নৈঃসঙ্গ চেতনার দু-পিঠ। আর মানিকবাবু জগদীশ গুপ্তের অপেক্ষা অগ্রসর এই কারণে যে, তাঁর চরিত্রেরা এই নিরুপায় বোধের কাছে আত্মসমর্পণ করেনা, হেরে গেলেও করেনা।'[১৭]

জগদীশ গুপ্তের প্রথম দিকের গল্প 'বিজলী'তে প্রকাশিত (২০ কার্তিক ১৩৩২) 'পল্লী শ্মশান'- এ দেখা যায়, পাড়াগাঁয়ের একজন মানুষের মৃতদেহ সৎকারে মানবীয় প্রচেষ্টার অপারগতা, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অভাগীর স্বর্গ'- এর অমানবিক নীচতা, ক্রূরতা ও সংকীর্ণ নিষ্ঠুর শক্তির নীচতাকে মনে করিয়ে দেয়। 'দৈবধন' বরপ্রার্থনা ও পুরাণনির্ভর কাহিনী, মনস্তত্ত্ব ও অলৌকিতার সংমিশ্রণে রূপায়িত। বিদেশি গল্প অবলম্বনে এটি রচিত। 'একটি দুটি' গল্পে ঘটনার অবিশ্বাস্য পুনরাবৃত্তি ও অভিশাপের সত্যতা চিত্রিত হয়েছে অপ্রত্যাশিতভাবে। এক প্রৌঢ় ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা এক কাফিরিস্তানীর চোখ নষ্ট হলে সে প্রতিশোধ নেবে বলে মনে মনে ভাবে। ত্রিশবছর পর একই রোগে ডাক্তারের চোখ নষ্ট হয়ে যায়। কাকতালীয় এই ঘটনা অভিশাপের কার্যকারিতায় আমাদের পেছনের দিকে টেনে নিয়ে যায়। লেখকের এই বিশ্বাস প্রবণতা 'হাড়' গল্পে লক্ষ করা যায়। 'তৃষিত আত্মা' গল্পে অশরীরী প্রভাবের কথা বর্ণিত হয়েছে। সীতাপতির হঠাৎ মৃত্যুর পর তার পুত্রবধূর মনে হয় 'কে যেন ঘরের সহস্র ছিদ্রপথে অসংখ্য অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া কি যেন টানিয়া টানিয়া লইতেছে।' জগদীশ গুপ্ত এখানে অশীরীরী জগতকে প্রতিষ্ঠা করে পাঠক সমাজকে আতঙ্কিত করতে গিয়ে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখার প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলেছেন। 'পুরাতন ভৃত্য' গল্পের যাজক ব্রাহ্মণ বিশ্বেশ্বর স্ত্রীর শ্রাদ্ধের জন্য যোগাড়কৃত সাতশত টাকা ডাকাতের পরিবর্তে বহুদিনের বিশ্বস্ত চাকর নব ছোরা দেখিয়ে কেড়ে নেয়। রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' নামক কবিতায় যে মানব মহত্ত্বের পরিচয় মেলে জগদীশ গুপ্তের গল্পে তার বিপরীত দিক পরিলক্ষিত হয়। তাঁর লেখার জগতে সেবা-মমতা-শুশ্রূষা, মৃত্যুতে কান্না, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি বিষয় নিছকই কথার কথা বলে মনে হয়।

এবার বোধহয় বলা যেতে পারে, 'বিনোদিনী' থেকে 'মেঘাবৃত অশনি' পর্যন্ত গল্পমালায় জগদীশ গুপ্তের তেমন কোন পরিবর্তন বা নতুনত্ব চোখে পড়ে না। তাতে মানস সংকট, মনোবিশ্লেষণ, মানসিক বিকার, প্রণয়শূন্যতা, জীবনের নেতিবাচকতা বা দেহবাদ যেমন প্রাধান্য পেয়েছে তেমনি অলৌকিকত্ব, নিয়তিবাদ, নানা অন্ধসংস্কারের দাসত্ব, পশ্চাৎপদতাও প্রকটভাবে অবলোকিত হয়েছে। 'রসের তুলনায় রূপের দার্ঢ্যে জগদীশ গুপ্ত তাঁর নিজের কাল এবং পরিমণ্ডলেও ছিলেন অতুল্য। বস্তুত ভয়ানককেও সংবেদনীয় করে তোলার প্রবণতাই অনুপস্থিত ছিল জগদীশ গুপ্তের তীব্র প্রখর জীবনানুভবে। ঐখানেই তাঁর প্রতিভার গ্রন্থি এবং সীমাবদ্ধতা।'[১৮]

'পরাধীন দেশের ঔপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক পীড়নের পরিবেশে আধুনিকতার পথে লেখকের সাফল্য এইখানে ব্যর্থতাও এইখানে। জীবনের বিষে তিনি সম্ভবত নীলকণ্ঠ হয়েছেন কিন্তু নীলকণ্ঠের মঙ্গলস্পৃহা তাঁর ছিলনা। তাই বিষতিক্ত সাহিত্যের শক্তিশালী স্রষ্টা হিসাবেই তিনি পরিচিত হয়ে রইলেন আমাদের মাঝে।'[১৯]

তাঁর গল্পসংকলন গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে :-'বিনোদিনী',(১৩৩৪), 'রূপের বাহিরে',(১৩৩৬), 'শ্রীমতী', (১৩৩৭), 'উদয়লেখা',(১৩৩৯), 'তৃষিত সৃক্কণী',(১৩৩৯), 'রতি ও বিরতি',(১৩৪১), 'উপায়ন', (১৩৪১), 'পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক, 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী',(১৩৪২), 'মেঘাবৃত অশনি'(১৩৫৪), 'স্বনির্বাচিত গল্প'(মৃত্যুউত্তর প্রকাশনা-১৩৬৬) ইত্যাদি।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬) 'কল্লোল'-এর তীরে নৌকা ভিড়িয়েছিলেন অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেবের কিছু আগে। তাঁর অসাধারণ গল্পের প্রবাহ শতমুখি ধারায় একের পর এক প্রকাশিত হয় 'কল্লোল', 'কালিকলম', এবং অপরাপর সমধর্মী পত্রিকায়। তিনি 'কালিকলম' পত্রিকার সম্পাদকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। শিল্পি- আত্মার স্বধর্মে স্বতন্ত্র শৈলজানন্দ বাংলা ছোটগল্প সৃজনের ইতিহাসে হয়তো বা নিঃসঙ্গ পথিক। জীবনের অন্ধকার ভরা দীনতার রূপ চিত্রণে 'কল্লোল' প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য রয়েছে। শতবার্ষিকী সংকলনে অচিন্ত্যকুমার তাঁর বিস্ময়ানুভব এভাবে ব্যক্ত করেছেন শৈলজানন্দ সম্পর্কে- ' বাংলা সাহিত্যে ইনিই সেই কয়লাকুঠির আবিষ্কর্তা ? নিঃস্ব, রিক্ত, বঞ্চিত জনতার প্রথম প্রতিনিধি ? বাংলাসাহিত্যে যিনি নতুন বস্তু নতুন ভাষা নতুন ভঙ্গি এনেছেন ? হাতির দাঁতের মিনারচূড়া ছেড়ে যিনি প্রথম নেমে এসেছেন ধূলিম্লান মৃত্তিকার সমতলে ?'

শৈলজানন্দ প্রধানত কয়লাকুঠির আদিমজীবনের সুখ-দুঃখ, গ্রাম ও শহরবাংলার মধ্য ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলির অন্তর্গত যন্ত্রণা, ক্ষুধা, লালসা, বঞ্চনা ও ক্ষয়িষ্ণুতার বিভিন্ন দিক নিয়ে গল্প লিখেছেন। ১৩২৯ সালের কার্তিক সংখ্যার 'মাসিক বসুমতী'-তে 'কয়লাকুঠি' গল্প প্রকাশিত হয়। 'দিনমজুর' গল্পসংকলনের ভূমিকায় লেখক নিজেই সে সম্পর্কে বলেছেন- 'সাঁওতালদের লইয়াই আমি আমার সাহিত্যিক জীবনের যাত্রা শুরু করি এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমার সাঁওতালি গল্পগুলি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।' অন্যত্র বলেছেন, 'আমার গল্পের সর্বপ্রথম পরিমণ্ডল কয়লার খনি এবং চরিত্ররা সব সাঁওতাল কুলিমজুর।'[২০] 'কল্লোল' পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম

সংখ্যাতে প্রকাশিত 'মা' গল্পের পরী তার জেঠা দুখনের নির্দেশে তার পছন্দের পাত্র টুরাকে বিয়ে করতে পারে না। টুরা পরীকে জোর করে শরীরী সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করে। গর্ভবতী পরী আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করতে গিয়ে সন্তানের কথা ভেবে ফিরে আসে। গল্পের শেষে দেখা যায়, পরী ছেলে কোলে করে টুরার ঘরেই প্রবেশ করে। 'সাঁওতাল জীবনের আদিম নগ্নতা, অসামাজিক মিলনের স্থূলতা, উদ্দাম বাসনা আর বিক্ষুব্ধ আক্রোশের কুলভাঙা ঋজু প্রকাশমানতা যে এ গল্পের প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য তা অস্বীকার করা চলে না।[২১] 'বধূবরণ' (১৩৩৬) গল্পগ্রন্থের নাম গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার গল্প। সমবয়সী বিবাহিত মেয়েদের সঙ্গে ননীমাধবের বয়ঃসন্ধিকালের একাংশ কেটেছে। ট্রেনের কামরায় একটি মেয়ের কানের দুল চুরি করতে ব্যর্থ হয়ে আলাপ জমিয়ে তাকেই বিয়ে করে। কিন্তু ছেলেবেলার নারী সাহচর্যের কথা স্মরণ করে সম্ভবত বৌকে পাড়ার কম বয়সী ছেলেদের কাছে যেতে দেয় না। আবার মামীর কাছে যাওয়ার সময় বৌয়ের গয়নার বাক্স নিয়ে সরে পড়ে সে। ননীমাধবের যৌন সম্পর্কিত জটিলতা ও মানসিক অস্থিরতা দেখানোই লেখকের উদ্দেশ্য বোঝা যায়। কিন্তু তাতে বিষয়বস্তুর বিন্যাসরীতি যথাযথ হয়নি বলেই মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বা পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানসিকতা বিষয়বিন্যাসে যেভাবে সিদ্ধ শৈলজানন্দের মানসিকতা তার অন্তরায়- এ গল্পের ব্যর্থতায় সে কথা প্রমাণিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে অদ্যাবধি মধ্য ও নিম্নবিত্ত বাঙালি জীবনের মূল্যবোধের ভাঙা-গড়া কম হয়নি। কিন্তু শৈলজানন্দ সেই অভিজ্ঞতার জগতে সংশ্লিষ্ট থাকলেও ছিলেন নির্বিকার। পরবর্তী কালে তিনি জীবনচিত্র অঙ্কন অপেক্ষা নিছক গল্প বলাতেই মনোনিবেশ করেছেন। তাঁর মধ্যে 'জীবন- সন্দর্শনের যুগ-দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টি দেখা গেছে - সমসাময়িক বাস্তবের দৈন্য, ক্ষোভ ও হতাশার নির্মোক পেরিয়ে চিরন্তন মানব-সত্যের মর্মস্থলে সে দৃষ্টি দৃঢ় অবিচল। কিন্তু সে উপলব্ধির ভারে শিল্পীর ব্যক্তি-আত্মা যেন এক প্রকাশহীন অন্তর্ব্যথায় পীড়িত হয়ে আছে ; তাই শৈলজানন্দের গল্পে জীবন জমাট বেঁধে উঠেছে, যার ভেতর থেকে কোন সুনিশ্চিত জীবন-বাণী প্রায় কখনোই দোলায়িত হয়ে ওঠে না মৃদুতম কম্পনেও। তাঁর গল্পরস বিশেষার্থে একান্ত বস্তুতললীন।'[২২]

'অভাগা' গল্পের টুইলার বৌকে কয়লাখনির ম্যানেজার ধর্ষণ করলে বৌ আত্মহত্যা করে। 'বিবাহ' গল্পের (প্রথমে 'জোহানের বিহা' নামে প্রকাশিত) খোঁড়া পলহানের সঙ্গে টগরীর বিয়ে হয়। কিন্তু বাঙালিবাবু বিনয়কে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া হয়। পলহান শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করে। শৈলজানন্দ সাঁওতাল পাত্র-পাত্রীর আত্মহত্যা ঘটিয়ে অনেক গল্পের সংকট মোচন করতে চেয়েছেন। গল্পটি অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ হওয়ায় গল্পের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। সুকুমার সেনের মত এক্ষেত্রে যথার্থ - 'সংক্ষেপ করায় গল্পটি উন্নত হয়নি। পাত্র-পাত্রীর নাম সুসঙ্গত হয়নি।'[২৩] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত -'শৈলজানন্দের গ্রাম্যজীবন ও কয়লাখনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ, কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এই বাস্তব সংঘাত আসেনি।[২৪] গোপিকানাথ রায়চৌধুরী আবার অন্য প্রসঙ্গে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন এভাবে- 'শৈলজানন্দের বাস্তবতা-বোধ

বিস্ময়করভাবে নিরাসক্ত। নারীজীবনের অসহায়তা ও বিড়ম্বনা ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে তাঁর নিজের চোখ কোথাও অশ্রুসজল হয়নি, কোথাও তিনি স্পষ্টভাষায় সমবেদনা প্রকাশ করেননি। কেবল নারী নির্যাতনের ভয়ঙ্কর রূপটি যেন অধরৌষ্ঠ রুদ্ধ করে কঠিন সংযমের সঙ্গে, স্বল্পতম বর্ণনা ও মন্তব্যের সাহায্যে প্রত্যক্ষগোচর করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন।...তাঁর অধিকাংশ রচনায় আধুনিক কাল একরকম অনুপস্থিত। বিশ শতকের তৃতীয় দশকের এই বাঙালি তরুণ লেখককে তাঁর চারপাশের সমকালীন সমবয়স্ক লেখকদের যুদ্ধোত্তর চেতনাসম্পন্ন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে প্রায় অনবহিত বলে মনে হয়। তিনি তাঁর নিজস্ব এক 'আঞ্চলিক' জগতের সীমা-স্বর্গে যেন বাস করেন।'[২৫]

প্রকৃতপক্ষে শৈলজানন্দের শিল্পিমানসের প্রবণতা নিটোল বিবরণের দিকে যতটুকু মনস্তত্ত্ব ব্যাখার দিকে ঠিক ততখানি নয়। আদিম সাঁওতাল নরনারীর জীবনকথা তাঁর রচনায় প্রধানত 'চিত্র' রূপেই সার্থকতা পেয়েছে। সংঘর্ষময় জটিল ভাবের ছোটগল্প শিল্পসিদ্ধি লাভ করে নি। তাঁর রচনায় ব্যাপ্তি বড় কম। মূলত আবেগধর্মী লেখক হিসেবে বিচার, বুদ্ধি অপেক্ষা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত চোখের জলকেই তিনি মুখ্য প্রেরণা রূপে গ্রহণ করেছিলেন। এখানেই তাঁর একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা, এখানেই তাঁর সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা।

তাঁর গল্প-সংকলন গ্রন্থ গুলোর মধ্যে রয়েছে -

'অতসী' (১৩৩২), 'নারী মেধ' (১৩৩৫), 'বধূবরণ' (১৩৩৬), 'মারণমন্ত্র' (১৩৩৯), 'দিন-মজুর' (১৩৩৯), 'নারী জন্ম' (১৩৪০), 'ঠিক্ ঠিকানা' (বহু বচন -এর নব সংস্করণ ১৩৫০), 'স্বনির্বাচিত গল্প' (১৩৬২), 'শ্রেষ্ঠগল্প' (১৩৬২), 'ভালবাসার নেশা' (১৩৬৫), 'প্রেমের গল্প' (১৩৬৫), 'অপরূপা' ('বানভাসি' ও 'ষোলআনা' একত্রে ১৩৬৬), 'মনের মত গল্প' (১৩৬৭) 'মিতে মিতেন' (১৩৬৭)। তাছাড়া, 'চাঁদ ও চকোর', 'সতী -অসতী', 'পৌষ পার্বণ, 'জীবন নদীর তীরে' ইত্যাদি গ্রন্থ পরে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

মননশীল অন্তর্ভেদী দৃষ্টির তীক্ষ্ণ আলো ফেলে প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) মানব মনের নানা আঁধার সর্পিল চোরাপথ উদ্ভাসিত করে তোলেন, আর সাংকেতিক ব্যঞ্জনাময় অভিমত দিয়ে শিল্প সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেন। তিনি জীবনের জটিল বিষয় ও মনস্তত্ত্বের গভীরতম বিষয় বিশ্লেষণে উদ্যমী শিল্পী। প্লটের ওপর দৃঢ় আধিপত্য, উচ্ছ্বাসহীন পরিমিত ভাষা ও মর্মভেদী দৃষ্টির সাহায্যে তিনি জীবনের রহস্য খুঁজে ফিরেছেন। তাঁর সাহিত্যে সহযোগী বুদ্ধদেব বসুর মতো তিনি নিজেকে গল্পের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেন না, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মতো অসীম আবেগ অনুভূতির তরঙ্গশীর্ষে উপনীত হন না। তিনি 'গোটা মানুষের মানে' সন্ধান করে ফিরেছেন, ভাঙাচোরা মানুষের ব্যবচ্ছেদ করেছেন। যুদ্ধোত্তর পর্বের গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই নৈপুণ্য আরো শাণিত হয়ে উঠেছে। 'জীবনের সত্য যেখান থেকে আপনারা (লেখকরা) গালিয়ে তোলেন তার বাইরে কত এলাকার এখনও জরিপই হয়নি'। 'বাঘ' গল্পের পত্র-লেখকের এ মন্তব্যের সাথে একমত হওয়া যায়। অপর মন্তব্যেও ঐকমত্যে পৌঁছানো

যায়, যেমন-'বৈজ্ঞানিক দার্শনিক শিল্পী রাজনীতিক যে যাই করুক, জীবনকে বোঝবার বোঝাবার কঠিনতম সাধনা যে একমাত্র সাহিত্যের, এ দম্ভ আপনাদের (লেখকদের) আবার ফিরে পাওয়া দরকার।'

সাহিত্যের সীমানা ও সাহিত্যিকদের সাধনা সম্পর্কে এই বিশ্বাস তাঁকে পরিচালিত করেছে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শিকারি - কথক পত্রলেখক, তার বন্ধু যমুনাপ্রসাদ ও যমুনাপ্রসাদের স্ত্রী সুভদ্রাকে নিয়ে জীবনের জটিলতা ('বাঘ'), উমা, তার স্বামী উমেশ ও উমেশের পাতানো রাঙা বৌদিকে ঘিরে সাংসারিক সমস্যা ('সাপ'), নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের প্রত্যাবর্তনে পিতার প্রত্যাখ্যানে জীবনরহস্য ('নিরুদ্দেশ') দিবা, সুপ্রিয় ও বাসবকে নিয়ে প্রেমের দ্বান্দ্বিক অবস্থা ('কালো জল'), ইভেৎ আর পিয়ের-এর সম্পর্কের গভীরতা ('বিদেশিনী') -'ক্বচিৎ কখনো' সংকলনভুক্ত (আষাঢ় ১৩৬৯) এইসব গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবনকে অনুধাবন করবার, তার রহস্যকে বোঝাবার সফল শিল্প প্রয়াস পেয়েছেন।

দাম্পত্যবহির্ভূত প্রণয় সম্পর্কও তাঁর লেখনীর আঁচড়ে অনুরূপ শিল্প সাফল্য লাভ করেছে। 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী', 'স্টোভ', 'ভস্মশেষ', তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গল্পকথক ('জনৈক কাপুরুষের কাহিনী'), শশিভূষণ ('স্টোভ'), অমরেশ ('ভস্মশেষ') -সবাই একই ধরনের নায়ক। তাদের চরিত্রে নেই স্থিরতা, আত্মপ্রত্যয়, পুরুষোচিত গুণাবলী, আছে দ্বিধা - দ্বন্দ্ব, হীনম্মন্যতা, দুর্বলতা। দৃঢ়তা ও মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরতে জানে না। ভালবাসাকে কেউ-ই শেষপর্যন্ত অর্জন করতে পারে না। শশিভূষণ, মল্লিকা, বাসন্তীকে ('স্টোভ') নিয়ে ত্রিভুজ প্রেমের দুর্দান্ত লড়াই ঘনীভূত হবার অবকাশ পায়নি, কারণ শশিভূষণ দ্বিধান্বিত। তাকে দেখে প্রাক্তন প্রণয়িনীর মল্লিকার মনে হয়েছে - 'এই শশিভূষণের সত্যকার চরিত্র। চিরকাল ভাগ্যের কাছে আগে থাকতে হার মেনে সে বসে আছে। স্রোতের বিরুদ্ধে একটিবার রুখে দাঁড়াবার সাহসও তার নেই।' ' ভস্মশেষ' গল্পে ত্রিভুজ প্রেমের যুদ্ধ জমে ওঠার আগেই মিইয়ে গেছে। ব্যর্থ ও ক্ষুব্ধ প্রেমিক অমরেশ ডাক্তার তার প্রণয়িনী সুরমাকে বলপ্রয়োগে তুলে আনার জন্য তার স্বামীর (জগদীশ) দূরবর্তী কর্মস্থলে হাজির হয়। সুরমা তাকে কয়েকটি দিন অপেক্ষা করতে বললে অমরেশ রাজি হয়। কিন্তু প্রতীক্ষার অবসান না হওয়ায় হৃদয়ের আগুন জ্বলে ছাই হয়ে যায়। জগদীশ ও সুরমার জীবন-বৃত্তে একটুখানি জায়গা পেয়ে অমরেশ জীবন কাটাতে থাকে, 'জীবনের একটি বাঁধা ছকে তিনি খাপ খেয়ে গেছেন সম্পূর্ণভাবে! আগুন কবে ভস্মশেষ রেখে একেবারে নিভে গেছে তা তিনি জানতেই পারেন নি।'

'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী'তে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, এই তিন নায়কই কাপুরুষ -লড়াই করতে অক্ষম, সমস্যা সমাধানে অপারগ, উদাসীনতায় দুর্লভ প্রেমের রত্ন সংরক্ষণে অনিচ্ছুক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর শীর্ণ মনোভাব, রুগ্ন ও জটিল মানসিকতার পরিচায়ক এসব গল্প। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের 'কল্লোল' পন্থী তরুণ লেখক গোষ্ঠীর অন্যান্যদের মত প্রেমেন্দ্র মিত্রও পরিবর্তনশীল যুগ পরিবেশে বিধ্বস্ত মূল্যবোধ প্রসঙ্গে সংশয়-হতাশায় বিদীর্ণ সমকালীন জীবনবোধের তাৎপর্য অন্বেষণ করছিলেন। 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে প্রকাশিত

অচিন্ত্যকুমারকে লেখা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কয়েকটি চিঠির মধ্যে সেই জীবনার্থ সন্ধানের আত্মযন্ত্রণার ছবিটি সুন্দরভাবে চিত্রায়িত হয়েছে।

'অচিন, আমি অধঃপাতে চলেছি। তাও যদি ভালভাবে যেতে পারতুম। জীবন নিয়ে কি করতে চাই ভালো করে বুঝিনা, যা বুঝি তাও করতে পারিনা।... জীবনটাকে যে বেঁকিয়ে দুমড়ে বিকৃত করে ছেড়ে গেল, আর যে প্রাণপণ শক্তিতে জীবনটাকে কবিতা করার চেষ্টা করলে, দু'জনেই বাজে কাজে হয়রান হল সমানই। ...বড় দুঃখ আমার এই যে, কোন কাজই ভাল করে করতে পারলুম না। জীবনের মানেও বুঝতে পারিনা। জানি শক্তি সংগ্রহে সুখ, পূর্ণ উপভোগ সুখ। কিন্তু সুখ আর কল্যাণ কোথায় এক হচ্ছে বুঝতে পারি না।'[২৬]

এরকম আরো অনেক চিঠিতে ঐ একই ধরনের হতাশা, জীবন যন্ত্রণা, জীবন জিজ্ঞাসা ও সংশয় লেখক চিত্তকে আলোড়িত করেছে। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যুগের যৌবন এভাবেই প্রপীড়িত, বিপর্যস্ত, হতাশাগ্রস্ত ও প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছিল।

মানুষের স্থূল ও আপাত-কুৎসিত প্রবৃত্তির মধ্যেও তাঁরা অনুপ্রবেশ করে অনুসন্ধান করেছেন জীবনের প্রকৃত অর্থ। হয়ত সেই কারণে তাঁদের সাহিত্য রচনায় উচ্ছ্বাস আতিশয্য এবং কিছুটা রুচি বিকার দেখা দিয়েছে। 'কল্লোল পন্থী' তরুণ লেখকদের অনেক রচনা অবাস্তব স্বপ্নাতুরতায় অসংযত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লেও প্রেমেন্দ্র মিত্র এদিক থেকে অনেকটা আবেগ-উচ্ছ্বাস বিবর্জিত। সমকালীনদের মত জীবনবোধের নিগূঢ়তম অর্থ অনুসন্ধানের চেতনা ও সংশয়-হতাশা মলিন জীবনের যন্ত্রণা তাঁর মধ্যে পুরোপুরি বিদ্যমান আছে, কিন্তু এক প্রকার শুষ্ক, আবেগহীন, বুদ্ধিহীন জীবন সমালোচনার মনোভাব তাঁকে সমসাময়িক যৌবনদীপ্ত তরুণ লেখকদের থেকে সংশয়াতীত স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছে। 'কল্লোল গোষ্ঠীর আধুনিক তরুণ লেখকদের মত কখনই তিনি অতিরিক্ত রোমান্টিক নন, বরং গল্প-উপন্যাস-কবিতায় সর্বত্রই জীবনকে মেধা ও মননের আলোকে স্পষ্ট করে পরখ করে নিতে চেয়েছেন তিনি। জীবনের যেখানে ত্রুটি ও অসঙ্গতি বিদ্যমান সেখানে তিনি তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের সূক্ষ্ম তীর নিক্ষেপ করেছেন। মানব জীবনের গ্লানিময় ও কদর্য ক্ষতের উপর রোমান্টিক প্রলেপ বুলিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনা করতে প্রবৃত্ত হননি। জীবনবোধ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ,স্বচ্ছ ও মর্মভদী বলেই আত্মযন্ত্রণাও তাঁর দুঃসহ। বিধ্বস্ত ও ভঙ্গুর হতভাগ্য মানুষের দ্বান্দ্বিক জীবনের মলিন ছবি দেখেছেন বলেই জীবনের রহস্য সন্ধানে তিনি এত ব্যাকুল। তিনি মানব জীবনের নানা ত্রুটি-অসঙ্গতির সমালোচনা করেছেন মনন দিয়ে, আর বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে জীবনের তাৎপর্য অনুধাবন করতে চেয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি একেবারে আবেগহীন, অনুভূতিশূন্য। প্রেমেন্দ্র মিত্র আবেগে উদ্বেলিত হন না। যন্ত্রণা ও বেদনায় অশ্রুবিহ্বল হন না। সমকালীন লেখকদের মত নিজেকে কখনও গল্পের মধ্যে সংশ্লিষ্ট করেন না। কিন্তু তবু সংশয়াতীত ভাবে অনুভব করা যায়, এই নশ্বর পৃথিবীর সাধারণ মানুষের এ ভাঙাচোরা জীবনের অসহায়তার প্রতি তাঁর কী অসীম মমত্ববোধ! প্রচলিত সমাজের নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের নিরুপায় ব্যর্থতা, সীমাহীন দারিদ্র্যের ভীষণ আঘাতে অন্তর্নিহিত আদর্শবোধ ও

নৈতিক মেরুদণ্ড কেমন করে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়– মনোজীবনের সেই কঠিন সঙ্কটের বাস্তব চিত্র প্রেমেন্দ্রের ছোটগল্পে এক সংযত ও সংহত রূপ লাভ করেছে। 'ভবিষ্যতের ভার' ও 'পুন্নাম' এমনি দুটি আশ্চর্য সার্থক ছোটগল্প। প্রেমেন্দ্র মিত্র মূলত নাগরিক জীবনের কুশলী শিল্পী। আধুনিক জীবনের ভাঙন ও ঘুণে ধরা অবক্ষয়ের স্বরূপ উন্মোচন করতে গেলে শহুরে পরিবেশ ছাড়া সম্ভব নয়। কারণ বাংলাদেশে প্রথম যুদ্ধোত্তর কালের যে ভয়াবহ বিপর্যয় ও মূল্যবোধ সঙ্কট তা নগর জীবনেই সবচেয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল। বিশেষভাবে নাগরিক বা শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনে। তাঁর রচনায় আর্থিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি মধ্যবিত্তের নৈতিক সঙ্কটের অসুন্দর ও ভয়ঙ্কর রূপটিও সেখানে উদঘাটিত হয়েছে কঠিন নির্মম বাস্তবতায়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেব বসুর মত কথাসাহিত্যকে কাব্যব্যঞ্জনায় মুখর বা উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত করে তোলেন নি কখনও। তবে তাঁর গল্প কাহিনীতে এ দুজন কথাশিল্পীর মতো সাংকেতিক চেতনার রহস্যাভাস প্রায় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। সমগ্র গল্পে কঠিন বাস্তবতাকে ম্লান না করেও তার উপর এক রহস্যময় সাংকেতিক ছায়া বিস্তার করে দেন লেখক। তাতে কাহিনীর অখণ্ডতা বা বাস্তবধর্মিতা ক্ষুণ্ন হয় না। বরং তাতে গল্পটি 'সাঙ্কেতিকতার সুষ্ঠু প্রয়োগে অপরূপ অর্থব্যঞ্জনায়' পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কল্লোল-গোষ্ঠীর প্রধান তিনজন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬) প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪ -১৯৮৮) ও বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)। এঁদের মধ্যে যতটা মিল ততোটাই অমিল। বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পে যে নির্মল কাব্যময়তা, প্রেমেন্দ্র মিত্র সে প্রভাব থেকে আশ্চর্যজনক ভাবে মুক্ত। অন্যদিকে বুদ্ধদেব ও প্রেমেন্দ্র যতটা শহুরে জীবনের লেখক অচিন্ত্যকুমার তা নন। তিনি অন্তর দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন বাংলার গ্রামীণ মানুষের জীবনকে। প্রেমেন্দ্র ও অচিন্ত্যকুমার মধ্যবিত্তের ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের দুঃসহ দরিদ্রতা ও শোচনীয় পরাজয়কে অবলম্বন করে গল্প লেখা শুরু করেছেন। প্রেমেন্দ্রের 'শুধু কেরাণী', অচিন্ত্যকুমারের 'দুইবার রাজা' তার প্রমাণ। কিন্তু বুদ্ধদেব শুরু করেছিলেন মানুষের জীবনের আদিম পিপাসা নিয়ে গল্প লিখে। 'রজনী হল উতলা' (কল্লোল ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ) সে ধরনেরই গল্প। বুদ্ধদেব সংকীর্ণ শহরজীবনের অক্লান্ত রূপকার, প্রেমেন্দ্র ও অচিন্ত্যকুমারের গল্পের পটভূমি বিস্তৃত ও বিচিত্র। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধদেব সমাজজীবনের চিত্রকর নন, তাঁর ছোটগল্পে সমাজ গৌণ। আবার প্রেমেন্দ্র ও অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পে সমাজ কোনভাবেই গৌণ নয় বরং সামাজিক মানুষগুলো প্রবলভাবে উপস্থিত হয়েছে তাঁদের রচনায়। এঁরা দুজনে পথে-ঘাটে গল্প খুঁজে বেরিয়েছেন, যেমন বেরিয়েছেন প্রবোধকুমার সান্যাল। আর বুদ্ধদেব গল্পকে পেয়েছেন সপ্রতিভ ও স্বতঃস্ফূর্ত তরুণের মনোলোকে। বস্তুত, বুদ্ধদেবের ছোটগল্পে আত্মজৈবনিক উপাদানের প্রাচুর্য রয়েছে, তিনিই তাঁর বেশিরভাগ গল্পের নায়ক। প্রেমেন্দ্র অচিন্ত্যকুমার সম্পর্কে সেভাবে বলা যায় না। 'বুদ্ধ-অচিন্ত্য বেষ্টনীর' সঙ্গে তুলনা করে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,- 'কথাশিল্পী প্রেমেন্দ্রের প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।... কাব্যের আতিশয্য বিষয়ে তিনি অচিন্ত্য- বুদ্ধদেব হইতে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। কল্পনাবিলাস বা কাব্যচর্চার লেশমাত্র বাষ্প তাঁহার উপন্যাসে নাই।'[২৭]

নীতিআদর্শ ও কল্পনামুগ্ধ প্রথম যৌবনের প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: ‘জীবনের চরম সার্থকতা...প্রেমের জাগরণে। যতদিন না এই প্রেম জাগে ততদিন মানুষ খণ্ডিত থাকে, সে নিজেকে পায়না সম্পূর্ণ করে।’[২৮] কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে নারী পুরুষের সম্পর্কের দ্বন্দ্বময় জটিলতা ও তির্যক বক্রগতি তাঁকে প্রেমের নৈতিক আদর্শে বিভোর থাকতে দেয় নি। যুদ্ধোত্তর কালের নারীপুরুষের জটিল মনস্তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতে গিয়ে তিনি বেদনার্ত হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করলেন যে, মানুষ অনেক পরিমানে অপ্রকৃতিস্থ ও বিকৃত। তাই আজকের মানুষের প্রেমচেতনা সরল ও স্বাভাবিক নয়। অনিকেত মনোভাব, দ্বিধা, সঙ্কট, অবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব যৌবনের সেই স্বতঃস্ফূর্ত সহজ প্রবৃত্তিটিকে এক বিচিত্র রহস্যময় জটিলতায় আচ্ছন্ন করে তুলেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর গল্পে নারী পুরুষের জটিল সম্পর্কের এই নিগূঢ় রহস্যের আশ্চর্য চিত্র অঙ্কন করেছেন সুনিপুণ ভাবে। এই চিত্রে যুদ্ধোত্তর আধুনিক জীবনের অসুস্থতা, বিকৃতি ও প্রবঞ্চনার সূক্ষ্ম প্রতিফলন গভীরভাবে লক্ষ করা যায়। ‘গল্পের শরীরে নাটকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্পষ্টতা, দ্রুতগতি এবং আবহ রয়েছে। কিন্তু তাঁর অন্তর জুড়ে আছে এক আত্মস্থ অস্ফুট কবি- জীবনবোধের সাংকেতিক ব্যঞ্জনা। ফলে বিষয়সর্বস্ব হয়েও বিষয়-উৎক্রান্তির মধ্যেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের প্রকরণ এবং রসগত সাফল্য, একাধারে দুইই বিধৃত হয়ে রয়েছে। তাঁর গল্পগুলি শরীরে বস্তুবিমণ্ডিত, আত্মায় অ-ধরা নিবিড় প্রত্যয়ের মৃদু সুরভিযুক্ত ; কাব্যধর্মী গল্প নয় কিছুতেই, কিন্তু অন্তরে যিনি কবি- তাঁরই আত্ম-উন্মোচনের মুকুর- রসোত্তীর্ণ সার্থক ছোটগল্প।’[২৯] তবে ‘বেনামী বন্দরের’ মুটে মজুরের কবি ‘ধূলিধূসর’ ‘মৃত্তিকা’ ঠিকমত চিনতে ও চেনাতে না পেরে মধ্যবিত্ত জীবনের ‘নিশীথ নগরী’র অন্তহীন জটিলতার কুম্ভীপাকে তলিয়ে গিয়ে তৃপ্ত রইলেন, মাঝে মাঝে ‘কুড়িয়ে ছড়িয়ে’ ‘নানারঙে বোনা’ কিছু আহত মানুষ কিছু ঘনাদার কল্পবিজ্ঞান বা কিছু পরাশরের অপরিণত রহস্য কাহিনী সরবরাহ ক’রে পাঠক সমাজকে ব্যস্ত রাখলেন। সত্যিই এ বড়ো আক্ষেপের কথা।’[৩০]

এঁর গল্প সংগ্রহ-গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে : ‘বেনামী বন্দর’ (১৯৩০), ‘পুতুল ও প্রতিমা’ (১৯৩১),‘অফুরন্ত’ (১৯৩২) ,‘পঞ্চশর’ (১৯৩৪), ‘মৃত্তিকা’ (১৯৩৫), ‘মহানগর, (১৯৩৭),‘ধূলি ধূসর’ (১৯৩৮), ‘কুড়িয়ে ছড়িয়ে’ (১৯৪০) ‘সামনে চড়াই’ (১৯৫০), ‘সপ্তপদী’ (১৯৫৩), ‘ডাল পায়রা’ (১৯৫৭) ‘প্রেমই ধন্বন্তরী’ (১৯৫৮), ‘নানারঙে বোনা’ (১৯৬০)।

কল্লোলগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রায় শুরু থেকেই সম্পৃক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫–১৯৮৩)। কল্লোল পত্রিকার প্রথম বর্ষের মাঘ মাসের সংখ্যায় তাঁর ‘মার্জনা’ গল্প প্রকাশিত হয়। কেবল গদ্যরীতির স্বাতন্ত্র্যেই নয়, অন্তরের নিগূঢ় প্রবণতার দিক থেকে প্রবোধকুমার কল্লোল চেতনার যথার্থ শিল্পী। প্রগতিশীলতা ও যৌবনচেতনা ছিল ‘কল্লোল’ গোষ্ঠীর অন্তর্নিহিত মূল প্রেরণা। “তারুণ্য থেকেই ‘কল্লোলের’ আবির্ভাব”– অচিন্ত্যকুমারের এই উক্তি কল্লোল পর্বকে যথার্থ অনুধাবন করতে সাহায্য করে নিঃসন্দেহ ভাবে। আর এই তারুণ্য চেতনার সার্থক রূপায়ণ

যদি কারো মধ্যে হয়ে থাকে তিনি প্রবোধকুমার। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের যুগসন্ধি ও বিপর্যয়ের পটভূমিতে যৌবন ও তারুণ্যের স্বপ্ন, কল্পনা, অভীপ্সা ও নৈতিক আদর্শ আবার ওই যৌবন ও তারুণ্যের করুণ অবক্ষয় ও হতাশা, এই লেখকের শৈল্পিক সৃষ্টির নেপথ্যে গভীরভাবে বিরাজমান। তারুণ্যের যে দুর্মর উদ্দীপনা ও প্রেরণা মানুষকে ঘরছাড়া ভবঘুরে করে, সেই পথচলার সীমাহীন প্রেরণা তাঁর মধ্যে বর্তমান। সেই যাযাবর জীবনমুখী শিল্পী পথ অতিক্রম করতে করতে জনজীবনের বিচিত্র আনন্দ বেদনার মধ্যে নিজেকে বিস্তীর্ণ করে মেলে দিয়েছেন। আবার তারুণ্য দীপ্তিতে উজ্জ্বল এই মেধাবী ও সংবেদনশীল শিল্পীর আধুনিক দৃষ্টিতে যৌনতার চেতনা এক বিচিত্র মৌলিক ভাবনা ও তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এই মৌলিকত্ব কিছুটা হয়ত বাস্তবতাবর্জিত কিন্তু এই মৌলিকতার প্রবণতাও যৌবন চেতনারই এক প্রদীপ্ত প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে তারুণ্যের মূল লক্ষণ যা, তা-ই প্রবোধকুমারের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বে ও রচনায় সংশয়াতীতভাবে পরিস্ফুট। তারুণ্যের বলিষ্ঠতম রূপ আধুনিক কালের সমস্ত জীর্ণতা ও অবক্ষয়ের মধ্যে থেকেও প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার মত জ্বলে উঠেছে প্রবোধকুমারের মধ্যে। 'মুক্ত হাওয়ার মুক্ত আকাশের মানুষ সে, আর সেই হাওয়া আর আকাশ আমাদের এই বদ্ধ জলার জীবনে অল্পদৃষ্ট। তাকে খুঁজে নিতে হয় না, সে আপনা থেকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।... বিচ্ছেদ আছে প্রবোধের কাছে, কিন্তু বিয়োগ নেই। সমস্ত চাঞ্চল্য- চাপল্য সত্ত্বেও তার হৃদয়ে একটা বলিষ্ঠ ঔদার্য আছে, সমস্ত উত্থানে-পতনে তার মধ্যে জেগে আছে ঘরছাড়া সদাতৃপ্ত সন্ন্যাসী। দুর্বিপাকে পড়েও তার এই উদারতা ঘোচে না। শত ঝড়েও মুছে যায় না তাঁর মনের নীলাকাশ। আর সকলের সঙ্গে বুদ্ধির ও বিদ্যার যোগাযোগ, প্রবোধের সঙ্গে একেবারে অন্তরের সংস্পর্শ। ওর মাঝে মেঘ এলেও মলিনতা আসে না।'[৩১] -অচিন্ত্যকুমারের এই উপলব্ধি অতিরঞ্জিত নয়। তাঁর বহু রচনায় বিস্তৃত জীবন অভিজ্ঞতা ও মুক্ত জীবনচেতনার সুনিশ্চিত পরিচয় আছে। সংসারের নানা পথ চলতে চলতে জীবনকে খুব কাছে থেকে অবলোকন করার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। তাঁর নির্মম বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার পাত্র বারবার ফেনিয়ে উপচে পড়েছে। সম্ভ্রান্ত, অভিজাত সুখী মানুষের নিস্তরঙ্গ সংকীর্ণ জীবনের প্রতি প্রবোধকুমার সবসময় অনীহা প্রকাশ করেছেন। বাইরের কদর্য, ভঙ্গুর ও হতশ্রী রূপের আড়ালে জীবন যেখানে উচ্ছল প্রাণের অমিত প্রাচুর্যে, অনন্ত হৃদয়ানুভূতির ঐশ্বর্যে নিজেকে প্রকাশ করতে চায় অথচ অপারগ, দুঃখ-যন্ত্রণায় প্রতিকূল সামাজিক প্রতিবেশের কঠিন পাষাণের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়–জীবনের সেই বিস্ময় ও বেদনাকে তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাঁর সমকালীন কল্লোল পর্বের অনেক লেখকের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টি কাব্যময়তার ছায়ায় কিছুটা স্বপ্নাতুর। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জীবনবোধকে তাঁরা অনুধাবন করেছেন কাব্যের এক সূক্ষ্ম আবরণের মধ্য দিয়ে। প্রবোধকুমার সেদিক থেকে জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন বাস্তবধর্মী জীবনচেতনায়। তিনি যৌনবিদ্রোহের নামে উন্মত্ত-উচ্ছৃঙ্খলতার পথকে প্রবীণের বিরুদ্ধে প্রগতিশীলের সত্যিকার প্রতিবাদ বলে বিবেচনা করেন নি। আবার বিবাহের নামে সামাজিক বন্ধনকেও সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখেন নি। আত্মসম্মানবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের

প্রেরণায় তিনি নারী পুরুষের যৌন সম্পর্কের মৌলিক অভিনব একটি স্বরূপের অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর 'প্রিয় বান্ধবী' উপন্যাস সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন–

'মনে হয় যেন সমাজ ও কাব্য দীর্ঘ -শতাব্দীর অনুশীলনের ফলে প্রেমের যে মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, লেখক তাহাকে চূর্ণ করিয়া তাহার ভিতরের মৌলিক আকর্ষণটুকু পৃথক করিতে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রেম হইতে যৌন ও আবেগমূলক এই উভয়বিধ উপাদান বর্জন করিয়া তাহাকে বন্ধুত্বের উত্তেজনাহীন শান্ত স্নিগ্ধ পর্যায়ে নামাইয়া আনিতে চাহিয়াছেন।'[৩২]

তাঁর ছোটগল্পের সমষ্টি 'অবিকল' -এর (১৯৩৩) মধ্যে দুটি গল্প উল্লেখযোগ্য -'অবৈধ' ও 'অপরাহ্নে'। প্রথম গল্পে গ্রামের সহজ সরল বালিকা হরিদাসীর রেলগাড়িতে মাতৃপরিত্যক্ত শিশুর প্রতি দুর্বার আকর্ষণের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই মানবশিশুর জন্য সে স্বামী, সংসার সব ছেড়ে মিথ্যা কলঙ্ক মাথায় নিয়ে অনাথ আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছে। এখানে হরিদাসীর ব্যাকুল মাতৃস্নেহের চিত্রটি মনোরমভাবে অঙ্কিত হয়েছে। 'অপরাহ্নে' গল্পে স্টেশন মাস্টারের করুণ-ব্যর্থ জীবন, তার প্রাক্তন প্রেমিকার সাথে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে যাওয়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।'প্রেতিনী' গল্পটি চন্দ্রময়ীর অতৃপ্ত সন্তানস্নেহ কীভাবে বাঁকাপথে ধাবিত হয়ে আত্মমর্যাদাহীন দুর্বোধ্য আচরণের মাধ্যমে তার ভাড়াটে পরিবারগুলোর জীবনযাত্রা অতিষ্ঠ করে তোলে তারই করুণ ও খানিকটা অরুচিকর কাহিনী। 'বিষ' গল্পে টুনির চপলতাকে গৌণ করে তাকে আফিং-এর নেশার মৃত্যকূপ থেকে উদ্ধার করার জন্য টুনির ওপর স্বামীর দৈহিক নিপীড়নের চূড়ান্ত প্রয়োগের বীভৎসতা প্রাধান্য লাভ করেছে- দাম্পত্য প্রেমের এমন অশোভন বহিঃপ্রকাশ লেখকের কল্পনার রুগ্ণ বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ। 'কল্পান্ত' গল্পে সমরকালীন বিপর্যয়ের ফলে মানবাত্মার চূড়ান্ত অধঃপতনের শিহরণকারী চিত্র রূপায়িত হয়েছে। 'মুক্তিস্নান' ও 'গুহায় নিহিত' দুটি গল্পে পূর্ব প্রেমের দুটি বিপরীতমুখী বিকারের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। প্রবোধকুমারের এই গল্পগুলোতে আদর্শ ও ভাববিলাস বর্জিত হয়ে অসুস্থ মনোবিকারের বিস্ময়কর নিদর্শন পাওয়া যায়। 'প্রবোধ সান্যালের রচনায় সবচেয়ে যা বিস্মিত করে, তা হচ্ছে শক্তির এই অমিত প্রাচুর্য। জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর প্রায় অশেষ, তার চেয়েও অনেক বেশি সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতারাজিকে নিজের অমোঘ কল্পনাশক্তির তাতে পুড়িয়ে যেমন-খুশি রূপমূর্তি গড়ে তোলার অনায়াস-দক্ষতা। গল্পের প্লটের শরীরে অকল্পনীয়কে এমন স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তায় বার বার আকার দিয়েছেন, যাতে স্তম্ভিত বিস্ময়ে কেবলই ভাবতে হয় আগুন নিয়ে খেলে বেড়াবার কি অদম্য প্রাণশক্তি এই শিল্পীর।'[৩৩]

তাঁর গল্পসংকলন গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে : 'নিশিপদ্ম', 'দিবাচল', 'কয়েক ঘণ্টামাত্র', 'অবিকল', 'গল্প-সঞ্চয়ন', 'নওরঙ্গী', 'মধুকরে', 'মাস', 'নিচের তলায়', 'অঙ্গার', 'কাটামাটির দুর্গ', 'সায়াহ্ন','পঞ্চতীর্থ' ইত্যাদি।

কল্লোলগোষ্ঠীর অন্যতম লেখক বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) সাহিত্যজীবনে নানা বৈচিত্র্যের সম্মিলন ঘটিয়েছেন। সাহিত্যের নানাক্ষেত্রে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ, কারণ তিনি সব্যসাচী। তাঁর ছোটগল্পের বিষয়বস্তু ও রচনারীতির মধ্যে ঈর্ষণীয় বিচিত্রময়তা আছে। বুদ্ধদেবের বর্ণিল প্রসাধিত ভাষা পাঠক সমাজকে কখনো আবেগের

তরঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যায় আবার কখনো বেদনার অতলে অবতরণ করায়। অন্তহীন ভালবাসার আবির্ভাবকে লেখক কেবল নাটকীয়তা দিয়ে নির্মাণ করেন না, সেই সঙ্গে তাকে দেন উজ্জ্বল কোমল ভাষারূপ। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতির মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায় -

'তবে জানবেন তিনি এই মুহূর্ত থেকে আপনার সমস্ত জীবন দাবী করছেন।

হঠাৎ বিদ্যাপতিবাবু নতজানু হ'য়ে বসে পড়লেন আমার সামনে। উৎসুক উত্তোলিত বাহু এড়াবার জন্য আমি বিদ্যুৎগতিতে সরে যেতেই আমার শাড়ির আঁচলটা লুটিয়ে পড়লো। বিদ্যাপতিবাবু দুই হাতে সেই আঁচল কুড়িয়ে নিয়ে তাতে মুখ ঢাকলেন।

ঈষৎ অবনত হয়ে আমি তাঁর চুলের ওপর হাত রাখলাম। ধীরে ধীরে তিনি মুখ তুললেন - সিংহের মতো প্রকাণ্ড মাথায় হরিণের মতো আশ্চর্য কোমল চোখ - জোছনা আর অশ্রুজল একত্র হ'য়ে সেই দুটি চোখকে উজ্জ্বলতর করেছে। দু-খানা আয়না মুখোমুখি রাখলে যেমন তারা পরস্পরের সংখ্যাহীন ছায়া সৃষ্টি করে, তেমনি আমাদের দৃষ্টি পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হ'তেই তার ভিতর দিয়ে আমরা নিজেদের অনন্তবিস্তৃত অসংখ্য মূর্তি প্রত্যক্ষ করলাম; সময় যখন শিশু তখন থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত আমাদের জন্ম -জন্মান্তরের কাহিনী। এক মুহূর্তে কেটে গেল - শত সহস্র শতাব্দী। বিদ্যাপতিবাবু আবার আমার আঁচলে মুখ ঢাকলেন। আমার ঐ বস্ত্রাঞ্চলে যদি আজ তাঁর মুখচ্ছবি দেখতে পেতাম, তা'হলে আমি একটুও বিস্মিত হতাম না।

পনের মিনিট আগে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে যে নেমে এসেছিল, সে আর ফিরে এলো না; তার শূন্যস্থান সে অধিকার করেছে, কবির মতো সে সুন্দর, দেবতার মতো সে অনির্বচনীয়। বিশ্বের সকল কবিদের অপরূপ আনন্দ ও বেদনা, কল্পনা ও অনুভূতি আমার মনে যে নেবুর রসে লেখা ছিলো, এতদিন তা পড়তে পারিনি, কিন্তু যে মুহূর্তে প্রেমের আলো জ্বলেছে, তার উত্তাপে সেই লেখা উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে ফুটে উঠেছে। নিজেকে আবিষ্কার করলাম; - এর চেয়ে রোমাঞ্চকর ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে লেখেনি।' (প্রথম ও শেষ, রচনাকাল -১৯২৮)

'একটি লাল গোলাপ' (১৯৪৬) গল্পে ভীরু প্রেমের গোপন সার্থকতা লাভের সুন্দর একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রতাপের হৃদয়ের গোপন সাধ পূর্ণতা পায় তখনই যখন অস্ফুট প্রেমের উপহার প্রেয়সী ছায়ার কাছে পৌঁছে যায়। আবার প্রেমের ব্যর্থতার কথাও বর্ণিত হয়েছে 'আদর্শ' গল্পে (১৯৫৮)। সুখী দম্পতি রমলা ও অনিমেষ আজ বিচ্ছিন্ন। সময়ের পরিবর্তনে রমলা ধনী সফল অভিনেত্রী আর অনিমেষ গরিব লেখক। অনেকদিন পরে পরস্পরের দেখা হলে রমলা অনিমেষের কাছে একটি পুত্র সন্তান চায়। কিন্তু অনিমেষের উত্তরহীন প্রস্থান মনে করিয়ে দেয়, প্রেমের কেবল সার্থকতা নেই, ব্যর্থতাও আছে। ইচ্ছে করলেই আবার প্রথম থেকে শুরু করা যায় না - এই মর্মবাণীই 'আদর্শ' গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে।

বুদ্ধদেব বসুর শেষদিকের রচনায় প্রেমের গল্পে বিরহ, বিচ্ছেদ ও ব্যর্থতা বড় হয়ে উঠেছে। প্রথম দিকের গল্পের প্রাণখোলা আনন্দময় স্বীকৃতি ও সার্থকতা প্রবলভাবে দূরীভূত। অবশ্য 'সুপ্রতিম মিত্র' (১৯৩৯) ও

'আবছায়া' (১৯৪১) গল্পেই তার শুরু হয়েছিল। তাঁর গল্পে ভালবাসা জীবনের একটিমাত্র খণ্ডিত অংশ নয়, বরং সমগ্র অনুভূতি, সত্তাবিলোপকারী দুর্লভ অভিজ্ঞতা। স্বয়ং বুদ্ধদেব নিজের লেখা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন-'আমি পরিপূর্ণ আত্মসচেতন- লিখতে সময় লাগে, বেশি ভাবতে হয়, বেশি খাটতে হয়... এ বিষয়ে সন্দেহই নেই যে, মনে মনে গল্পকে আমি কবিতার চাইতে নিচু আসনে বসাই।'[৩৪] নিরুপম চট্টোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছিলেন- 'যদি বলা যায় বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্প ও উপন্যাসের প্রধান বস্তু হল প্রেম, তাহলে বোধহয় ভুল হবে না। প্রেমের জাগরণ, উপভোগ, বিকার, অভাব, স্মৃতি, বহুদিক থেকে প্রেমকে উপলব্ধির প্রয়াস 'সাড়া' থেকে 'যমুনাবতী' পর্যন্ত বিস্তৃত।'[৩৫] বুদ্ধদেব নিজেও বলেছেন - 'তাই বলি / যা কিছু লিখেছি আমি- হোক যৌবনের স্তব, অন্ধ জৈব / আনন্দের বন্দনা হোক না-/ যা কিছু লিখেছি, সবই ভালোবাসার কবিতা...' (মৃত্যুর পরেঃ জন্মের আগে)

বুদ্ধদেব বসু হলেন কল্লোলগোষ্ঠীর রোমান্টিক স্বপ্নাতুর গীতিকাব্যসুরভিত কথাশিল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্রষ্টা। কবিতার স্বপ্নকল্পনায় তিনি আবিষ্ট ছিলেন কৈশোর থেকেই। তাঁর গল্পে গীতিকবিতার সৌন্দর্যবিলাস ও সূক্ষ্ম অনুচ্চার ভাবময়তা গভীরভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। জীবনকে তিনি অবলোকন করেছেন মুখ্যত আত্মমগ্ন কবি-দৃষ্টিতে। সাধারণ মানুষের যে 'বাস্তব' বিপর্যয়, যে সীমাহীন যন্ত্রণা, দুর্গতি, দারিদ্র্য, তা তাঁকে কখনো নিবিড়ভাবে স্পর্শ করতে পারে নি। আত্মমুখী শিল্পী সমস্ত কষ্ট যন্ত্রণা দুর্গতির মধ্যে জীবনের নিটোল সৌন্দর্য ও ভালবাসার কল্পলোক সৃজন করতে চেয়েছেন। তাঁর গল্পে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনজীবনের কোন কাহিনী নেই, গ্রামীণ বাংলার মাটির মানুষের সাধারণ নর-নারীর বাস্তব হাসিকান্নার কোন চিত্র সেখানে রূপায়িত হয়নি। মূলত তিনি কলকাতার নাগরিক জীবনের শিল্পী। কিন্তু সে শহুরে জীবন যন্ত্রণাবিধুর প্রপীড়িত বা জীবন সংগ্রামের বিপুল তরঙ্গের আঘাতে বিক্ষুব্ধ নয়। এ নগরও অনেকটা তাঁর মনের স্বপ্ন-কল্পনা দিয়ে তৈরি। গল্পের নায়ক নায়িকার রোমান্টিক প্রেম ও স্নিগ্ধ পরিশীলিত অন্তর্জীবন রূপায়িত করার জন্য কলকাতার নাগরিক জীবনের যেন অবতারণা। নাগরিক কিংবা শহুরে চরিত্রগুলি সামাজিক মর্যাদায় ও আর্থিক সঙ্গতিতে তাঁরই সমশ্রেণীভুক্ত বা তাঁর চেয়েও উচ্চতর পর্যায়ের। নিম্নবিত্ত মানুষের দরিদ্র হতশ্রী পরিবেশ তিনি রচনা করেন নি বোধকরি একটিও। অচিন্ত্যকুমারের গল্পে কাব্যময়তার মাঝে মাঝে ঘটনা বা কাহিনী মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে, কিন্তু বুদ্ধদেবের কাহিনীর ছোট্ট পরিসরের পরতে পরতে কাব্যের স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে গেছে। কাহিনী ও কাব্যময়তাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলাদা সত্তা রূপে চেনা যায় না, ঘটনাধর্মী গল্প সেখানে কবিতার সুরে ধ্বনিত হয়েছে আবার গল্পের মধ্যে নতুন স্বাদ ও সৌরভ এনে দিয়েছে মাঝে মাঝে। অচিন্ত্যকুমারের গল্পে তবু কাহিনী বা বিষয়ের একটা 'ঘনত্ব' আছে, কিন্তু বুদ্ধদেবের রচনায় সমস্ত ঘটনাই দ্রবীভূত হয়ে অনর্গল সুরের ধারায় ভেসে চলে গেছে অনির্বচনীয়ের দিকে। অচিন্ত্যকুমারের গদ্যভাষা অপেক্ষাকৃত স্থাপত্যধর্মী ও চিত্রধর্মী। তার তুলনায় বুদ্ধদেবের ভাষা অনেক বেশি শৈল্পিক ও সূক্ষ্ম সঙ্গীতধর্মী। ভাষার এই গীতিধর্মিতা বুদ্ধদেবের ভাষাকে আরো গতিশীল করেছে, ফলে পাঠকের মন সুরব্যঞ্জনামুখর ভাষার বেগে অন্য কোথাও হারিয়ে যায়। বুদ্ধদেবের সমস্ত রচনাজুড়ে এই কাব্যসুরভিত

কথনশৈলীর প্রবহমানতা একনিষ্ঠ পাঠককে মুগ্ধ করে, অভিভূত করে, চমৎকৃত করে। বুদ্ধদেবের কাছে শিল্পকলাকে বাদ দিয়ে জীবনবোধের তেমন কোন স্বতন্ত্র সৌন্দর্য নেই। তাঁর কথাসাহিত্যে তাই বিষয়ের চেয়ে কথনভঙ্গি অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ। তাঁর দৃষ্টিতে শিল্প অনেক সময় জীবনকে আরও বেশি প্রাণবন্ত ও সজীব করে তোলে। আবার অনেক সময়, শিল্প জীবনের চেয়েও আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর। এ প্রসঙ্গে জগদীশ ভট্টাচার্যের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য - 'বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে শিল্পায়নের মূল্যেই জীবনায়নের মূল্য।... তাঁর সাহিত্যে জীবনশিল্পের চেয়ে বাণী শিল্পের চমৎকারিত্বই অধিক চিত্তাকর্ষক।'[৩৬]

বুদ্ধদেব কোথাও জীবনকে অস্বীকার করেন নি, অবমাননাও করেননি। তাই তাঁর সাহিত্যে জীবনের চেতনা মুখ্যত প্রেমচেতনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। প্রেমের বিচিত্র বর্ণিল রাগ তিনি ছন্দোময় রেখায় চিত্রিত করেছেন– আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নারী পুরুষের জীবনে প্রেমের স্বপ্ন, শারীরিক প্রেমের পিপাসা যেমন তাঁর কবিকল্পনায় বাণীরূপ পেয়েছে, অন্যদিকে প্রগতিশীল জীবনে প্রেমের জটিল মনস্তত্ত্বের চিত্রও তাঁর কথাসাহিত্যে প্রবহমান। তিনি মুখ্যত প্রেমের রূপকার। কাব্য, গল্প ও উপন্যাসের জগতে এই প্রেমবোধের স্বরূপকে খুঁজে ফিরেছেন তিনি। তাঁর কথাসাহিত্যে পরিবেশগত যে বৈচিত্র্যহীন সংকীর্ণতা আছে, এই প্রেমের বর্ণময় অন্বেষণ-তৃষ্ণায় সেই সংকীর্ণতা ও বৈচিত্র্যহীনতাকে তিনি বিপুল পরিমাণে অতিক্রম করে গেছেন। এখানেই তাঁর সৃজনশীল সর্বজনীন আবেদন দেখা দিয়েছে।

যৌনবাসনার এই শারীরিক রূপকে বুদ্ধদেব আধুনিক যুগের অনিবার্য অবক্ষয়ের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবেও অনুভব করেছেন। নারী-পুরুষের এই যৌনস্পৃহা চিরন্তন বটে, কিন্তু আধুনিক কালের তরুণ-তরুণীর মনে তার প্রকাশ বিচিত্র পথে, নানা রূপে। সে রূপ অনেক সময়ে বিকৃত, অমার্জিত ও উন্মার্গগামী। তিনি নীতিবাদী লেখক নন, বরং জীবন রহস্যের নিরন্তর অন্বেষণে যৌবনের স্পর্ধিত উচ্ছলতায় প্রথাগত শালীনতা ও শ্লীলতার সীমা অনায়াসে অতিক্রম করেছেন বারবার, তবুও এই যুগ-অবক্ষয়ের বিকৃতিকে কখনও স্বাভাবিক বলে মেনে নেন নি। তাই নিজে 'আধুনিক' ও 'যুবক' হয়েও প্রগতিশীল যৌবনের এই নগ্নতা, স্থূলতা ও বিকৃতিকে কটাক্ষ করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেন নি তিনি।

'আধুনিক যৌবনের লক্ষণ হচ্ছে একটা অগভীর, চিন্তাহীন সুখবাদ, যখন যা-ভাল-লাগে-তাই-করে... সমস্ত বিষয়ে উচ্ছৃঙ্খল হ'তে হবে; কোন নিয়মের অধীনে না থেকে চলতে হবে খেয়ালের বশে, যৌনস্পৃহা মুহূর্তের জন্য চুলবুল করে উঠলেই যে করে হোক সেটা মেটাতে হবে, কোনো কাজ যদি করতেই হয়, তাতে ফাঁকি দেয়া, সেটা ভালো মতো না করাটাই গৌরবের।'[৩৭]

আধুনিক কালের অবক্ষয়পীড়িত যৌবনের বিভিন্নমুখী প্রবণতাকে বুদ্ধদেব জেনেছেন, অনুধাবন করেছেন, বিশেষভাবে যৌনআকাঙ্ক্ষার মর্মদাহী ভীষণ যন্ত্রণাকে। তবু প্রাণের গভীরে তিনি অন্য এক নিগূঢ় আকুতিকে সন্তর্পণে লালন করেছেন। সে চিরন্তন প্রেমের অমৃত চেতনা। এই প্রেমচেতনারই বিচিত্রমুখী রূপায়ণ ঘটেছে তাঁর

কথাসাহিত্যে। বুদ্ধদেবের ব্যক্তিসত্তার এই বন্ধনমোচন তৃষ্ণা তাঁর গল্পের প্রধান চরিত্রের ওপর নানাভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। তবে তিনি সংকীর্ণ নগরজীবনের দক্ষ চিত্রকর, নাগরিক নরনারীর প্রেমচেতনার চিত্র তিনি নিপুণ হাতে এঁকেছেন। নাগরিক জীবনের উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত শৌখিন হৃদয়হীন শরীরসর্বস্ব তথাকথিত প্রেমকে কখনও যথার্থ প্রেম বলে মনে হয়নি তাঁর। আসলে তিনি মধ্যবিত্ত মানসিকতারই শিল্পী। তাই মূল্যবোধের আদর্শে ঘেরা মধ্যবিত্ত জীবনবোধের মধ্যেই তিনি প্রেমের অসামান্যতা অনুভব করেছেন। চিরন্তন প্রেম বিরহের মধ্যেই সার্থক। বাস্তবতার চেয়ে কল্পনাতেই তার পরিপূর্ণতা। বাস্তবের কঠিন মৃত্তিকার সংস্পর্শে যা বিচূর্ণ হতে পারে, চিরন্তন প্রেমের বিরহী প্রেমিক তাকে অন্তরের গহীনে খুব যত্নে লালন করে রাখে। তাঁর নাগরিক প্রেম বিরহের যন্ত্রণায় বিশুদ্ধ হয়ে গভীরতা লাভ করেছে। তিনি নর-নারীর প্রেমের বিচিত্র অনুভব ও নিগূঢ় শিল্পরূপ দিয়েছেন। প্রেমলীলা মাধুর্য, স্বপ্ন-কল্পনার সৌরভ, প্রেমবিলাস আবার নিবিড় ঘন রহস্যমেদুরতা সবই তিনি উপলব্ধি করেছেন, প্রকাশ করেছেন কাব্যমহিমার অস্ফুট ব্যঞ্জনায়। তৎকালীন গল্পে বা উপন্যাসে নর-নারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের যে বিশেষ প্রবণতা চোখে পড়ে বুদ্ধদেব সে পথের যাত্রী নন। তিনি মনে প্রাণে কবি বলে, নারী পুরুষের হৃদয়কে যথেষ্ট অনুধাবন করা সত্ত্বেও সেই হৃদয়ের দুর্গম অরণ্যপথকে মনোবিজ্ঞানীর সুতীক্ষ্ণ, তির্যক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হন নি। বরং আপনার বিষয়টি কবির মোহময় দৃষ্টির আবছায়া আলোক প্রক্ষেপণে সেই মানবিক জটিলতার ওপর রহস্যময়তার স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করেছেন। 'বুদ্ধদেবের গল্প রচনার একমাত্র গুণ এক অখণ্ড ভাবপরিমণ্ডল রচনার সৌষম্যে। তাঁর চরিত্রগুলি একটিও বাস্তব নয় - অর্থাৎ নিখাদ বস্তু নেই তাতে এমন- কিছু, ভাব এবং কথা ছেঁকে নিলে যা অবশিষ্ট থাকে। ... নিজের স্ব-নিহিত ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনাকে ছড়িয়ে দিয়ে গল্পগুলো জমাট বেঁধেছে। ফলে শিল্পীর রচনাজগৎ বস্তুময় নয়; বস্তুবিশ্বকে ঘিরে তাঁর মদির কল্পনা আশার ও স্বপ্নের যে দেউল রচনা করেছে- সেখানেই বুদ্ধদেবের গল্পের জগৎ গড়ে উঠেছে।'[৩৮] 'বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যজীবনের প্রথমার্ধে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবন অবলম্বিত এবং উচ্চবিত্ত জীবন ব্যঙ্গাশ্রিত হলেও অভিজ্ঞতার স্বল্পতায় সর্বত্র অভীপ্সিত হয়নি, দৃষ্টিভঙ্গির আবিলতায় যথার্থ আবেদনগ্রাহী ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়নি।'[৩৯]

তাঁর গল্পসংকলন গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে : 'অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩০), 'রেখাচিত্র ও অন্যান্য গল্প'(১৯৩১) 'এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে'(১৯৩২), 'অদৃশ্য শত্রু'(১৯৩৩), 'মিসেস গুপ্ত'(১৯৩৪), 'প্রেমের বিচিত্রগতি'(১৯৩৪), 'শ্বেতপত্র'(১৯৩৪),'অসামান্য মেয়ে'(১৯৩৫), 'ঘরেতে ভ্রমর এল'(১৯৩৫), 'নতুন নেশা'(১৯৩৬), 'ফেরিওয়ালা ও অন্যান্য গল্প'(১৯৪১),'খাতার শেষ পাতা'(১৯৪৩)।

কল্লোল যুগ-বাসনার অন্যতম সুনির্দিষ্ট লক্ষণ নবজীবনের যৌবনতৃষ্ণা অচিন্ত্যকুমারের ব্যক্তিচেতনায় অনুভূত হয়েছিল এবং তাঁর ছোটগল্পে তারই যথার্থ রূপায়ণ ঘটেছে। আকর্ষণীয় ভাষায় তিনি তাঁর গল্পের কাহিনী সাবলীলভাবে বর্ণনা করে গেছেন। তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতার পুঞ্জিত সঞ্চয় ধীরে ধীরে জায়গা তৈরি করে নিয়েছে। আবার বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্প প্রধানত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ এবং রোমান্টিক মাধুর্যমণ্ডিত। তাঁর গল্প নিটোল

পূর্ণাঙ্গ কবিতাধর্মী- তার অবয়বে কাব্যাড়ম্বর নেই, অতিরঞ্জন নেই অথচ রূপে ও স্বভাবে ছড়িয়ে আছে কবিতার সুস্পষ্ট স্বাদুতা। তাঁর দুর্লভ ঝঙ্কার স্পন্দিত সুপ্রযুক্ত ভাষাশৈলী থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্লটের মধ্যে আর কিছু এমন বিষয় থাকে না যাকে দুহাত দিয়ে আয়ত্তে আনা যায়। তিনি ছিলেন সমকালীন সাহিত্য শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে নান্দনিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টির অধিকারী। গল্পে রূপের প্রকরণে তাঁর সচেতন বিচিত্র সুরবিলাসের পরিচয় বিদ্যমান। অনুভূত হয় 'কাহিনীর ক্ষীণ অবয়বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কাব্যের সৌরভ ছড়িয়ে গেছে।'[৪০] তাঁর সকল সফল রচনাতেই আছে একটানা সুরের রেশের সঙ্গে কবিতার মোহনীয় আবহ। তিনি নিজেই বলেছেন,'এমন গল্প কিছু কিছু লিখেছি যাকে গল্পাকারে প্রবন্ধ বললে দোষ হয় না।'[৪১] অন্যদিকে বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি আনয়ন করে বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। সামাজিক ও নৈতিক অধঃপতনের কদর্যতা, লোভের নিষ্ঠুরতা, নারীর ব্যাভিচার, অপমানিতের ভীরুতা, মানুষের হিংসা ও কদাকার অহঙ্কার, বুদ্ধিজীবীর নৈরাশ্য - সবকিছুই তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। তাঁর গল্পের ভাব গভীর, স্নিগ্ধ ও অচঞ্চল ভাষা সহজ ও ধীরগতি। কবিতা ও কথাসাহিত্যে একই সঙ্গে তাঁর অধিষ্ঠান হয়েছিল অপ্রতিরোধ্যভাবে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কালে রূপে-গুণে অনন্য ছোটগল্প নির্মাণে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অন্যদিকে নিজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রবোধকুমার সান্যাল লিখেছেন, 'আমি ভাবলুম মানুষের হৃৎপিণ্ডের রক্তের ধারা যে লেখায় ছোটে নি, তাকে কিছুতেই সাহিত্য সৃষ্টি বলা চলবে না। আমি সে জন্য পথে-ঘাটে গল্প খুঁজে বেরিয়েছি-স্টীমার ঘাটে, চটকলের ধারে, রেলস্টেশনে, বিদেশের ধর্মশালায়, মফঃস্বলে, ওয়েটিংরুমে, তীর্থপথের মেলায় আমি গল্পের বিষয়বস্তু খুঁজে পেতুম।... আমি বড়লোক নিয়ে কিছু লিখতে পারতুম না। আমি লিখতুম মজুর, জেলে, রাজমিস্ত্রি, গাড়োয়ান, মুদি, ফড়ে, এইসব চরিত্র নিয়ে, কারণ তাদের জীবনযাত্রাটা চোখে দেখতে পেতুম।'[৪২] আবার 'মানববৃত্তির একটানা অন্ধকার রূপ-চিত্রণের যে একঘেয়েমি প্রত্যক্ষ বাস্তব জগতের পক্ষেও অস্বাভাবিক, জগদীশ গুপ্তের গল্পে তার প্রশ্নাতীত অমোঘতা আসলে শিল্পীর অবিচল প্রত্যয়েরই অনিবার্য পরিণতি।'[৪৩] মনোবৈকল্যজনিত বিভিন্ন ঘটনা তাঁর গল্পগুলোর বিশেষত্ব। এক দুর্বার, অপ্রতিরোধ্য, অনিবার্য নিয়তিবাদ তাঁর নির্মিত কাহিনীর মূল সুর।

এঁরা ছাড়াও আরো অনেক গল্পকার কল্লোলযুগে ছোটগল্প রচনায় নৈপুণ্য অর্জন করেছেন। তাঁরা বাইরের জগতের সাথে মনোজগতের মিল ঘটিয়েছেন, সমাজের বিকৃত রূপ উন্মোচনের জন্য যৌনতার নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করেছেন, গদ্যের শরীরে কবিতার লাবণ্য বিস্তার করেছেন, শিল্প-সাহিত্যের সৌন্দর্যালোকে কঠিন সত্যকে অন্বেষণ করেছেন, সর্বোপরি সত্যের দৃঢ়ভিত্তির উপরেই সৌন্দর্যের বেদী রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁদের প্রতীকধর্মী শব্দ প্রয়োগ, বাক্যের বিন্যাস, কাব্যিক ভাষার ব্যবহার, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রাধান্য বাংলা ছোটগল্পকে নিয়ে গেছে সমৃদ্ধির অভিলক্ষ্যে।

তথ্যসূত্র

১. বুদ্ধদেব বসু - *রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক, সাহিত্য চর্চা।* উদ্ধৃত গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৩৮০, পৃ. ১৪৪*

২. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃলিঃ, কলকাতা - পৃ: ১৪৭* উদ্ধৃত গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, প্রাগুক্ত , *পৃ.১৫৬*

৩. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃলিঃ, কলকাতা - পৃ: ৮৩* উদ্ধৃত গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, প্রাগুক্ত , *পৃ.১৫৮*

৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *লেখকের কথা- পৃ: ৩০* উদ্ধৃত গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, প্রাগুক্ত , *পৃ.১৭৭*

৫. প্রমথনাথ বিশী, *বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য (আধুনিকতা), পৃ: ৭৪* উদ্ধৃত গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, প্রাগুক্ত, *পৃ.১৭৮*

৬. অসিত সিংহ, *বাংলা উপন্যাসে সমাজচিন্তার বিবর্তন : পৃ. ১১৫* উদ্ধৃত *ড. সুদীপ্তা চক্রবর্তী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কবি ও কথাশিল্পী, প্রকাশক- দেবাশিস ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-১লা বৈশাখ,১৪২০,পৃ.৬৯*

৭. দেবকুমার বসু, *'কল্লোলগোষ্ঠীর কথাসাহিত্য' : পৃ.৫৭ উদ্ধৃত ড. সুদীপ্তা চক্রবর্তী*, প্রাগুক্ত , *পৃ.৬৯*

৮. *(কল্লোল: ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা (ডাকঘর)* উদ্ধৃত গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, প্রাগুক্ত , *পৃ.১৮১*

৯. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, *'কল্লোলের কাল' কথাশিল্প, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ১১১-১১২* উদ্ধৃত মাহবুব সাদিক, *অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত*, জীবনী গ্রন্থমালা, প্রথম প্রকাশ- জুন ১৯৯৫, বাএ ৩১৮২ *পৃ. ৫০*

১০. *অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শতবার্ষিকী সংকলন*, প্রথম প্রকাশ- মাঘ ১৪১০, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, এস.এন.রায় কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ২১৬।

১১. জীবেন্দ্র সিংহরায়, *কল্লোলের কাল, প্রকাশক: সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, প্র.প্র. ১৯৭৩, পৃ.১৯*

১২. ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃলি, পুনর্মুদ্রণ-১৯৯৯, পৃ.৩৬৮*

১৩. জীবেন্দ্র সিংহরায়, *কল্লোলের কাল, প্রকাশক: সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, প্র. প্র. ১৯৭৩, পৃষ্ঠা-১০৩*

১৪. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৪ উদ্ধৃত রবিন পাল, কল্লোলিত ছোটগল্প, বুক ট্রাস্ট, কলকাতা-৯, বরুণ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম বুক ট্রাস্ট সংস্করণ/ আগস্ট ১৯৮৮,কলিকাতা,পৃষ্ঠা-১৬৪*

১৫. সুবীর রায়চৌধুরী, *লুপ্তলেখক জগদীশ গুপ্ত, 'সারস্বত'*, আষাঢ় ১৩৭৫ *উদ্ধৃত রবিন পাল, কল্লোলিত ছোটগল্প, বুক ট্রাস্ট, কলকাতা-৯, বরুণ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম বুক ট্রাস্ট সংস্করণ/আগস্ট ১৯৮৮, কলিকাতা, পৃ-১৬৪*

১৬. রবিন পাল, *কল্লোলিত ছোটগল্প, বরুণ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম বুক ট্রাস্ট সংস্করণ/ আগস্ট*

১৯৮৮, কলিকাতা,পৃষ্ঠা-১৬৭

১৭. রবিন পাল, প্রাগুক্ত ,*পৃষ্ঠা-১৬৬*

১৮. ভূদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত , *পৃষ্ঠা-৩৭৫*

১৯. রবিন পাল, প্রাগুক্ত ,*পৃষ্ঠা-১৮৫*

২০. জ্যোতিপ্রকাশ বসু-*গল্প লেখার গল্প, পৃষ্ঠা-৫৫* উদ্ধৃত ভূদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত , *পৃষ্ঠা-৪০১*

২১. ভূদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত , *পৃষ্ঠা-৪৯৭*

২২. ভূদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত, *পৃষ্ঠা-৪১০*

২৩. রবিন পাল, প্রাগুক্ত ,*পৃষ্ঠা-১৯৮*

২৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *লেখকের কথা, পৃষ্ঠা-৩০* উদ্ধৃত গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, প্রাগুক্ত , *পৃষ্ঠা-২৩২*

২৫. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, প্রাগুক্ত, *পৃষ্ঠা-২৩০*

২৬. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শতবার্ষিকী সংকলন, প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৪১০, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, এস.এন.রায় কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা- ২৪৮-২৪৯।

২৭. ভূদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত, *পৃষ্ঠা- ৩৩৪*

২৮. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা চিঠিঃ কল্লোল যুগ, ৬২ পৃ: ৫ম সংখ্যা উদ্ধৃত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শতবার্ষিকী সংকলন, প্রথম প্রকাশঃ মাঘ ১৪১০, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, এস.এন.রায় কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-২৩০

২৯. ভূদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত , *পৃষ্ঠা-৩৪২*

৩০. রবিন পাল, প্রাগুক্ত, *পৃষ্ঠা- ১২৭*

৩১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শতবার্ষিকী সংকলন, প্রথম প্রকাশ :মাঘ ১৪১০, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ , এস.এন.রায় কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৩০৩

৩২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃলিঃ কলিকাতা, প্রকাশক : শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, পৃ. ৪৮২, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৭-১৯৯৮*

৩৩. ভূদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত , *পৃষ্ঠা-৪৬৩*

৩৪. ভূদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত, *পৃষ্ঠা-৩৫৫*

৩৫. রবিন পাল, প্রাগুক্ত, *পৃষ্ঠা-১৪০*

৩৬. জগদীশ ভট্টাচার্য, *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প: ভূমিকা*, উদ্ধৃত গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, প্রাগুক্ত, *পৃষ্ঠা-২০৪*

৩৭. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, প্রাগুক্ত , *পৃষ্ঠা-২০৬*

৩৮. ভূদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত , *পৃষ্ঠা- ৩৬২*

৩৯. রবিন পাল, প্রাগুক্ত , *পৃষ্ঠা- ১৪৯*

৪০. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, প্রাগুক্ত , *পৃষ্ঠা-২০৪*

৪১. জ্যোতিপ্রকাশ বসু-*গল্প লেখার গল্প*, উদ্ধৃত ভূদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত , *পৃষ্ঠা- ৩৬৮*

৪২. জ্যোতিপ্রকাশ বসু-*গল্প লেখার গল্প*, উদ্ধৃত ভূদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত , *পৃষ্ঠা-৪৫৬*

৪৩. ভূদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত , *পৃষ্ঠা-৩৭৪*

তৃতীয় অধ্যায়

অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পে জীবনচেতনা

জীবনচেতনার সীমাহীন রূপ ও অবিরাম রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হয় একজন শিল্পীর সমগ্র চৈতন্য। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় কালজ্ঞান, পরিবেশ-সচেতনতা, ইতিহাস-ঐতিহ্যবোধের পরাকাষ্ঠা এবং দ্বিধাহীনভাবে অর্জিত হয় সমাজ-প্রতিবেশ সৃষ্ট বিশ্বাস ও মূল্যবোধের গভীরতা। জীবনানুরাগী শিল্পীর ব্যক্তিচৈতন্য ও শিল্পীমানস প্রবহমান সময় ও দ্বন্দ্বময় সমাজের অনিবার্য যোগফল। তাই একজন শিল্পী তাঁর সমাজ-সময়-প্রতিবেশ-ঐতিহ্য-আদর্শ-মূল্যবোধকে আয়ত্ত করেই নির্মাণ করেন তাঁর শিল্প-সাহিত্যের জগৎ। সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার মতই ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও এ সত্যের অনিবার্যতা সর্বজনস্বীকৃত।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পরের সময়কালের সবটুকু যেন সাহিত্যের ঐশ্বর্যে ও প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। জ্যোৎস্নালোকিত কবির পুনর্যৌবন লাভের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাশে এসে দাঁড়ান শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর নিত্য নতুন দানে কথাসাহিত্য নতুন প্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, অন্যদিকে ধ্বনিত হয় ‘সবুজপত্রের’ পৃষ্ঠায় বীরবলীয় বুদ্ধিবাদ মোহমুক্তির মন্ত্র। চারিপাশের নানা আয়োজনে জীবনের রঙ্গমঞ্চে তখন চলছে দ্রুত পটপরিবর্তন। আশা ও নিরাশায়, সফলতা ও ব্যর্থতায় প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত প্রাণচঞ্চল।

মানব সংসারের একদিকে দুঃখে দারিদ্র্যে-লাঞ্ছনায়-বঞ্চনায় জীবন পর্যুদস্ত অপরদিকে সর্বদুঃখ বিজয়ের অপরাজেয় প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে নবজীবনের রঙিন অভিসার। ভাঙ্গা-গড়ার বিপুল উত্তেজনায় মহাযুদ্ধ আমাদের প্রযুক্ত করে বৈশ্বিক জীবনের সঙ্গে। এই মহাজীবনের মোহনায় দাঁড়িয়ে তৃতীয় দশকের শেষ বৈশাখে ‘কল্লোলে’র কলধ্বনির হিল্লোল বয়ে যায় বাংলাসাহিত্যের প্রাঙ্গণে। শুধু কলধ্বনিই নয়, ‘স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন’ আসে সাহিত্যে। বাঁধনহারা বিপ্লবীযৌবন নবজীবনের সন্ধানে নতুন পথে যাত্রা শুরু করে। স্পর্ধিত পথিকৃতের দল স্পর্ধাভরে বললেন-

‘বৃন্তবন্ধহারা
যাব উদ্দামের পথে, যাব আনন্দিত সর্বনেশে,
রিক্তবৃষ্টি মেঘসাথে, সৃষ্টিছাড়া ঝড়ের বাতাসে,
যাব, যেথা শঙ্করের টলমল চরণ- পাতনে
জাহ্নবী তরঙ্গমন্দ্রমুখরিত তাণ্ডব-মাতনে -’[১]

কিন্তু এই 'বৃন্তবন্ধহারা'-র দল অভিনন্দনের প্রশংসা, স্তুতি, মালা-চন্দন বয়ে আনতে অসমর্থ হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে 'কল্লোল যুগে'র অপরিপক্ক রচনার বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ উত্থাপন করেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে 'দারিদ্র্যের আস্ফালন' অন্যটি 'লালসার অসংযম'। বলা বাহুল্য এ অভিযোগ নিতান্ত অমূলক ছিল না। যে দুর্বার জলস্রোত দুকূলপ্লাবী ফেনিল উচ্ছ্বাসে কল্লোলিত হয়ে ওঠে, তার মধ্যে পঙ্কিল আবিলতা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ফেনিল উচ্ছ্বাসের আবরণ ছিঁড়ে যাবার পর তা যে-পলল মৃত্তিকার আস্তরণ বিছিয়ে দেয় সেটাই নতুন ফসল-সৃষ্টির উর্বরতম ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। 'কল্লোল' যুগের সব রচনাই অপরিণত, অপটু হাতের ছিল না। তাঁদের মধ্যে শক্তিধরও অনেকেই ছিলেন। তাঁরা শুধু প্রলয়ের উল্লাসেই প্রমত্ত ছিলেন না, সৃষ্টির প্রাণদ স্বপ্ন-কল্পনাও এঁদের মননকে প্রভাবিত করে ছিল। ভাঙনের গানই শুধু এঁরা গেয়ে যাননি, নতুন পথের নতুন আদর্শবাদের সন্ধানও এঁরা করেছেন। উন্নাসিক বিমুখতা দিয়ে নয়, সশ্রদ্ধ কোমল সহানুভূতি দিয়ে এযুগের শিল্পীমনকে বুঝতে হলে অচিন্ত্যকুমারের ভাষাতেই বলতে হয়–

'বস্তুত কল্লোল যুগে এ দুটোই প্রধান সুর ছিল: এক- প্রবল বিরুদ্ধবাদ; দুই- বিহ্বল ভাববিলাস। একদিকে অনিয়মাধীন উদ্দামতা, অন্যদিকে সর্বব্যাপী নিরর্থকতার কাব্য। একদিকে সংগ্রামের মহিমা, অন্যদিকে ব্যর্থতার মাধুরী। আদর্শবাদী যুবক প্রতিকূল জীবনের প্রতিঘাতে নির্বারিত হচ্ছে-এই যন্ত্রণাটা সে যুগের যন্ত্রণা। শুধু বন্ধ দরজায় মাথা খুঁড়ছে, কোথাও আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না,- কিংবা যে জায়গা পাচ্ছে, তা তার আত্মার আনুপাতিক নয়–এই অসন্তোষে এই অপূর্ণতায় সে ছিন্নভিন্ন। বাইরে যেখানে বাধা নেই, সেখানে বাধা তার মনে, তার স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের অবনিবনায়। তাই একদিকে যেমন তার বিপ্লবের অস্থিরতা অন্যদিকে তেমনি বিফলতার অবসাদ।'[২] আর বিফলতাই যে সফলতার স্বর্ণসোপান, 'কল্লোলের' উত্তরকালেই আছে তার পূর্ণ স্বীকৃতি।

যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 'কল্লোলগোষ্ঠী'র অনেকের লেখনীই বাকরুদ্ধ, স্তব্ধ হয়েছে কিন্তু চলিষ্ণুমনা অচিন্ত্যকুমারের সৃষ্টিতে রয়ে গেছে সেই বিপুল অকৃপণ অজস্রতা। পৌন:পুনিকতা নয়, নিজেকে অতিক্রম করে যাবার শক্তিতে তাঁর সাহিত্যের ঋতুবদল হয়েছে যুগে যুগে, কালে কালে। আর ঋতুবদলের সঙ্গে সঙ্গে কথাসাহিত্যের অভ্যন্তরীণ রীতিবদলও হয়েছে বার বার। কবিত্বময় ভাবুকতা নিয়ে তাঁর জীবনবোধের প্রারম্ভ। জীবনের বৈচিত্র্যময় পরিবেশে বহু বিচিত্র নরনারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তিনি। মফস্বলের বড়পুতুল ছোট পুতুল, তাঁদের অন্ত:সারহীন আত্মাভিমান, অযৌক্তিক অনুযোগ, তাঁদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উন্নাসিকতা সতর্ক-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি। অবলোকন করেছেন উকিল-মোক্তার-মুহুরি-মামলাবাজ-মতলববাজদের বিড়ম্বিত দিনযাত্রাকে। ব্যঙ্গে ও হাস্যরসিকতায়, কোমল সহানুভূতি ও সহৃদয়তায় তাদের জীবনকে নতুন সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন। শুধু সমাজের উঁচু তলার স্বরূপ বিশ্লেণেই তাঁর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকেনি, শহরের সংকীর্ণগন্ডি পেরিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছেন সুদূর গ্রামীণ জীবনের অতি সাধারণ মানুষের নগণ্য সুখ-দুঃখের মধ্যে। 'কাঠ-খড়-

কেরোসিন, হাড়ি-মুচি-ডোম', 'চাষা-ভূষা' নিয়ে তাঁর রচনা সাহিত্যকে নতুনত্বের মহিমায় সিক্ত করেছে। বাংলাসাহিত্যে এতদিন যারা উপেক্ষিত ছিল সেই দরিদ্র মুসলমান জনসাধারণের অন্তরঙ্গ জীবনের সুখ-দুঃখ-যন্ত্রণার কথায় অচিন্ত্যকুমারের লেখনী 'কল্লোলযুগে' অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা পেয়েছে। জীবনের বিশেষ কোন ঘটনা, বিশেষ কোন মুহূর্ত বা চরিত্র চিত্রণ কবিদৃষ্টিকে উচ্চকিত ও নন্দিত করে তোলে। অচিন্ত্যকুমার সেই চিত্তবিস্ফারী জীবন-রহস্য-সন্ধানের নির্মল আনন্দকেই তাঁর ছোটগল্পে ধরে রেখেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমাজচেতনা

সমাজদ্রষ্টা, শিল্পী ও সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সমাজ-উপবনের বহু বিচিত্র পুষ্পসম্ভার থেকে তিল তিল করে মধু আহরণ করে তাঁর নিজের মনের মত সেগুলির প্রকাশ ঘটিয়েছেন বিভিন্ন ছোটগল্পে। দেশ, কাল, সমাজ ও সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন সাহিত্যের প্রত্যক্ষ উপকরণ হলেও তা নির্মাতার সৃষ্টি কৌশলের অপরূপ শিল্প সৌন্দর্যে সমকালীনতার সীমাবন্ধন অতিক্রম করে চিরকালীন জগতে উত্তীর্ণ হয়। রচয়িতার শিল্প প্রতিভার অনুপম রূপসৃষ্টির চিরন্তনতার জয়টিকা ললাটে নিয়ে তা হয়ে ওঠে সর্বজনীন, সর্বকালীন। সমাজভাবনায় কেবল স্থান, কাল এবং মানুষই ঠাঁই পায় না, সেখানে ঠাঁই হয় মানুষের বিশ্বাস, আচার-সংস্কার, বিচার-অবিচার, মহত্ত্ব-নীচতা, অমৃত-গরল সব কিছুরই। এভাবেই অচিন্ত্যকুমার সমাজের বৈচিত্র্য থেকে আহরণ করেছেন তাঁর সৃষ্টির বিচিত্র উপাদান। সমাজের বিস্তীর্ণ অবারিত প্রান্তর থেকে খড়কুটো সংগ্রহ করে বেঁধেছেন তাঁর সৃষ্টির ঘর।

সৎ নীতিবান ও পরিশ্রমজীবী মানুষ এবং তাদের নিত্যসঙ্গী দারিদ্র্যের প্রতি অচিন্ত্যকুমারের প্রবল ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। বিত্তশালী ও বিত্তহীনের মধ্যেকার ব্যবধানকে তিনি তাই সততা ও অসততা, নীতিবান ও নীতিহীনতার পার্থক্য রূপেই বিবেচনা করেছেন। ধনাঢ্য ও দরিদ্র জীবনের বৈপরীত্যকে তাঁর গল্পে উপস্থাপন করে জীবনবোধের বৈশিষ্ট্যকে করেছেন পরিস্ফুটিত। বিত্তহারা অভাবী মানুষের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ পক্ষপাতিত্ব তার জীবনচেতনাকে আলোকিত করে। তাঁর অধিকাংশ গল্পে দারিদ্র্যক্লিষ্ট অসহনীয় নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের চিত্র আছে। হতদরিদ্র জীবনের গ্লানিময় যন্ত্রণার স্বরূপ নির্দেশ করার পাশাপাশি তিনি দেখিয়েছেন অনাহারক্লিষ্ট জীবনধারায় মনুষ্য ধর্মের বিকাশও ব্যাহত হয়। সম্পদহীনা নিঃস্বদের জীবন এমন দুর্বিষহ অসহনীয় ও কলুষতায় আকীর্ণ হওয়ার মূলে রয়েছে, নিঃসন্দেহে, তাদের ওপর পুঁজিপতি শ্রেণীর নির্মম শোষণ, ন্যায্য মজুরি থেকে চিরস্থায়ী বঞ্চনা। বিত্তহীনদের দারিদ্র্যের যে ভয়ঙ্কর রূপ তিনি উন্মোচন করেছেন তা যেমন পাঠক মনকে আচ্ছন্ন করে তোলে তেমনি তার জীবনবোধকে চিরকালীন শিল্প সফল ব্যঞ্জনায় আভাসিত করে। অনটন ও ক্ষুধাজর্জর জীবনের রূপাঙ্কন অচিন্ত্য-সাহিত্যের এক সাধারণ প্রবণতা। দীনতা তাঁর কাম্য নয় , কিন্তু দৈন্যক্লিষ্ট জীবনের প্রতি মমতাবোধ ও সহানুভূতিতে পূর্বাপর সিক্ত ছিল তাঁর মন। অর্থকষ্টের অভিশাপমুক্তি কামনা করলেও অভাবগ্রস্ত জীবনের হীনতা ও অনুদারতার প্রতি ছিল না তাঁর এতটুকু বিদ্বেষ কিংবা অবজ্ঞা।

ছোটগল্প **'দুইবার রাজা'** অচিন্ত্যকুমারের শৌর্যসত্তার প্রথম নিঃসংশয় প্রমাণ। কবিগুরু যাকে সে যুগের অপটু হাতের রচনায় 'লালসার অসংযম' আর 'দারিদ্র্যের আস্ফালন' বলেছিলেন, আমরা যাকে বর্তমান শতাব্দীর মানুষের হাতে জীবনবোধের সঙ্গে প্রকৃত পরিচয়ের নতুন অভিজ্ঞান বলে পরিচিহ্নিত করেছি, এ রচনায় সে যুগেরই পরিচয় প্রকাশিত। দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনে মানুষের যে পরিচয়, অচিন্ত্যকুমারের দৃষ্টিতে তার জীবনবোধের প্রসারতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তা আরো স্পষ্ট আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কল্পনাসমৃদ্ধি ও কাব্যসুরভিতে অনন্য প্রথম যুগের বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ গুলো চিহ্নিত হয় অচিন্ত্যকুমারের অসাধারণ রচনারীতির অনবদ্য স্বাক্ষর 'দুইবার রাজা' ও 'ধন্বন্তরি' গল্পের মধ্যে।

'দুইবার রাজা' গল্পের মধ্যে একটা বিষণ্ন মাধুরী, হতভাগ্য মানুষের পরাজয়ে একটা স্নিগ্ধ কারুণ্য অন্ত:সলিলা ফল্গুর মত প্রবহমান। অসীম অভাব আর হাঁপানি-রোগের সঙ্গে কবিপ্রাণ কল্পনাপ্রবণ যুবক অমরের আজীবন সংগ্রাম। ঝুল-ঝোলা নোংরা দাঁত-বের করা খোলার ঘরে মাকে নিয়ে থাকে, আর মার শেষ গয়না বন্ধক দিয়ে বিএ পড়ার খরচ চালায়। ঠাকুরের কাছে মা যখন ছেলের কল্যাণ কামনা করেন, তখন সে বলে 'তোমার সেই ঠাকুর উড়ে ঠাকুরদের মতই বাজে রাঁধুনে, মা। হয় খালি ঝাল, নয় খালি নুন। পরিবেশন করতে পর্যন্ত ভাল শেখেনি।' রসিকতা উচ্চগ্রামের হোক আর নাই হোক, ওর মধ্যেই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আর অভিমান পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। তবু ত বুকের মধ্যে স্বপ্ন ও আশার শেষ নেই। একমুঠো ভাত, একখানি কুঁড়ে ঘর, আর একটি কল্যাণী। কিন্তু তাও ত আগামীকালের স্বপ্ন, আপাতত যে বি-এ পড়ার খরচই কুলোয় না। ছাত্র পড়াতে গিয়ে কবিকিশোরের স্বপ্নদেখার প্রশ্রয় প্রদানের অপরাধে চাকরি যায়। জীবনের বাকি স্বপ্নসাধও অপূর্ণ থাকেনি। দু'বছরের পড়ার খরচ আর মায়ের হাতে এক হাজার টাকার নোট তুলে দেওয়ার বিনিময়ে ধনিগৃহের অরক্ষণীয়া 'যমের অরুচি' পাত্রীর সঙ্গে বিয়ে হয়। হোক কালো কদাকার মেয়ে, তবু ত জীবনের অন্তত একটা দিন রাজার মত সম্মান পাওয়া গেল। অন্তত একটা দিন একমাত্র তাকেই উপলক্ষ করে বিরাট আয়োজন। কিন্তু একবারই নয়, আরো একবার সে রাজার মত সম্মান পায়, পথ চলতে গিয়ে বেখেয়ালে মোটর চাপা পড়ে যেদিন অনেকের কাঁধে চড়ে সে মহাযাত্রায় বের হল সেদিন। ওর জন্যেই ত সেদিনের সূর্য অস্ত যায়। ওর জন্যেই ত প্রেয়সী লুসির চোখে এক বিন্দু অশ্রু। গল্পের নায়ক অমর। 'দুইবার রাজা' দারিদ্র্য-ব্যাধি-মৃত্যু কবলিত জীবনের অমর কাহিনীই বটে! সমস্ত বাধা-বিঘ্ন, প্রতিকূলতা অস্বীকার করে বেঁচে থাকার কী তীব্র আকাঙ্ক্ষা, প্রতি পদে ব্যর্থতা-নৈরাশ্য সত্ত্বেও জীবনের প্রতি গভীর আসক্তি এ গল্পে মূর্ত হয়ে উঠেছে। অচিন্ত্যকুমার নিজেই এ গল্প সম্পর্কে বলেছেন- 'গত চল্লিশ বছরেরও উপর লিখছি, ১৯২১ সাল থেকে ১৯৬৫- লিখে চলেছি সমস্ত খণ্ডকালকে ছুঁয়ে- ছুঁয়ে, ক্রমবাহিতার সঙ্গে তাল রেখে। 'দুইবার রাজা' কল্লোল-কালে লেখা, প্রথম সাড়া জাগানো গল্প। একটি রুগ্ণ দরিদ্র ব্যর্থ যুবকের জীবনের স্বপ্ন ও সংগ্রামের কাহিনী। তবু যে কোন মানুষই বুঝি জীবনে দু'বার রাজা হয়, একবার যখন সে বিয়ে

করে, আরেকবার যখন সে মরে। তাই গল্পের অমরও দুবার রাজা হল।'[৩] 'দুইবার রাজা' নামকরণের মধ্যে যে ধারালো ব্যাঙ্গের হাসি ফুটে উঠেছে, তা গল্পের শেষে কান্নার চেয়েও করুণ বলে মনে হয়।'[৪]

সীমাহীন দারিদ্র্য, উৎকট অভাব আর দুঃসহ ক্ষুধা কীভাবে একজন নারীকে বহুগামিনীতে রূপান্তরিত করে তারই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে **'শাঁখা'** গল্পটিতে। 'শাঁখা' শব্দটি গল্পের মধ্যে এক তাৎপর্যপূর্ণ আবহের সৃষ্টি করেছে। শাঁখা সতী নারীর কাছে অত্যন্ত পবিত্র অনুষঙ্গ। শত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অত্যাচারের মধ্যেও নারী এই পবিত্র প্রতীককে লালন করে জীবনের পথ পাড়ি দেয়। কিন্তু জীবনের এই পথে যখন বিভীষিকাসম অভাব তার কদর্যতা নিয়ে পথ আগলে দাঁড়ায় তখন প্রিয় লালিত বিষয়কে রক্ষা করা কঠিন হয়ে যায় , যা প্রকাশিত হয়েছে 'শাঁখা' গল্পের মঙ্গলা চরিত্রের মধ্যে। মঙ্গলা বাড়িওয়ালার এক অন্নে বাঁচতে চেয়েছিল। মাথা উঁচু করে বাচাঁর প্রতীক হিসেবে দু'হাতে পরেছিল শ্বেতশুভ্র বজ্রাগ্নির মত দু'গাছি শাঁখা। সিঁথি সিঁদুরশূন্য থাকলেও এই শাঁখা তাকে এক জনের করে রেখেছিল ,যা রেবতীকে প্রথমদর্শনই দ্বিধান্বিত করে তুলেছিল। কিন্তু রেবতী নারীর টানেই হোক আর মঙ্গলা ক্ষুধার তাড়নায় হোক দু'জনের পথ একেবারে ভিন্নপথে বাঁক নিয়ে এক জায়গায় মিলিত হয়। সেখানে ক্ষুধানিবৃত্তির তৃপ্তি আছে, আশ্রয়ের নির্ভরতা আছে। নেই শুধু আগের মতো 'শুধু একজনের' হয়ে থাকা, শাঁখার অগ্নিতেজে নারীলোভীদের কাছে আসতে না দেয়ার বাধা।

দুর্ভিক্ষের অস্থিরতা, অসহায়তা, মানুষকে করে তোলে মনুষ্যত্বহীন, বিপন্ন ও ক্ষুধার্ত। ক্ষুধা- দারিদ্র্য মানুষকে এতটাই গ্রাস করে যে ধীরে ধীরে মানুষ নিজের অস্তিত্বটুকুও ভুলতে শুরু করে যা তাকে সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকতে অসমর্থ করে তোলে। আশা আর বিশ্বাসের ঘূর্ণিবাতে আবৃত 'শাঁখা' গল্পে দরিদ্র ঘরের মেয়ে মঙ্গলার বিয়ে হয় ব্যাধিতে আক্রান্ত একজন পুরুষের সঙ্গে। তার স্বামীর মায়ের বিশ্বাস ছিল বিয়ের পর তার অসুস্থ ছেলে সুস্থ হয়ে উঠবে, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। শাশুড়ি চিকিৎসার জন্যে তাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এসে এক ব্রাহ্মণের কাছে গোপনে বিক্রি করে দেয়। ব্রাহ্মণ ছোট একটা ঘরে মঙ্গলা আর তার মাকে রেখে মাঝে মাঝে এসে সময় কাটানোর সময় দিনযাপনের জন্যে অর্থ দিয়ে যেত। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণের আর্থিক অবস্থার পতন হওয়ার পরও নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সহায়তা দিতে কার্পণ্য করেনি। এভাবে ব্রাহ্মণের রক্ষিতা হয়ে দশ বছর পার করে দেয় মঙ্গলা। নানা অভাব অনটনেও সে অন্য কোন পুরুষের কণ্ঠলগ্না হয়নি। সে চেয়েছিল একজনের হয়ে জীবন ও যৌবনকে রক্ষা করতে। গল্পের প্রধান চরিত্র রেবতীর মানস দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে গল্পের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে মঙ্গলার সঙ্গে একরাত্রির সাক্ষাতের মাধ্যমে। রেবতীর বিবাহিতা স্ত্রী রূপবতী ও সৌন্দর্যে অনুপমা হলেও তার ভেতরের জৈবিক ক্ষুধা তাকে পতিতা পল্লীতে টেনে আনে। গল্পে তার স্ত্রীর বর্ণনা নিম্নরূপঃ

'বছর পুরো হয়নি বিয়ে করেছে সে। আর যাকে বিয়ে করেছে, সে তিল তিল সৌন্দর্য দিয়ে তৈরি। যেমন রঙ, তেমনি অবয়ব। যেমন কচি তেমনি টাটকা।' (য.বি./১২৯) ঘরে নববিবাহিতা তরুণী

সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও রেবতীর পতিতাপল্লীতে আগমনের কারণ জৈবিক ক্ষুধা, যার নিবারণ সম্ভব হয়নি স্ত্রীর মাধ্যমে। পতিতা পল্লীতে রেবতীর প্রথম আগমন বলে সে অনেককে দেখে বেরিয়েছে কিন্তু কাউকে নির্বাচন করতে পারেনি। তার দৃষ্টি পড়েছে পতিতা-পল্লীর শেষ প্রান্তে একটি ঘরে বসবাসরত মঙ্গলার প্রতি। রাস্তার কলের কাছে মঙ্গলা পিতলের থালা মাজায় ব্যস্ত ছিল। রেবতী লক্ষ করে মেয়েটার হাতে শাঁখা থাকলেও মাথায় সিঁদুর নেই। রেবতী তাকে বাড়িতে কাজ করার প্রস্তাব দিলে সে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ, এর আগে দু বাড়িতে কাজ করার সময় সে এক বাড়ির বড় ছেলে ও অন্য বাড়ির গৃহকর্তার হাতে নিগৃহীত হয়। মঙ্গলার প্রতি তীব্র আকর্ষণে রেবতী পরদিন আবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। মঙ্গলা তাকে রাত নটার পর তার ঘরে আসতে বলে। নটার সময় রেবতীকে আসতে বলার কারণ, মঙ্গলার রক্ষক তার কাছে সময় কাটানোর পর নটার সময়ে স্থানত্যাগ করে চলে যায়।

রেবতী নটার পর মঙ্গলার ঘরে প্রবেশের পর সে দরজা বন্ধ করে দেয়। মঙ্গলার ঘর আর ঘরের সামান্য সামগ্রীর বর্ণনার মধ্যে দিয়ে লেখক তার বিকট দারিদ্র্যের দিক তুলে ধরেছেন। দরজার ফাঁক বন্ধ করতে হয় ছেঁড়া নোংরা কাপড় দিয়ে। ইটের ওপর একটা তক্তপোষ, তার ওপর বিছানো একটা পাটি। ঘরে নেই কোনো আয়না, সুগন্ধ তেলের বোতল বা মুখ ঘসার পাফ। দড়িতে ঝোলানো নেই কোনো শাড়ি। এই অবস্থায় দশ বছর ধরে বয়স্ক ব্রাহ্মণকে নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে মঙ্গলা। অভাব পূরণ করতে বারবণিতাদের মতো দ্বিতীয় কোনো পুরুষকে ঘরে তোলেনি। রেবতী প্রথমে মঙ্গলাকে ভুল বুঝেছিল, মনে করেছিল সে কাছের পাড়ার মতো দেহপসারিণী। এজন্যে সে অনায়াসে মন্তব্য করতে দ্বিধাবোধ করেনি।

'এই তো তোমার এখন গুছিয়ে নেবার বয়স-করলে কী এত দিন? তাছাড়া এমন খোলতাই চেহারা তোমার, তাজা আনাজের মতো। শোনো, শোনো', হাত বাড়িয়ে রেবতী ধরতে গেল মঙ্গলাকে: 'আমি যখন এসে পড়েছি একবার, আর তোমার ভয় নেই। তোমার হাল-চাল বদলে দেব একদিনে।' (য.বি./১৩৪)

রেবতীর কথায় মঙ্গলার মনে আশা দানা বাঁধে। তার জীবনে রেবতীই প্রথম ব্যক্তি যার কাছে দশ বছর একজনের কাছে বাঁধা থেকে বের হয়ে এসেছে। লেখক এই অংশের বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নরূপে:

'শুধু মঙ্গলার শাঁখা শ্বেত বজ্রাগ্নির মতো জ্বলতে লাগলো সেই অন্ধকারে।' (য.বি./১৩৫)

মঙ্গলার বিশ্বাস, সে এতদিন একাশ্রিতা ছিল বলে অসতী নয়। ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ হলেও সেই তাকে প্রথম স্পর্শ করেছে। মঙ্গলাও তাকে স্পর্শ করে শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে চেয়েছে। এই কারণেই এত কষ্টের মধ্যে মাকে নিয়ে জীবনযাপন করেও সে আয়ের জন্যে অন্য পথে পা বাড়ায়নি। মঙ্গলা জীবনে একজন

পুরুষের হাত ধরে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা করেছে বলে রেবতীকে নিজের মনের অভিলাষ নিবেদন করতে দ্বিধাবোধ করেনি।

'শুনুন। কিন্তু একটা সর্ত। আপনি আমার একার না হোন, কিছু আসে যায় না আমার, কিন্তু আমি আপনার একার থাকবো।...আর আমি একজনের, আমি স্ত্রী, আমার একদিন বিয়ে হয়েছিলো, আমি হাতে শাঁখা পরেছিলাম–তা বোঝবার ও বিশ্বাস করবার মতো একটা অবস্থা। সেইটুকুই যদি আমি পাই, তা হলে আমায় পায় কে? তা না হলে বাড়িওয়ালাকে লুকিয়ে এমনি ছুটোও তো আনতে পারি লোক, কে বা তাকে বলতে আসছে বলুন–কিন্তু তা হলে আমার শাঁখার যে কোনো মান থাকে না।' (য.বি./১৩৮)

মঙ্গলার উক্তিতে তার জীবনের বিশ্বাস আর একভর্তৃকা নারীর মনোভাব প্রকাশিত। জীবনকে সুখকর করার প্রচেষ্টায় যে বহু পুরুষের দিকে হাত বাড়ায়নি, একজন পুরুষকে আঁকড়ে ধরেই দারিদ্র্যবরণে দ্বিধাবোধ করেনি। রেবতী তাকে আশ্বাস দেয়, ঘর ভাড়া করে তাকে অন্যত্র রাখবে, লেপ, তোষক, খাট, তোরঙ্গ, আয়না, আলমারিসহ অন্যান্য জিনিস এনে তার অভাব পূর্ণ করার এবং সেই সঙ্গে নিয়মিত মাসোহারা দেবার প্রতিশ্রুতি। দু একদিনের মধ্যে ঘর দেখে সেখানে মঙ্গলাকে তুলে নিয়ে যাবে। মঙ্গলার এই উপলব্ধি জন্মেছে যে, পুরুষ মানুষের মুখের আপ্তবাক্য অর্থহীন। সেজন্য সে শীত নিবারণের জন্যে তার গায়ের মূল্যবান শাল রেখে যেতে বলার পর তাকে প্রবোধ ও প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্যে সে তার হাতে মানি ব্যাগ খুলে আশাতীত টাকা দিয়ে যায়।

দুদিন পর বাড়িওলা ঠোঙায় সামান্য খাবার নিয়ে ঢোকে মঙ্গলার ঘরে। মঙ্গলা তাকে অশ্রুঘন কণ্ঠে বলতে দ্বিধা করেনি, আমাকে ছুঁয়ো না, আমি নষ্ট হয়ে গেছি।' রাত নটার কাছাকাছি বাড়িওলা ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর মঙ্গলা তার প্রকৃত জীবন বেছে নিতে দ্বিধা করেনি। রেবতী তার প্রতিশ্রুতি মতো আর মঙ্গলার কাছে আসেনি। মঙ্গলা তার ঘরের পাশের গলির মেয়েদের সঙ্গে মিশে গেছে অনেক দিনের লালিত মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে। এখন তার ঘরে শোভা পেয়েছে একটা বিছানা, লেপ, স্টিলের ট্রাংক, বড় টিনের বাক্স, কয়েকটা বাসন, পিকদানি, থালা-বাটি, আয়না আর প্রসাধন সামগ্রী। দশ দিনে তার জীবনের মোড় একেবারে ঘুরে গেছে। শুধু হাতের দুগাছি শাঁখা নেই, সেখানে স্থান পেয়েছে ঝলমলে কেমিকেলের চুড়ি। 'শাঁখা' গল্পে শাঁখা প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত। এক পুরুষের সঙ্গিনী এবং অনষ্ট হওয়া নারীর প্রতীকী চিহ্ন শাঁখা। বিয়ের পর মঙ্গলা একজন পুরুষের সঙ্গিনী হয়ে বাঁচতে চেয়েছিল, কিন্তু দুঃসহ অভাব আর রেবতীর আশ্বাস তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করায় সে রোহিণী ও রাজুবালাদের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। নষ্ট জীবনে পদার্পণকারী মঙ্গলা আর কখনো হাতে শাঁখা পরেনি। পরেছে কেমিকেলের চুড়ি। একজন বিপন্ন নারীর হাত থেকে শাঁখা কেড়ে নিয়েছিল বৃদ্ধ বাড়িওয়ালা আর ধনী

তরুণ রেবতী। সংসারচ্যুতা মঙ্গলা একজন পুরুষকে কেন্দ্র করে জীবন অতিবাহিত করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত পুরুষের বঞ্চনা তাকে পতিতা জীবনে ঠেলে নিয়ে যেতে বাধ্য করেছে।

সংস্কারবোধ নারীকে অনন্য করে তোলে। কিন্তু অগ্নিসম ক্ষুধা সেই সংস্কারে ফাটল তৈরি করে। আত্মীয় পরিত্যক্ত মঙ্গলার শাঁখা পরে একজনের হয়ে থাকা এবং কেমিকেলের চুড়ি পরে বহুজনের হয়ে যাওয়ার বিষয়কে বস্তুনিষ্ঠভাবে রূপায়িত করেছেন লেখক। জীবনের তাগিদে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন গৃহবধূ যে বারবধূ হিসেবে পরিগণিত হয় - এই জীবনচেতনাই অচিন্ত্যকুমারের গল্পে অসামান্য ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত হয়েছে।

'হাড়ি মুচি ডোম' প্রকাশিত হয় ১৩৫৪ সালে। এ গল্পগুলোতে নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের মর্যাদাশূন্য অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবনগাথা অঙ্কিত হয়েছে। অক্ষর জ্ঞানহীন এ শ্রেণীর মানুষের জীবনের আনন্দ, কষ্ট, ব্যথা, বেদনা, সহানুভূতিশীলতা সর্বোপরি মানবিক দিকগুলো উন্মোচিত হয়েছে। 'জাত-বেজাতের' বিল্লাতালি ও বিলাস ধর্মীয় নিষেধের ঘেরাটোপ টপকে একে অন্যকে আপন করে নিয়েছে। মানবিকতার কাছে হার মেনেছে ধর্মীয় অনুশাসন। 'মুচি বায়েন'-এর গোরাশশী অভাব আর ক্ষুধাকে বিসর্জন দিয়ে স্বামীর 'নাম' কে বড় করে রাখতে চায়। এ জন্য সে যে কোন ছুতায় তারাপদকে তাড়িয়ে দিতে উদ্যত হয়। ক্ষুধায় অন্নের চেয়ে স্বামীর 'নাম' যে তার কাছে অনেক বড়। 'হাড়ি হাজরা' তে কুড়োমতির মানবিকতা সাবলীল ভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। পূর্ণশশীর দুর্ব্যবহারে প্রতিশোধ স্পৃহায় অগ্নিপিণ্ড কুড়োমতি বৈরাগ্যদের বাড়িতে না যেয়ে থাকতে পারে না। বারবার অবহেলিত অথচ মানবিকতার উজ্জ্বল প্রতিনিধি কুড়োমতির কাছে আত্মমর্যাদার চেয়ে মমতাই প্রাধান্য পায় সবচেয়ে বেশি। উপচিকীর্ষা,আত্মত্যাগ ও পরার্থপরতার মহিমায় সে অতুলনীয়।

'জাত বেজাত' গল্পে ধর্মীয় দ্বন্দ্বের স্পর্শকাতর বিষয়টি সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠেছে। এ গল্পের বিল্লাতালি মৃত বাবার মরনোত্তর কার্যাদি সম্পন্ন করার জন্য হাজী সাহেবের কাছে জমি বিক্রি করেছে অল্প মূল্যে। হাজী সাহেবের নিষ্ঠুরতায় ঠকেও কোন বিচার পায়নি বিল্লাত আলি। কারণ সবাই বলেছে 'মোগো জাত ভাই জ্ঞাতিকুটুমই তো নিলে। এ ঘর থিয়া ও ঘর। এক দ্যাশ, এক নাম, এক ধম্ম। বিদেশে - বিপাকে চলিয়া গেলনা। বিড়ালের বাচ্চা বিড়ালই খাউক, শিয়ালে খায় ক্যান?' (এ.এ.গ/৩৮২) সেই জাতের মানুষই তাকে অধর্ম করে পথে বসিয়ে দেয়। সেখানে একই জাতের বলে না পেল করুণা না পেল ভালোবাসা বা দয়া। দরিদ্র মানুষকে 'জাতের' ধনীলোক কখনো আপন করে নেয় না। সেখানে একই জাত বড় হয় না, বড় হয় ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে নিষ্ঠুর ব্যবধান। দরিদ্রতা সেখানে মানব মিলনের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মীয় বিষয় নয় মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে বিত্ত। একই বিত্তের মানুষেরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, যা দেখতে পাওয়া যায় বিল্লাতালি আর বিলাসের মধ্যে। হিন্দু বিলাসের ভাত মুসলমান বিল্লাতালি খেতে কোন আপত্তি করেনি, কারন জাত মুখ্য নয়, মুখ্য হল ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুধা। পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়ে মুখের অন্ন ভাগ করে নিয়েছে তারা। এই মমতা ও ভালোবাসার মধ্যে কোন জাত স্থান পায়নি, পেয়েছে মনুষ্যত্ববোধ। এই বোধ মানুষকে ধর্মীয় গোঁড়ামির বেড়াজাল

ডিঙ্গাতে সাহায্য করে। মানুষকে করে তোলে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীল। এখানে বিলাস ও বিল্লাতালির ভেতরকার ঠুনকো ধর্মীয় বিশ্বাস ভেঙ্গে গিয়ে সেখানে স্থান করে নিয়েছে মানবীয় জীবনবোধ।

'মুচি বায়েন' গল্পে অর্থের চেয়ে নাম যশের দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। দারিদ্র্যে ঘেরা জীবনে শুধু যে অর্থই মূল্যবান তা নয় অর্থের চেয়ে 'টিকে থাকার' বোধটি বেশি মূল্যবান। ভোলানাথের তাই সহজ উচ্চারণ 'আরে, টাকাই যদি সব, তবে ঢোল ফেলে দিয়ে লাঙ্গল তুলে নিলেই তো হয়। বলি, মান খাতিরটা কি কিছু নয় দুনিয়ায়? শুধু টাকা হলেই কি মন ওঠে? পেট ভরলে কি বুক ভরে? দশটা গায়ের লোক যবে সুখ্যাতি করে, তার দাম কি টাকায় ধরা যায়?' এখানে ক্ষুধা ও দরিদ্রতাকে অতিক্রম করেছে যশ লাভের ঐকান্তিক চেষ্টা। অর্থকষ্টে জর্জরিত গোরাশশী তারাপদের দেয়া টাকার নোটটি টুকরো টুকরো করতে দ্বিধা বোধ করেনি শুধুমাত্র স্বামীর 'নামের' জন্য। সে জানে সবকিছুর উর্ধ্বে তার স্বামীর 'নাম'। ক্ষুধা,অনটন, অনাহার ,অশান্তি, অভাব, মেয়েলি সাধ- সব বিসর্জিত হয়, শুধু ভোলানাথের টিকে থাকার 'নাম ও যশের' - কাছে।

'হাড়ি হাজরা' (১৩৫৪) গল্পটিতে মানবতার জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। বর্ণবৈষম্যের বেড়াজালে আবদ্ধ মানুষের কাছে কুড়োমতি পৌঁছে দিয়েছে সাম্যের বাণী, সহমর্মিতার বাণী। উচ্চবংশীয় পূর্ণশশী মাতৃত্বের বেদনায় যখন পীড়িত, সন্তানের চেয়ে নিজের জীবনের প্রতি যখন প্রবল আগ্রহী তখন অস্পৃশ্য কুড়োমতিই তাকে জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণ থেকে বাঁচিয়ে তুলেছিল। পূর্ণশশীকে মাতৃত্বের স্বাদ উপভোগ করতে সাহায্য করেছিল সদ্যজাত ছেলেকে কোলে তুলে দিয়ে। এই তো সার্থকতা কুড়োমতির মত দাইমাদের। কিন্তু বিপদ পেরোনো উচ্চবংশীয়ারা অস্পৃশ্য কুড়োমতিদের অবজ্ঞাভরে অপমান করতে দ্বিধা বোধ করে না, 'ছোট লোকের আবার অত খ্যাঁক খ্যাঁক কেন? কুঁজোর সাধ যায় চিৎ হয়ে শুতে- না? আঁতুড় ঘরে না হয় খেয়েছে ছুঁয়েছে- বেকচ্চায় পড়ে হাতি, চামচিকেতে মারে লাথি- তাই বলে কি শুদ্ধ হয়েও তোকে ছুঁতে হবে?' (এ.এ.গ./৩৯৬) অর্থ-বিত্তে না হোক, মান সম্মানে আঘাত পড়লে মানুষ মাত্রই রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। কুড়োমতিও তাই-ই করেছিল। স্বামী লালুকে বলেছিল- 'শরীরে তুই একবার বল বাঁধ। লাঠি হাতে নে। গলায় রজ দে। বলে আমরা নাকিনি কেউ লয়, আমরা ছোট জাত, আমাদের সব ইতুরে কাণ্ড।' আবার এই কুড়োমতিই প্রবল সহানুভূতিশীলতায় মনের ক্ষোভ রাগ, সব ঝেড়ে ফেলে গর্ভবতী মায়েদের ক্লেশ মোচন করতে এগিয়ে যায় বর্ণ-বৈষম্যের তোয়াক্কা না করে। বলে, 'না যাই, বেপদ উদ্ধার করে দিয়ে আসি। ই বেপদে আমি না গেলে যাবে কে? ই বেপদের কথা শুনলে থির থাকা যায় না যে।' (এ.এ.গ./৩৯৮) অস্পৃশ্য কুড়োমতি এখানে মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বর্ণ-গোত্রের সীমানা ছাড়িয়ে মনুষ্যত্বকে নিয়ে গেছে আলোর মহিমায়।

'গার্ড সাহেব' গল্পে নিম্ন বেতনের কর্মচারী নিবারণ ভেবেছিল কষ্টে সৃষ্টে চলা একঘেয়ে সংসার জীবনে কিছুটা আনন্দ বয়ে আনবে তাদের বিবাহবার্ষিকী। তেমন বড় কোন আয়োজন নয়, ছোট্ট পরিসরে বন্ধু বান্ধবকে ডেকে চা খাওয়ানোর অজুহাতে না হয় দিনটি উদ্‌যাপন করবে তারা। 'কিছু ফুল পাতা', 'কিছু গন্ধওয়ালা চা, ছোট্ট

এক শিশি দামী এসেন্স' ছোট্ট জীবনের এই দিনটিকে হয়তো সৌরভে ভরিয়ে দেবে। কিন্তু সমস্ত অভিলাষ, আশা-আকাঙ্ক্ষার সামনে পথ রোধ করে দাঁড়ায় বেঁচে থাকার ছোট্ট ও প্রধান অবলম্বন চাকরির দায়িত্বশীলতা। আশাভঙ্গের বেদনায় লতিকা বলে - 'এর চেয়ে ভিক্ষে করা ভালো ছিল-' তার অনুভূতিতে কেবলই বেজে ওঠে 'সেই ঘরে ছোট হয়ে থাকবার হুকুম। একটা নতুন কিছু দেখবার, নতুন কিছু বোঝবার থেকে বঞ্চনা'। এত বঞ্চিত থাকার মধ্যে বেজে ওঠে সৎ ও নিষ্ঠাবান থাকার ঐকান্তিক চেষ্টা। মিথ্যে মিথ্যে সিক রির্পোর্টে নিবারণের প্রবল আপত্তি তাই প্রমাণ করে। কর্মনিষ্ঠ স্বল্পভেতনভোগী নিবারণ লতিকারা বুঝি অন্তরের লালিত সুখ আনন্দকে এভাবেই নিঃশেষ করে দেয়। সীমাবদ্ধ জীবনে অসীম আনন্দকে বুঝি তাদের স্পর্শ করবার অধিকার নেই। প্রত্যাশা করতে নেই ছোট্ট ঘরের কোনে প্রিয়জনের সান্নিধ্যে একান্ত কিছু সময় কাটাবার।

অভাব, দারিদ্র্য ও ক্ষুধা মানুষের জীবনে নির্মম পরিণতি ডেকে আনে। আত্মমর্যাদাবোধ, মনুষ্যত্ববোধ, সামাজিক নীতিবোধের ক্ষেত্রে ঘটে মারাত্মক অবনতি। অস্তিত্বের সংকটপীড়িত মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের বিপর্যয় ঘটে। বাস্তবতাকে সাহিত্যে রূপদানের ক্ষেত্রে শিল্পী হিসেবে অচিন্ত্যকুমারের সফলতাও **'টুটাফুটা'** গল্পের আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক।

রাজা, গল্পলেখক ও অনিল মিত্তির (কবি) নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মূর্তিমান প্রতিনিধি। রাজা দারিদ্র্যের অনাকাঙ্ক্ষিত পীড়ন থেকে রক্ষা করতে চেয়েছে তার আশেপাশের চিরচেনা মানুষদের। জীবনে যুক্ত করতে চেয়েছে একটু আনন্দের মাত্রা। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আজিজুল হকের মন্তব্য উল্লেখ করা যায়- 'আসলে ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তরে, সীমা থেকে অসীমে, বিশেষ থেকে নির্বিশেষে, ব্যক্তিস্বার্থ থেকে সমাজকল্যাণে মানুষের যখন জীবনাভিসার ঘটে তখনই জীবনমুক্তির স্পন্দন, মহত্তের অভিব্যঞ্জনা অনুভূত হয়।'[৫] মানবেতর জীবনাচারে, বীভৎস দারিদ্র্যের পঙ্কিলতায় মানুষের জীবন যখন কলুষিত রাজা তখন তাদেরই কাছে উপস্থিত হয় খুশির লহরী নিয়ে। জীবনে সৌন্দর্যের আহ্বান সে অনুভব করে অভাবগ্রস্ত মানুষের হাসির মধ্য দিয়ে। তার কাছে বসুন্ধরা 'বিধাতার আনন্দের একবিন্দু অশ্রুজল' আর জীবন হল- 'প্রিয়ার প্রথম চুম্বনের মতো,' সৃষ্টি প্রসঙ্গে অভিমত -'সমস্ত সৃষ্টিই ত' বৈরাগিনী। সন্ধ্যাতারা থেকে চৈত্রের রজনীগন্ধা'। গল্পলেখক তার বন্ধুর কাছে জীবনের দুঃখের পাতাগুলো উল্টাতে উল্টাতে করুণ চোখে চেয়ে দেখে 'ছোট্ট ছেলে অন্ধ ভিখিরি বাপের মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে। বুড়োটার কি গোগ্রাস, গিলছে না ত' অভিশাপ দিচ্ছে। (টুটাফুটা/৩৩৬) সৌন্দর্যহীন ও আবেগবিহীন বিবর্ণ জীবন সম্পর্কে বন্ধুর অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে এভাবে- 'ওদের সমস্তটা জীবন হাপর। এককোণে ব'সে সমাজ নামে কামার লোহা পিট্ছে- ওদের সমস্ত আশা বা বাসনা সব তাই চ্যাপ্টা, থেৎলানো, ধারালো নয়।' (টুটাফুটা/৩৩৬) অচিন্ত্যকুমারের অনুভবের গভীরতাকে এ গল্পে অনুধাবন করা যায়। জীবন ও মানবমন অনুধ্যানে তাঁর যে প্রয়াস তার স্ফূরণ নিঃসন্দেহে এ গল্পকে ঔজ্জ্বল্য দান করেছে। রাজা আবেগময় ভাবালুতায় কল্পনা করে, যন্ত্রণাবিদ্ধ প্রাণ ক্ষণিকের আনন্দ-ঐশ্বর্যে ঝলমল করে উঠবে। গল্পে সুতীব্র ভাবাবেগের অনুষঙ্গ নিম্নরূপ-

' রোজ এমনি ভোরে ওদের ঘুম ভাঙ্গার আগে পাড়ায় পাড়ায় পয়সা বিলোই।

-তার মানে?

- মানে কিছুই নেই। ওরা ওদের ভোরবেলাকার জানলা খুলে অন্তত ভুল করেও একটিবার ভাববে - ভগবান আছেন। ওদের আনন্দে ভোরের আকাশ লাল হয়ে উঠবে।

বললাম- ওদের মদ- ভাং-এর পয়সা জুটল।

-জুটুক ! সমস্ত দিনের হাড়- গোড়- ভাঙা খাটনির পর একগ্লাস জুটুকই না। কারু কারু হয়ত ওষুধ, দু'বেলার চাল, মরন্ত ছেলের জন্য একফোঁটা দুধ। কিছু ভাবিনা তা'। খুশি হবে ত' ওরা?

একটা জানলার খোপে একেবারে একটা টাকা পড়ল।

বললাম- এত ভাগ্য কা'র?

-একটা ভিখিরি খুকির। রাস্তার মোড়ে ওর নুলো মাকে বসিয়ে রেখে ও দূরে আরেকটা মোড়ে কাঁদতে বসে।(টুটাফুটা/৩৩৯)

জীবনে হারাবার কিছু নেই তাই প্রাপ্তির আনন্দে বিভোর রাজা বলে-'আকাশের সমস্ত আলো ঢেলে দেবার আনন্দে ফতুর হয়ে গেছে, ভাই। জীবনে যে ভালবাসতে পেল না সেই ত' ফকির, ফতুর।... আমার মাথায় প্রেমের রাজমুকুট।' (টুটাফুটা/৩৩৯) জীবনের মহত্ত্বকে মুক্তির আনন্দ সার্থক করে তোলে। প্রেমের বৈচিত্র্য চিঠির মাধ্যমে সৌন্দর্যের বারতা নিয়ে প্রবেশ করে রাজার জীবনে। সে ভাবে -'মনে হয়, অনন্তকালের বিচিত্র শোভাযাত্রা থেকে কয়েকটি নির্মল প্রভাত ও স্নিগ্ধ সন্ধ্যা ছিনিয়ে রেখে দিয়েছি অক্ষয় ক'রে। কয়েকটি নিশীথরাত্রিও ঘুমহারা।(টুটাফুটা/৩৪১) আবার নিপীড়িত মানবাত্মার করুণ কান্নায় ঈশ্বরের অস্তিত্বও খুঁজে পায়, যেমন-'এর প্রতিটি ঘরে না খেতে পেয়ে ভগবান কাঁদছেন, মরছেন-... এমনি প্রতি ঘরে আমার বিরহিনী প্রিয়া রুগ্ন ঘৃণ্য শয্যায়।' (টুটাফুটা-পৃ. ৩৪৫) সমাজতান্ত্রিক দর্শনের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় যখন সে বলে-'চাষা আসবে লাঙল নিয়ে, মিস্ত্রি বাঁটালি -তুরপুন নিয়ে, মজুর গাঁইতি-কুড়ুল নিয়ে- এল ব'লে। দলে দলে- জলোচ্ছ্বাসের মতো। বিদ্রোহীর দল।' (টুটাফুটা/৩৪৩)

কবি অনিল মিত্তিরের কাব্যময়তা মুহূর্তে ছাই হয়ে যায় দারিদ্র্যের রোষানলে। দুঃসহ অভাবী জীবনের সীমাহীন অসহায়ত্ব ও মধ্যবিত্তের অন্তঃসারশূন্য আত্মসম্মানচেতনা ও গরিব-ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে উপলব্ধি ও মূল্যবোধগত পার্থক্য অচিন্ত্যকুমার খুব গুরুত্বের সাথে অঙ্কন করেছেন তাঁর গল্পে। কবি অনিল মিত্তিরের কবিতার বিষয়বস্তুতে তাই 'শুধু ঝরা কাঠ গোলাপ, খসা তারা, মরা নদীর গান থাকেনা। থাকে- 'মা তার ছেলে ডাস্টবিনে ফেলে গেছে- সেই ডাস্টবিন আর নেই, সেখানে একটি আকন্দ গাছ, তাতে দুর্বল ভীরু মৃদু একটি কুসুমকণা।' (টুটাফুটা/৩৪২) জীবনের এই ক্ষুদ্র বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা একটি দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের যন্ত্রণার স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারি। জীবনের বহুমুখি সংকট নিরসনে আর্থিক দীনতা জনিত ব্যর্থতা মানবমনে যে চাপ তৈরি

করে, তারই ফলে অনিবার্যভাবে সে হয়ে ওঠে সংকীর্ণ, হীন ও গ্লানিযুক্ত। একদিকে সংসারের প্রতি দায়িত্ববোধ, অন্যদিকে উপার্জনের বিধিসম্মত ও সম্মানজনক উপায়ের অনুপস্থিতি এ -দুয়ের দ্বন্দ্ব কবিকে উদাসীন করে তোলে তার আত্মমর্যাদা ও নীতিনিষ্ঠা সম্পর্কে। বিধাতার ওপরেও তার অভিযোগের অন্ত নেই। ক্ষোভ ভরা কণ্ঠে বলে- 'এই পৃথিবী যে সৃষ্টি করেছে, সে ও তো প্রকাণ্ড কবি- কেরাণী নয়। আমার দাদাকে যে মারলে, আমার ফুসফুসে যে পোকা ঢোকালে- আমার ভাবী বধূর এয়োতি যে চুরি ক'রে নেবে-...বিধাতার হাতুড়ির তলায় সবাই বুক পেতে দিয়েছি- বাপ ছেলে নাতি; বিধাতার হামান্‌দিস্তে ! (টুটাফুটা/৩৪৫)

গল্পের শেষ দৃশ্যপট উন্মোচিত হয় অন্য এক চমকের অবতারণা করে। রাজার ভালবাসা সুষমা এখন গল্পলেখকের ঘরের বৌ। বিয়ের আসরে 'সু' কে বলার জন্য বলে 'বলিস না পাওয়ার মধ্যেই-' এই অপূর্ণ কথার মাঝেই আছে পরার্থপরতায় জীবনকে পূর্ণ করে তোলার ইঙ্গিত। মৃত নারীর সৎকারে নিজেকে দ্বিধাহীনভাবে যুক্ত করার মধ্যেই রাজার জীবনবোধের অন্য এক রূপ লক্ষ করা যায়।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর জীবনদর্শনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়কে 'টুটাফুটা' গল্পে দীপ্তিময় করে তুলেছেন। মধ্যবিত্তের ভাবালুতা ও অর্থনৈতিক শক্তির সাথে তাঁর ছিল সুস্পষ্ট বৈরিতা। কল্পনার আকাশবিহার পরিহার করে বাস্তব মৃত্তিকার স্পর্শই যে একজন লেখকের সার্থকতার পূর্বশর্ত- সে সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন। তাঁর এই জীবনানুভব আর শিল্পানুভবই রাজা, গল্পলেখক ও কবি চরিত্রের ভিত্তি নির্মাণ করেছেন।

মানবমনের অতল গভীর রহস্যের ও ঘটনার অনুসন্ধান করা সাহিত্যিকের কাজ। তিনি চেতন-অবচেতনের চিরন্তন সংঘাতের অতলান্ত গভীরতায় ব্যক্তিজীবনের আনন্দবেদনার উৎস সন্ধান করে শিল্পলোকের এক রহস্যমহলের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। তাই কালোত্তীর্ণ শিল্পী মনের মধ্যে তলিয়ে গিয়েও অন্তর্মুখি নয়, বর্হিমুখি।**'অচল টাকা'** গল্পে মানুষের একটি স্বাভাবিক মনোভাবকেই সার্থক শিল্পরূপ দেওয়া হয়েছে। এখানে ব্যক্তিজীবনের মানস বিশ্লেষিত হয়েছে। অবচেতনলোকের অন্ধকার রহস্যের দিকে এর মুখ নয়, বরং জীবন ও সমাজ চৈতন্যের উজ্জ্বল দিবালোকের দিকেই এর দৃষ্টি। এ গল্পে একদিকে যেমন সাধারণ, সরল মানুষের স্বাভাবিক জীবনবলয় উপস্থাপিত হয়েছে তেমনি অন্যদিকে সুযোগসন্ধানী স্বার্থপর, ধূর্ত মানুষদের আপাতভদ্র চেহারার আড়ালে বীভৎস চরিত্রও উন্মোচিত হয়েছে।

দৈন্যপীড়িত পরিবারে বাবা মায়ের কটূক্তি ও তাচ্ছিল্যের মধ্যে শৈশব কাটানো নরেন বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে ধুকে ধুকে জীবনের তরী বেয়ে চলে। বন্ধুদের কাছে টাকা ধার করে রেস্টুরেন্টে খায়। ঘুণে ধরা সংসারের আর সদস্যরা কীভাবে খেয়ে না খেয়ে বেঁচে আছে তা নিয়ে কোন উদ্বেগ কাজ করে না তার অন্তর্চেতনায়। নির্বিকার চিত্তে নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বাড়িতে ফিরে বিড়ি ধরিয়ে সুস্থতা ও সুখের কল্পনায় নিজেকে আচ্ছন্ন করে রাখে। জীবনের মূর্তিমান কদর্য বিভীষিকা-রূপ অভাবের হাতছানি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার অসহায় ভান করে। বিড়ি জ্বালিয়ে স্বপ্ন দেখে-'যেন প্রকাণ্ড ভোজ দিচ্ছে ও। কাতারে কাতারে ভিখিরির দল ব'সে গেছে

রাস্তার কিনারে। ও নিজেই যেন পরিবেশন করছে– পোলাও, মাংস, কত কি ! যে যা চাচ্ছে তাই পাচ্ছে। কাপড়, নগদ টাকা, বৌ'র জন্যে বাজু খাড়ু– কেউ কেউবা জুতো জামা এস্টকিং পর্যন্ত।... ওর বাপ বাতে পঙ্গু নয় আর চমৎকার যুবা পুরুষ। উদার অমায়িক। মা বিদুষী, সুন্দরী– কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী। ছোট ছোট ভাইবোনগুলি যেন শরতের শেফালিকা। খোলার ঘর নয়–প্রকাণ্ড ইমারৎ। গাড়ি বারান্দায় মিনার্ভা।' (টুটাফুটা/৩৯৪) আবার স্বপ্নের পরিসমাপ্তি প্রতিকায়িত হয় নিভে যাওয়া বিড়িতে-'আরো অনেক কথা ভাববার আগেই বিড়িটা নিবে যায়। পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে।'

দুঃসহ দারিদ্র্যে ঘেরা বিকট হা করা সংসারে বিয়ে মানে আনন্দের পরিবর্তে আরেকটি ক্ষুধার্ত মুখের সংখ্যা বাড়ানো। নবপরিণীতা বধূর সৌন্দর্যময়তা নিমেষে বাস্তবতার করালগ্রাসে লীন হয়ে যায়। রোমান্টিক কাব্যময়তায় ভাবে-'মুখে তার লোধ্ররেণু লীলাপদ্ম হাতে !' নামটি হয়ত বা নীলিমা। হয়ত বা রাণুই। অন্তরলক্ষ্মী ! চারিদিকে যেন হাসির দেয়ালি জ্বলে উঠেছে।... পৃথিবীর আজ শুভরাত্রি। সমস্ত কাঙাল বিরহী যুগ-যুগ দীর্ঘ তপস্যার পর তাদের একাকিনী প্রিয়াকে শয্যাসঙ্গিনী ক'রে পেল - একান্ত সম্পূর্ণ ক'রে। আবার পরক্ষণেই বাস্তবের অভিঘাতে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দেখে 'পুটুলিটি সমস্ত রাত্রি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলে।' অসম্মানজনক সম্বোধনে নববধূর প্রতি বিতৃষ্ণার কালি ছুঁড়ে দেওয়া হয়- 'ছোট ছোট ভাইবোনগুলি ডাকে - কেলো বৌদি। মা আবার মাঝে মাঝে শুধরে দেয়– চামচিকে।' খাদ্যাভাবপীড়িত নরেন সংসারজীবনের গতানুগতিক ধারায় স্থির থাকতে পারে না। দুঃসহ মানসিক জ্বালা ও গভীরতম হতাশায় সে লক্ষ্য করে, উপার্জনের সব পথ বন্ধ। হঠাৎ একদিকে আশার আলো দেখতে পায়। এক বন্ধুর আশ্বাসে বই লিখতে শুরু করে। রাতের বেলায় তেল ফুরিয়ে গেলে গ্যাসের আলোয় স্বপ্নের কথা লিখে চলে। বহু আকাঙ্ক্ষিত আশা ধূলিসাৎ হয় বন্ধুর প্রতারণায়। খুব সাধারণ একটি দৃশ্যে নিঃস্ব জীবনবোধের চিত্র ভেসে ওঠে। যেমন-

'প্রকাশকের কাছে হাত পাতলে – টাকাটা?

প্রকাশক কপালের ওপর থেকে চশমাটা নাকের ওপর নামিয়ে তেরছা চোখে চেয়ে বললে- টাকা? সে ত' আপনার বন্ধু শৈলেনবাবু নিয়ে গেছেন।

– নিয়ে গেছে?

কথা যেন নরেনের গলা চিরে বেরুল।

–আপনি তাঁকে একটা বন্ড্ সই করে দিয়েছেন – দেখালেন। তাতে বই বিক্রির সমস্ত টাকাই ওঁর প্রাপ্য।

– ও ! হ্যাঁ –তাকে লিখে দিয়েছিলাম বটে।

নরেনের সমস্ত রক্ত যেন কালিয়ে এল। পরে অস্ফূটস্বরে বললে- বেচারা ভারি গরীব– আমারো চেয়ে।' (টুটাফুটা/৩৯৮)

শেষ পর্যায়ে আরেক বন্ধুর কাছে পায় অচল টাকা, ওজনে ভারি কিন্তু চলে না। জীবনও এই অচল টাকার প্রতীকী ব্যঞ্জনায় দীপ্ত। সর্বস্বহারা অভাবী মানুষেরা যেন বিবিধ পুঞ্জীভূত অভাবের ভারে ভারাক্রান্ত ঠিক অচল টাকার মতো। লেখক এ গল্পের মধ্য দিয়ে বিত্তহারা জীবনবোধের লাঞ্ছনায় ব্যথিতচিত্ত এক সংবেদনশীল মানুষের একাকীত্বের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। আশ্চর্য কাব্যময় ভাষা ব্যবহার করে অচিন্ত্যকুমার তাঁর ছোটগল্পে এনেছেন অসাধারণ ছন্দ-মাধুর্যের ব্যঞ্জনা। একটুখানি তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত, একটুখানি তীর্যক আলো ফেলে তিনি মানবচরিত্রের জীবনবোধকে উন্মোচিত করেছেন। পুঞ্জীভূত কালিমা, সমস্ত সঞ্চিত ব্যথা, লজ্জা-গ্লানি-পাপ, মনস্তাপের সঙ্গে লেখকের তীক্ষ্ণ মনোবিশ্লেষণের দক্ষতায় পাঠকের নিবিড় পরিচয় ঘটে। চরিত্র ও বিষয়বস্তুর বিস্ময়কর বৈচিত্র্য, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে উপলব্ধি করার আশ্চর্যক্ষমতা, যে কোন পরিবেশে বৈচিত্র্যময় স্বাদের শিল্পসৃষ্টির সহজাত কুশলতা তাঁর অসামান্য পারদর্শিতা প্রমাণ করে।

দরিদ্র্য নিম্নবিত্ত জীবনে রূঢ় বাস্তবতা ও স্বপ্ন কল্পনার সংঘাত এবং অনিবার্যভাবে সেই সংঘাতের ব্যর্থ পরিসমাপ্তি, সর্বোপরি এক আশাহীন দ্বান্দ্বিক পরিবেশের নিরবচ্ছিন্নতা- এ সবই **‘যে-কে-সে’** গল্পের মুখ্য বিষয় হিসেবে প্রতীয়মান। অভাবগ্রস্ত মানুষের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা, ভাবালুতা, অনুভূতি প্রবণতা, সংবেদনশীলতা প্রভৃতি লেখক খুব দক্ষতার সাথে চিত্রায়িত করেছেন।

নিম্নবিত্ত অভাবী মানুষের মুক্তির স্বপ্ন ও সেই স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, দুঃখী মানুষের জীবনে পদে পদে বিড়ম্বনার বৃহত্তর ব্যঞ্জনা, বেশিরভাগ সাধেরই অপূর্ণতার সাংকেতিকতা, করুণরস, প্রভৃতি বৈশিষ্টসমূহ শিববাবু ও বিনয়ের জীবনকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। শুধু অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে দুর্বিষহ দীনতা যে দরিদ্র মানুষের জীবনবোধে অশান্তির প্রলেপ ছড়িয়ে দেয় তা নয়, পরিবারের আপনজনদের মাঝেও তার ছোঁয়া রেখে যায়। শিববাবুর মুখেই তার জীবনের করুণ কাহিনী বর্ণিত হয় এভাবে-‘ঊনপঞ্চাশ বছরে বাত আর বউ ঘরে আনলাম। তারপরের ইতিহাসটা আগের মতো ক্ষিপ্ত না হ’লেও নেহাৎই সংক্ষিপ্ত। বউ বাতের ছুতোয় শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন, বড়ো বড়ো ছেলে দু’টো মারা পড়লে, একটা ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে ছাত থেকে প’ড়ে- আরেকটা কালীপুজোয় হাউস ছুঁড়তে। একটা মেয়ে হয়েছে- এইটুকুন, পাঁচ বছর বয়স- কোমর থেকে পা পর্যন্ত অবশ। শামুকের মতো বুকে হেঁটে-হেঁটে চলে- দেখতে সে ভারি মজার! মেঝের ঘষায় বুক পর্যন্ত ঘা হয়ে গেছে।’ (টুটাফুটা/৪৬৬)

লেখক তাঁর প্রায় রচনায় প্রকৃতির সঙ্গে গল্পের চরিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য অনুসন্ধানের প্রয়াস পান। খুব সবুজ, নিবিড়, সুবাসিত রোমান্টিক প্রকৃতি নয়, জীবনের ম্লানিমার সঙ্গে মিলে যাওয়া বিবর্ণ প্রকৃতি। বারবার এই অনুজ্জ্বল আর বিষাদে ছাওয়া প্রকৃতি জীবনের চেতনাকে করে স্থবির, নিরুত্তাপ, নিস্পৃহ। প্রকৃতি নিরীক্ষণে শিববাবুর অনুভূতি তাইতো এভাবে প্রতিফলিত হয়-‘আকাশে সেদিন কৃষ্ণপক্ষের বিবর্ণ পাণ্ডুর চাঁদ ছিল, ফাল্গুনের

রাতে কুঁড়ির অন্তরালে কিশোরী রজনীগন্ধা হয়ত প্রফুল্ল যৌবনের স্বপ্ন দেখেছিল - কত কি হচ্ছিল তার কি কিছু হিসেব আছে? অগুন্তি আশা, অফুরন্ত অন্ধকার, অঢেল অশ্রুজল।' (টুটাফুটা/৪৬৮)

চরমদারিদ্র্য একটি নিম্নবিত্ত জীবন ও মনকে কিভাবে ভেঙ্গে চুরে একাকার করে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন এক কাঠামোয় রূপান্তরিত করে, শিববাবু চরিত্র নির্মাণসূত্রে লেখক তারই আলেখ্য রচনা করেছেন। সম্বলহীনতার নির্মম অভিশাপ 'জীবন' নামের ধারণাকেই পাল্টে দিয়েছে। শিববাবুর জীবনবোধে 'জীবনের' করুণ উপমা এভাবে রূপায়িত হয়েছে- 'জীবনে যে সব বাড়তি আশা ছিল সব কেটে-কুটে মানানসই ক'রে এই তেত্রিশ টাকার কেরানিগিরির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে। টিকে থাকবার জন্য আলো আর হাওয়াটুকুও হিসেব ক'রে কিনে নিতে হয়- দোকানি একটি কড়িও ভুল চুক করে না। যে সমস্ত চোখা ও ধারালো আকাঙ্ক্ষা ছিল ভাগ্য লোহার হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে-পিটিয়ে সব ভোঁতা ক'রে দিয়েছে। পরিচিত জুতোর পা গলালেই যেমন তাকে আত্মীয় ব'লে মনে হয়, তেমনিই এ জীবন। কোথাও এতটুকু ব্যতিক্রম নেই- নিটোল, নিভাঁজ।' (টুটাফুটা/৪৬৯) অভাব-অনটন মানবজীবনের জন্য যে ভীষণ অভিশাপ সৃষ্টি ক'রে-তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো, যে জীবন সে নিজে যাপন করে, সেই জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা হারিয়ে ফেলা। বিত্তহারা মানুষের জীবনবৈশিষ্ট্য হিসেবে নিজেদের স্তরের প্রতি অবজ্ঞার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে বিনয়ের নিস্পৃহ হতাশায় -' এই সন্ধ্যায় ওর ঘরের কি অবস্থা ও বেশ ভেবে নিতে পারে। বড় ছেলে আজ ন'দিন ধ'রে জ্বরে পুড়ছে -এক ফোঁটা ওষুধ পড়ে নি। ছোট মেয়েটা ট্যা ট্যা করছে নোংরা মেঝের ওপর প'ড়ে- অবাঙ্মুখী চারু নিঃশব্দে ঘরের কাজ ক'রে যাচ্ছে ক্ষিপ্রপদে- পরনের কাপড়টা সেলাই-করা, দু'টি হাতে খালি দু'টি শাঁখা, নাকের উপর একটা নাকছাবি আছে ব'লেই মুখখানিকে বেশি করুণ মনে হয়। নিশ্চয়ই এখন উনুনে আগুন দেওয়া হয়েছে, সমস্ত পাড়াটা দম বন্ধ ক'রে আছে। কাঁচা ড্রেনের ওপর মশাগুলি গুঞ্জন ক'রে ফিরছে।' (টুটাফুটা/৪৭০)

বন্ধুসৌরীন নবপরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে মোটরে ক'রে বেড়াতে বের হয়েছে। সদ্যবিবাহিত বর-বধূর আনন্দে চারদিক যেন ঝলমল করছে। সেই আনন্দময় পরিবেশে নিরানন্দের প্রতীক বিনয় বন্ধুর সৌভাগ্যের সঙ্গে নিজের করুণ অবস্থার বৈসাদৃশ্য অনুধাবনে ব্যথিত হয়। বিত্তহীনতাই তার মনের শক্তিকে ভেঙে দেয়, তার অন্তরের সমগ্রতাস্পন্দী জীবনদৃষ্টিকে করে বিনষ্ট। দারিদ্র্যের পীড়নে পিষ্ট ও সংকুচিত বিনয় ভাবে একদিন সেও তার স্ত্রীকে নিয়ে মোটরে ঘুরতে বের হবে। অনটনের জীবনে ক্ষুদ্র বিলাসিতার অদম্য অভিলাষ তাকে হঠাৎ অন্যভুবনে নিয়ে যায়। স্ত্রীকে বলে- 'পৃথিবীর উনুনের ধোঁয়া আর ড্রেনের গন্ধই ত সব নয়! আজকের দিনে পৃথিবীতে খালি আমি আর তুমি, সেখানে আর কেউ নেই।(পৃ.৪৭৬) কিন্তু এই রাজবিলাসিতায় অনেক কষ্টে জমানো দু টাকার মূল্য যে অনেক। জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত পোড় খাওয়া বিনয়ের যেখানে বেঁচে থাকার মধ্যে রয়েছে প্রবল অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাবোধের অভাব, মর্যাদা হারানোর আশঙ্কা সেখানে এই ভিন্নতর মুক্তির স্বাদ কোন খুশির সমারোহ বয়ে আনে না, বরং ব্যর্থতা আর পরাজয়ের গ্লানিকেই মনে উস্কে দেয়। এমন পরিস্থিতিতে বিনয়ের একটি ক্লান্ত পরাহত

রূপই অচিন্ত্যকুমার পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। বিনয়ের জীবন-যন্ত্রণার স্বরূপ অনুধাবনের জন্য নিম্নোক্ত অংশটি স্মরণযোগ্য -'তোমার জন্য শুধু-শুধু দুটো টাকা উড়ে গেল আজ- একেবারে খামোখা। তা দিয়ে দশ বারো দিন বাজার খরচ হ'ত- ছেলেটার ওষুধ হ'ত, হয়ত মরত না। সাধে কি বলেছে- স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ? সাধে কি শিববাবু এত বিগড়েছেন?..কেরানির স্ত্রী, তার আবার কেরামতি দেখ- যাবেন গাড়ি চ'ড়ে ! খেঁকশিয়ালি রাজা হলেও জুতো খায়। ছোঃ ! ...বৃষ্টি থেমে গেছে- কাপড় ছেড়ে চারু গিয়ে নোংরা সেই রান্নাঘরে ঢুকেছে, মেঝেতে চিৎ হ'য়ে মেয়েটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, ড্রেন থেকে ফের গন্ধ উঠছে-জীবনে এই সত্যি।' (টুটাফুটা/৪৮০)

কুৎসিত দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপটে অভাবী মানুষের মনোরহস্য উদ্‌ঘাটনে অচিন্ত্যকুমার জীবনব্যাপী সাধনা করেছেন। বিশাল বিশ্বসংসারে মানুষের যে নৈঃসঙ্গ্যপীড়ন, অস্তিত্বজিজ্ঞাসা কিংবা অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ কল্পনায় অসহায়ত্ববোধ-তার উৎস ও স্বরূপ এই উভয়কে লেখক গভীর অনুসন্ধিৎসাসহ নিরীক্ষণ করেছেন। এক ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দুকে আশ্রয় করে তার বৃন্তে শ্রেণীবৈষম্য, আর্থিক দীনতা, মনস্তাত্ত্বিক সংকট ও জীবনসৃষ্টির মূল অনুসন্ধান করে 'যে-কে-সে' গল্পের বহুমাত্রিক তাৎপর্যকে পরিস্ফুটিত করে তিনি তাঁর কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার সার্থক পরিচয় দিয়েছেন। গোপিকানাথ রায় চৌধুরী বলেছেন- 'যে-কে-সে' গল্পে নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের সেই গাঢ় হতাশা, কঠিন বাস্তবের আঘাতে যৌবনের স্বপ্ন ও আদর্শ ভঙ্গের ছবি অচিন্ত্যকুমারের বাস্তব-সচেতন-মনকে উদ্দীপ্ত করেছে।'[৬]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **'গৃহদীপ্তি'** গল্পগ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৭০ সালে। এ গল্পগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানসিকতার স্ফূরণ ঘটেছে। 'ত্রাণ' গল্পের মধ্যে পুত্রধর্মের জয়গান গীত হয়েছে। কন্যার প্রতি বাৎসল্যপ্রীতি প্রত্যক্ষ করা যায় নি। সনাতন ধর্মের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী যেখানে পুত্রই বংশবৃক্ষ সেখানে কন্যার অধিকার বিসর্জিত; মমতা, বাৎসল্য তিরোহিত। 'থার্ডক্লাস' গল্পে দেখা যায় উপরে ওঠার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় সুমিত্রা সহজ ও স্বাভাবিক আচরণকে বির্সজন দিয়েছে অনায়াসে। গল্প সংকলনে অনাবৃষ্টি, আস্বাদ, ধ্রুপদ, ত্রাণ, পিকআপ, গৃহদীপ্তি, থার্ডক্লাস - এই সাতটি গল্প অন্তর্ভুক্ত।

'ত্রাণ' গল্পের কান্তিবাবু প্রথাগত সংস্কারের অনুসারী হয়ে পিতৃধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। নিজ সন্তানদের দেখেছেন দু'রকম দৃষ্টি দিয়ে। বাৎসল্যপ্রীতি সন্তানবিশেষে যোজন দূরে অবস্থান নিয়েছে। সম্পত্তি বিষয়ে পুত্র কন্যার প্রতি রাষ্ট্রের যে নিয়ম সেখানেও তাঁর আপত্তি থাকায় চরম হীনমানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ভিন্ন গোত্রে বিয়ে করার অজুহাতে কন্যাকে চরমভাবে বঞ্চিত করেন যা পিতা হিসেবে একেবারেই বেমানান।

'ত্রাণ' গল্পটি হিন্দু সমাজের তথাকথিত প্রাচীনপন্থী মানসিকতার ধারক। এখানে সন্তান বাবার কাছে মুখ্য নয়, মুখ্য পুত্র সন্তান। সে বংশগতির বাহক। মমতা, স্নেহ এখানে তুচ্ছ হয়ে যায় সম্পত্তির মালিকানার কাছে। পিতৃত্ববোধ এখানে অদৃশ্য। দৃশ্যমান প্রাচীন হিন্দু সমাজের শাশ্বত কালের পুত্র বাৎসল্য। কন্যা সন্তান পরের ঘরে চলে যাবে বলে পিত্রালয়ে কোন কিছুতে তার অধিকার নেই, নেই স্বাধীন ভাবে কাজ করবার যোগ্যতা। স্বার্থপর

পিত্রালয় ছেড়ে আসবার সময় এক কাপড়েই মালিনীকে চলে আসতে হয়। বিষয়টি লেখকের সরল বর্ণনায় উপস্থাপিত হয়েছে এভাবে : 'লাল চোখ তুললেন কান্তিবাবু। মালিনীকে বললেন, 'যেখানে বিয়ে করেছ সোজা সেখানেই চলে যাও। যদিও আগে আমরা নেই পরেও আমরা নেই।'

'এখুনি চলে যাব, বাবা?'

'এখুনি। একবস্ত্রে।' হুকুম দিলেন কান্তিবাবু।

হাতে গলায় কানে যে সামান্যতম গয়না ছিল তাও খুলে দিতে যাচ্ছিল,মা কেঁদে উঠলেন।

কান্তিবাবু বললেন,'সব খুলে দিয়ে যাবে। শ্মশানে পাঠাবার আগে গা থেকে সমস্ত গয়না খুলে রাখে সংসার। নইলে ছিটেফোঁটা যা থাকবে সব ডোম নেবে। ডোমে নিলে আমার সহ্য হবেনা।' (এ.এ.গ/৮১)

গয়নার ছোঁয়াচটুকুও না রেখে একবস্ত্রে চলে গেল মালিনী।' খরচহীন বিয়ের আনন্দের কারণে মিথ্যে ভানের অহেতুক নাটক সাজাতে হয় কান্তি বাবুকে।

'স্ত্রীকে জাগালেন ঘুম থেকে। বললেন,'মালিনী আমাদের খুব ভাল মেয়ে,লক্ষ্মী মেয়ে –'

ধড়মড় করে উঠে বসলেন মহামায়া।

'আমাদের একটি পয়সাও খরচ করাল না।' অন্ধকারে হেসে উঠলেন কান্তিবাবু : 'প্রায় কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা বাঁচিয়ে দিল। হয়ত বা আরো বেশি। আর এত লক্ষ্মী –'

মহামায়া অন্ধকারে দেখতে লাগলেন চারদিক।

'আর এত লক্ষ্মী যে গায়ের শেষ সোনাটুকুও ফিরিয়ে দিল।' (এ.এ.গ/ ৮১)

সন্তানদের সম অধিকার না দেয়ার তুচ্ছ ও হীনমানসিকতা তার চরিত্রকে কলঙ্কিত করেছে। তাঁর মনে বার বার অনুরণিত হয় স্ত্রী মহামায়ার কথামালা –'ছেলেই তো সব। ছেলের জন্যই তো যত কিছু। ছেলে না হলে আমাদের দেখবে কে, নাম-ধাম-বংশ রাখবে কে?' তারপরেও বিবেকের তাড়নায় 'আলমারি খুলে বার করলেন উইল। ভাবলেন, ছিঁড়ে ফেলি। ভাবলেন এক অপরাধে অপরাধী ছেলে মেয়েতে কেন আর তফাৎ করি। আইন যাকে যা দিয়েছে তাই দুজনে নিক ভাগাভাগি করে।

যা হবার হোক আমি নিরপেক্ষ থাকি।

না! মেয়ে কে? ছেলেই তো সব ,ছেলেই তো ষোলআনা।

উইলটা আবার ভেতরের ড্রয়ারে রেখে আলমারির দরজা বন্ধ করলেন কান্তিবাবু।' (এ.এ.গ/৮২)

'ত্রাণ' গল্পটি অসবর্ণ বিয়ে নিয়ে হলেও এ গল্পের সুরে একটু আলাদা ব্যঞ্জনা পরিলক্ষিত হয়। এখানে গল্পকার শুধু ব্রাহ্মণ কায়স্থ – এই অসবর্ণ বিষয়কেই গল্পের মধ্যে বোঝাতে চাননি, এখনও শিক্ষিত সংসারে যে পুত্র ও কন্যা সন্তানের মধ্যে অসবর্ণ বিষয় আছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কায়স্থের ভেদরেখার মত পুত্র-কন্যা সন্তানের মধ্যে যে সীমাহীন বৈষম্য আছে, সেকথাও লেখক স্পষ্ট করেই আলোচ্য গল্পে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তত্ত্বগত দিক থেকে

নারী পুরুষের অবস্থান সমান হলেও বাস্তব সমাজে তেমন দেখা যায় না। নারীরা বাইরে যেমন অবহেলিত তেমনি ঘরেও বাবা কিংবা ভাইয়ের কাছে সমান অবহেলিত। তৎকালীন ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থায় নিগৃহীত হিন্দু নারীদের অবস্থা ছিল ভয়াবহ ও মর্মান্তিক। পুরুষশাসিত সমাজে পুত্রধর্মের জয়গান গেয়ে বলি দেয়া হয়েছে নারীর মানবিক আকাঙ্ক্ষাকে। কান্তিবাবুর মত হাজারো পৌরুষহীন ও ব্যক্তিত্ববিবর্জিত লোকেরা নারীদের অনগ্রসর সমাজের অধিবাসী করতে আগ্রাসী ভূমিকা পালন করেছে। সুদীর্ঘকাল ধরে সমাজকাঠামোর নির্মম অসঙ্গতির যূপকাষ্ঠে পড়ে স্বাভাবিক বিকাশ বিঘ্নিত হচ্ছে মালিনীদের মত নারীদের।

সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট ও ধর্মীয় পর্যায়ে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক অসঙ্গতির চিত্র 'ত্রাণ' গল্পে অঙ্কিত হয়েছে। একটি মননশীল রচনা তখনই চিরায়ত সাহিত্যের সম্পদ হয়ে ওঠে যখন রচনাটির মধ্যে লেখকের শাশ্বত জীবনবোধ প্রতিফলিত হয়। গল্পটিতে নারীর প্রতি বৈষম্য ও অসঙ্গতির সমকালীন চিত্রকে ফুটিয়ে তুলে লেখক প্রজ্ঞাময় দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন। এমন একটি সামাজিক সমস্যাকে প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করায় গল্পটি শিল্পসফল রচনা হিসেবে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৩৪৫ সালে প্রকাশিত **'ডিসক'** গল্পটি একজন শিল্পীর ব্যথাতুর হৃদয়ের কাহিনী নিয়ে পল্লবিত হয়েছে। শিল্পী শেফালি রায়ের নান্দনিক অনুভূতির প্রকাশ সঙ্গীতের মধ্যেই। এর মাঝে সে খুঁজে পায় নিজস্ব ভাললাগার নিটোল আনন্দ। 'তার মুখে ধ্যানের তন্ময়তা, দু চোখে প্রগাঢ় ভাব, উৎক্ষিপ্ত গ্রীবার সুকোমল শান্তি, শরীরের রেখা ও চূড়া সুরের শিহরণে প্রস্ফুটিত'। কিন্তু সুরের এই ঝরনাধারায় সে বেশিদিন অবগাহন করতে পারে নি। প্রধান বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সনাতন সাংসারিকবোধ। পুরোনো সেই সংস্কারবোধ নারীর কোনো প্রতিভাকে মূল্যায়ন করেনা, সেখানে নারী শুধু গৃহবধূ। যে সবার 'ফরমাশ' খেটে বেড়াবে। তার স্বকীয়তা, ভাল লাগা, স্বাধীনতা বলে কিছু থাকতে নেই। দৈনন্দিন জীবন কাটবে স্বামীর মর্জি মাফিক। নারীর ব্যক্তিসত্তার মূল্য পুরুষশাসিত সমাজে কখনোই মূল্যায়িত হয়নি। হোক সে পুরুষ বাবা কিংবা স্বামী। কন্যা সন্তানের বাবা নিজেকে 'কন্যাদায়গ্রস্ত' মনে করার কারণে কন্যা নারী থেকে কখনো মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি, পারেনি নিজের প্রতিভা বা গুণকে বিশ্বময় আলো করে ছড়িয়ে দিতে। আর তাই গোপন 'আন্ডার টেকিং' এর মাধ্যমে মেয়ের বিয়ে দিয়ে বাবা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। শিল্পী গান গাইতে পারবে না-এ নির্দেশ তো শেফালীর অন্তরাত্মার মৃত্যু ঘোষণা। নীরবে, ধীরে ধীরে অন্তরের মৃত্যু শরীরের কাঠামোকে একদিন আক্রমণ করে। তাই তো গল্পকথকের মনে হয় 'গান ফুরিয়ে যাবার পর পিনের সংঘর্ষে ডিসক্-এ যে খানিক কর্কশ আওয়াজ বেরোয় শেফালির শরীরে সেই কর্কশতা।' শিল্পের উৎকর্ষ সবার জন্য কিন্তু শিল্পীর দুঃখবোধের হাহাকার, বুক বিদীর্ণ দীর্ঘনিশ্বাস একান্তই নিজের। তাই অন্যের করুণামিশ্রিত আন্তরিক বাণীতে 'একা একা আপন মনেও তো গাইতে পারেন, ছাতে, নিরালায়, মাঝরাতে'-শেফালির হৃদয়মন ভেঙ্গে বিচূর্ণ হয়। রক্তাক্ত হৃদয়ে নির্বিকারভাবে উচ্চারিত হয় শেফালির মুখে ' আমি তো শুধু নিজেকে নিয়ে আমি নই, সমস্তকে নিয়ে আমি। নিজের জন্য তো চোখের জলই আছে, গান কেন,' শিল্পীর

যে অঙ্গনে মুক্তির নিঃশ্বাস আর স্বাধীনতার ছোঁয়া থাকে তা যদি জীবন থেকে কেড়ে নেয়া হয় তবে সেখানে শিল্পীর অপমৃত্যু ঘটে বৈকি। তাইতো অনুভবের নীলকষ্টে পাথর হয়ে যাওয়া গানহারা পাখি শেফালি ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যায়, পরাজিত হয়ে পরিণত হয় জীবন্মৃত নারীতে। এ গল্পগুলোতে জীবন অনুভূতির যে বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয় তা হলো মানবজীবন নিশীথ আকাশের মত রহস্যময়, এখানে জীবনবৈশিষ্ট্য পর্যালোচনায় বস্তুতান্ত্রিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। বস্তুত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঘটনাবহুল মানবজীবনের অন্তর্চেতনার বর্ণিল আলোকচ্ছটা। পারস্পরিক সংলাপের শানিত দীপ্তিতে বর্ণিত চরিত্রগুলোর জীবনচেতনা একটা অর্থবহ ও সাংকেতিক ঔজ্জ্বল্যে উন্মোচিত হয়েছে।

'ডবল ডেকার' গ্রন্থের ডিস্‌ক গল্পটি বিকশিত হয়েছে একজন শিল্পীর অবস্থানগত যথার্থতাকে কেন্দ্র করে। শিল্পী মাত্রই নিজস্ব সীমানা পেরিয়ে অপরের হৃদয়ে সংবেদনা তৈরি করে, সময় ও কালকে সমৃদ্ধ করে, আর দেশের গৌরবের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব যুক্ত করে। কিন্তু যখন এই শিল্পী লিঙ্গবৈষম্যের কারণে নিগৃহীত হয়, নিষ্পেষিত হয়, তখন শিল্পী-সত্ত্বার অবমাননা কেউ বুঝতে পারে না। অবরুদ্ধ শিল্পী-সত্ত্বার অরণ্য রোদন বোধ করি সামাজিক মানুষ তথা পারিবারিক মানুষের হৃদয়ে কোন সহানুভূতির লেশমাত্র জাগাতে পারে না। এ গল্পে দেখা যায়, গার্হস্থ্য জীবনে অভ্যস্ত মানুষগুলোর জীবনভাবনা বিচিত্র রকমের ভিন্নধর্মী। তিনটি চরিত্র–শিল্পী শেফালি রায়, স্বামী ও স্ত্রী সংশ্লিষ্ট যে গল্পের অবতারণা তাতে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে গল্পকথক তথা স্বামী দু'জন নারীর মানসিক বৈষম্য বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন।

নারীমাত্রই অন্তরের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে প্রশান্তিময়, স্নেহশীলা চিরন্তন মাতৃমূর্তি। কিন্তু 'ডিসক' গল্পে দেখা যায় স্ত্রীরূপিনী একজন নারীর ভোগবিলাসিতার চরম নিদর্শন। শিল্পবোধহীন, মমতাহীন, সন্দেহপ্রবণ এ নারীর জীবনপ্রাঙ্গণে শুধু বিত্ত-বৈভবের আকাঙ্ক্ষা। বিষয়ের অন্তরালে এমন অনেক কিছু আছে যা জীবনকে করে তোলে মোহময়, আনন্দময়, গৌরবময়; সে দিকটি তার কাছে চির অপরিচিত। ড্রয়িং রুমের শোভাবর্ধক গ্রামোফোনের কার্যকারিতায় অবগত গল্পকথকের বর্ণনায়– 'দিন নেই, রাত নেই, মেজাজ নেই, মর্জি নেই, স্ত্রী নিরন্তর রেকর্ড বাজিয়ে চলেছেন। আমার ব্যয়ের স্রোতস্বতীতে গভীর করে একটা খাল কাটা হল। দেখলুম এ বিষয়ে স্ত্রীর যতটা উৎসাহ তার এক ভগ্নাংশও সুরুচি নেই– যার-তার যা-তা গান দিনে দিনে স্তরীভূত হয়ে উঠতে লাগল।' (এ.এ.গ/৬৬৬) একই সংসারের অন্যজন হৃদয়াঙ্গম করেছে সুরের অপার্থিব রূপকে। তার চিন্তায় 'কিন্তু কথার একটা মানে হোক, তাতে ঈষৎ কবিতা থাকুক, সবিনয়ে এটুকু তো অন্তত আমি আশা করতে পারি। বললেন জানি, গানে সুর হচ্ছে প্রাণ, কথা শুধু কঙ্কাল। কিন্তু কঙ্কালেরও একটা আকার চাই নিশ্চয়। প্রেয়সীকে কোন এক সময় যেমন স্ত্রীতে চলে আসতেই হবে তেমনি সুরকেও সম্পূর্ণতা পেতে হবে কথায়।' (এ.এ.গ/৬৬৬) শিল্পরুচির অপূর্ব জীবনবোধ রূপায়িত হয়েছে এ কয়টি বাক্যকে কেন্দ্র করে। তবে এই সুরের মোহময়তা চিরকাল স্থায়ী হতে পারে নি সন্দেহপ্রবণ স্ত্রীর অমানবিক আচরণের কারণে। গল্পকথক সকরুণভাবে উপলব্ধি করেছেন

'স্ত্রীলোকমাত্রেই সঙ্কীর্ণজীবী, তা আমার আগে আরও বড়-বড় দার্শনিকরা বলে গেছে। তারা ঘুরছে শুধু বর্তমানের ডিসক-এ, তাদের না আছে অতীত, না আছে ভবিষ্যৎ, না স্মৃতি না স্বপ্ন। তাই বর্তমান নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকুন, আমি আমার সেই সঙ্গীতময় অতীতের একাকীত্বে ফিরে যাই। সিগারেটটা ঠোঁটে করে পাশের ঘরে দিয়াশলায়ের সন্ধানে গিয়েছিলুম, স্ত্রী কখন ঘরে ঢুকেছেন টের পাই নি। হঠাৎ একটা আর্তনাদ শুনে ফিরে গিয়ে দেখি স্ত্রী ডিসকখানা মেঝের উপর আছড়ে ফেলে ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো করে দিয়েছেন।' (এ.এ.গ/৬৭২) অন্য আরেকদিন গল্পকথক তন্ময়াবিষ্ট হয়ে ভাবছিলেন–'শেফালির দেহই দীপ্ত একটি গীতরেখা তা হলে হয়ত বা অতিরিক্ত করে বলব, কিন্তু মিথ্যা বলব না। খানিক আগে তাকে না দেখে শুধু তার গান শুনে তার যে ভাবস্নিগ্ধ মূর্তি কল্পনা করেছিলুম, দেখলুম তার এ-মূর্তি সমস্ত ভাবকে বহুদূর অতিক্রম করে গেছে। দীর্ঘাঙ্গী, ছিপছিপে মেয়েটি, বছর সতেরো-আঠারো বয়েস, যৌবন একটু দেরি করে এসেছে বলে সমস্ত শরীরে প্রসন্ন একটি লীলার তরলিমা। তার গলা শুনেই বুঝেছিলুম তার লাবণ্যের সঙ্গে একটি সবলতা আছে, কান্তির সঙ্গে তেজ। সেই তেজ দেখলুম তার এই জানলায় উন্মুক্ত দাঁড়িয়ে থাকায়, প্রায় সম্মোহিতের মত। হঠাৎ খেয়াল হল বাজনা আর নেই, সাউন্ড বক্সটা স্ত্রী ক্ষিপ্ত হাতে তুলে নিয়েছেন।' (এ.এ.গ/৬৬৭)

শিল্পী শেফালি রায়ের শিল্পী-সত্তার উত্তরণের পরেই শুরু হয় একটু একটু করে পতন। নারী সত্তাকে যখন অতিক্রম করে শিল্পী-সত্তা বিশালত্বে ব্যাপৃত হতে চায় তখনই সমাজ হুংকার দিয়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অত্যন্ত বেদনাদায়ক হল, নারীদের অসম্মানের পর্যায়টি শুরু হয় নিজের বাড়ি থেকে, নিজের পরিবারের আপনজনের কাছ থেকে। শেফালির স্মৃতিকথায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'এ বিয়ে আমার হতেই পারত না, যদি না আমার বাবা শ্বশুর মশাইকে আন্ডারটেকিং দিতেন যে, বিয়ের পর ও বাড়ি আমি গান গাইবো না কোনদিন। ভেবেছিলুম একটু-আধটু বাজালে হয়ত দোষ হবে না, তাই এসরাজটা নিয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু ও বাড়িতে পদার্পণ করার পরদিনই সেটাকে শাশুড়ি জ্বলন্ত উনুনে গুঁজে দিলেন।' (এ.এ.গ/৬৭০) নারীদের মর্যাদা কতটা ধুলোয় লুটালে শেফালির স্বামী এ ধরনের উক্তি করতে পারে যে, স্ত্রীলোকের 'গান আর এক প্রকারের স্ত্রীলোক সমশ্রেণীর।' (এ.এ.গ/৬৭০) সঙ্গীতশ্রোতা কিংবা সঙ্গীতশিল্পী উভয়ই সুরের মূর্চ্ছনায় নিমগ্ন হতে পারে, সেখানে নারী-পুরুষের আলাদা কোন অবস্থান নেই– এ উপলব্ধিটুকু সম্ভবত সংকীর্ণমনা পুরুষেরও নেই। শিল্প যে সবার জন্য, তাকে নিরালায় রাখতে নেই। তাইতো বেদনাবিধুর কণ্ঠে শেফালি রায়ের অনুধাবন– 'একা একা নিজের মনে গাইতে ভাল লাগে না, সে তো সকলেই গায়, যে জানে না সে-ও। কিন্তু আমি চাই শোনাতে, কিংবা আপনি যা বলবেন, দেখাতে–স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা যা চান। বলুন, আপনি যদি সত্যি কাউকে ভালোবাসেন...তবে কি তা আপনি মনের মধ্যে পুষে রাখতে পারেন, উদ্বেল বন্যার মত সমস্ত পৃথিবী আপনার ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে করে না? আমি তো শুধু নিজেকে নিয়ে আমি নই, সমস্তকে নিয়ে আমি। নিজের জন্যে তো চোখের জলই আছে, গান কেন?' (এ.এ.গ/৬৭১) ভঙ্গুর বিশীর্ণ কতগুলি রেখায় খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে শেফালির উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গিমায় গল্পকথকের মনে হয়–'গান ফুরিয়ে যাবার পর

পিনের সঙ্ঘর্ষে ডিসক এ যে খানিক কর্কশ আওয়াজ বেরোয়, যদি বলি শেফালির শরীরে সেই কর্কশতা, তবে তাকে আপনারা কিছুটা বুঝতে পারবেন হয়ত।' (এ.এ.গ/৬৭১) মুগ্ধ শ্রোতা কখনোই শিল্পীর এই দ্রুতপতন প্রত্যক্ষ করতে চায় না। সুরের তৃষ্ণায় তৃষ্ণার্ত গল্পকথক, বিরক্ত স্ত্রীর 'বাড়িকে পাগলাগারদ ভাবার' গঞ্জনাকে প্রাধান্য না দিয়ে চুপিচুপি জাগিয়ে দিলেন শেফালিকে, সেই ফুলন্ত শেফালিকে। তার ভাষায় 'কতদিন তাকে দেখি না। আজ দেখলুম, এতটুকুও সে ম্লান বা শীর্ণ হয়নি, গানের জ্যোৎস্নায় শরীরে তার সেই তরল তরঙ্গিমা। সেই তার কপালে আভা, মুখে রক্তিমা, বুকে উদ্বেলতা। সমস্ত শরীর যেন প্রার্থনার মত কোমল, উচ্ছ্বসিত।' (এ.এ.গ/৬৭১)

অক্লান্ত পিপাসার্ত গল্পকথক গ্রামোফোনটি বিক্রি করে দিয়ে ইলেকট্রিসিটি আছে এমন জায়গায় যেতে চেয়েছেন। রেডিও শ্রবণ-উপকরণ হলেও তাকে 'বর্বর, পৈশাচিক, বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদিও রেডিও খুললেই সংবাদ, গান, নাটক, কবিতা শোনা যায়, তবুও শেফালির সুললিত কণ্ঠে মধুবর্ষিত গান না শোনার অতৃপ্তি কখনো শেষ হবে না। যেখানে ডিসক চালালেই সুমধুর কণ্ঠের সঙ্গীত চিত্তমনকে প্রশান্তিময় করতো সেখানে রেডিও অন্তরের আকাঙ্ক্ষা প্রশমনে সম্পূর্ণ অকেজো, ব্যর্থ ও অক্ষম। গল্পকথকের বর্ণনায় শেফালির সঙ্গীতময় অনিন্দ্যরূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এভাবে– 'কী বা সুর, কিছুই আমি অনুধাবন করতে পারছি না, চোখের সামনে দেখছি, হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আরতির আলোকে প্রতিমার মুখের মত সুরের অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় শেফালি রায়ের মুখ অনির্বচনীয় সুন্দর হয়ে উঠেছে। দেখছি তার মুখে ধ্যানের তন্ময়তা, দু'চোখে বিগাঢ় ভাব, উৎক্ষিপ্ত গ্রীবায় সুকোমল শান্তি, শরীরের রেখা ও চূড়া সুরের শিহরণে প্রস্ফুটিত। গলায় এমন উন্মাদনা, এমন বিকিরণ, এমন আত্মদান আর কোথাও দেখিনি। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি লাবণ্য, যেমন স্ফূর্তি তেমনি গভীরতা।' (এ.এ.গ/৬৬৬) গল্পকথক স্বামীর অন্তরের চাপা বেদনা, কষ্টের দীর্ঘশ্বাস, অনুভূতির তন্ময়তা মাঝে মাঝে দার্শনিক উক্তির প্রতীকে পাঠকের সামনে মূর্তমান হয়। যেমন–

ক. 'রঙকে শোনা ও শব্দকে দেখাই হচ্ছে অনুভূতির চরম।' (এ.এ.গ/৬৬৮)

খ. 'সব কিছুর ফুরিয়ে যাওয়াটাই সৌন্দর্য, যা যত বেশি সুন্দর তার উচিত তত শিগগির ফুরিয়ে যাওয়া।' (এ.এ.গ/৬৬৮)

গ. 'এমনি অনেক তারার কণা আকাশ থেকে ঝরে গেছে, রাত থেকে অনেক স্বপ্নের টুকরো।' (এ.এ.গ/৬৬৯)

ঘ. 'কত কথাই তো আমরা বলি, আর যা বলি তা বলব না বলেই বলি।' (এ.এ.গ/ ৬৭২)

'ডিস্ক' গল্পে যদি শেফালি রায় ও গল্পকথক স্বামীকে যদি একই মেরুতে দাঁড় করানো যায়, তাহলে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা যাবে যে, তাদের উভয়ের মধ্যে মনোগত সাদৃশ্য বিদ্যমান। ডিসক হলো প্রাণের বিষয় অনুধাবণ করার যান্ত্রিক অনুষঙ্গ। আর এই অনুষঙ্গের আবর্তনে আবর্তিত দু'জন–একজন শিল্পী অর্থাৎ গায়ক অন্যজন মুগ্ধ শ্রোতা। কিন্তু এই শ্রোতা ও শিল্পী দুজনই পারিপার্শ্বিক মানুষের নিষ্করুণ অনাহুত হস্তক্ষেপে বিপর্যস্ত।

একজন অন্তরে লালিত সুর প্রবাহকে শ্রোতার অন্তরে পৌঁছে দিতে বাধাপ্রাপ্ত অন্যজন হৃদয়ে সযতনে আদৃত সঙ্গীতের মাধুরীকে কর্ণকুহরে পৌঁছাতে বাধাপ্রাপ্ত। আর যারা এই কর্মসম্পাদনে ব্রতী হয়েছেন তারা আর কেউ নন ঘরের আপনজন। সে বাণী গুলোই গভীর জীবনযন্ত্রণার সাথে উচ্চারিত হয়েছে 'ডিসক' গল্পে। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর সর্বময় প্রভু স্বামী। বিবাহিত নারীর জীবন আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা, প্রাপ্তি সবকিছুই রূপায়িত হয় তার স্বামীর অঙ্গুলি নির্দেশে। এর ব্যত্যয় ঘটলে কতটা দুর্বিষহ পরিণতি নেমে আসতে পারে কোন নারীর জীবনে, তার প্রকৃষ্ট প্রামাণ্য চিত্র 'ডিকস' গল্পটি। শিল্পী শেফালি রায়ের শিল্পীসত্তার সবটুকু বিসর্জিত হয়ে শুধু শরীর নামক বিষয়টি টিকে আছে, আর সেখানে প্রাণের সৌরভ হয়েছে অন্তর্হিত। প্রাণহীন শারীরিক অবয়ব শেফালির জীবনবোধকে করেছে রিক্ত, নিঃস্ব।

'তিরশ্চী' গল্পে সুমিতার জীবনের বিফলতা সৃষ্টির মূলে সমাজশক্তির ক্রিয়া প্রচ্ছন্ন ছিল কিন্তু **'হরেন্দ্র'** গল্পে ব্যক্তিজীবনের যন্ত্রণারচনায় সামাজিকতার প্রভাব প্রত্যক্ষ ভাবে বিদ্যমান। হিন্দুসমাজে প্রচলিত অশিক্ষা ও কুসংস্কারের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে কত মূল্যবোধের যে অকালপ্রয়াণ ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই। জাত-পাত-শ্রেণি-বর্ণবৈষম্য ছিল তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নৈমিত্তিক চিত্র। সে সমাজে ন্যূনতম মানবিক মূল্যবোধও উপেক্ষিত হয়েছে অনিয়মের চোরাবালিতে। 'হরেন্দ্র' গল্পের প্লট প্রকল্পনা, চরিত্র রূপায়ণ সমকালীন বাঙালি সমাজ জীবনের নিষ্ঠুরতাকেই শুধু মূর্ত করে তোলেনি, পণলোভী, নিষ্ঠুর ও অমানবিক মানসিকতার নির্মমতা মর্মস্পর্শীভাবে মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে রূপায়িত হয়েছে। এখানে হরেন্দ্র নামে একটি পুরুষ পণপ্রথার শিকার হয়েছে। প্রায় আটত্রিশ বছর ধরে অবিবাহিত হরেন্দ্র মাথাধরায় বিনিদ্র রজনী যাপন করে। রোগের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে যদি সে সন্ন্যাসী বাওয়ালির মেয়ে বেগুনিকে বিয়ে করে। বেগুনির বাবা সমাজ মানে, বিনাপণে সে মেয়ের বিয়ে দেবে না, তার জন্য ছ'কুড়ি টাকা কন্যাপণ চাই। হরেন্দ্রের সাধ্য নেই সে টাকা সংগ্রহ করে; তাই তার বিয়েরও কোনো সম্ভাবনা নেই। বেগুনির বাবার কাছে কোন ওকালতিই খাটে না। বিনাপণে বিয়ে দিয়ে সে জাতজন্ম খুইয়ে সমাজের বার হয়ে যেতে পারবে না। রুখে উঠে বলে 'সমাজে আমার একটা সম্মান নেই? লোকে বলবে কী আমাকে? নেমন্তন্ন খেতে ডাকবে না যে। ছিছিছি, সমস্ত সংসারে যা কেউ করল না, দাম না দিয়ে মেয়ে ছাড়ব? তারচেয়ে মেয়ের বিয়ে না হয় তাও ভালো।' হলোও তাই। তারপর একদিন পিতৃগৃহ থেকে অপহৃতা হয় বেগুনি। নারীহরণ মামলা শেষ হয়ে গেলেও বাপ তাকে কিছুতেই ফিরিয়ে নেয় না। বেগুনি আশ্রয় পায় এক সন্ন্যাসীর অবলা আশ্রমে। তখনও হরেন্দ্র তাকে বিয়ে করতে রাজি। তবে এবারও তাদের মিলনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় সমাজ। হরেন্দ্রের বাপ, ভাই, আত্মীয় পরিজন, পাড়া প্রতিবেশী, স্বজাতি, বিজাতি সবাই এর বিরুদ্ধে। 'জমিদারের লোক পর্যন্ত খাপ্পা–বলে, ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন করে দেব। সন্নেসি-খুড়ো শাসিয়ে বেড়াচ্ছে–'বেগুনি যদি ফের গাঁয়ে ঢোকে, কেটে কুচি কুচি করে শেয়ালের মুখে ধরে দিয়ে আসব।' তাই শেষ পর্যন্ত হরেন্দ্রের আর বেগুনিকে বিয়ে করা হয় না। 'পারলাম না, কিছুতেই রাজি করাতে-পারলাম না।' হরেন্দ্রের সেই উদ্বেলিত কান্না যেন বুভুক্ষু

উপবাসী জীবনের নিরুপায় যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। অচিন্ত্যকুমারের গল্পে ব্যক্তিজীবনের সুখদুঃখ রচনায় সমাজশক্তি ও পরিবার কাঠামো বরাবরই নেপথ্যচারী। সুন্দর সাবলীল মানবিক জীবনের পটভূমি কীভাবে স্বার্থপর মানুষের নিজস্ব গোঁড়ামি, লোভে আর নিষ্ঠুরতায় বিপর্যস্ত হয় তারই মর্মান্তিক রূপায়ণ এই **'হরেন্দ্র'** গল্পটি।

অচিন্ত্যকুমার **'খাখ্'** গল্পে একাধিক ঘটনার ব্যঞ্জনাকে বহুবর্ণ শব্দবুননে বর্ণিল করে তুলেছেন। দরিদ্র মাতার অসুস্থতা, অসহায় ছেলের ওষুধ কেনার অপারগতা, সাহেবদের অত্যাচারের নমুনা, ভালোবাসা না পাওয়ার বেদনা ইত্যাদি জীবনযন্ত্রণাকে তিনি তাঁর বাক্যবন্ধে ধরতে চেয়েছেন। জীবনবোধ তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে বিভিন্ন উৎস থেকে। দারিদ্র্যের অশান্ত তরঙ্গ সমাজ-পরিবার ও প্রেমময় জীবনের অনেক বন্ধনকেই নির্মমভাবে ছিন্ন করেছে। অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়টিই যে মানুষের জীবনের সবচেয়ে মুখ্য বিষয়–সংকটের মুখোমুখি না হলে তার স্বরূপকে চেনা যায় না। এ গল্পের সমগ্র কাহিনীতে ভোমরার গ্লানিময় জীবনযন্ত্রণার চিত্রই মুখ্য হয়ে উঠেছে। কঠোর জীবন-সংগ্রামে ক্ষয়ে যাওয়া ভোমরা মায়ের জন্য ওষুধ কিনতে পারে না। চিররুগ্‌ণ 'মার হাড় বের করা ভাঙা গালের ওপর একটু হাত বুলিয়ে' তাই সে দৌড়ে ছুটে যায় সেই জায়গায় যেখানে সাহেবরা গরিব দুঃস্থদের দিয়ে মাটি কাটাচ্ছে। সেখানেও লক্ষ করে অভাবে জীর্ণ হওয়া লোকদের ওপর তাদের নির্মম অত্যাচার। যেমন-

'ঠিকাদার ট্যাঁস সাহেব সিগারেটের ছাইটা বুড়োর মাথার ওপর ঝেড়ে ফেলে পালিশ-করা বুটটার চোখা ডগাটা বুড়োর মেরুদণ্ডের ওপর ঠেকালো– সচেতন ক'রে দিতে হয়ত, গাফিলতির জন্য শাসন করতে।
তাইতেই–...ব্যাজার মুখে ভোমরা বললে– জানিস মা, বুড়ো পেসাদটা ম'রে গেছে।' (টুটাফুটা/৩৫৬)

অত্যাচারী নিপীড়ক শক্তি যতই ক্ষমতাবান হোক না কেন তার অত্যাচারের বিরুদ্ধে দৃঢ় মনোবল প্রদর্শন করাও যথার্থ সাহসিকতার পরিচায়ক। ব্যক্তি যত অসহায় কিংবা নিঃসম্বল হোক, ন্যায়ের পক্ষে নির্ভীক প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ হওয়ার মধ্যেই তার প্রকৃত শক্তি নিহিত। নিম্নোক্ত অংশে এ বিষয়টিই চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে–

'চোখের জল মোছে না, মা'র বুকের ওপর হাত রেখে বলে– মা, সাহেব-সুবোটার মুখে থাবড়া বসিয়ে কেউ দিলে না। আমার ইচ্ছে করছিল, মারি পেসাদের কুড়োলটাই বেটার মাথায়। লুকিয়ে একগাদা থুথু বেটার কোটের ওপর ছিটিয়ে দিয়েছি- বাড়ি গেলে টের পাবে।' (টুটাফুটা/৩৫৭)

অপ্রত্যাশিত আড়াই হাতের বামনত্ব ও অভাবের কারণে ভোমরার জীবনে বেকির অনুপ্রবেশ ঘটে নি। অথচ 'ও আর সব বিরহীদের মতোই ভাবে, প্রিয়ার মূর্তি ওর হৃদয়ের পাতে আঁকা।' হাতের ওপর তার ছবির উল্কি এঁকেছে সে। অন্তরের গহীনে ভালোবাসার কোমলরঙে লালিত সেই প্রিয়তমার কাছে সর্বদাই অবহেলা, তাচ্ছিল্য ও অনাদরের শিকার ভোমরা। মানসপ্রিয়া বেকির বিয়ের রাতে নিজের হাতটা পুড়িয়ে ফেলে। অসহ্য জীবনযন্ত্রণায় তার ভালোবাসার রং ফিকে হয়ে যায়। কাল পরিক্রমায় একদিন বেকি বিধবা হয়। তবু অফুরন্ত আশা নিয়ে বেকির কাছে সর্বস্ব দেবার আকুতি জানিয়ে নিজেকে সমর্পণ করে খর্বাকৃতি ভোমরা। পুনরায় প্রত্যাখানের হোঁচট খেয়ে, মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে একমাত্র রোজগারের দোকান জ্বালিয়ে দিয়ে সব সাধের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

'খাখ' শব্দের শাব্দিক অর্থ ভস্মাবশেষ। হৃদয়ের অভ্যন্তরে লালিত স্বপ্নের ও প্রণয়প্রীতির ধ্বংসাবশেষ এ গল্পের মূল প্রতিপাদ্য। কাব্যিক প্লট বিন্যাস, ছোট ছোট শ্লেষের ব্যবহার, তীক্ষ্ণ শব্দের প্রয়োগ করে লেখক শিল্পচাতুর্যের বর্ণনা দিয়েছেন এ গল্পে। জীবনবাস্তবতার শিল্পী অচিন্ত্যকুমার ভোমরার অস্তিত্বসংকটের কোন সহজ অলৌকিক সমাধান দেন নি। কারণ তিনি জানেন, এ ধরণের সমস্যার কোন সরল সমাধান নেই। তিনি ভোমরার বহির্সংকট ও অন্তর্সংকটের স্বরূপকে বিভিন্ন দিক থেকে উন্মোচন করেছেন। প্রবল জীবনাগ্রহই হয়ে উঠেছে ভোমরা চরিত্রের মৌল অভিজ্ঞান। নৈঃসঙ্গ্যবোধ, অসহায়ত্ববোধ ও অস্তিত্বজিজ্ঞাসার পীড়ন এ চরিত্রকে করেছে হতাশ ও বিহ্বল। সমগ্র গল্পকাঠামোর ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পরিণতির এই করুণসুর সংযোজিত হয়ে বক্তব্যবিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনচেতনার ব্যঞ্জনাকেও দীপ্ত করে তুলেছে।

অচিন্ত্যকুমার অদম্য যৌবন-তৃষ্ণা ও বিলাসী ভাবময়তা থেকে বাস্তবের কঠিন মাটিতে পদার্পণ করেন **'ইতি'** গল্পে। মনোবিকলাশ্রিত জীবনচেতনাকে অনুভব করার উৎকণ্ঠা, কৌতূহল ও আকাঙ্ক্ষা নিরূপিত হয়েছে এ গল্পে। এর বিষয় বস্তুতে রয়েছে-বারবনিতা জীবনের ব্যর্থ নৈরাশ্যের এক করুণ বিষণ্ন ছবি–"বড়দিনের ছুটিতে বড় শহর থেকে এক থিয়েটার পার্টি এসেছে,-বিনা নিমন্ত্রণেই। দু রাত্রি থিয়েটার হবে বলে আগেই রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল ,'মালতী ঃ শ্রীমতী চমৎকারিণী দাসী।' মানে মেয়ের পার্টে যিনি নামবেন তিনি মেয়েই।

'এ খবরে সারা শহরে ও গাঁয়ে হৈ চৈ পড়ে গেছল,–স্টেজে দাঁড়িয়ে মেয়ে মানুষ বইয়ের কথা গড় গড় করে মুখস্থ বলে যাবে,-এ আশেপাশের গাঁয়ের লোকদের কাছে একেবারে অবাক কাণ্ড ;... ।"(টুটাফুটা/৫০৫)

চারদিকে গোঁড়া সমাজপতিদের প্রতিবাদ ও অপর সকলের উদ্দীপনায় পরিবেশ যখন উত্তেজনামুখর, ঠিক তখনই দুর্ভাবনা দুঃসহ হয়ে উঠল, চমৎকারিণী জ্বরে শয্যাশায়ী। দিশেহারা ম্যানেজার আকুল কণ্ঠে সহকারী কৃতার্থকে জিজ্ঞেস করে 'এখন উপায়?' তাইতো তাড়াহুড়ো করে কৃতার্থ সরলাকে ধরে আনে বে-পাড়া থেকে। পেটের ভাত জোগার করতে যে অসহায় নারীকে রুক্ষজীবনের পথে প্রতিদিন প্রণয়ের অভিনয় করে চলতে হয়, স্টেজে রাজকুমারী মালতীর ভূমিকায় অভিনয় করার কথা– কুমার হিরণকুমারের প্রণয়িনী সে। নিমাই হিরণকুমারের ভূমিকায় অভিনয় করবে।'চমৎকার ছেলে এই নিমাই ! ঊনিশ-কুড়ির বেশি হবে না। ছিপছিপে পাতলা চেহারাটা, টানাটানা চোখ, কথায় যেন মধু ঢালা।'(টুটাফুটা/৫১৩)

এই প্রণয় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে মালতীরূপিণী সরলা কখন যেন নিজের অজান্তে হিরণকুমার-বেশী নিমাইয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। তাঁর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসার কথায় উদ্বেলিত হয় সে। নিমাই বলে-'তুমি এসেছ, ভালোই হয়েছে। এমনি একটি মেয়েই আমি চেয়েছিলাম– দুটি চোখে এমনি একটা লজ্জা,- তোমাকে পেয়ে মনে হচ্ছে সমস্ত সিন যেন একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠবে– গানের মতো ছবির মতো।'(টুটাফুটা/৫১৩)

দু, তিনটি দিন যেন স্বপ্নের মত অতিবাহিত হয় সরলার, নিমাই-এর স্বল্পাবকাশ উষ্ণ সান্নিধ্যে ঘোরে আচ্ছন্ন হয় সে। টাকায় বাঁধা সরলাকে না পেয়ে ক্রোধে-আক্রোশে ফিরে যায় অটলবাবু। সরলার তাতে মোটেও ভ্রূক্ষেপ নেই। বাড়িউলিকে সে বলে-'সরি এবারে সরে পড়েছে,-বাবুর তোয়াক্কা সে রাখে না।' সরলাকে একদিন নিভৃতে নিজের র‍্যাপারটা পরিয়ে দিয়েছিল নিমাই, দুজনে একসঙ্গে একথালায় খাবার খেয়েছিল। রিহার্সালের সময় 'নিমাইয়ের মাথাটা কোলের কাছে টেনে এনে সরলা সত্যি-সত্যিই কেঁদে ফেললে–চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। নিমাইয়ের কোঁকড়ানো চুলগুলি নিয়ে ওর শীর্ণ আঙুল কটির কী সে আদর, যেন আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে জলের মতো সমস্ত হৃদয় গলে পড়েছে।'(টুটাফুটা/৫১৬)

এই ভালোবাসার অনুভূতি নিয়ে মাত্র দুটি দিনের জন্য 'সরলা সব ভুলে যায়- খাল পারে সেই নোংরা ঘর, সেই শীতকালে রাত বারোটা পর্যন্ত ফাঁকে জবুথবু হয়ে বসে থাকা, সেই একঘেয়ে বিশ্রী কথাবার্তা, সেই অটলবাবুর বীভৎস মুখ। ওর বন্দী পৃথিবী যেন হঠাৎ একটা অপরিমিত পরিধি লাভ করে। আকাশকে আজ ওর ভালো লাগে,- সমস্ত অবকাশ পূজার আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভাবে, ও সত্যিই অটলের রক্ষিতা ক্রীতদাসী নয়, ও সত্যই রাজকুমারী। ও ভালোবাসে। প্রেমিককে হারিয়ে ও বৈরাগিনী হয়েছে, ওর দারিদ্র্য, ওর বিরহের কী সুন্দর ব্যাখ্যা। সরলা সব ভুলে যায়, মিথ্যার মাদকতা ওর ক্লান্তি ঘুচোয়- ও নতুন করে পৃথিবীতে জন্মলাভ করে।'

কিন্তু শেষ মুহূর্তে মিথ্যার আকাশ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ভেঙ্গে পড়ে তার দীর্ণ জীবনের মাথায়। অনুষ্ঠানের দিন সকালে সরলাকে জানিয়ে দেয়া হয়- চমৎকারিণী দাসী একদম সুস্থ হয়ে উঠেছে, অভিনয়টা সেই করবে, সরলা নিরর্থক। অপমানে, অভিমানে, হতাশায় মুহূর্তে অর্থহীন হয়ে পড়ে সরলার বিবর্ণ জীবন। একদিন নিমাই বলেছিল,'তোমাকে না নামালে আমি ওদের ডুবিয়ে মারব।' ঐ কথাটুকুতে ভরসা করে গভীর রাতে সরলা থিয়েটারের দিকে এগিয়ে যায় নিমাইয়ের দেওয়া র‍্যাপার গায়ে দিয়ে। সে নিশ্চয়ই পালিয়ে গেছে, চমৎকারিণী কি করে বলবে নিমাইকে সে কথা, যা বলে বলে মুখস্থ–আত্মস্থ হয়ে গেছে সরলার ! আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে থিয়েটার-তাবুতে পৌঁছে যায়–খোঁজ-খবর নিয়ে জানে নিমাই কখন ফিরেছে। পুরোদমে অভিনয় চলছে, 'তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য'-অর্থাৎ চমৎকারিণী নিমাইকে বলছে সরলার আত্মার কথা, হৃদয়ের কথা।

অভিনয় শেষে দর্শকের প্রশংসা স্রোতের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, 'খুনের সিন্‌টা কি রকম করলে! ওয়ান্ডারফুল !' অথচ ঐ সিন্‌টা সরলা কিছুতেই দক্ষতার সাথে উৎরাতে পারতো না। নিরাশায় ক্লান্ত, অভুক্ত 'সরলা আর বসে না, বাড়ি চলে।চলতে পারে না, কেঁদে কেঁদে মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে।'

পরদিন ভোর বেলা নিজের ঘরে সরলার যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন সারা গায়ে ভীষণ ব্যথা, জ্বর। আগের দিন রাত্রে ক্রোধে উন্মত্ত নেশাগ্রস্ত অটলবাবুর লাথি-জুতোর চোটে 'একেবারে ভেঙে' পড়েছিল সে। তবুও 'এত দুঃখেও ওর স্বপ্ন কাটে নি। ভোরের আলোয় মনে হচ্ছে যেন ওর কাছে ওর হিরণকুমার আসছে– মাথায় তার সোনার মুকুট, তাতে পাখির পালক গোঁজা।'

এই পরিসমাপ্তি প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মন্তব্য স্মরণযোগ্য, -'অচিন্ত্যকুমারের পরবর্তী পরিণতি লক্ষ করিলে ইহাই মনে হয় যে, বীভৎসতার প্রতি তাঁহার কোনো স্বাভাবিক প্রবণতা নাই, বরং কুৎসিতের ঊষর মরু-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া এক দুরধিক্রম্য সৌন্দর্যলোকে উত্তীর্ণ হওয়াই তাঁহার প্রকৃত কাম্য।'[৭] 'ইতি' গল্পে জীবনের নীতি-নিষিদ্ধ পথের বর্ণনায় তাঁর লেখনী অবাধগতি। এখানে অভিজ্ঞতার একান্ত ঘনিষ্ঠতা রয়েছে, এমনটি মনে করার কোনো অবকাশ নেই, তবে জীবনকে তার রূঢ়তম ক্ষেত্রেও যথাযথভাবে দেখার গভীর ব্যাকুলতা শিল্পীর প্রবল হয়েছে। তাই উদ্দাম নগ্নতার উল্লাস এখানে হতে পেরেছে শান্ত, স্তিমিত। তাঁর সহজ, সাধারণ সৌন্দর্য-পিপাসার প্রসঙ্গটিও এই গল্পের পরিণামে স্পষ্ট ব্যঞ্জনা পেয়েছে।

ভূদেব চৌধুরী মন্তব্য করেছেন-'জীবন-সংযোগ রহিত সেই অদম্য যৌবন-পিপাসা ও বিলাসী ভাবালুতা থেকে মানুষের মনের প্রত্যক্ষ শক্ত মাটিতে পদক্ষেপ করলেন শিল্পী 'ইতি' গল্পতে।...চোখ আর মন জেগে থাকলে দেখবার জিনিসের অভাব জীবনে কখনোই ঘটে না-'ইতি' এ সত্যেরই প্রমাণ।'[৮]

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী 'পরিচয়'-এর বৈশাখ ১৩৩৯ সংখ্যায় 'ইতি' গল্পগ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

'অচিন্ত্যকুমার পৃথিবীকে সুখদুঃখের রঙে রাঙাইয়া দেখিয়াছেন, এবং সে রঙ গভীরও বটে। কিন্তু বুঝিতে পারি দুঃখের কালো রঙটার দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশি, এবং এজন্য যখন চতুর্দিককার পরিচিত পৃথিবী হইতে মশলা আহরণ করিয়া তাহার কুলায় নাই, অবলীলায় তিনি নিছক কল্পনার শরণাপন্ন হইয়াছেন।...দুঃখের প্রয়োজনেই দুঃখ। রসসৃষ্টির খাতিরেও ইহার একটুখানি relief স্থানে স্থানে থাকা উচিত ছিল।

ইহা স্বীকার করিব, গল্প জমিয়াছে, গ্রন্থকার নিপুণহাতে কাঠামো গড়িয়াছেন। কিন্তু রঙের তুলি যখন বুলাইয়াছেন তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতার সৌকর্য রক্ষিত হয় নাই। ইহাতে এই দোষ হইয়াছে যে, হৃদয়কে অত্যন্ত গভীর করিয়া আলোড়িত করিবার সমস্ত আয়োজন হাতে লইয়াও লেখক হৃদয় স্পর্শ করিতে পারেন নাই।...

নয়তো গল্প কাহাকে বলে তাহা বোঝেন। সে পরিচয় তাহার শেষ গল্প 'ইতি' তে পাই।...সত্যকারের সৃষ্টির তাগিদ বেগবান নদী স্রোতের মতো তাঁহাকে তাঁহার নিজের কাছ হইতে টানিয়া ছিনাইয়া রসতীর্থের দিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। অতি গভীর সহানুভূতি এবং সত্যকারের অন্তর্দৃষ্টি হইতে সরল চরিত্র আঁকা হইয়াছে, গোড়ার দিকে চেষ্টা করিয়াও সে অচিন্ত্যকুমারের মতো হইয়া পড়িতে পারে নাই।'[৯]

বাংলার ইতিহাসে ছিয়াত্তরের (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) ও পঞ্চাশের (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) মন্বন্তর নামে পরিচিত দুটি দুর্ভিক্ষের ঘটনা ধ্বংস ও ভয়াবহতার দিক থেকে পরিচিত। দুর্ভিক্ষ বাঙালি জীবনে সৃষ্টি করে এক দুঃসহ অভিশাপ, দুরারোগ্য ক্ষত। অসহ্য ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মানুষের প্রাণান্ত প্রয়াস, মায়ামমতা বিসর্জন দিয়ে শুধু আত্মরক্ষার চিন্তা, ডাস্টবিনে, লঙ্গরখানায় কেবল খাদ্যান্বেষণে ছুটে চলা, চোরাকারবারি ও কালোবাজারি ব্যবসায় অমানুষিক

অত্যাচার, পথে-ঘাটে সর্বত্র অনাহারী মানুষের মৃতদেহ প্রভৃতি বাংলার দুর্ভিক্ষকালীন এক অবর্ণনীয় দুর্দশার চিত্র। একদিকে খাদ্যাভাবে মানুষের যন্ত্রণাময় মৃত্যু ও পলায়নের পরিণতিতে গ্রামের নির্জনতা, মানবেতর জীবনাচার, বংশ পরম্পরার আবাসভূমি ত্যাগ, নারীর সম্ভ্রমহানি, অপরদিকে কালোবাজারিদের মুনাফালাভের পৈশাচিকতা-এই ছিল দুর্ভিক্ষের স্বাভাবিক রূপ। মন্বন্তরের এই চিত্রই অত্যন্ত করুণ ও মর্মস্পর্শীভাবে রূপায়িত হয়েছে গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে-গানে-শিল্পে-চলচ্চিত্রে। শিল্পী লেখকদের রচনাকর্মে তাঁদের হৃদয় নিংড়ানো বেদনার এই বাণী ও রূপেরই ঘটেছে প্রতিফলন। দুর্ভিক্ষবিষয়ক ছোটগল্পের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) *চাউল ও ভীড়* বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৮৭) *বীরুর প্রশ্ন*, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১ *বোবাকান্না*, *পৌষলক্ষ্মী ও তিনশূন্য*, সোমনাথ লাহিড়ীর (১৯০৯-৮৪) *১৯৪৩*, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের (১৯১৭-৭৫) *মদনভস্ম ও আবরণ*, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৮-৭০) *কালো জল, হাড়, পুষ্করা ও দুঃশাসন*, সুনীল জানার *কুকুর* প্রভৃতি স্মরণীয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের দুর্ভিক্ষ প্রধান গল্পসমূহ এ ধরনের রচনার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। কাহিনী বিন্যাস, বিষয়শৈলী ও উপস্থাপনা কৌশল- এসব দিক দিয়ে গল্পসমূহের উৎকর্ষ প্রশংসনীয়। এসব গল্পের ঔজ্জ্বল্য ও ঐশ্বর্য সন্দেহাতীতভাবে স্বীকার্য। তাঁর জীবনচেতনা, মানববোধ এখানে চূড়াস্পর্শ করেছে। নিগৃহীত-উৎপীড়িত মানবের প্রতি গভীরতর সহানুভূতি তাঁর শিল্পিধর্মের মৌল প্রবণতা। দুর্ভিক্ষবিষয়ক গল্পে তাঁর শিল্পবৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর প্রতিফলিত। দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর মানুষের ব্যক্তিজীবন, সংসারজীবন ও সমাজজীবনে কী ধরনের অপ্রত্যাশিত অভূতপূর্ব ও অবর্ণনীয় সমস্যা-সংকট সৃষ্টি করেছে অচিন্ত্যকুমারের গল্পে রয়েছে তারই স্বরূপ সম্পর্কিত নিপুণ বিশ্লেষণ।

'যতনবিবি' গল্পের আবহের মধ্যে দুর্ভিক্ষের ছায়া প্রতিফলিত। যতন বিবি দুর্ভিক্ষের প্রতীকে দৃশ্যমান। প্রায় বস্ত্রহীন, ক্ষুধার্ত যতনবিবিকে দেখে সাহেবের চাকর হানিফ মমতায় আর্দ্র হয়। একমুঠো চাল,একটু দুধ,এক টুকরো পুরোনো কাপড় দিয়ে হানিফ যতন বিবির আব্রু ও ক্ষুধা নিবারণ করার চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, তাকে ভালোবাসতেও শুরু করে। কিন্তু যতন বিবি হানিফের আন্তরিকতার কোন মূল্য না দিয়ে উঠে পড়ে সাহেবের নৌকায়। জয় হয় লোভের, পরাজয় ঘটে আন্তরিক ভালোবাসার।

দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে 'যতন বিবি' কাহিনী গঠিত হলেও বহির্ভাগীয় অংশে বাস্তব প্রেক্ষাপটে হানিফের পরাজয় ও অন্তর্ভাগীয় অংশে তার প্রভুর জয়ের মধ্য দিয়ে জীবনদ্বন্দ্বের প্রকাশ প্রাধান্য পেয়েছে। ইনসপেক্টর সাহেবকে নৌকাডুবির হাত থেকে রক্ষার পর হানিফকে তিনি পাচকের কাজে নিয়োগ করেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সারা বাংলার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। হত দরিদ্র জনসাধারণ ক্ষুধা নিবারণের জন্যে বাড়িতে বাড়িতে ভাতের ফ্যান ভিক্ষা করে ফিরত। সে সময় মানুষের পেট ও পিঠ সমান হয়ে যায়।

হানিফের কাজ ছিল বাগানে মোষ চরানো। তার শরীর ছিল 'কালো কদাকার, কিন্তু শরীর একেবারে পেটা লোহা'। নৌকাডুবি থেকে ইনসপেক্টারকে বাঁচানোর পর সে তাঁর বাবুর্চির চাকরি পেলেও নদীমাতৃক অঞ্চলের

সাধারণ সরল মানুষ হানিফের অনাকর্ষণীয় জীবনে তীব্র আকর্ষণ নিয়ে আবির্ভূত হয় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলের যতনবিবি।

লেখক যতনবিবির বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নরূপে :

'প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ, পচা গলা একটা ন্যাতা কোনোক্রমে কোমর ও বুকের কাছে জড়ো করে রেখেছে - বয়েস বোঝা যায় না, শুধু চোখের কালোর থেকে যৌবনের অল্প যা অনুমান আসে, নইলে বুকে নেই এতটুকু স্তনলেশ, গা-হাত-পা শুধু হাড়ের লুপ্তোদ্ধার'। (য.বি./৪)

দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত যতনকে দেখার পর তার প্রতি গভীর করুণা ও ভালোবাসার উদ্রেক হয় হানিফের মধ্যে। সে ফ্যান নয়, তাকে খেতে দেয় মাছের সঙ্গে ডাল ভাত। তার খাওয়ার প্রকৃতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে সে। জীবনে কোন নারীর সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব হয়নি হানিফের। যতনবিবির প্রতি সে একটা আকর্ষণ অনুভব করে। তার জন্যে হাট থেকে কাঁচের চুড়ি কিনে আনার সিদ্ধান্তও নেয়। তার গায়ের ছিন্ন মলিন কাপড় দেখে সাহেবের বোঁচকা থেকে একটা মোটা ছেঁড়া বিছানার চাদর চুরি করে যতনকে পরতে দেয়। তার মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় মানসিক লাবণ্য। লেখকের বর্ণনায় এই দিকটি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়-

'অনেকখানি কাপড় নিয়ে অগোছালো হয়ে উঠতেই হানিফ স্পষ্ট টের পায় যতনের যৌবন, বুকের উপর আঁচল টেনে দেবার শৃঙ্খলায়, যে-লজ্জা এতক্ষণ ছিলনা সে লজ্জা হঠাৎ গায়ের উপর টেনে আনায়।' (য.বি./৮)

প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে যতন আসে হানিফের কাছে। সে ভোলেনি তার ক্ষুধাকে আর হানিফের কাছে প্রাপ্তির কথা। হানিফ তাকে শুধু ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্য দেয়নি, তেল-শাড়ি-চুড়ি সাবান সব দিয়ে তার চাহিদা পূরণ করেছে। কিন্তু সে লক্ষ করেনি এক নারীর দৈহিক পূর্ণতা আর মানসিক ইচ্ছার। এই পর্যায়ে লেখক যতনের দেহের বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নরূপ :-

'গাল দুটো প্রায় ভরা-ভরা, বুকের মধ্যিখানটায় থর ফেলে দু' পাশ থেকে প্রায় গোল হয়ে উঠেছে, চলা-বলায় এসেছে অনেক ভার আর গরিমা। পাতা-ঝরা গাছে কখন ফের হঠাৎ ফুল গজায়, কে জেগে তাকিয়ে থাকতে পারে সারাক্ষণ! এক সময় বিস্ময় এসে ধাক্কা দেয় আকস্মিক, তেমনি যেন হানিফ একটা ধাক্কা খায়। নতুন চোখে তাকাতেই যতন হাসে তেরছা করে। হানিফ দেখে তার হাসিতে এখন চাকুর চাকচিক্য।' (য.বি./১০)

যতন হানিফের হাতে তৈরি মাটির প্রতিমা। তা সত্ত্বেও তার প্রতি কোন দৈহিক আকর্ষণ অনুভব করেনি সে। দক্ষ কারিগরের মতো হানিফ প্রতিমা তৈরি করেছিল অন্যের ভোগের জন্যে খানিকটা নিজের অগোচরে। এই কারণে লেখক তাকে নির্দেশ করেছেন 'বোকা মোষ' হিসাবে। যতন সাজসজ্জা করে তার সামনে দিয়েই নৌকায় উঠে তার সাহেবের দিকে এগিয়ে যায়। পরাজিত, ব্যর্থ, দুর্বল হানিফ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেও তার হাতে

আগের সেই বেগ আর শক্তি অনুপস্থিত, জলেও নেই আগের মতো প্রবাহ। অথচ এই হানিফই একদিন নদীর উত্তাল তরঙ্গ থেকে রক্ষা করেছিল তার সাহেব প্রভুকে, কিন্তু জীবনের তরঙ্গ থেকে সে রক্ষা করতে পারেনি যতনবিবিকে। দুর্ভিক্ষ থেকে হানিফ যতনবিবিকে খাদ্য,বস্ত্র দিয়ে বাঁচিয়ে দান করেছে নতুন জীবন; কিন্তু তার জীবনে মানবিক দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে সবাই একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে।

বাস্তবতা মিশ্রিত রূঢ় জীবন, উৎকট মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, নিম্নশ্রেণী অধ্যুষিত জীবনচিত্র, আঞ্চলিক জীবনের আদিম রূপ কল্লোল উত্তর গল্পরাজিতে এক প্রভাবশালী দিকবলয় সৃষ্টি করে। নিম্নবিত্ত পর্যায়ের অপরিচিত নরনারীর জীবনচিত্র অচিন্ত্যকুমারের গল্পে এক মৌলিক প্রবর্তনা। যতনবিবিকে কেন্দ্র করে লেখকের জীবনবোধের যে বস্তুনিষ্ঠ প্রাণধর্মিতা পরিলক্ষিত হয়েছে তা শুধু অসাধারণই নয় একই সঙ্গে অনবদ্য। দুর্ভিক্ষের দুঃসহ দিনগুলিতে নিরন্ন যতনবিবির মুখে খাবার তুলে বাঁচিয়েছে হানিফ। কিন্তু অন্নে-বস্ত্রে পরিপূর্ণ যতনবিবি জৈববাসনা চরিতার্থের প্রত্যাশায়, কৃতজ্ঞতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে সাহেবের নৌকায় উঠে বসে। তার নিরাপত্তাহীনতা ও জৈবিকতৃষ্ণার অপূর্ণবোধই স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে এ গল্পে। যতনবিবির লোভাতুর বিষয়ভাবনা ও দেহবাদী কামনার দুর্বার স্রোত লেখকের জীবনবোধে মৌলিক বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

ধারা ও অনিমেষ ট্রেন যাত্রায় দুর্ভিক্ষের কুৎসিত রূপ প্রত্যক্ষ করলেও উপলব্ধি করেছে কি না সেটা খুব একটা স্পষ্ট নয় **‘সরজমিন’** গল্পে। অন্ধ ভিখারীকে সাহায্য করা দূরের কথা ধমকে তাড়িয়ে দিয়েছে। শীর্ণ পেটের ভিখারী, কঙ্কালসার শিশু, সদ্য মরে যাওয়া ছেলের মা, আসন্ন প্রসবা দুঃস্থ মা, প্রায় বস্ত্রহীন স্ত্রীলোক, পাঁজর গুনতে দেয়ার দলের ভিক্ষুক - কেউই ধারা বা অনিমেষের করুণার পাত্রী হতে পারেনি। গল্পের প্রেক্ষাপটে দুর্ভিক্ষকে দাঁড় করিয়ে লেখক দেখিয়েছেন এই দম্পতির সীমাহীন ঔদাসীন্য, যারা টাকার বদলে সুখ কিনে দিন পার করার পক্ষপাতী। যাদের করুণা বা অর্থ কোন দিনই উপকারে আসে না বিত্তহীন দরিদ্র ভিক্ষুক, অসহায়দের।

ট্রেনের প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণরত ধারা ও অনিমেষের চোখে দুর্ভিক্ষ ধরা পড়েছে পঞ্চ আঙ্গিকে। দুর্ভিক্ষের সময় ট্রেনের অভ্যন্তরেও দুর্ভিক্ষ প্রবেশ করেছে। কামরার আসনগুলো ছেঁড়া, বৃষ্টির সময় প্রথম শ্রেণীতে ছাতা মাথায় দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে হয়। ইঞ্জিন চালককে ডেকে ট্রেন থামাতে হয়। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ প্রথম শ্রেণীর দরজায় পা-দানিতে দাঁড়িয়ে জীবন হাতে নিয়ে চলাফেরা করতে বিন্দুমাত্র জীবনের জন্য ভীত হয়না। স্টেশনের ঘড়িও প্রকৃত সময় দেয় না পরিচর্যার অভাবে। ধারা ও অনিমেষ প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণের সময় শহরে কন্ট্রোলের দোকান থেকে চাল কেনার পর বাড়িতে প্রত্যাবর্তনরত অসংখ্য বিনা টিকিটের যাত্রীদের দেখতে পায়। প্রত্যেকের আঁচলে দু-চার মুঠো চাল বাঁধা। এই সামান্য চাল নিয়ে পরিবারের ক্ষুধা দূর করার অসাধ্য প্রয়াস। শক্তিহীন এই মানুষগুলো কোনক্রমে ট্রেনের পা-দানিতে পা রেখে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে খড়ের বা গোল পাতা দিয়ে তৈরি ঘরে।

খিদের তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে মা বাবার সঙ্গী হয় তাদের শিশুকন্যা। সাতদিন ধরে তারা আস্তানা গেড়েছে রাস্তার গাড়ি-বারান্দায়।'পাতের উচ্ছিষ্ট কখনো কখনো তাদের হাতে পড়ে, তারি প্রলোভনে'। মানুষের পাতের উচ্ছিষ্টও সব সময় তাদের ভাগ্যে জোটে না। ছোট মেয়ের মত তার বাবাও তার মাকে সর্বত্র খুঁজে বেড়ালেও শেষ পর্যন্ত তার কোন সন্ধান পায়নি। মিথ্যা আশায় কন্যাসন্তান গ্রামের পথে রওনা হয়েছে, বিশ্বকর্মার পুজোর সময় যদি তার মা গ্রামে ফিরে আসে। ছোট একটি পরিবারের দুর্ভিক্ষ ভারাক্রান্ত জীবন লেখক ইঙ্গিতের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন টুকরো ছবির মাধ্যমে। ট্রেনের পা- দানিতে ছোট এই মেয়েটির মতো সবার একটাই প্রার্থনা :

'আর যাই কষ্ট হোক, যেন ভাতের কষ্ট কেউ না পায়। যেন পেট না কান্নুর খোলে পড়ে, যেন কেউ আঁত-শুকনো না হয়।' (য.বি./১৮)

ধারা ও অনিমেষের ট্রেনে যাত্রা শুধু ভ্রমণ নয়-গন্তব্যস্থানে যাওয়ার পথে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের চিত্র নিজেদের বাস্তব দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ ও দুঃখবোধের উপলব্ধি। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে অসহায় মানুষ ভিক্ষার জন্যে অনেক সময় মিথ্যার ভান করতে বাধ্য হয়। সমস্তটুকু না হলেও সত্যকে মিথ্যার আবরণের কাছে পরাজিত হতে হয়। এক অন্ধ ভিক্ষুক ধারার কাছে ভিক্ষা চাইলে সে তাকে 'ভণ্ড' বলে চিহ্নিত করলে ভিখারির উত্তরে মিথ্যার বাইরে প্রকাশিত হয় প্রকৃত সত্য। ভিখারি বলে :

'মাগো, জোচ্চর জেনে না দাও, ক্ষুধার্ত জেনে তো দেবে। আমার খিদে তো আর জোচ্চুরি করে না। বলে সে তার জামা তুলে পেটটা মেলে ধরলো। পেটে পিঠে এক যদি কিছু থাকে তো এই। খোঁড়লটা যেন বিকট মুখব্যাদানের মতো। বললে ভিখিরি, 'আমার চোখ ভণ্ড হতে পারে, কিন্তু বলুন, আমার এই পেটটাও কি ভণ্ড? এও কি বলছে না এত দিনে সত্য কথা?'

লেখক একের পর এক ঘটনার বিন্যাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকে দৃশ্যমান করে তুলেছেন বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে। অন্ধের অস্থিসার পেট, পালকহীন পাখির বাচ্চার মত কঙ্কালায়িত শিশু, সদ্য মৃত শিশুর পাশে রোরুদ্যমান মা,আসন্ন সন্তান সম্ভবা মায়ের স্তনলেশহীন বুক সবই অন্নহীন মানুষের শবযাত্রা। চাল নয়, ভাত নয় শুধু ফ্যানের সন্ধানে হাতে মাটির ভাঁড় নিয়ে দুর্বল পায়ে মুখে প্রত্যাশা নিয়ে লঙ্গরখানা অভিমুখে ছুটে চলেছে অসংখ্য মানুষ। স্টেশন মাস্টারও ট্রেনের ইঞ্জিনের কয়লা চুরি করতে বাধ্য হয় নিজের পরিবারের ক্ষুধা নিবারণে। এই কারণে শেষ স্টেশনে পৌঁছানোর দশ মাইল আগে ট্রেন চলে শুধু কয়লার ধোঁয়ায়। ট্রেনের টি টি আই -এর সঙ্গেও দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের কোন পার্থক্য নেই। তিনিও বিনা টিকেটে ভ্রমণরত যাত্রীকে বলতে কার্পণ্য করেন না 'শুধু লঙ্গরখানার দিকে তাকাবেন না, আমাদের এই হাঙ্গরখানার দিকেও তাকান।' এই উক্তির পর তিনি নিজের পেটের দিকে ইঙ্গিত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। অনিমেষের স্ত্রী ধারা বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে বলতে বাধ্য হয়, 'এই দারিদ্র্য এই অভাবের চেয়ে আর পাপ কী হতে পারে সংসারে?' অনিমেষ, ধারা ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে খাবার প্রস্তুতি নেবার সময় এক বুভুক্ষু নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে তাদের প্লেট থেকে ছোঁ মেরে কয়েকটা

লুচি নিয়ে ট্রেন থেকে নিচে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। ছিনিয়ে আনা লুচি তার ভাগ্যে জোটে না। 'সরজমিন' গল্পে লেখক খণ্ড খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষের রূপ নিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন। ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর ছেঁড়া গদি, ভাঙ্গা ছাদ দুর্ভিক্ষের প্রতীকী রূপ ব্যঞ্জনায় অঙ্কিত।

মন্বন্তরকালীন মধ্যবিত্তশ্রেণীর নৈতিক মূল্যবোধের বিনাশ লেখক এ গল্পে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছেন। ক্ষুধার্ত মানুষের অন্ধকার জীবন, জটিল জীবনপ্রবাহ, মানবিকতার বিপর্যয়- সবকিছু মিলে যে পরিবর্তনের প্রবল গতিধারা তা লেখকের জীবনবোধকে উজ্জীবিত করেছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের অসহনীয় যন্ত্রণা অনিমেষের স্ত্রী ধারার মনোজগতকে নাড়িয়ে দিয়েছে, সেই সঙ্গে লেখকের জীবনচেতনায় সংবেদনশীল ধারা দুর্ভিক্ষকালীন মানুষের দুর্দশা উপলব্ধির মূর্তিমান প্রতীক হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। এখন আর তার কাছে ক্ষুধার্ত মানুষ 'ভণ্ড' নয়, 'জোচ্চর' নয়। শ্রীভূদেব চৌধুরী অভিমত ব্যক্ত করেছেন: 'অচিন্ত্যকুমারের পরিণত ছোটগল্পে কবিকর্মের প্রাচুর্য থাকলেও গল্পত্বের অভাব কখনো ঘটেনি। তার মুখ্য কারণ শিল্পীর জীবন অভিজ্ঞতার পুঞ্জিত সঞ্চয়।'[১০]

দুর্ভিক্ষের কদর্য রূপের পাশাপাশি এক মমতাময়ী নারীর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে **'কালনাগ'** গল্পে। শিশু সন্তান আর স্বামীর জন্য বস্তির ঝি সেজে খাবারের সন্ধানে ছুটে যাওয়া সুধা আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর নয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ক্ষুধার দুর্বিষহ ব্যথায় কাতর চীনে পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোকটিকে যখন সে দু'মুঠো খাবার দেবার অঙ্গীকারে ডেকে আনে। স্নেহময়ী সুধা জানে পর পর তিনদিন না খেয়ে থাকার কী অসহনীয় যন্ত্রণা। ক্ষুধাপীড়িত অসহায় ভদ্রলোকটি শেষ পর্যন্ত সুধার স্বামীর কাছে অপমানিত হয়ে বিদায় নিলে সুধার মনটি বিষাদে ভরে ওঠে। অন্যদিকে ভবতোষের প্রাণে করুণার বদলে উদ্‌গিরণ হতে থাকে সন্দেহ নামক বস্তুটির। কালনাগের মতোই সন্দেহ ফুঁসে ওঠে। সুধার মায়াভরা হৃদয়ের কথা তার কাছে অজানাই থেকে যায়।

দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মধ্যেও সন্দেহের কালনাগ যে বিস্তৃত ফণা তুলে বিবেকের ওপর আঘাত করে 'কালনাগ' গল্পে স্কুল শিক্ষক ভবতোষের আচরণের মধ্যে তা প্রতিফলিত হয়েছে। মন্বন্তর নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের ওপর দারিদ্র্যের আঘাত হানলেও মানুষ তার চিরায়ত সন্দেহের বৃত্ত থেকে বের হতে পারেনি। দুর্ভিক্ষের পদধ্বনিতে দরিদ্র স্কুল -শিক্ষক ভবতোষের সংসারে দারিদ্র্য দেখা দেয় প্রকট আকারে। তিনদিন ধরে আধপেটা করে খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে হয়েছে স্বামী- স্ত্রী আর তিন সন্তানকে। কয়লার অভাবে চুলোয় আগুন জ্বালানোর প্রয়োজনে একমাত্র লেখার টেবিল ব্যবহার করতে হয়েছে। গল্পের এই বিবরণের মধ্যে হতদরিদ্র, অসহায় বিপন্ন ভবতোষের সংসারের করুণ চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পরাজয় মোচনে ভবতোষ আত্মহত্যার কথা চিন্তা করলেও শেষ পর্যন্ত সে পথে অগ্রসর হতে পারেনি। সকালে স্ত্রীকে ঘরে না দেখে তার অন্তর্ধান তাকে চিন্তিত করে তোলে। বিপদের আশঙ্কা চিন্তা করে সে ঘরের

জিনিসপত্র খুঁজেও কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারে না। লেখকের বর্ণনায় তার অভাবের সংসারের ছবি দৃশ্যমান হয়েছে এভাবে -

'দু গাছি সোনার চুড়িই সুধার শেষ আভরণ। আর বাকি যা কিছু ছিল কাগজের টুকরোয় পর্যবসিত হয়ে জঠরের আগুনে ভস্মসাৎ হয়ে গেছে।' (য.বি./৫৩)

ভবতোষ বাড়ি থেকে বের হয় স্ত্রী সুধার সন্ধানে। সারাদিন অনুসন্ধানের পর ব্যর্থ হয়ে সন্ধ্যের আগে বাড়ি ফেরে ভবতোষ। বাড়িতে বাতি জ্বালানোর পূর্ব মুহূর্তে রাস্তার গলি দিয়ে সুধা বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে। লেখক সুধার বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে :

'পরনে খাটো ফেঁসে যাওয়া নোংরা কাপড়, পাড় আছে কি নেই চোখে পড়ে না -হাত- গলা সব খালি, এক হাঁটু ধুলো। যেন দাঁড়াতে পাচ্ছে না- এমনি তার চলা, হাতে আবার একটা পুঁটলির ভার।' (য.বি./৫৬)

কনট্রোলের চাল প্রাপ্তির জন্যে সুধা ভিখারির পোশাক পরে রাত থেকে সন্ধ্যের আগে পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে দু'সের চাল সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দু'সের চাল প্রাপ্তির সংবাদ শোনার পর ভবতোষের উক্তিতে স্বর্গপ্রাপ্তির মত উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়। 'চাল! যেন ভবতোষ কোনদিন নাম শোনে নি ও জিনিসের। হ্যাঁ, দু সের চাল পেয়েছি। সুধা হাসলো। অসীম ক্লান্তির মাঝেও জয়ের একটু স্পর্ধা আছে লেগে।'

ষোল ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে দু'সের চাল প্রাপ্তিতে শুধু আনন্দ নয়, বেদনাও গভীর ভাবে জড়িত। একজন পুরুষ 'পুরুষ লাইনে' সুধার আগেই দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সুধা চাল পাওয়ার পর দোকান বন্ধ করে দেওয়ায় সে খালি হাতে ফিরতে বাধ্য হয়। তার বাড়িতে সবাই প্রতীক্ষা করছে চাল নিয়ে বাড়িতে ফেরার প্রত্যাশায়। স্ত্রী -পরিবারকে একবেলা আধপেটা খাওয়াতে সক্ষম হলেও সে নিজে অভুক্ত চারদিন। পরিবারের সদস্যদের অন্নে কম পড়বে বলে সে বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে আসার ভান করে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেছে। গল্পে অভাব জয়ের প্রচেষ্টায় সেই লোকটির বর্ণনা নিম্নরূপ :

'আধাবয়সী, কিন্তু যেন ঠিক ভদ্রলোকের পর্যায়ে পড়ে না। যদিও গায়ে একটা ছেঁড়া ও কুচকানো চীনে সিল্কের পাঞ্জাবি। দাড়ি কামায়নি কত দিন। চুলগুলিতে চিরুনির আঁচড় নেই। চাউনিটা যেন ঘোলাটে, অপরিচ্ছন্ন।' (য.বি./৫৭)

বাস্তবের সঙ্গে যুদ্ধরত এই লোকটির ভেতরে স্ত্রী পরিবারের জন্যে গভীর ভালোবাসায় নিজে উপোস করেও কোনদিন তাদের জানতে দেয়নি। এই লোকটি রেশনে চাল পেলে সুধার ভাগ্যে দু' সের চাল জুটত না বলে সুধা ভদ্রলোকের অবস্থা জানার পর মানবিক চেতনাবোধে তাকে নিজেদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল অন্নগ্রহণের। কিন্তু বাড়িতে প্রবেশের আগে ভবতোষ তাকে সন্দেহ করে উত্তপ্ত হয়ে উঠে। তার ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, লোকটি তার স্ত্রীকে রূপোপজীবী মনে করে বাড়িতে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছে। কালনাগের মত সন্দেহ ফণা তুলে ওঠে।

ভবতোষ অপমান করে এই অভুক্ত লোকটিকে তাড়িয়ে দেয়। সুধার কাছ থেকে সব শোনার পর ভবতোষের বিবেক পরাজিত হয় সন্দেহের কালো বিষবাষ্পে, যা দুর্ভিক্ষও গ্রাস করতে পারে নি।

মন্বন্তরপীড়িত বাংলার নরনারীর মর্মভেদী কান্না আর দারিদ্র্যনিষ্পেষিত মানুষের বিপর্যয়ের ছবি এঁকেছেন অচিন্ত্যকুমার। দুর্ভিক্ষ নামক ভূমিকম্পের ফলে ভদ্রতার আবরণ, নীতির রক্ষাকবচ, পারিবারিক মূল্যবোধ, মায়ামমতা, আনুগত্য, যুগযুগান্তরের ধর্মসংস্কার সবই ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এখানে স্নেহময়ী ও কর্তব্যনিষ্ঠ স্ত্রীও সন্দেহপরায়ণ স্বামীর চোখে অভিযুক্ত হয়ে আসামীর কাঠগড়াতে দাঁড়ায়। সদা মমত্ববোধে উজ্জীবিত নারীর প্রতি পুরুষের সন্দেহের এই সরল রৈখিক মানসিকতা লেখকের জীবনচেতনায় গভীরভাবে ছায়া ফেলেছে যা 'কালনাগ' গল্পকে উত্তীর্ণ করেছে এক উন্নত ভাবভূমিতে। 'গল্পের আকার বা ফর্ম সম্বন্ধে সচেতনতা, সূচনা ও সমাপ্তি সম্পর্কে সতর্কতা, ভাষাবাহন সম্পর্কে শিল্পবোধ এইসব গল্পেও অনায়াস লক্ষণীয়। বস্তুতঃ গল্পকার অচিন্ত্যকুমারের সৃষ্টিশক্তি ক্লান্তিহীন।'[১১]

'বস্ত্র' গল্পটি মন্বন্তরের আরেকটি মর্মান্তিক শ্মশান চিত্র। বুড়ো ছাদেম ফকিরের সংসারে স্ত্রী আর তার বিধবা পুত্রবধূ। বস্ত্রাভাবে সভ্যসমাজের সম্মুখীন হওয়া যায় না বলেই ছাদেমের জীবিকার উৎস বন্ধ হল। অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে জর্জরিত ছাদেমের কোমরের নিচে একহাত অবধি একটা ন্যাকড়ার ঘের ছিল। সেটি আস্তে আস্তে নেংটিতে পরিণত হয়। তারপর ভদ্রসমাজে বসবাসের অযোগ্য হয়ে একেবারে তন্তুহীন ছাদেম ফকির অন্ধকারে ভূতের মত শ্মশানে শ্মশানে কাপড় খুঁজে ফেরে, যদি মেলে ন্যাকড়ার ফালি, চটের টুকরো, কিংবা বালিশের খোল। অবশেষে দিগম্বর অবস্থায় একদিন শ্মশান পথের অন্ধকারে ধরা পড়ে তার ভাগ্যে জোটে একখানা নতুন কাপড়। কিন্তু এই একটিমাত্র নতুন কাপড় দিয়ে সে কার লজ্জা নিবারিত করবে? নিজের, বৌ-এর, না ছেলের বৌ এর? তাই তাদের লজ্জা বাঁচিয়ে, নিজে লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য নতুন কাপড়খানি গলায় জড়িয়ে আমের ডালে ঝুলে আত্মহত্যা করে। লেখক সেই নিদারুণ কাহিনীর করুণ চিত্র এঁকেছেন এভাবে–'তখনও গাছপালা একেবারে ঝাপসা হয়ে আসেনি। দেখলুম একটা সাধারণ আমগাছ। তারই একটা ডালে কি একটা ঝুলছে। সন্দেহ কি, আমাদের ছাদেম ফকির। তেমনি নিঃস্ব, তেমনি নগ্ন, তেমনি নিরবকাশ।... নতুন দক্ষিণের বাতাসে বোল ধরা ডালগুলো কাঁপছে মৃদু-মৃদু। যেন বলছে আমার তুমি মান বাঁচালে বাবু। উলঙ্গতা আর দেখতে হল না নিজেকে।' (এ.এ.গ./৫৩০)

ছাদেমের এই লজ্জার আত্মহত্যায় শোকে বিলাপ করবার মতও বিহ্বল কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। না তার স্ত্রী, না তার পুত্রবধূ। পাওয়া যাবেই বা কি করে? মানুষের সমাজে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে বেরুবার উপায় নেই, কাঁদবারও উপায় নেই। পরিশেষে ছাদেমকে লাশখানায় নিয়ে যাবার পর তার গলা থেকে কাপড়খানি খুলে শাশুড়ি-বৌ দুজন পরবার পর প্রকাশ্যে কাঁদবার ও শোক প্রকাশের সুযোগ পায়। মানুষের হাতে মনুষ্যত্ব কিভাবে

বিবস্ত্র ও বেআব্রু হয়ে লজ্জায় আর অপমানে রুদ্ধকণ্ঠ হয় তারই ভাষারূপ এই 'বস্ত্র' গল্পটি। দারিদ্র্য যে মানুষকে শুধু অন্নে নয়, পরিচ্ছদেও রিক্ত করে দেয়–সে বিষয়টিই এখানে অসাধারণ ভাষাশিল্পের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে।

পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং তৎপরবর্তী বাংলার জনমানবের দুঃখদুর্গতি ঘেরা জীবনচেতনার ছবিই বিশেষভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছে তাঁর রচনায়। **'বাঁশ বাজি'** গল্পে পুত্রের মৃত্যুতেও মন্তাজের চোখের জল ফেলবার উপায় নেই, কারণ বাঁশ বাজি দেখিয়েই সে অর্থোপার্জন করে, সেটাই তার একমাত্র জীবিকা। কিন্তু অনাহারী জীর্ণ বৃদ্ধ দেহ সব সময় টাল সামলাতে পারে না। বাঁশের ডগায়- উঠে বাজি দেখাতে গিয়ে বড় ছেলেটি ছিটকে মাটিতে পড়ে মৃত্যু বরণ করে। বড় ভাই মারা যাবার পর ছোট ছেলেটি বোঝে এবার তার পালা। তাই তার অসহায় শিশু কণ্ঠে ভীত আর্তনাদ 'আমি নিঘঘাত পড়ে যাব। মরে যাব আমি।' (এ.এ.গ./৫৯৩) কোন এক অদৃশ্য স্রষ্টার কাছে নিরুপায় শিশুর করুণ অথচ প্রতিকারহীন কাকুতি। মন্তাজ কিন্তু একেবারেই ছিল নির্বাক। তার পাথুরে মুখে তখন নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততা বিরাজ করছে। ছেলের কান্নার উত্তরে রেখাহীন কাঠিন্য তার চোখে মুখে ভর করেছে। কঠিন দারিদ্র্য জীবিকান্বেষী মানুষকে হৃদয়হীন অমানুষিকতার পাথারে নামিয়ে দেয়, 'বাঁশবাজি' তারই নির্মমতার উদাহরণ। হা ভাতের যন্ত্রণায় পাষাণীভূত পিতৃহৃদয় রূপায়ণে লেখক ভাষাশিল্পেও ভাস্কর্য কাঠিন্য সৃজন করেছেন। মন্বন্তরকালীন রুক্ষ বাস্তবতায় মানুষের কোমল অনুভূতিসমূহের পরাজয় ঘটে। মানুষ বিসর্জন দেয় তার মর্যাদা, মহিমা ও মায়ামমতাসহ সকল মানবীয় গুণ, হয়ে ওঠে নির্মম স্বার্থপর, উদরতাড়নায় কাতর প্রবৃত্তির দাস। মানুষের মনুষ্যত্ববোধ ও সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশের জন্য প্রয়োজন সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন পরিবেশ ও সম্মানজনক জীবননির্বাহের সামর্থ্য। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মানসিক অধঃপতন ও জীবনসঙ্কট আমাদের সেই সত্যকেই বারবার মনে করিয়ে দেয়।

পত্রাকারে লিখিত **'শেষ চিঠি'** গল্পটি জীবনের একটি বিষাদ রাগিণী। বেঁচে থাকার নিদারুণ আকুতি ফুটে উঠেছে এ গল্পে। ছায়াসুনিবিড় নিশীথ-শীতল গ্রামের ভেতর লুকিয়ে আছে অনাহারের হাঁ করা বিকট কঙ্কাল। সহায়-সম্বল ভিটে মাটি আশ্রয়হীন মানুষগুলো এক মুঠো খাবারের জন্য রোগ-শোককেও তুচ্ছ মনে করে। বিশাল বিস্তৃত মাঠের ধান গাছগুলোর ওপরে যখন কমলা রঙ্গের সূর্যের আভাস ঢেউ খেলে যায় তখন অপূর্ব নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের সূচনা হয়। কিন্তু সুন্দরের আড়ালে যে অতি বিকটাকার কঙ্কাল থাকে তাকে সহজে কেউ দেখে না। ধানসঞ্চয়ীদের ধনভাণ্ডার আরো বিরাটাকার হয় সোনালি ধানের ঐশ্বর্যে। সুদখোরদের সুদ খাওয়া থেমে নেই, ঘুষখোর মহাজনদের ঘুষ খাওয়াও চলছে মহা উদ্যমে। শুধু 'চারিদিকে দুর্ভিক্ষের শূন্যতা হাই তুলে আছে'। 'আর নির্দোষ কন্যার সতীত্বহানির নিস্পন্দ সাক্ষী হচ্ছে বাপ-মা'। দুঃখ বিষাদের সমান্তরাল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'শেষচিঠি' গল্পে। আড়তের গুদামে স্তূপীকৃত হওয়া চাল ঘুষখোর, সুদখোর মহাজনদের স্বার্থান্ধ কলহবিবাদের ফলে বুভুক্ষুদের কাছে এসে পৌঁছায় না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর দুর্বল মানুষরা পথ চলে টলতে টলতে,মরতে মরতে। সেই পথেই হয়তো কেউ যাচ্ছে মোটরে হাওয়া খেতে খেতে কোন স্ফূর্তির জায়গায়। মুমূর্ষু রোগীর স্বজনরা এ

দোকানে সে দোকানে ওষুধ খুঁজে মরছে। কিন্তু সে জানে না ওষুধ পাচার হয়ে যাচ্ছে কোন চোরাগলির পথে। ভয়ার্ত করুণ পিছু ছুটে ধরে ফেলা কয়েদীর মতো বৃদ্ধের প্রশ্নবাণে হতবিহ্বল পত্রলেখক। কেন তার হাতে ছয়টি আঙ্গুল নেই? কেন তার পাঁচ ছেলে মারা যাবার পর সে তাদের সঙ্গে যেতে পারল না? যেতে পারলে হয়তো পাঁচটি আঙ্গুলের সাথে সাথে ছয়টি আঙ্গুলের গোনাও শেষ হয়ে যেতো। অসহায় বৃদ্ধপিতার চোখে বিবর্ণ দৃষ্টি দারিদ্র্যের মতই ম্লান। অসহায় জীবনের আরেক চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় গল্পের শেষাংশে এসে। বৃদ্ধ মা তার মৃত সন্তানকে বুকে ধরে রেখেছে। দারিদ্র্যের ভয়াবহ চিত্র দেখে বিমূঢ় পত্র লেখক। শরীরের দুটো হাড়ের কোনটি হাতের আর কোনটি পায়ের? বৃদ্ধ মায়ের চামড়ার নিচে অস্তিত্বমান কোন হাড়ের সাথে তার মৃত ছেলের হাড়ের মিল খায়? হতবিহ্বল পত্র লেখকের কাছে এ প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। ধর্মের চেয়ে মৃত্যুকে যাদের ভয় বেশি তেমনি এক নারী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃসহ ক্ষুধাকে জয় করতে সে গিয়েছিল ফড়ে দালালের হাতে রপ্তানি হতে। কিন্তু এখানেও বিধি বাম। মাংসহীন শরীর বাতিল হয়ে যায়। তাছাড়া দুধের শিশুকে নিয়ে ভিক্ষে করা সাজে, ব্যবসা করা সাজে না। নবীন কালী কেড়ে খেতে খেতে এখন বিধ্বস্ত, অবসন্ন, পরীজানকে হাটে বিক্রি করে তার মা এখন উন্মাদিনী। প্রত্যেক রবি-মঙ্গলের হাটে যায় যদি তার মেয়েটি ভুল করে ফিরে আসে। অনাহারে জর্জরিত বিনোদা নিজের কম্বলখানি বাপকে দিয়ে দেয় পরম মমতায়। পত্রলেখক তার প্রেমিকাকে একবার অনুরোধ করে এসব ভয়াবহ অসহনীয় চিত্র দেখে যাবার। কারণ তিনি মনে করেন, এসব উদ্ধত দরিদ্রতার মাঝে প্রেমের কবিতা রচনা নিতান্ত বাতুলতা মাত্র। তিনি আরো উপলব্ধি করেন, প্রেমিকার মুখের ওপর এসে পড়া চাঁদের আলোর সাথে সাদা মৃত মানুষের ওপর এসে পড়া চাঁদের আলোর কত যোজন পার্থক্য।

‘যতন বিবি’ গল্পসংকলনের ষষ্ঠ গল্প ‘শেষচিঠি’ স্বতন্ত্র আঙ্গিকে লিখিত। গল্পে স্বেচ্ছাসেবী দলের একজন সদস্য তার প্রেমিকার কাছে চিঠির মাধ্যমে একটি গ্রামের দুর্ভিক্ষচিত্র বর্ণনা করেছে। অন্যান্য গল্পের আঙ্গিকের সঙ্গে এখানেই ‘শেষ চিঠি’ গল্পের আঙ্গিক পরিকল্পনায় পার্থক্য লক্ষ করা যায়। ‘শেষ চিঠি’ গল্পে একটি সুন্দর গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অসহায়, বুভুক্ষু, নির্যাতিত মানুষের পরাহত জীবনের করুণ চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে যা মানুষকে শুধু বেদনাক্রান্ত করে তোলে না, কৃত্রিম মানবসভ্যতার দিক থেকে নিজেকে সরিয়ে আনে দুঃখাহত মানুষের পাশে। গল্পের শুরুতেই লেখক গ্রামের রূপ বর্ণনা করেছেন অনেকটা আক্ষেপের সুরে -

‘এমন কমলারঙের সূর্য, ধানের রঙের আকাশ, স্বচ্ছন্দ কামনার মতো নদী - ইটকাঠ লোহালক্কড় আর গুলি - বারুদের পর দস্তুর মতো শিহরণ আনে। কিন্তু সুন্দর মুখের নিচে যে বিকট কঙ্কাল আছে হাঁ করে, তা আমরা সহজে দেখি কই?’ (য.বি./৮৫)

স্বেচ্ছাসেবী তরুণ অন্য একজন সঙ্গীর সঙ্গে লরিতে কিছু কম্বল, কুইনাইন আর কলেরার ইনজেকশন নিয়ে গ্রামে প্রবেশের পর একদিকে জোতদার শ্রেণির শোষণ ও অন্যায় অন্যদিকে বঞ্চিত,

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের অবস্থা দেখার পর তার মধ্যে জন্ম নিয়েছে নতুন চৈতন্যবোধের। গল্পে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে মন্বন্তরের ভয়াবহ অভাবের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বিভিন্ন চরিত্র উপস্থাপনে দুর্ভিক্ষের ভিন্ন ভিন্ন চিত্র উপস্থাপনের পূর্বে লেখক গ্রামের অবস্থার যে বর্ণনা দিয়েছেন তার চিত্ররূপ এখানে নির্দেশ করা যায়।

'বাঘের হাই দেখেছ? তেমনি চারদিকে দুর্ভিক্ষের শূন্যতা হাই তুলে আছে। ...
এত ধান যে সঞ্চয়ীদের লুব্ধ ভাণ্ডার আবার স্ফীতকায় হয়ে উঠেছে। এত ধান তবু এত ক্ষুধা!...নির্দোষ কন্যার সতীত্বহানির নিস্পন্দ সাক্ষী হচ্ছে তার বাপ-মা। মোটরে করে চলেছে কোনো ফূর্তির জায়গায়, সে-রাস্তায় তোমারই চোখের সামনে টলতে-টলতে পড়ে মরে যাচ্ছে চলমান বুভুক্ষুরা। ...
আড়তে গুদামে গাদা হয়ে আছে চাল, অথচ চালুনির সঙ্গে ছুঁচের ঝগড়া বলে সে-চাল তোমার ধুচুনিতে এসে পৌঁছুচ্ছে না।'-(য.বি./৮৭) দুর্ভিক্ষের প্রথম কাহিনী বর্ণিত হয়েছে পাঁচ সন্তানহারা ব্যথাতুর একজন বৃদ্ধের। তার পাঁচ সন্তানের দুর্ভিক্ষে অকালমৃত্যু হওয়ার পর সে অর্ধ উন্মাদ। সে গাছের তলায় বসে বাঁ হাতের পাঁচটা আঙুল গুনে মৃত ছেলেদের সংখ্যা হিসেব করে। কারুর সঙ্গে দেখা হলে সে জিজ্ঞেস করে, হাতে ছটা আঙুল হয়নি কেন, তাহলে সে-ও যেতে পারত ছেলেদের সঙ্গে।

গল্পে দ্বিতীয় বর্ণনা শুরু হয়েছে ইদু গাজীর জীবন-কাহিনীকে কেন্দ্র করে। সে বর্গায় চাষ করত কোনো এক সমাদ্দারের জমি। মালিকের লোক মাঠের সব ধান কেটে নিয়ে গেলেও তার ভাগ্যে কিছু পড়েনি। সমাদ্দারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে মামলা করলেও মামলার দিন দুর্বল শরীর নিয়ে আদালতে উপস্থিত হতে পারেনি, রাস্তায় পড়ে গেছে ভিরমি খেয়ে। এক সপ্তায় সে শুধু লালআলু খেয়ে ক্ষুধানিবৃত্তির চেষ্টা করেছে। স্বেচ্ছাসেবীর ইদু গাজীর দিকে দৃষ্টিপাত করে মনে হয়েছে 'নিধানী মাঠের হলুদ উলঙ্গতা তার শরীরে, তার দৃষ্টির রূঢ়তায়।' সে তাদের কাছে খাবার প্রার্থনা করলে তার সঙ্গী শ্লেষের মধ্যে দিয়ে উচ্চারণ করেছে খাবারের মধ্যে ওষুধ আছে, সে খেতে চাইলে তাকে ওষুধ দিতে পারে। ইদু গাজী বলেছে, তাই দিন না। এমন কোনো ওষুধ নেই যা একটুখানি খেয়েই অনেক দিনের খিদে ভোলা যায়?'
আসন্ন সন্ধ্যার বর্ণনা লেখক দিয়েছেন নিম্নোক্ত রূপেঃ

'রক্তাক্ত ক্ষতের মতো দেখাচ্ছে এখন আকাশকে, স্তব্ধতার মাকড়শা জাল বুনে চলেছে শূন্যে।'
গল্পে তৃতীয় বর্ণনা এক বৃদ্ধার হৃদয়বিদারক ঘটনাকেন্দ্রিক। এক বৃদ্ধা তার মৃত শিশুকে বুকের মধ্যে পরম স্নেহে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। এক শেয়াল তার মৃতদেহ ছিন্নভিন্ন করে মাংস ভক্ষণ করার পর সে শুধু সন্তানের দুটো হাড় নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে পড়েছিল। স্বেচ্ছাসেবী তার কাছে যাওয়ার পর সে উদাসীন চোখের দৃষ্টি মেলে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমার গায়ের চামড়া ছিলে ফেলে দেখাতে পারো একবার

এ দুটো হাড় আমার কোন হাড়ের সঙ্গে মিল খায়?' লেখক এই নারীর বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নোক্ত ভাবে–'জ্বলন্ত কয়লার মতো দুটো চোখ, সে চোখে বার্ধক্য লেখা নেই, লেখা আছে বা অস্তমিত যৌবনের স্তিমিত ভস্মাভা।'

গল্পে চতুর্থ বর্ণনা এক বিগতযৌবনা নারীর। সে তার শিশুপুত্রের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্যে নিজেকে বিক্রি করতে চেয়েছিল। প্রতিদিন দুর্ভিক্ষ পীড়িত এ গ্রামে ফড়ে আসে নৌকো নিয়ে মেয়েদের কুড়িয়ে নিতে, লেখক নিমগাছের উপমার সঙ্গে এই নারীর বর্ণনা দিয়েছেন-

'উলঙ্গ মৃতদেহের মতো একটা নিস্পত্র নিমগাছ আছে দাঁড়িয়ে। তার তলায় বিষণ্ন একটি নারীমূর্তি।' দিন-মজুরির সন্ধানে স্বামী শহরে চলে যাওয়ার পর সম্বলহীনা এই নারী পাঁচ মাস ভিক্ষে করে ও অন্যান্য উপায়ে দুগ্ধ- পোষ্য শিশুকে নিয়ে দুর্ভিক্ষের করাল ছোবলের মধ্যে কোনক্রমে দিন কাটিয়েছে। অসহায়ত্বের শেষ পর্যায়ে এসে সে চেয়েছিল নিজেকে বিক্রি করতে, কিন্তু সেখান থেকেও ফিরে আসতে হয় জৌলুসহীন দেহের কারণে। গল্পে এই অংশের বর্ণনা থেকে দুর্ভিক্ষের আর এক রূপের পরিচয় পাওয়া যায় -

'তাই সেও গিয়েছিলো আজ খেয়াঘাটে। এইমাত্র বেরিয়ে গেল চালানী নৌকো। না,ধান-বোঝাই ধোলাই নৌকো নয়, মেয়ে-চালানী নৌকো। এখনো শরীরে যাদের মাংসের অবশেষ আছে, আছে বা বয়সের পাণ্ডুলিপি। সেও তাই গিয়েছিলো রপ্তানী হতে। কিন্তু ফড়ে তাকে বাতিল করে দিলে। উদ্ধবের পরিবারের কাতু গেল, নবী সেখের পরিবারের জৌলসি বিবি, হিমচাঁদের মেয়ে দিব্যমণি আর দেনাজখাঁর বোন শহরবাবু। শুধু তার গায়েই নাকি মাংস নেই, নেই নারীদের যৌবনের এতটুকু ছলছলানি।' (য.বি./৯২)

গল্পের পঞ্চম চরিত্র নবীনকালী। যে দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার তাড়নায় ছোট ছোট ছেলেদের ভিক্ষে করা সামগ্রী কেড়ে নিয়ে নিজের ক্ষুধা নিবারণ করেছে। মানুষ কিভাবে তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে অমানুষ হয়ে ওঠে নবীনকালী তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ-যার অসহায়ত্ব বিবেককে করে তোলে শুধু ক্ষুধা নিবারণের যন্ত্র।

পরীজানের দুঃখী মা দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পাঁচবছরের মেয়েকে আতাপুরের হাটে বেচে দিয়েছে একটাকা পঁচিশ পয়সায়। মেয়েকে বিক্রির বেদনা তার সমস্ত হৃদয় ব্যথিত করে পাগলপারা করে তুলেছে। রাক্ষুসী খিদের কাছে পরাজিত হয়েছে তার মানবিকতা, মাতৃত্ব নয়। রবি ও মঙ্গলবার এই দুদিন আতাপুরের হাট বসে। প্রতি সপ্তাহে সে এই দুদিন সকাল থেকে হাট না ভাঙা পর্যন্ত বসে থাকে মেয়ের জন্যে। পরীজান তার মায়ের স্নেহের কথা ভেবে যদি তাকে ডাকে, কেঁদে ওঠে এ জন্যে মায়ের

হৃদয় হাটে এসে সন্ধান করে তার বিক্রিত পাঁচবছরের অসহায় মেয়ের। সে স্বেচ্ছাসেবীর কাছে আকুতি জানিয়ে বলতে ভোলেনি–

‘চাষীরা এঁশে-রোগা গরু বেচে, আর আমি আবাগী, মেয়ে বেচি।

তুমি তো কত দেশ ঘুরবে, দেখো তো কোথাও আমার পরীজানকে দেখ কিনা। যদি দেখ তো, বোলো যে তার মা এখনো রবি-মঙ্গলবার তার জন্যে বসে আছে সেই আতাপুরের হাটে।’ (য.বি./৯৪)

‘দুঃখের কাটালি দিয়ে কাটা, ক্ষুধার রেদা নিয়ে ঘষা। মাংস নেই, রক্তে স্পন্দন নেই। শিরাময় শরীর’- অভয় হাওলীর। ক্ষুধার রাজ্যে যে এক যাযাবর পথিক, ক্ষুধাকে দূর করতে সে চিকিৎসকের কাছে আবেদন করেছে তার পেটের ভেতর থেকে খানিকটা কেটে বাদ দিয়ে দিলে সে একটু দম নিতে পারে। দুঃখীরাম নিজের সৌভাগ্যের সময় দুটো দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধিয়েছিল। দুর্ভিক্ষে তার পাঁজরের অবস্থা হয়েছে উইধরা চটার বেড়ার মত। সে এসেছে দাঁত থেকে সোনার দানা বের করতে, যে-সোনা তার মুখে খানিকটা অন্ন তুলে দিতে সক্ষম হবে।

গল্পের সর্বশেষ চরিত্র তের-চৌদ্দ বছরের কিশোরী বিনোদা। অসুস্থ বাবাকে বাঁচানোর প্রয়োজনে আড়াই আনি মালেকের ডিহিনায়েবের ছোট মুহুরিবাবুর কাছে নিজের সম্ভ্রম বিলিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেনি। কখনো সামান্য পয়সা দিয়ে কখনো বা বিনা পয়সায় তার যৌবন উপভোগ করে তাকে ছিন্নপত্রের মতো মুহুরিবাবু দূরে ফেলে দিয়েছে। একদিকে মানুষের নির্দয়তা, অন্যদিকে দুর্ভিক্ষের আঘাতে বিনোদার বাবার মৃত্যু। বাবার মৃত্যুর সময় তার পরনে কোমর পর্যন্ত শুধু একটা ন্যাকড়া। সম্পূর্ণ ন্যাকড়া দিয়েও সে তার সম্ভ্রম ঢাকতে পারেনি। মৃত পিতার পাশে চালাহীন ঘরে বিমূঢ় হয়ে বসে থাকে কিশোরী বিনোদা। জীবনের শেষ আশ্রয় তার পিতাকেও দুর্ভিক্ষ টেনে নিয়েছে নির্দয়ভাবে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘শেষ চিঠি’- গল্পে দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক বাস্তবচিত্র অঙ্কিত হয়েছে জীবনের বিভিন্ন পরিধিকে কেন্দ্র করে। দুর্ভিক্ষের এমন নিখুঁত চিত্র সাহিত্যে প্রায় বিরল বলা যায়।

পত্রলেখকের প্রেয়সী আর নিরন্ন বুভুক্ষু মানুষের জীবনবোধে যে দুস্তর ব্যবধান-লেখক অচিন্ত্যকুমার তাঁর জীবনচেতনায় সেই দিকটিকেই ধারণ করেছেন গভীর মমতায়। উজ্জ্বল রক্তিমাভা প্রেয়সীর কাছে ‘রোমান্টিসিজমের মোহ মাখানো’ অন্যদিকে অন্নহীন মানুষের কাছে এই প্রতীক ক্ষুধার রঙ্গে রাঙানো। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় অচিন্ত্যকুমারের লেখা সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন এভাবে -‘শহরবাসী মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের আশাভঙ্গ, মোহভঙ্গ ও জীবন সংগ্রামে পরাজয়ের বেদনা, দারিদ্র্যের ঘনকৃষ্ণ পটভূমিতে রোমান্টিকতার লাল রং ফুটে উঠেছিল।...রোমান্টিক স্বপ্নের পাশাপাশি দেখা দিয়েছে দারিদ্র্যের বেদনা। প্রতারিত প্রবঞ্চিতের আর্তি। রূঢ় বঞ্চনার নির্মোহ ছবি।’[১২]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বেশকিছু ছোটগল্পে নারীর ব্যক্তিত্ব, আত্মবোধ, স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য আভাসিত। প্রেমের অকৃত্রিমতায়, নির্ভীকতা ও তেজস্বিতায় তারা স্বভাবগত মাধুর্যের প্রকাশ ঘটিয়েছে। লেখক তাদের প্রাণশক্তির উদ্বোধনে তাদেরই জীবনে ঘটে যাওয়া আনন্দ-বেদনার চিত্র অঙ্কনে প্রয়াসী হয়েছেন। নিজের বাড়ির প্রাঙ্গণে কাব্যের যে অপরূপ সুরভি ফুল ফুটেছিল সেখান থেকেই নারী ব্যক্তিত্বের অম্লান গীতিমালা রচনা করেছেন। চমৎকার বিশেষত্বের এই চরিত্রগুলো তাইতো বস্তুতান্ত্রিক ও মর্মস্পর্শী।

'যশোমতী' গল্পে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর যাপিত জীবনের সাধারণ দিক ফুটে উঠেছে। দরিদ্র পরিবারের গৃহস্বামী শ্রীনিবাস অর্থের কারণে নিজের প্রিয়জনদের বিক্রি করে দেয়। জীবনে অনেকেই অভাববোধে তাড়িত হয়, তবু প্রিয়জনদের বিসর্জন দেয় না, বরং আগলে রাখে। এমনি একটি চরিত্র দুর্গাচরণ। 'গরু বেচে, ধান বেচে, জমি বেচে কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা শোধ দিয়ে দিয়েছে। তবু বিপথে যেতে দেয়নি যশোমতীকে। ভিক্ষুকের অধম হতে দেয় নি।' স্বকীয় অবস্থানে অনড় যশোমতীও তাই নিজের আঙ্গিনা ছেড়ে বিক্রি হয়ে যাওয়া জীবনের পথে পা বাড়ায় নি। কিন্তু অর্থের অভাবে হৃদয়হীন শ্রীনিবাস সন্তানকেও বিক্রি করতে পিছু হটেনি। অভাবের চরমতম অবস্থা মানুষকে কীভাবে অমানুষে পরিণত করে তার প্রকৃষ্টতম প্রমাণ শ্রীনিবাস। কিন্তু জীবনযন্ত্রণায় ক্লান্ত যশোমতী বারবার বিক্রি হতে রাজি নয়। স্বামীত্বের স্বত্ত্ব থেকে বেরিয়ে পড়েছে তার মন মুক্তির দিকে। যে যুক্তি তাকে স্বামীত্বের বেড়াজালে বন্দী হতে বাধ্য করবে না। চিরকালের সধবা যশোমতী তাই সিঁদুর পরাকে বিশেষ কারো স্ত্রী হিসেবে নিজেকে মনে করেনা। সে দুর্গাচরণ কিংবা শ্রীনিবাস-কাবুর নয়। 'কোনো ঘাটেই নোঙর ফেলতে না পেরে সে ডুবেছে পাঁকের মধ্যে।' সাধারণ গৃহবধূর কাছে সে পাক বর্জনীয় পরিবেশ মনে হলেও যশোমতীকে দিয়েছে অনাবিল স্বাধীনতা, মুক্তির অপার আস্বাদ। প্রচলিত বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে প্রবাহিত একজনের এককেন্দ্রিকতা থেকে বহুকেন্দ্রিকতায় সে পেল মুক্তির অবারিত আনন্দ।

দুঃখ দরিদ্রতায় বিপন্ন স্বামী শ্রীনিবাস ও তার স্ত্রী যশোমতীর সঙ্গে সূক্ষ্ম আদর্শগত দ্বন্দ্বের এক কাহিনী বিধৃত হয়েছে 'যশোমতী' গল্পে। সংসারে অভাবের যন্ত্রণায় শ্রীনিবাস স্ত্রী আর সন্তানকে বিক্রি করতে দ্বিধাবোধ করে না। তার কাছে সংসারের সুখ, স্ত্রীর মর্যাদাপূর্ণ পরিচয়, সন্তান বাৎসল্য খুব তুচ্ছ বিষয়। অথচ যশোমতীর কাছে সাংসারিক এই বিষয়গুলো খুবই প্রিয় অনুষঙ্গ। তেজস্বিনী যশোমতী ছেলেকে নির্দ্বিধায় স্নেহহীন জন্মদাতা প্রসঙ্গে বলতে পারে 'যে বাপ ছেলেকে খাওয়াতে পারে না, টাকার জন্য ছেলেকে বিক্রি করে দেয় মুসলমানের কাছে ...সে বাপ বাপই নয়।' (প্রে.গ/৯৬) স্বামীত্বের সব অধিকার বিসর্জন দিয়ে যখন শ্রীনিবাস যশোমতীকে রহমালি আর কাঞ্চনের কাছে বিক্রি করে দেয় তখন একনিষ্ঠ নারীত্বের দায় হতে মুক্ত হতে পারেনি যশোমতী। তাই নিজেকে সঁপে দেয়নি দখলদারদের কাছে। তেজদীপ্ত সাহসী যশোমতী দৃপ্তকণ্ঠে দুর্গাচরণকে বলেছে, 'আমাকে তুই বিয়ে করে ফেললে কেউ আর আমাকে শ্রীনিবাসের বউ বলতে পারবে না। শ্রীনিবাস পারবে না আমাকে বিক্রি করতে, আর করলেও সে বিক্রি টিকবে না, বাতিল হয়ে যাবে।' (প্রে.গ/৯৭) নিজেকে দুর্গাচরণের

কাছে সমর্পণের একটি জোরালো কারণ হল, যশোমতীর প্রতি দুর্গাচরণের সম্মানবোধ। এ বোধের কারণেই দুর্গাচরণ যশোমতীর মান বাঁচিয়েছে বার বার।

রিসিভারবাবু শৈলেশ্বরের কাছে সংসারের আদর্শ সবচেয়ে বড় বিষয়। পরের স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণের বাড়াবাড়ি তার কাছে বিপথগামিতারই নামান্তর। তাই দুর্গাচরণের ভয়হীন, লজ্জাহীন নিঃসঙ্কোচ স্বীকৃতি তাকে হতবুদ্ধি করে দেয়। তার মনে হয় স্বামী শ্রীনিবাস যতই দুর্বল আর বিবেকহীন হোক না কেন, তাকে তার স্ত্রী পুত্রকে ফিরিয়ে দেয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এত কিছু ঘটে যাবার পরও শৈলেশ্বরের মনে কৌতূহলের সৃষ্টি হয় যশোমতীর বাহ্যিক সৌন্দর্য নিয়ে। যার আত্মিক সৌন্দর্য অগ্নিময় তেজে পরিপূর্ণ সে সুন্দর না হয়ে যায় না। তবে ভাবনার বিষয় এটাই যে এই সৌন্দর্য কি শ্রীনিবাস বুঝবে? সে কি অনুভব করতে পারবে যশোমতীর অন্তঃস্থলের তীব্র জ্বালাময় তেজের উত্তাপ? লেখক যশোমতীর ফিরে আসার সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–'কিন্তু তার কপালে সিঁদুর, ডগডগে সিঁদুর। ঐটেই তার তেজ। আর তার চোখে ও কি জল? না ঐটেই তার অপূর্ব জ্বালা। জয়ী হয়েছেন শৈলেশ্বর। অনুতপ্ত হয়ে যশোমতী তার স্বামীর আশ্রয়ে আনুগত্যের অভিজ্ঞান নিয়ে ফিরে এসেছে। তবু এ সৌন্দর্য আস্বাদ করে, এ যোগ্যতা শ্রীনিবাসের নেই, হয়তো অধিকারও নেই।' (প্রে.গ./১০০)যশোমতীর কপালের ঐ সিঁদুর তার ভেতরে বহ্নিজ্বালাময় তেজেরই প্রতিবিম্ব। এ তেজ সাহস, আদর্শ আর অন্যায়ের কাছে মাথা না নোয়াবার দীপ্তিময় অঙ্গীকার। আর চোখের জল অন্তরের খুব গভীর থেকে উঠে আসা মনোযন্ত্রণার বাহ্যিক প্রকাশ।

অধিকারবিহীন, ভালোবাসাহীন, স্বামী ও সংসারের দায় থেকে মুক্ত হবার মানসে যশোমতী প্রবেশ করেছে অন্য জগতে। লেখক নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বলেছেন–'তাছাড়া কোথায় আর যেতে পারে যশোমতী। কোথায় গিয়ে সে মুক্তি পেতে পারে স্বত্বহীন স্বামিত্বের দাবি থেকে? জমিদার আর পুলিশ তার জন্যে আর কোথায় জায়গা রেখেছে, আর কোথায় তার আশ্রয়। তাড়া-খাওয়া ইঁদুরের মত সে ঢুকে পড়েছে আঁস্তাকুড়ে।...কিন্তু সে মুক্ত। সে অধরা। তাকে আর কেউ ধরে রাখতে পারে না।' (প্রে.গ./১০০)

যশোমতী মুক্তি পেতে চায়, ধরা দিতে চায় ভালোবাসার চিরন্তন রূপের কাছে। চিরকালের সধবা যশোমতী নিজেকে স্ত্রীত্বের অধিকার থেকে মুক্ত করে বন্দী হয়েছে দুর্গাচরণের মানবিক জীবনবোধের জালে। ব্যভিচারিণী নয় বরং ভালোবাসার সম্মান আকাঙ্ক্ষী এক নারীর চিত্র সুনিপুণ ভাবে অঙ্কিত হয়েছে 'যশোমতী' গল্পে। এখানে প্রেম রূপায়িত হয়েছে একটু ভিন্ন মাত্রার আলোকে। বিবাহিতা নারী মাত্রই সংস্কারের অধীন-এ ধারণাকে ভ্রূকুটি দেখিয়ে যশোমতী সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ভালবাসার চিরকালীন জীবনচৈতন্যে নিজেকে উদ্দীপ্ত করেছে। ভালোবাসাহীন সংস্কারাবদ্ধ জীবনের চেয়ে ভালোবাসাময় অন্য জীবন তার কাছে অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষিত। তাই সে প্রথাগত নিয়মকে ভেঙ্গে নিজেকে সমর্পিত করেছে প্রেমের অসীমতায়।

অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পে তাঁর অবস্থান দৃষ্টিগোচর হয় প্রবল জীবনানুরাগী হিসেবে। গল্পের রূপবৈচিত্র্য আর বক্তব্য দুয়ের প্রতিই তাঁর দুর্নিবার ঝোঁক। স্বামী পরিত্যক্তা নারীর জীবনের শূন্যতা, ব্যর্থ ও বঞ্চিত নারীর স্নেহ তৃষিত অন্তরের রিক্ততা, জীবনে না পাওয়ার অপূর্ণতা প্রভৃতি বিষয়গুলো তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। আধুনিক মননের অধিকারী যশোমতীকে সনাতনী মূল্যবোধ বেঁধে রাখতে পারেনি। তার প্রধান কারণ, যশোমতীর অর্থহীন ও ভালবাসাহীন বন্ধনের প্রতি ভীষণ অনাসক্তি। অযাচিত বন্ধন নয় বরং অন্তর্গত ভালবাসার বন্ধনহীন মুক্ত জীবনই বেঁচে থাকার মূলমন্ত্র- লেখকের জীবনবোধে সে বাণীই গীত হয়েছে স্নিগ্ধসুরে।

১৩৬৯ সালে প্রকাশিত **'মা নিষাদ'** গল্পের প্রেক্ষাপট একটু ভিন্ন রকমের, যা সাধারণের বোধগম্যের অন্তরালে প্রবাহিত। অবসরপ্রাপ্ত শিবদাস জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন চাকুরি করে। বাড়ি করেছেন, দুটো ছেলেকে ভালোভাবে মানুষ করেছেন। শুধু নিজের কর্মহীন অবসর সময়টুকু কারো সঙ্গে ভাগাভাগি করতে পারেন নি। নিদ্রাপ্রিয় গৃহলক্ষ্মীর নিষ্ঠুর মুখরতায় ঘরে ফেরারও সাহস পেতেন না তিনি। অবসর পরবর্তী জীবনও কাটাতে চেয়েছিলেন কর্মনিষ্ঠায় কিন্তু বিধি বাম। বন্ধু নরহরির কাছে সময় কাটাতে গেলে এক অদ্ভুত প্রস্তাবের সম্মুখীন হন। 'একটি বিষণ্ন সন্ধ্যা রমণীয় করে তুলবেন?' নরহরির এ প্রশ্নের উত্তরে শিবদাস বিব্রত বোধ করে।

সংসারে মানবমনের জীবনবাসনা বিচিত্র ভাবে নিরূপিত হয়। নরহরির প্রস্তাবে শিবদাসের মন সায় দেয় আবার বের হবার জন্য একটা তুচ্ছ কারণও খোঁজে, নইলে যাত্রাটাই যে পানসে হয়ে যাবে। তাইতো স্ত্রী বিভাবরী যখন মুখিয়ে উঠে বলল -'যাওনা দুদণ্ড ঘুরে এস না,' তখন 'যেন কত অনিচ্ছা এমনি ক্লিষ্ট করছে চোখমুখ' করে বেরিয়ে গেল। যেন, 'এ ছলনাটুকুতেও কত রঙ কত রহস্য'। নরহরির গাড়িতে প্রথম দেখা হয় অনীতা চক্রবর্তীর সঙ্গে। কথা শেষে মেয়েটির জন্য ভেতরে ভেতরে মমতা অনুভব করে। খুব জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, 'ঐ পাষণ্ড নরহরি তোমাকে কোথায় পেলে? কী করে তুমি ওর সংস্রবে এলে আর কোন অতল অধঃপাতে ও তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে?' এক পর্যায়ে মেয়েটির হাতে শিবদাস কুড়ি টাকা দিলে নরহরি নিন্দা করে। কিন্তু মেয়েটি তার অভাব-অনটনের কথা অকপটে তুলে ধরে। প্রচণ্ড অর্থকষ্টে সংসারজীবনের চাকা যেন আর ঘোরে না। ছোট ভাইটির পরীক্ষার ফিস নেই, ঘরে অথর্ব বুড়ো বাবা, যেন বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছে জীবনের নিষ্করুণ দুরবস্থা। শিবদাসের প্রতি কৃতজ্ঞ অনীতা শিবদাসের ছেলেকে বিয়ে করেনি। আদর্শবোধে দৃঢ় মানসিকতার অধিকারী অনীতার তাই দৃপ্ত উচ্চারণ 'আমি এক বাড়িতে দু'জনের হয়ে থাকতে পারব না কিছুতেই।' সংসারের এত হা করা অভাবের মধ্যেও নিজের বোধটুকুকে সে জলাঞ্জলি দেয়নি। গোপনীয় বিষয়কে আড়াল করে ইচ্ছে করলে বিয়েতে রাজি হতে পারতো। কিন্তু বিবেকের কাছে বাধা অনীতা সত্যবোধে উজ্জ্বল থেকেছে ব্যক্তিত্বের মহিমায়।

'নিঃসঙ্গতা' কীভাবে একজন মানুষকে তার বহু বছরের আচরিত অভ্যস্ত জীবনকে অন্যপথে ধাবিত হতে প্রভাবিত করে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'মা নিষাদ' গল্পটি। এ গল্পে স্ত্রীর তাচ্ছিল্য ও অবহেলা নিরীহ শিবদাসকে মর্মাহত করে, অসম্মানিত করে। স্বামী ও স্ত্রী একই সঙ্গে অনেক দিন কাটালেও বোধকরি হৃদয়ের স্পর্শে অনেকেই

স্পর্শিত হয় না। বিয়ে সামাজিত প্রথা বা বন্ধন হলেও তাতে আত্মিক সম্পর্কের একটা প্রগাঢ় বন্ধন বিদ্যমান। সেখানে থাকে প্রেম, মমতা, নির্ভরতা ও পারস্পরিক সম্মানবোধ। যখন এই বিবিধবোধের বিষয়গুলোর সূত্রের মধ্যে টানাপোড়েন তৈরি হয় তখনই মানবহৃদয় অন্যত্র খোঁজে নির্ভরতা আর প্রশান্তিময় স্থান। একটুখানি স্বস্তি কিংবা ভালবাসা প্রত্যাশী মানবমন শান্তি প্রাপ্তির যৌক্তিক অযৌক্তিকতা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয় না।

রিটায়ার করার পর শিবদাস, স্ত্রী বিভাবতীর কটূক্তি আর তাচ্ছিল্যে ম্রিয়মান হয়ে দিনের পর দিন কাটিয়েছে। অসময়ে বাড়ি ফিরতে কুণ্ঠাবোধ করেছে, অপ্রস্তুত হয়েছে, তবু কখনো এতটুকু ভালোবাসার বাণী পায়নি বিভাবতীর কাছে। লেখকের বর্ণনায় বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে এভাবে–'আরও একদিন দুপুরে বেরিয়ে দুটো তিনটের মধ্যে ফিরেছিল শিবদাস। আঁচল লুটোতে লুটোতে উঠে এসেছিল বিভাবতী। দরজা খুলে দিয়ে বলেছিল, 'এরই মধ্যে হয়ে গেল?'

সে কী লজ্জা, এরই মধ্যে হয়ে যাওয়া! চারটে পাঁচটার আগেই বাড়ি ফিরে আসা। দরজাটা ফের বন্ধ করতে করতে বিভাবতী বলেছিল, 'আমার ঘুমটা নষ্ট করে দিল! একেবারে চারটে বাজিয়ে বাড়ি ফেরা যেত না?' (এ.এ.গ./১৪৯) কিংকর্তব্যবিমূঢ় রিটায়ার্ড শিবদাস। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লেখাপড়ার কাজ করার বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হলে হতাশ হয়ে যায়। ব্যথিত অন্তরের লুকানো কথাগুলো বেরিয়ে পড়ে মুখবিবর থেকে। বলে–'দুপুরে জেগে থেকে কাজ করব? তা হলে ও পক্ষ ঘুমুবেন কী করে? খুটখাট হবে, কাগজ ওলটাবার খসখস, হয়তো একবার চেয়ারটাকে টানলাম টেবিলের কাছে–আর কথা নেই, অমনি ভস্ম থেকে হুতাশন জেগে উঠবেন। তা ছাড়া যাতে আলো না আসে জানালাগুলোও তো বন্ধ করে দেবেন। করুন আপনার লেখাপড়া। সুতরাং জাগ্রত লোকটাকে ঘুমন্ত করে ছাড়বেন। আমাদের রিটায়ারমেন্ট আছে, ওদের তো রিটায়ারমেন্ট নেই। না ঘুম থেকে, না বা রসনা থেকে।' (এ.এ.গ./১৫১)

কর্কশ সুরের অধিকারী বিভাবতী সন্ধ্যে বেলাতেও তাঁর পঞ্চমস্বর ঝংকৃত হয় স্বামী শিবদাসের প্রতি। মমতা আর ভালোবাসা এ নিষ্করুণ নারীর চরিত্রে অনুপস্থিত। চিরায়ত নারী চরিত্রের স্নেহ প্রবণতা এখানে তিরোহিত। তার বাক্যবিন্যাসে সে প্রমাণই স্পষ্ট মেলে। 'সন্ধ্যেবেলা ঘরের মধ্যে বসে আছ কী গুম হয়ে? ঝামটা দিয়ে ওঠে বিভাবতী, যাও না, দু দণ্ড ঘুরে এস না। ... কী আশ্চর্য, এখন আমি স্নান করে এসে সারা গায়ে-পিঠে পাউডার মাখব।' বিভাবতী হুংকার করে উঠল, 'তোমার জ্বালায় আমার কি একটু প্রাইভেসিও থাকতে নেই?' 'আহা, কী গোপন করে রাখবার মত সম্পত্তি!' বিনা তর্কেই বেরিয়ে গেল শিবদাস' বন্ধুহীন, একাকী পথচারী শিবদাস নৈঃসঙ্গ্যচেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে ভাবে– 'এখন বাড়ি না ফিরলে কেমন হয়? যদি আরেকটা কোন ঘর থাকত। আরেকটা কোন বিশ্রাম। আরেকটা কোন ঘনিষ্টতা। যেখানে বেকারত্বের ক্ষমা আছে বার্ধক্যেরও প্রশ্রয় আছে। আছে সমস্ত আলস্যের অভিনন্দন। হায়, সে মরীচিকাই বা কোথায়? অন্বেষণের অভ্যাস বাঁচিয়ে না রাখলে

মরীচিকার পিছনেও ছোটা যায় না। ডাক্তার ঠিকই বলে, জীবনে সিদ্ধ হতে হলে একটি নিষিদ্ধাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। কোথায় সেই নিষিদ্ধা?' (এ.এ.গ./১৫১)

শিবদাসের জীবনতৃষ্ণার এমন অনুভূতি প্রত্যেক নিঃসঙ্গ মানুষের অন্তরের বাণীমূর্তি, করুণ আর্তি। জীবনের একটি পর্যায়ে মানুষ জৈবিকচেতনায় প্রণোদিত না হয়ে আত্মিকচেতনায় প্রণোদিত হয়। আর সে সময় হল বার্ধক্য। হৃদয়ের বেদনাকে উপলব্ধি করে যে শান্তির বাণী শোনাতে পারে, প্রয়োজন হয় সে-ই বন্ধুর। এ বন্ধু অনেকেই হতে পারে–স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে কিংবা অন্যকোন নারী বা পুরুষ– যারা বয়সের সীমারেখায় আবদ্ধ হয়ে থাকবে না। মাঝে মাঝে রঙ্গিন স্বপ্ন কল্পনায় নিজেকে ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে করে শিবদাসের। একাকী মনে স্বপ্নেরা ভিড় না করলে হয়তো বেঁচে থাকাটাই কঠিন হয়ে যেত তার। সে ভাবে 'যদি একটা নাতি থাকত, এখুনি, অসময়েই, খুলে দিত দরজা। হ্যাঁ, বয়সে নিতান্ত ছোটই হবে সে, কিন্তু অত্যন্ত দুরন্ত বলে ঘুমুত না সে দুপুরে। হয়তো হাত বাড়িয়ে খিলের নাগাল পেত না, কিন্তু দুষ্টু ছেলে, ঠিক একটা টুল এনে, তার উপর দাঁড়িয়ে খিল ধরত। আর হাসত খিলখিল করে।

কতদিনে এত বড় নাতি হবে তার! নিজের মনেই হেসে উঠল শিবদাস। নাতি না হোক বড় ছেলের বউ তো হতে পারত। সংসারে আর এক বন্দী বাসিন্দে। সে নিশ্চয়ই তার শাশুড়ির মত বিরুদ্ধ- বিমুখ হত না। নিঃশব্দে উঠে এসে আরও নিঃশব্দে খুলে দিত দরজা। শাশুড়ি যে ঘুমে সেই ঘুমে। জানতেও পেত না ঘুণাক্ষরে।' (এ.এ.গ./১৫১) হৃদয়ের সীমানায় কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাড়া না পেয়ে আর স্ত্রী বিভাবতীর অগ্নিময় নির্দয় আচরণে শিবদাস নরহরির 'ভিন্ন প্রস্তাবে' সম্মতি জ্ঞাপন করে, যার সামাজিক বা পারিবারিক প্রথায় কোন সম্মানজনক অবস্থান নেই।

অনীতা চক্রবর্তী নিষ্ঠুর অভাবের কষাঘাতে বিপর্যস্ত এক নারী। সংসারের বহু সদস্যের মুখে আহার জোগাবার জন্য সমাজ কর্তৃক গৃহীত 'বাঁকা পথে' নেমেছে সে। শিবদাস অনীতার প্রতি প্রেমাচ্ছন্ন নয় বরং সহানুভূতিশীল। প্রথম দর্শনে তার মনে হল 'মেয়েটি এত সুশ্রী, এত ভদ্র, এত পরিচ্ছন্ন দেখতে। বড় বড় চোখদুটিতে ভয় আর বিষাদ ছাড়াও আরেকটা কী আছে, যা ভয় আর বিষাদও মুছে দিতে পারে নি। আর গলার স্বর কী অকৃত্রিম কোমল! যেখানে গাছ নেই, পাখি নেই, সেখানে এমন কণ্ঠস্বর ও কার কাছ থেকে শিখল?' (এ.এ.গ./১৫৫)

সহানুভূতিশীলতা ও সহমর্মিতা জৈবিক জীবনবাসনাকে পরাজিত করে স্নিগ্ধ মমতার পরিবেশ তৈরি করে। যেখানে মায়াপ্রীতিডোরে আবদ্ধ থেকে মানবমনকে পৌঁছে দেয় তৃপ্তিময় ভালোলাগায়। আর এই বিষয়গুলোই মানুষকে তার শক্ত অবস্থানে দাঁড় করাতে সহায়তা করে। তাই গল্পের প্রায় শেষ পর্যায়ে অনীতার হাতে চুপিসারে টাকা গুঁজে দেয়ায় শিবদাসের মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আর কৃতজ্ঞতাবোধে নমনীয় অনীতা শেষ সংলাপে একটি বাক্যের অবতারণা করে অসামান্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। শিবদাস আর অনীতার প্রথম

পরিচয়ের অন্তর্নিহিত বিষয় আর পরিণতিতে দৃশ্যমান বিষয়ে যোজন পার্থক্য বিরাজিত। ভোগ লিপ্সার পরিণতি স্নেহপরায়ণতায় বিলীন হওয়ায় কৃতজ্ঞ অনীতা শিবদাসের মানবিক মূল্যবোধে বিস্ময়াবিষ্ট। অন্যদিকে তারই ছেলেকে বিয়ে করে পরিপূর্ণভাবে স্বামী অন্তঃপ্রাণ হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। আর সে কারণেই অনীতার মুখে উচ্চারিত হয়, 'না, তা হয় না। মুখ আরও ডুবিয়ে দিয়ে অনীতা বললে, 'আমি এক বাড়িতে দুজনের হয়ে থাকতে পারব না কিছুতেই।' (এ.এ.গ./১৫৭)

কিছু কিছু উদ্ধৃতি গল্পটির জীবনস্পন্দনে যুক্ত করেছে অনন্য শিল্পমাত্রা। যেমন–

ক. 'জীবন একটা পেয়েছি এই শুধু হিসেবে আছে, কে চালাচ্ছে তার খবরে কী দরকার।' (এ.এ.গ./১৫৪)

খ. 'সব কিছুর থেকে রিটায়ার করলেও আকাঙ্ক্ষার থেকে রিটায়ারমেন্ট নেই।' (এ.এ.গ./১৫৩)

গ. 'একমাত্র দারিদ্র্যই খারাপ। একমাত্র দারিদ্র্যকেই খারাপ বলি।' (এ.এ.গ./১৫২)

ঘ. 'দড়িছেঁড়া গরু আবার গোয়ালের দিকেই ফিরে চলল।' –(এ.এ.গ./১৫১)

মনুষ্যত্ববোধের পরিচর্যা গল্পের শেষ পর্যায়ে অত্যন্ত প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে। নিঃসঙ্গতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেও ভোগস্পৃহার বিমুখতা শিবদাসকে সম্মানিত করেছে। আর অনীতার নিজের অবস্থান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকায় সম্মানিত হয়েছে শিবদাসের মতোই। শিবদাসের মনের নৈঃসঙ্গ্যচেতনাকে ব্যাধের মত শিকার করে অনীতা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে 'মা নিষাদ'-এ। এখানে উদগ্র দারিদ্র্যের নিকষকালো অন্ধকারের সাথে লড়াই করে পেরে না উঠে অন্ধকারের হাত ধরে পথ চলা তরুণীর জীবনসঙ্কট পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে। বিপন্ন অনীতা তারপরও আগলে রেখেছে নিজের প্রাণময় সত্তাকে, যা তার জীবনসুষমাকে করেছে সমৃদ্ধ, সম্মানিত।

'এক অঙ্গে এত রূপ' গল্পগ্রন্থের **'শ্রেয়সী'** শিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্ক দুটি নরনারীর অভিমান অনুরাগের সুরে গ্রথিত একটি চমৎকার গল্প। এখানে পূরবী ও সুখেন্দুর পরিণত মানসের রোমান্টিকতা অত্যন্ত পরিমিতবোধে উদ্দীপ্ত। অপরিণত কাঁচা প্রেম রূপঅনুসন্ধানী। রূপের মোহময়তায় আচ্ছন্ন হতে চায় প্রেম পিয়াসীর মন। কিন্তু সুখেন্দু উপলব্ধি করে-'মেধা, বিদ্যা বা প্রতিভা কি রূপ নয়? তার স্বাধীন ব্যক্তিত্ব তার কঠোর কর্মশক্তি এসব কি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে না? এসব কি নয় আস্বাদের উপযুক্ত?' (এ.অ.এ.রূ./৫৬)

গল্পের বিভিন্ন জায়গায় সুখেন্দুর অনুভূতির মধ্য দিয়ে তার উদার অথচ রোমান্টিক মানসিকতার পরিচয় বিধৃত হয়েছে। যেমন–

ক. 'নিয়মে একটু নির্মম না হ'লে জীবনে লাবণ্য থাকে না'। (এ.অ.এ.রূ./৫৪)

খ. 'সুখকে বেশি কাছে ঘেঁষতে না দেওয়াই সুখ। একটু দূরে-দূরেই তো ভালো, মন জায়গা পাবে ওড়বার'। (এ.অ.এ.রূ./৫৬)

গ. 'রূপের জাদুর চেয়ে বিদ্যার জাদু যে কম নয়'। (এ.অ.এ.রূ./৫৬

ঘ. 'সুখের চেয়ে শান্তি বড়ো। মনের চেয়ে মান। সবার উপরে ডিসিপ্লিন'। (এ.অ.এ.রূ./৫৮)

শিক্ষিত দুজন নর-নারীর জীবনবোধে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়টি নানাভাবে তাদের পারিপার্শ্বিকতায় স্পষ্ট প্রভাব ফেলেছে। কনে দেখার গভীর অনুভূতিতে সুখেন্দু শুধু কনের রূপৈশ্বর্য অবলোকন করেনি, সেখানে গভীর শ্রদ্ধার সাথে অনুভূত হয়েছে শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা। সুখেন্দুর কাছে পূরবী 'শ্যামলা, রোগাটে, রুক্ষ, ঋজু। বেশ একটু গম্ভীর, কঠিন। দাঁড়ানো ও চলায় বেশ একটু স্পর্ধা। নিজের পায়ে দাঁড়ানো, নিজের পায়ে চলা। সে স্পর্ধা যেন ঔদ্ধত্য নয়, দীপ্তি। টানা টানা চোখ ক্লান্তিতে ভরা। অনেক পড়া ও রাত জাগার ক্লান্তি। অনেক বা অবদমনের। কাঠে ফুল ফোটাতে পারাই তো ইন্দ্রজাল। শুষ্কে ঝরনা নিয়ে আসা। ধূসরে সবুজের সারল্য। একটি স্বাস্থ্যের ঘুমে ক্লান্তির অপসার।' (এ.অ.এ.রূ./৫৫)

কৈশোর কিংবা উদ্ধত যৌবনের সীমা অতিক্রমকারী সুখেন্দু তাই তার জীবনাচরণে অনেকটা সংযত, অন্তত পূরবীর তাই ধারণা। 'কি রকম যেন ভারিক্কি ভিতু শ্রদ্ধেয় দেখতে। চিঠি দু-একখানা যা লিখেছে সম্বোধনে শূন্য, ফিল আপ-দি গ্যাপ করতে দিলে ছাত্র-ছাত্রীরা তাতে সবিনয় নিবেদন লিখত। এই দেখ না হালের চিঠিটা। কিছুমাত্র ব্যাকুলতা নেই, আগ্রহ আনন্দ নেই। যেন আইনের ভাষায় স্থির ও সংযত একটা বিজ্ঞপ্তি মাত্র। এখানে বদলি হ'য়ে আসছে এ খবর দিয়ে যে চিঠি লেখে- কত বড় সুখের খবর–তখনো এতটুকু আন্দোলন নেই। যেন একটা নামজারির নোটিশ।' (এ.অ.এ.রূ./৬০) অথচ সুখেন্দু তার ভালোলাগার ভুবনে বিচরণ করছে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ভাবে। সেখানে প্রেম আছে, ভাললাগা-ভালোবাসা আছে, আছে রোমান্টিক পুরুষের গভীর প্রণয়ের সংযত প্রকাশ।

'সমস্তটা পথ ভাবতে ভাবতে আসছে সুখেন্দু। চারদিককার মাঠ-ঘাটও ভালো লাগছে দেখতে। ধানক্ষেত, মেঠো পথ, গরু- বাছুর লোকজন। কোনো দিন খায় না, আজ ভালো লাগছে খুরিতে ক'রে চা খেতে। কপট পোশাকে নয়, ঘরোয়া সরল পোশাকে দেখবে আজ পূরবীকে। মন্দ লাগবে না। গম্ভীরকে বিগলিত করবে, আড়ষ্টকে পরিমুক্ত। বেশ দেখতে লাগবে সেই অবতরণ, বিদুষী বিনতা হবে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিবুদ্ধ। প্রতীক্ষা থেকেই সব হবে।' (এ.অ.এ.রূ./৬২)

কিন্তু প্রতীক্ষার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায় স্টেশনে পূরবীর অনুপস্থিতিতে। অভিমানের পাষাণ স্তূপ জড়ো হতে থাকে তার মনে। কল্পনায় যে সারাপথের সঙ্গী হয়ে ছিল সে কি করে পারলো না এসে থাকতে? প্রিয়জনের সান্নিধ্যের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় সবার আগে তো তারই সেখানে থাকবার কথা ছিল। কিন্তু পরিণতবোধে উদ্দীপ্ত পূরবী অনুভব করে 'নিজের খুব যেতে ইচ্ছে করছে, কত দিন দেখা নেই। বিয়ের পর প্রায় তিন মাসের ফাঁক। মাঝে দু-দিনের ছুটি গোটা দুই পড়েছিল যাতে পুরো রাত একটার বেশি হয় না। কিন্তু কে কার কাছে যায়? পূরবী যাবে? ছি ছি লোকে বলবে কি, সুখেন্দু যাবে? সম্ভ্রান্ততার গলায় দড়ি (এ.অ.এ.রূ./৫৮) তাছাড়া তখন সে আবেগায়িত হয়ে মন ভাসিয়ে দেবার চেয়ে কর্তব্য কর্ম কলেজের ফাংশনটাকেই প্রধান করে দেখেছিল। তাছাড়া 'কি ভাববে মেয়েরা, প্রফেসররা। স্বামীর সঙ্গে মিলতে চলেছেন উন্মাদিনী। ছি ছি। না, আস্তে সুস্থে সিডিউল ঠিক

রেখেই সে ফিরবে। বরং তৈরি হ'য়েই ফিরবে। নাচ ও নাটকের টাটকা হাওয়া গায়ে নিয়ে। যদি খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে ইতিমধ্যে তবে তো ভালোই। চমকে দেবে ঝলসে দেবে। ঘুমের মধ্যেই তো চমকে দেবার সুখ।' (এ.অ.এ.রূ./৬১) সর্বোপরি 'সে শিক্ষয়িত্রী তাকেই একটু নিতে হবে শিখিয়ে-পড়িয়ে। প্রাবল্যের অভাব মেটাতে হবে ছলনার প্রাখর্যে'।

অভিমানের টানাপোড়েনে গল্পের শেষ পর্যায়ে দেখা যায় অভিমানের সে বরফ পিণ্ড দু জনের হৃদয় মনকে আবৃত করে রেখেছিল তা অবশেষে গলেছে। আর তাইতো সুখেন্দুর মনে হয় 'এখানে কি ঘুম আসবে, না ঘুমে সুখ আসবে? তার চেয়ে সোজা চ'লে যাই গোকুলে। পৌরুষে আঘাত লাগবে তার চেয়ে মেঝেয় শুয়ে পিঠে আঘাত লাগারই বেশি সম্ভাবনা। বরং এই অবস্থায় এই ভূমিকায় গেলেই কিছুটা কথা বলার বিষয় পাওয়া যাবে। কিছু বা ব্যাখ্যা বক্তৃতার। আর বাদানুবাদের পরই তো রাগানুরাগ। খেলো দেখাবে, হালকা দেখাবে? দেখাক না, কে দেখছে! তার জন্যে হীরের আংটির মতো এমন একটা রাত জলে ফেলে দেবে?' তাই অনুরাগের সমস্ত ব্যথা বেদনা ভুলে গিয়ে দাঁড়ায় পূরবীর দ্বারপ্রান্তে। আর পূরবী? সেও তার অভিমানের সমস্ত অর্ঘ্য জলাঞ্জলি দিয়ে ফিরে যায় প্রিয়জনের কাছে। সেখানে বিরহব্যথা সূচনার মধ্য দিয়ে পরস্পরের প্রতি মিলনাকাঙ্ক্ষা দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে গল্পের শেষ প্রান্তে–'সুখেন্দু হু হু ক'রে উঠে গেল উপরে। এসে দেখল, মেঝের উপর পাতা প্ল্যাটফর্মের বিছানায় কুঁকড়ে মুঁকড়ে শুয়ে আছে পূরবী।'

মানবমনের নিগূঢ় রহস্য উন্মোচনে নিরন্তর নিরীক্ষারত অচিন্ত্যকুমারের শিল্পিস্বভাবের বীজ 'শ্রেয়সী' গল্পটির পরিণতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। দুর্জ্ঞেয় মানব-হৃদয় বিশ্লেষণে তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর হিসেবে এ গল্প নিঃসন্দেহে তাৎপর্যদীপ্ত, মর্মস্পর্শী ও ব্যঞ্জনাময়। আত্মসম্মানবোধের সুদৃঢ় মানসিকতাই এ গল্পের 'পূরবী' চরিত্রকে ব্যক্তিত্বময়ী ও আকর্ষণীয় করেছে। অন্যদিকে 'সুখেন্দু'র মধ্যে লক্ষ্য করা যায় রোমান্টিক অথচ দৃঢ় ব্যক্তিত্বের সুকুমার ভাবগাম্ভীর্য। এই দুই চরিত্রের মাধ্যমে লেখক একই সমস্যার আবর্তে নিপতিত দুজন মানুষের অন্তর্জগতে সৃষ্ট দু ধরনের জীবনতৃষ্ণার রূপ অঙ্কন করেছেন। মানুষের কল্পনা ও বাস্তবের যে দ্বন্দ্ব কিংবা মনোরহস্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে শাস্ত্রজ্ঞান ও প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতার যে অপরিমেয় পার্থক্য -এই বিষয়গুলো যেমন এ গল্পের পরিণতিকে ত্বরান্বিত ও কার্যকারণশৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে তেমনি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের জীবনচেতনাকে অনির্বচনীয় শুদ্ধতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

'রাতের মত রাত' গল্প গ্রন্থিত হয়েছে নির্ঘুম একজন সাহিত্যিকের মানসিক যন্ত্রণাকে কেন্দ্র করে। পারিপার্শ্বিক দুর্বিষহ অবস্থা, ব্যক্তিগত জীবনে দরিদ্রতার উৎকট ছাপ, সাহিত্যিক বিনায়ক সেনের জীবনচেতনায় অনেকটাই প্রভাব বিস্তার করেছে। তার প্রাত্যহিক জীবনে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দীনতা সঙ্গী করে নিয়ে এসেছে নির্ঘুম রাতকে। মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা বিনায়ক সেনকে কীভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছিল তারই প্রাঞ্জল উপস্থাপন রয়েছে এই গল্পে।

বিনায়ক সেনের দিবারাত্রির কাব্যের মধ্যে শুধু অভাবের প্রাবল্য। অশান্তির আতিশয্য ফুটে উঠেছে লেখকের বিভিন্ন চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে। যেমন 'ঠোঙায় করে মুড়ি ফুলুরি নিয়ে এসেছে দুটো ছেলে, পরের দুটো অপেক্ষা করছে বারান্দায়। ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে চতুষ্টয়ের মারামারি শুরু হয়েছে। আর ওদের মা একটা চেলা কাঠ দিয়ে নীরবে তার মীমাংসা করছেন।' (স্বা.স্বা.প.প./৭৬)

অভাব আর অনিদ্রায় খিচঁড়ে যাওয়া মেজাজ নিয়ে তবু তিনি সাহিত্য রচনা করেই চলেছেন। কিন্তু সে রচনাতে কি সাহিত্যের ভেতরের রসের সন্ধান দিতে পেরেছেন?

'কেমন একটা ধিক্কার এল বিনায়কের মনে। এতদিন সে কী লিখেছে? শুধু তিক্ততা, শুধু শ্লেষ, শুধু রোষ, শুধু বিদ্রুপ। একটা প্রেমের কবিতা লিখে নি?' (স্বা.স্বা.প.প./৮৭) কী করেই বা লিখবে সে প্রেমের কবিতা! যার জীবন চেতনায় ভালোবাসার কোন অস্তিত্ব নেই, সুখ পরিমাপের কোন মাপকাঠি নেই, সে কি করে পারবে 'পরিপূর্ণ ভালোবাসার কবিতা, জীবনকে ভালোবাসার, ভালোবাসাকে নিয়ে ভালোবাসার কবিতা লিখতে? আর সে কারণেই সুকঠিন বাস্তব নিষ্ঠুরতার ঘায়ে আহত বিনায়কের কণ্ঠে ঝরে 'উদগীরণ। অগ্নিস্রাব। ভাগের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, সরকারের বিরুদ্ধে। লেখক-পাঠক-প্রকাশক-সম্পাদক-পরিচালক জগৎ সংসারের বিরুদ্ধে। একটা সর্বসাকল্য বজ্রনাদ। কোটরে-ঢোকা উগ্র দুটো চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। শীর্ণ হাত বারে বারে কাঁপছে উত্তেজনায়। পারলে যেন এখুনি একটা বর্শা বা বন্দুক নিয়ে তেড়ে যায়।' (স্বা.স্বা.প.প./৭৭)

তার এই মানসিক অস্থিরতার পুরো দায় নির্ঘুম রাতের এক ফোঁটা ঘুমের জন্য। অসহায় এ লেখক তার জীবনে স্বস্তি ও শান্তির কোন চিহ্নই দেখতে পান না। রুচিরার কাছে তার কাতর বর্ণনা এভাবে নিরূপিত হয়েছে 'কবে ঘুমিয়েছি মনে করতে পারছি না। মনে হয় যখন মরবো, যদি মরি, তখনও আমি জেগে থাকবো, তখনও আমার দুচোখের পাতা একত্র হবে না। আপনার প্রিয় কবিকে দেখতে এসেছেন, দেখুন এক অনিদ্রিত কবি। আমার সমস্ত কবিতাই এক জ্বলন্ত অনিদ্রা'। (স্বা.স্বা.প.প./৭৭)

'...জানেন কত দিন ধরে এক ফোঁটা ঘুমাতে পারি না। না দিনে না রাত্রে। না শীতে না বর্ষায়। একটা জীবন্ত আত্মহত্যার মত পথে পথে ঘুরে বেড়াই। আর সবকিছু নেই সহ্য হয় কিন্তু ঘুম নেই এ এক জাগ্রত উন্মত্ততা।' (স্বা.স্বা.প.প./৭৬)

বিনায়ক সেনের এই মনোবৈকল্যময় অবস্থায় রুচিরার আগমন ঘটেছে এক সহানুভূতিশীল ও মমতাময়ী বন্ধু হিসেবে। কোন স্বার্থের অভিসন্ধিতে নয়, কোন সস্তা প্রচার লাভের আশায় নয়, শুধুমাত্র একজন মানুষকে তার প্রচণ্ড মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়ার একান্তিক সদিচ্ছায় তার কর্মপ্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে সাময়িক বিচ্ছিন্ন রচিরা ব্যক্তিগত অভিমান পরিত্যাগ করে তার স্বামী ডাঃ সুব্রত -এর কাছে নিয়ে যায় বিনায়ক কে। তার প্রতি ডাক্তারের অসম্মানযুক্ত বিশেষণ 'আধমরা, আধবুড়ো, ভবঘুরে, শুনেও এতটুকু দমলো না, এতটুকু কাঁপলো না। সরল সাহসে বললে, ইনি বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যক বিনায়ক বোস। ক বছর

ভুগছেন ইনসমনিয়ায়, দিনে রাতে একটানা ঘুম হচ্ছে না কখনও। এর দুর্দিন সাহিত্যের দুর্দিন। এঁকে যদি একটু দেখেন'-(স্বাদু স্বাদু পদে পদে পৃ-৭৯) ডাক্তারের সন্দেহের 'প্রাথমিক কাঠিন্যটা তরল হয়ে' এলে ফের দুর্বিনীত প্রশ্ন, 'কেউ হন আপনার? রুচিরার দ্বিধাহীন উত্তর 'হ্যাঁ, আত্মীয় হন, তার চেয়ে বেশি, গুরু হন।' রুচিরার এই দুঃসাহসিক আচরণে স্তব্ধ সম্মানিত বিনায়ক এক ভিন্ন অনুভূতির স্বাদ পায়। প্রশান্তিতে তার চেতনা উদ্ভাসিত হয়। সে ভাবে 'গুরু মানেই তো ভক্তির পাত্র। আর ভক্তি মানেই তো চিত্তের তন্ময়তা। চিত্তের তন্ময়তা মানেই তো সমস্ত বৈধতার বিসর্জন।' (স্বা.স্বা.প.প./৮১)

অন্তরে তৃপ্তি নিয়ে 'হাঁটতে হাঁটতে শোবার ঘরে চলে এল বিনায়ক। কি আশ্চর্য খোলা পশ্চিম আর দক্ষিণের খানিকটা। বিকেলের অঢেল হাওয়ায় উড়ছে পর্দাগুলো, খাটের উপরে তোলা মশারির খানিকটা। অস্ত যাবার সময়েও যে সুন্দর হওয়া যায় সোনালি অক্ষরে তাই লেখা হচ্ছে আকাশে।' (স্বা.স্বা.প.প./৮২) চিত্তের সুস্থিরতা ও কোমল স্বস্তি মানুষকে জাগরণের দেশ থেকে ডেকে নিয়ে নিদ্রার দেশে নিয়ে যেতে পারে। আবার ঠিক তেমনি মনোজগতের অস্থিরতা ও যন্ত্রণাময় প্রতিবেশ তাকে ঠেলে ফেলে দিতে পারে কোনো অসহনীয় পরিবেশে। রুচিরার পর্যবেক্ষণে বিনায়কের আবার আগের চিত্রের পুনরাবৃত্তি। 'তক্ত পোশে শুয়ে ছটফট করছে বিনায়ক আর তার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে একটা আহত পশুর আর্তনাদ। ভাঙা লণ্ঠন যত না আলো দিচ্ছে তার বেশি দিচ্ছে কালি। যত না চিৎকার তার বেশি বোধ হয় যন্ত্রণা।...আজ ভেবেছি আত্মহত্যা করবো। বদ্ধ পাগল হয়ে গেলে আর আত্মহত্যা করা হবে না। ঘুম নেই বলে আমার শেষ ঘুমও কি থাকবে না?' (স্বা.স্বা.প.প./৮৫)

গল্পের শেষে দেখা যায় একটি অভাবনীয় মোড়। সেখানে পরিলক্ষিত হয় অনিদ্রা কীভাবে মিলন ঘটায় রুচিরা - সুব্রত এবং বিনায়ক সেন আর নিদ্রার মধ্যে। রুচিরার প্রখর ব্যক্তিত্ববোধ রক্ষা করে লেখক বিনায়ক সেনকে। রুচিরার সহানুভূতিশীলতা আর ব্যক্তিত্বের প্রাখর্য তার সংলাপে বিধৃত হয়েছে সাবলীলভাবে।

'কে এই লোকটা?

সব বললে রচিরা। বললে, 'মদ খেয়ে এসেছে। আজকে রাতে আমার পাশে থাকতে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।'

'তুমি পাড়ার লোক জড় করনি কেন?' রুখে উঠল সুব্রত।

'ছি'। নিবৃত্ত করলো রুচিরা। বললেন, 'মানী লোকের মান রাখতে হয়। কত বড় কবি-সাহিত্যিক। তারপর অসুস্থ। অপ্রকৃতিস্থ। সবদিক দিয়েই তাই বিঘ্ন। আজকের দিনে আমাকে এবং ওকে একমাত্র রক্ষা করতে পার তুমি।' (স্বা.স্বা.প.প./৮৯)

একটু ব্যতিক্রম গল্পের প্লট নিয়ে রচিত 'রাতের মত রাত' গল্পটি ত্রিমুখী ধারায় অতিবাহিত হয়েছে। রুচিরা, সুব্রত ও বিনায়ক যেন-তিনজনেরই ভেতরে ছিল ভিন্নরকম শূন্যতা। সেই শূন্যতা পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায় গল্পের শেষ পর্যায়ে। রুচিরা-সুব্রতর দাম্পত্য বিচ্ছেদের অবসান ঘটে আর বিনায়ক তার আকাঙ্ক্ষিত নিদ্রার মধ্যে দিয়ে খুঁজে পায় জীবনের প্রকৃত স্বস্তি। সুব্রত-এর উক্তির মধ্য দিয়ে তার যথার্থ প্রমাণ মেলে। 'আপনার এক

অনিদ্রা দিয়ে আমাদের দুই অনিদ্রা মুছে দিয়েছেন। আমাদের বিচ্ছেদের মামলা মিটে গিয়েছে, আপনারটাও মিটুক। শান্তি হোক। আমাদের বিচ্ছেদ প্রেমের -আপনার ঘুমের।'

অচিন্ত্যকুমার তাঁর ছোটগল্পে সমাজ অন্তর্গত বিভিন্ন ধরনের মানুষকে তুলে আনতে পেরেছেন পরম সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি ও পর্যবেক্ষণক্ষমতার গুণেই। সমাজের এইসব মানুষের মনস্তত্ত্বগত বৈচিত্র্যও তাঁর মনোযোগের বাইরে নয়। বরং তা তাঁর শিল্প-অভিপ্রায়সূত্রে স্বতঃস্ফূর্ত ও পরম আগ্রহ-সমন্বিত এক ব্যাপার। তাঁর বেশ কিছু গল্পে মনস্তাত্ত্বিক অনুষঙ্গসমূহ নানাভাবে চিত্রিত হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় চরম নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের জীবনানুভবকে শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপন করেছেন। সেখানে নাটকীয়তা-নির্মমতা-কারুণ্য-নিষ্ঠুরতা-অসহায়ত্ব সব একাকার হয়ে মানুষের জীবনকে উপহাস করে।

তাঁর ছোটগল্পে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মনোবিশ্লেষণ ও মানবমনের নানামাত্রিক বৈচিত্র্যময় প্রান্তসমূহকেও আভাসিত করা হয়েছে। জীবনের যথাযথ বাস্তবতার রূপায়ণসূত্রে তিনি মানবমনের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার সাথে মনস্তাত্ত্বিক সংকট বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন। ছোটগল্পে মানববৈচিত্র্যের রূপায়ণে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা তাঁর কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। মানুষের অসংলগ্ন ও অস্থির আচরণের মূলভিত্তি হল তার মনোগত জটিলতা। ব্যক্তি ও সমষ্টি, মানুষের একক জীবনমূল ও সমাজসত্তা কিংবা অন্তর্জগত ও বর্হিবাস্তবতা- এই বিষয়গুলোকে তিনি তাঁর গল্পে সন্নিবেশ করেছেন অপূর্ব দক্ষতায়। মানবমন জটিল, রহস্যময় ও বৈচিত্র্যপরায়ণ। আবার মনের অন্তর্প্রবণতার মধ্যেই রয়েছে প্রথাবিরোধী অভিনবত্বের ব্যঞ্জনা। মনস্তত্ত্ব সংকটে অবগাহন করে মানুষের মধ্যে যে নৈঃসঙ্গ্যপীড়ন, অস্তিত্ব জিজ্ঞাসা কিংবা অসহায়ত্ববোধের উন্মেষ ঘটে তারই চিত্র তিনি মমতা ও সহানুভূতির সঙ্গেই চিত্রিত করেছেন তাঁর ছোটগল্পে।

'অরণ্য' গল্পে তথাকথিত উচ্চবিত্ত সংসারের জীবনবোধের বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এখানে ভদ্রলোকি আবরণের অন্তঃসারশূন্যতা উন্মোচিত হয়েছে। তাদের জীবন আশা ও মূল্যবোধগত বৈভিন্নকে আলোকদান ছাড়াও এ গল্পে এমন পরিণামচিত্র আভাসিত হয়েছে, যা জীবনের গভীরতম সত্যকে অনুভব করতে সহায়তা করে। জীবন নয় বরং মৃত্যুই বারবার জীবনের বিরাট সত্যকে আমাদের বোধের কাছে স্পষ্ট করে তোলে। মানব জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব, মৃত্যুর অনিবার্যতার কাছে মানুষের অসহায়ত্ব - এইসব অপ্রিয় সত্যের মুখোমুখি হই আমরা এ গল্পের রুষের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে।

চাকরিহীন ক্ষিতিশ মেস-এ 'শুয়ে শুয়ে আবোল-তাবোল স্বপ্ন' দেখে। অর্থ উপার্জনে অক্ষম হলেও অভিজাত জীবনের প্রতি তার ছিল তীব্র বিতৃষ্ণা। মেস-এর ঝি বাসন-কোসন নিয়ে সরে পড়ার কারণে অন্য ঝি খুঁজতে মাসির বাড়িতে উপস্থিত হয়। এ পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় অতিবাহিত করার কারণে সবার অন্তর্গত মনোবেদনা, হতাশা, নিরুপায় নৈঃসঙ্গতা, গ্লানিময়তা প্রভৃতি বোধ তাকে বিচলিত করে। অবস্থার রূপান্তরে মনে মনে ভাবে-'ছিলাম ধাবমান নির্ঝরের ফেনসঙ্কুল দুর্নিবার খরস্রোত-এখন হ'য়ে আছি পুষ্করিণী- সীমাবদ্ধ,

নিষ্প্রাণ, অগভীর ! (ইতি/৪২৩) কেউ তার অবস্থান নিয়ে তৃপ্ত নয়। সবাই যে যার মত শূন্যতার গভীরতা নিয়ে দুশ্চিন্তায় মগ্ন। উদ্দেশ্য একটাই, বর্তমান জীবনবোধের ক্লান্তিময় অবস্থা থেকে মুক্তি বা পরিত্রাণের পথ খোঁজা। ভ্রমরের বিগত ভালোবাসা বর্তমানেও সতেজ, প্রাণবন্ত, 'মিষ্টি বাজনা'র মত প্রিয়। অতীতের সুখময় স্মৃতি এখনও তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। বলে 'বাড়ির সবাইর কাছে ছিল সে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া, আমার কাছে সে ছিল শুধু সাইক্লোন !' (ইতি/৪২৭) কিন্তু তার ভালোবাসার গভীরতায় দ্বিধান্বিত ক্ষিতিশ বলে 'এও তো হ'তে পারে, ভ্রমর, যে সে মোটেই তোমাকে পাবার মতো ভালোবাসেনি– এমনিই তোমার পথের মাঝে ধূলির মতো উড়ে এসেছিল, এমনিই আবার ধুয়ে গেছে।' (পৃ. ঐ) স্ত্রীর নৈঃসঙ্গ্যবোধের জগতে স্বামী যখন বন্ধুর স্থান অধিকার করতে পারে না তখনই অতীত প্রেমের প্রেমিক বন্ধু হয়ে আবির্ভূত হয়। যাকে নিঃসঙ্কোচে ভরসা করা যায়, যে 'সুবাসের মতো ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে শুধু'-কিন্তু একেবারে উবে যায় নি। সেখানে 'স্বামী স্বামীই বটে, বন্ধু নন– তপস্যার স্বামী, বিনা মূল্যের বন্ধু নন।' (পৃ. ঐ) ভ্রমরের এই আত্মগত উপলব্ধিতে তার সঙ্কটগ্রস্ত মনোজগৎ উন্মোচিত হয়। অতীত আর বর্তমানের জীবনবোধে দেখা দেয় যোজন পার্থক্য। যাকে চিরকালের মতো অর্জন করা যায় না কিন্তু অন্তরের খুব গভীরে লালন করা যায়, সে অন্য কারো কণ্ঠলগ্ন হলে তাকে হৃদয়ে ধারণ করা অনৈতিক। অনুভূতির কথামালা ঝরে পড়ে এভাবে – 'আমার জীবনে কবিতার একটি কণাও আর রইল না, ক্ষিতি দা। নীরেনের বেদনা আমার জীবনে পরমমধুর একটি লাবণ্য বিস্তার করেছিল, আমি আজ একেবারে বিরস, বিগতসৌরভ, বিফল হ'য়ে গেছি। কেউ আমার জন্য মার্টার হয়েছে– এ ভাবার মধ্যে বেদনা ও স্নেহের সঙ্গে কী প্রকাণ্ড গৌরব ছিল ! (ইতি/৪৪০)

হেনার দুর্দমনীয় প্রেমবোধ তার জীবনচেতনাকে করেছে মাধুর্যমণ্ডিত।'সুস্নিগ্ধ রজনীগন্ধা' বা বৃষ্টিসিঞ্চিত তৃণকণা'র মত দেখতে হেনা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে 'সতীত্বের চেয়ে বড়ো প্রেম– যে প্রেমে দুঃখদহন আছে, আত্মত্যাগ আছে ! তুমি জান না, এই দুঃখ সহ্য করার সাহসের অভাবেই সমস্ত সৃষ্টি শীর্ণ, বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শকুন্তলা যেখানে তপোবনবাসিনী তার চেয়ে উজ্জ্বল–শকুন্তলা যেখানে তপশ্চারিণী ! পার্বতীর চেয়ে অপর্ণা।' (ইতি/৪৩০) কিন্তু এই প্রেমময়ী নারীর জীবনস্পৃহা অন্য দৃশ্যপটে পাল্টে যেতে দেখা যায়। সেখানে প্রেমানুভূতি সেবায় রূপান্তরিত না হয়ে ঘৃণায় পর্যবসিত হয়। ভালোবাসার মধ্যে বিরাজ করে মমতা, স্নেহ, সেবা। শাশ্বত এই উপলব্ধি যদি প্রাণকে বাঁচাতে না পারে তবে ভালোবাসার মূল্য কোথায়? ক্ষিতিশের এই চেতনা হেনাকে সচকিত করে। প্রেম ও বাস্তবতার মধ্যে সংঘর্ষের পর পুনরায় ভালোবাসার জগতে প্রত্যাবর্তন করে। বলে 'পুরী-ই যাই তাহলে। পীযূষ সেখানে আছে। একবার প্রাণপণ দেখি না চেষ্টা ক'রে সে বাঁচে কি না। তবে রইল রংপুর।' (ইতি/৪৪১)

সিনেমা ও খেলাপ্রেমী সুবল পড়াশুনায় কোন রস পায় না বলে পড়াশুনাকে রসাতলে পাঠিয়েছে। তার জীবনস্পন্দনে উজ্জ্বল হয়ে আছে বিভিন্ন হৃদয়গ্রাহ্য দৃশ্যাবলি। যেমন ইটের ফাটলে ছোট কচি একটি বট গাছ, পাভলোভার মন অভিভূত করা নাচ, সমস্ত রাত্রি ঝড়ের পর প্রথম সূর্যোদয়, আলমগীরের ভূমিকায় শিশির ভাদুড়ির

রঙ্গমঞ্চে আগমন, জীবনে ব্যর্থ মানুষের স্বাক্ষর জমা করা প্রভৃতি কাজে তার জীবন-ভাবনা ও জীবনাগ্রহের স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে।

গল্পের শেষ অংশে বুষের মৃত্যু বিশাল বাড়ির সবাইকে বাকরুদ্ধ করে দেয়। অচিন্ত্যকুমার একটি ছোট্ট শিশুর কেন্দ্রবিন্দুকে আশ্রয় করে তার বৃত্তে জীবনস্পন্দনের মূল অনুসন্ধানে প্রয়াসী হয়েছেন। শিশু বুষের মৃত্যু সবার জীবনচেতনাকে করে আলোড়িত, বিধ্বস্ত। স্তব্ধতা সবাইকে আচ্ছন্ন করলেও শুধু ক্ষিতিশের মুখেই উচ্চারিত হয়, 'মাসিমা বুষকে এবার ছাড়ুন, ওকে নিয়ে যেতে হবে।' (ইতি/৪৪৩)

'অরণ্য' গল্পটি একটি একান্নবর্তী বিশাল পরিবারের স্বার্থপ্রিয় মানব মানবীর মানস বিশ্লেষণ। একান্নটি পাত পড়ে প্রতিবেলায় উচ্চবিত্ত তিন ভাইয়ের তিন তলা বাড়িতে। তারা সবাই যখন একত্রে থাকে তখন মনে হয় ওদের চতুর্দিকে স্ফূর্তির ফোয়ারা চলছে, বৈভবের প্রাচুর্য আর জাঁক জমকের মধ্যে ওদের দুঃখ-যন্ত্রণাকে স্পর্শ করাই যায়না। কিন্তু যখন তারা একাকী, তখন ওরা প্রত্যেকেই আপনাকে নিয়ে সম্পূর্ন আলাদা। অরণ্যের বৃক্ষরাজির মতই একই ছায়াতলে বাস করে, কারুর সঙ্গে কারুর অন্তর বা আত্মার যোগাযোগ নেই। এই পরিবারের বিবাহিতা মেয়ে ভ্রমর বিভোর হয়ে আছে তার বিবাহপূর্ব যুগের পূর্ব প্রণয়ীর স্বপ্ন নিয়ে, দুচোখে কবিতার আলো জ্বেলে বাস্তবের কঠিন মাটিতে বসে কল্পনার আকাশে প্রেমের ফানুস ওড়াচ্ছে হেনা। বড় ভাইয়ের ছেলে সুধাংশু ল' সমুদ্র পাড়ি দেয়ার আশায় বৃথাই নৌকা ঠেলছে। বিত্ত-বৈভব তার কাছে দুর্বিষহ বোঝা। ছোট্ট সংসারে ছোট্ট সীমানার মধ্যে সে হতে চায় একান্ত আলাদা, একান্ত স্বতন্ত্র। কেউ বা বাংলা কাব্যসমুদ্রের কালাপাহাড়, কেউ পানাসক্তির ওমর খৈয়ম। সুবল হচ্ছে সবচেয়ে টিপিক্যাল তরুণ চরিত্র। এডিলেডের ক্রিকেট খেলার মাঠ থেকে শিশির কুমারের অভিনয় আর পাভ্‌লোভার নাচের আসর পর্যন্ত সবদিকেই যার সমান আগ্রহ। অটোগ্রাফের খাতায় উড়ে মালি, দারোয়ান আর ঝাড়ুদারের স্বাক্ষর নিয়ে সে ভাবে, জীবনে যারা বঞ্চিত, অবহেলিত- এই আখরের আচঁড়ে তাদের মনোবেদনা জমা করে রাখছে।

পাঁচ বছরের ছেলে বুষ সেই পরিবারের পরস্পর বিচ্ছিন্ন নরনারীর জীবনে একটি মাত্র যোগসূত্র, একটি মাত্র স্নেহের বন্ধন। তেতালার ছাদে উড়ন্ত ঘুড়ি ধরতে গিয়ে একেবারে বাড়ির উঠোনে ছিটকে পড়ল বুষ। আর সেই আকস্মিক অনাহুত শোকের তীব্র আঘাতে একই উপলব্ধির সমতলে এসে মিলিত হয় সবাই। মনে হয়, মানুষের প্রীতি ও স্নেহের বন্ধন কত ভঙ্গুর, মানুষের আশা কত অল্পায়ু, মানুষের অধীর ও অসীম প্রতীক্ষা কি বিশ্বাসঘাতক ! গল্পটির উপসংহার প্রাত্যহিক জীবনের যন্ত্রণা, ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য বোধের মধ্যে। কিন্তু বিষয়বস্তুর সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণে, বিচিত্রমুখী চরিত্র সৃষ্টির নববৈচিত্র্যে, এবং পরিসমাপ্তির বিস্ময়াবিষ্ট অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতায় 'অরণ্য' ছোটগল্পের ক্ষেত্রে শুধু অচিন্ত্যকুমারেরই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই সম্পদ।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **'অমর কবিতা'** কবিত্ব আর মনস্তত্ত্বের মনিকাঞ্চন যোগ। প্রথম ও একমাত্র শিশুকন্যার অকাল মৃত্যুতে শোকার্ত জননীর আবেগাতিশয্য, তার পরিণতি ও তার স্বরূপ সন্ধান এ গল্পের

উপজীব্য। প্রিয় সন্তানের মৃত্যুতে শোকার্ত জননী হঠাৎ কবি হয়ে উঠে। নিজের নাম বানান করতে যার কষ্ট হতো সে কন্যার মৃত্যুর ওপর বিশাল শোকগাথা রচনা করে। স্নেহের সন্তানকে সে মৃত্যুর ঘোর অন্ধকারে হারিয়ে যেতে দেবেনা, শিল্পের মধ্য দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। অথচ তার কাব্যশিল্পের মূল্য কেউ উপলব্ধি করল না। দেয়ালে সন্তানের ছবি এঁকে, কাদা দিয়ে তার মূর্তি রচনা করে নিজের মনকে প্রবোধ দেয়ার বৃথা চেষ্টা করে। কিছুতেই সে বিশ্বাস করবে না যে, তার খুকি নেই। একটা পুতুলকে খুকি মনে করে ঘুমের মধ্যে বার বার উঠে সে পুতুলের কাঁথা বদলে দেয়, লুকিয়ে প্রত্যেক দিন স্নান করায়, খাবারের সময় তাকে কোলে নিয়ে বসে। কিন্তু শোকার্ত মায়ের সন্তান শোকের এই আত্যন্তিকতা ধীরে ধীরে পরিবার পরিজনের উপহাসের বিষয় হয়ে উঠে। শাশুড়ি তাকে কটূক্তি ও ভর্ৎসনায় অস্থির করে তোলে, স্বামীও শেষের দিকে ব্যঙ্গ শ্লেষে জর্জরিত করে নিষ্ঠুর হয়ে উঠে। পরিশেষে এই উৎকেন্দ্রিকতার যা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম তাই ঘটে। সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে, শোকের সমস্ত আড়ম্বরতা বিসর্জন দেয়। দেয়ালের ছবি ছিঁড়ে ফেলে, কবিতাটি পুড়িয়ে ফেলে একতাল কাদা দিয়ে খুকির মূর্তি গড়বার বদলে নিজেরই মূর্তি তৈরি করে।

ফ্রয়েডীয় অবচেতনবাদের ভিত্তিতে এই ধোঁয়াসাচ্ছন্ন জীবনরহস্যের জটিল গ্রন্থিমোচন করলে দেখা যাবে যে, মেয়ে সম্পর্কে মায়ের কোন অপরাধবোধ তার অবচেতনলোকে ছিল বলেই মেয়ের মৃত্যুকে অস্বীকার করার জন্য তার মনে এত উৎকণ্ঠা। মা হয়ে সে হয়ত মেয়ের মৃত্যু কামনা করেছে, অথবা এও হতে পারে মেয়ে সম্পর্কে সে ঈর্ষা পরায়ণা ছিল। কাব্যশিল্পের মধ্য দিয়ে বাসনার পরিশুদ্ধ করণের দ্বারা সে মুক্তির সন্ধান করেছে। কিন্তু চতুর্পার্শ্বের প্রতিবন্ধকতা এই মুক্তির পথ রোধ ক'রে দাঁড়াবার ফলে ঘটে তার চেতন মনের পরাজয়। তখন অবচেতন মনের স্বরূপ প্রকাশের আর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। দেখা গেল নিজ কন্যার মূর্তি তৈরির সচেতন বাসনা আসলে নিজেরই মূর্তি রচনার ছদ্মবেশমাত্র। যে মাতৃত্ব চিরকাল অমর কবিতার বিষয়বস্তু হয়েছে, মনঃ সমীক্ষণের সুবাদে তার এই নিরাবরণ উন্মুক্ত আবিষ্কার এ আধুনিক যুগের জীবনবোধে ট্রাজেডির নব ও বৈচিত্র্যপূর্ণ উপাদান রচনা করেছে। মানুষ তার নিজেরই অবচেতন মনের কাছে কত নিরূপায়, তার সামগ্রিক আচার আচরণ, তার নিজস্ব ভাবনা-কল্পনা তার অজ্ঞাত বাসনার কাছে কত অকিঞ্চিৎকর- এই অনুভূতির মধ্যে গল্পের ট্রাজিক উপসংহার 'সহৃদয়- হৃদয়- সংবেদ্য' হয়ে উঠেছে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লিখনরীতি ও শৈলীতে, গল্পরূপ নির্মাণ ও রসপরিবেশনে এবং জীবনবোধের ক্রমবিবর্তনের ধারাকে তিনটি ভাগে বিভাজন করা যেতে পারে। প্রথমভাগে রয়েছে, কল্লোলের বিষয় ভাবনা ও সৃষ্টি নিরীক্ষার সরাসরি ও প্রত্যক্ষ প্রভাবের যুগ; দ্বিতীয় ভাগে লক্ষণীয়, মফস্বলের শহুরে জীবনের চর্চা ও অভিজ্ঞতার যুগ; তৃতীয় প্রান্তে রয়েছে, শহর বা নগরবিকেন্দ্রিত গ্রামীণ জনজীবন চেতনার যুগ। বিভাজিত দ্বিতীয় যুগে বাস্তবতার ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হয়েছে। কল্পনাপ্রসূত গল্পকাহিনীর চেয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা গল্পকে আমাদের চেনা জগতের আরো কাছে এনে পৌঁছে দেয়। কবিকর্মের চেয়ে সৃষ্টিধর্মই বড় হয়ে ওঠে এখানে। 'অমর কবিতা'র

সঙ্গে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' গল্পটির তুলনা করলে এই পরিবর্তন স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। এখানেও মাতৃত্বের কথা, তবে এ মাতৃত্ব দৈনন্দিন জীবনের অতি পরিচিত পরিবেশের মধ্যে তার সহজ রূপেই উদ্ভাসিত। হতদরিদ্র সংসারের বি.এ পাস বেকার ছেলে। যেমন-তেমন একটা চাকরি সংগ্রহের আশায় স্বর্গ-মর্ত্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ একদিন শুভাগমন ঘটে সেই প্রত্যাশিত শুভ মুহূর্তের। টেলিগ্রামে খবর এল, দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের কেরাণীর চাকরিতে সে নিযুক্ত হয়েছে। বেতন পঞ্চাশ টাকায় শুরু, বছরে দু টাকা করে বেড়ে চুয়াত্তর টাকায় শেষ। যদিও অর্থের পরিমাণটা এখানে নিতান্ত তুচ্ছ তবু বেকারত্বের পাপমুক্তি হল, এই ত সবচেয়ে বড় কথা! বেকারত্বের অভিশাপে নিষ্পেষিত অভাবসর্বস্ব সংসারে একটি চাকরি পাওয়ার সুসংবাদ যে কি আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে এ গল্পটি তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। খোকার চাকরি পাওয়ার খবরে মা খুশিতে আটখানা। এত বড় সুসংবাদটা দশজনকে দশখানা করে না বলতে পারলে তৃপ্তি কোথায়? যে যাই ঠাট্টা করে বলুক, পাকা বাড়ি হবে বৈকি! রাজলক্ষ্মী বৌ ঘরে আসবে। ধীরে ধীরে পায়ের তলায় কাঁচামাটি সোনা হয়ে উঠবে। কিন্তু চাকরিতে সঙ্গে সঙ্গেই যোগদান করতে হবে। টেলিগ্রাম এসেছে সকালের দিকে, কালক্ষেপণ না করে রাতের ট্রেনেই রওনা হতে হবে। খোকা চাকরি নিয়ে চলে যাবে দূরে-নির্বান্ধব অপরিচিত জায়গায়। মায়ের মনে সন্তানের জন্য দুর্ভাবনার অন্ত নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খোকার যাওয়াই হয় না। ট্রেনের সময় এগিয়ে যাওয়ার কারণে স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ফেল করে বাড়ি ফিরতে হয় তাকে। দিশাহারা মা আর্তনাদ করে উঠে চাকরিটা তা হলে গেল!–যাবে কেন, পরের দিন রওনা হলেই হবে। কিন্তু মায়ের মনে তাতে স্বস্তি নেই। এদিকে স্টেশন থেকে ফিরে আসতে বৃষ্টিতে ছেলের জামা-কাপড় ভিজে গেছে। সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপও নেই। ছেলেকেই মুখ ফুটে বলতে হয়, 'তুমি এখন আমাকে একখানা শুকনো কাপড় দাও দিকি। বেশিক্ষণ ভিজে কাপড়ে থাকলে অসুখ করবে।' সে কথাও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই মা বললেন, 'আর কোনো ট্রেনে অন্য রাস্তা দিয়ে আজই যাওয়া যায় না?' মাতৃ-মনস্তত্ত্বের দিগদর্শন এই সংলাপের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ হল। মায়ের কাছে সন্তান স্নেহের ধন হিসেবে প্রিয় নয়, অর্থ বিত্তের জন্যেই পুত্র প্রিয়। চাকরির মূল্যেই সন্তানের মূল্য। এখানে যেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাশফেল' গল্পে নীরেনের মা-কেই খুঁজে পাওয়া যায়। প্রচলিত ভাবাদর্শের ভিত্তিমূলে বাস্তবতার রূঢ় আঘাত যতই নির্মম-নিষ্ঠুর হোক, সত্যকে অনাবৃত করে সত্যদ্রষ্টার চোখে দেখার যুগচেতনাই এ গল্পে ভাষারূপ পেয়েছে।

'ধন্বন্তরি' গল্পের পটভূমিতে রয়েছে গল্পের অঢেল বিত্ত ও স্বাস্থ্যসম্পদে পরিপূর্ণ ডাক্তার আর বিত্তহীন, সম্বলহীন দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত রোগী। ডাক্তার টগবগে তরুণ, শ্বশুর মশাইর টাকাতেই ডিসপেনসারি, ল্যাবরেটরি, গাড়ি, বাড়ি সবকিছু। স্বচ্ছকান্তি অভিনবযৌবনা অভিমানিনী স্ত্রী। অপর প্রান্তে রোগী নিম্নবিত্ত কেরাণী। সংসারে তিনজন মানুষ, স্বামী, স্ত্রী ও তাদের প্রেম-কামনা-ব্যর্থতার প্রতিনিধি একটি অবুঝ শিশু। বাসর রাত্রির প্রেম-বিহ্বল স্বপ্নমদিরতায় স্ত্রীর নাম দিয়েছিল শিপ্রা। অসুস্থ শিশুর যথাযোগ্য সেবা নিশ্চিত করতে অপারগ বলে সেই স্ত্রী অনুযোগ করেছে- 'ছেলেকে পথ্য দিতে পারবে না তবে বিয়ে করেছিলে কেন?' শেষপর্যন্ত নিজের চিকিৎসার

যৎসামান্য টাকা ছেলের অসুখে নিঃশেষিত করেও তাকে বাঁচানো গেল না। অবশেষে রিক্তহস্তে জীবনযুদ্ধে পরাজিত রোগী হাজির হল ডাক্তারের কাছে। অন্তিম ভিক্ষা তার। বেঁচে থাকার জন্যে নয়, মরবার জন্যে এমন একটা ওষুধ চাই, যা সন্ধ্যাবেলা খেয়ে শুলে সকাল বেলা আর ঘুম থেকে উঠতে হয় না। কত দুঃখে এই মৃত্যুকামনা। কিন্তু কতটুকুই বা তারা প্রত্যাশা করে? শুধু জীবন সমরাঙ্গণে টিকে থাকার শুধু বুকভরে নিঃশ্বাস নেবার সহজ ও সাধারণ আনন্দটুকুই তো তাদের একমাত্র প্রার্থনা। মায়ামমতাহীন ডাক্তারের হঠাৎ রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। অস্থির বিচলিত চিত্তে ল্যাবরেটরিতে বসে তার কেবলই মনে হতে থাকে, দুখানি ব্যাধিজীর্ণ দুর্বল হাত তার দিকে কে প্রসারিত করে দিয়েছে, ঘোলাটে দুই চোখে কি বিবর্ণ বেদনা, তাকে বলছে: 'আপনার কাছে আমি আমার জীবন ভিক্ষা করছি। আপনি বিধাতার চেয়েও বড়।' বিবেকবোধে তাড়িত ডাক্তার ভোগবিলাসের বিহ্বলতা অতিক্রম করে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সে ব্যাধিগ্রস্থকে প্রাণবন্ত করে তোলার সাধনা গ্রহণ করে। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে রোগী জীবনের সীমারেখায় ইতি টানে। এ গল্পে স্বাস্থ্যসম্পদ আর বিত্তের অজস্রতার বৈপরীত্যে জীবন বিধ্বংসী ব্যাধি আর দারিদ্র্যের নগ্ন ও বীভৎসতার করুণ চিত্রটি লিপি কুশলতায় উজ্জ্বলতা পেয়েছে। এখানে ডাক্তারের মানসপটের পরিবর্তন এবং তার অন্তিম ব্যর্থতাবোধই গল্পের মুখ্য উপজীব্য।

নিম্নবর্গের মানুষ রেবতীর উপর অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধি ডাক্তারের নির্মমতার ছবি চিত্রিত হয়েছে এখানে। সবচেয়ে করুণ আবহ নির্মাণে ক্রিয়াশীল থেকেছে অসহ্য ও অবমাননাকর দারিদ্র্য ও সুস্পষ্ট শ্রেণীবৈষম্য। রেবতীর উদ্‌ভ্রান্ত আচরণের বাহ্যিক আবরণ ভেদ করে তার অন্তরের মর্মমূলে প্রবেশ করলেই তার জীবনের বিষাদাত্মক ব্যর্থতার স্বরূপ অনুধাবনে সক্ষম হওয়া যায়। অর্থনৈতিক দীনতা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবনস্তরের জন্য এক মারাত্মক অভিশাপ। দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বপ্ন-আশাগুলিও যখন দারিদ্র্যের কারণে প্রতি মুহূর্তে দলিত পিষ্ট ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে থাকে, তখন তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় মধ্যবিত্ত-হৃদয় হয়ে ওঠে আত্মকেন্দ্রিক, অপ্রতিভ, সংকুচিত, বিভ্রান্ত ও আশাহীন বেদনায় পান্ডুর। জুতোর উপমাতে লেখক দারিদ্র্য-ব্যাধিতে জর্জরিত রেবতীর বিপন্ন অবস্থা তুলে ধরেছেন-

'জুতোর গোড়ালিতে একটা লোহা ক্ষুধার্ত দাঁত দিয়ে ওর বাঁ পা ক্ষতাক্ত করে দিচ্ছিল। ফুটপাতের ওপর ব'সে জুতোটা খুলে ফেলে একটা ইট দিয়ে রেবতী লোলুপ লোহাটাকে ঠুকতে লাগল।

শীতের দুপুরে রাস্তায় স্বভাবতই ধুলো জমে। তার ওপর একটা মোটর যদি হুঙ্কার দিয়ে চলে যায়- দিগ্বিদিকে ধুলোর ঝড় উঠবেই। অভিযোগ করার কি আছে?

তবু রেবতীর মনে হয়-সামান্য একটা মোটর পর্যন্ত ওর বিরুদ্ধে চিৎকার ক'রে উঠেছে- নেই নেই বাঁচবার অধিকার নেই তোমার-

উদ্ধত লৌহাগ্রকে বশীভূত করা যায় না।' (ইতি/৪৪৫)

বিত্ত-বৈভবে আচ্ছাদিত বিলাসী স্ত্রী রয়েছে অর্থলিপ্সু ডাক্তারের। সুখের ঘরে প্রকৃতির সৌন্দর্যের আভা যেন ঠিকরে পড়ে।'পাশের বাড়ির পাঁচিল টপ্‌কে বারান্দার টবের কি-একটা শিশু-গাছের নবোদ্গত পাতায় আঙুল বুলিয়ে রৌদ্র ডাক্তারের ঘরে আসে। কত প্রফুল্ল, কত বাঞ্ছনীয় !' (ইতি/৪৪৩) স্বচ্ছকান্তি স্ত্রীর ব্রেসলেট ও নাকছাবির দাবী মেটানো, বায়োস্কোপ দেখতে নিয়ে যাওয়া, অহেতুক রোমান্টিসিজমে সময় পার করার চেষ্টা- সবকিছুতেই ডাক্তারের দাম্পত্যজীবন যেন সোনাঝরা ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। 'নীল সমুদ্রের মত অগাধ দুই চোখের অধিকারিনী রমার স্বামীর সঙ্গে এমনি ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে। দৈনন্দিন ভালোবাসায় একঘেয়েমি আর ভালো লাগে না।'... কিংবা 'নিজে স্টোভ ধরিয়ে কিছু একটা রাঁধতে বসে। মনগড়া নানান রকম খাবার তৈরি ক'রে - স্বামীকে অবাক করে দেবে।

স্বামী হয়ত বলবেন, এসব অদ্ভুত খাবার কোত্থেকে এল?

ও বলবে -আকাশ থেকে।

স্বামী খেতে-খেতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলবেন- তুমি বুঝি ফের রান্নাঘরে ঢুকেছিলে? তোমাকে-কতবার বলব কয়লার ধোঁয়ায় তোমার চোখ আরো খারাপ হয়ে যাবে।' (ইতি/৪৪৯)

অন্যদিকে অসীম বৈপরীত্যে অবস্থানকারী রেবতীর দারিদ্র্য-আবৃত সংসারে রয়েছে -'দুখানি কাপড়, দু'টো থালা, দু'টি বালিস-আর প্রাণী তিনটি। স্বামী, স্ত্রী ও তাদের একটি প্রতিনিধি। তাদের কামনার, তাদের প্রেমের, তাদের ব্যর্থতার।' (ইতি/৪৪৭) দুঃসহ নিম্নবিত্ত জীবনের নানারূপ বিড়ম্বনা ও পদে পদে তাদের আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যুর কথা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে করুণ ব্যঞ্জনায়। ওষুধের অভাবে হাত পা নীল হয়ে রেবতীর একমাত্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদেও মনুষ্যত্বহীন ডাক্তারের চৈতন্যোদয় হয় না। ভিজিটের জন্য হা-পিত্যেশ করা ডাক্তার 'বলে - সেই ডাক্তারের কাছেই যান। এখানে জোচ্চোরদের জায়গা হবে না।' ভিজিট দিতে অপারগ রেবতী ডাক্তারের কাছে সুস্থতা চাইতে এসে মনে করে-'ভিক্ষুকই ত বটে। ডাক্তারের কাছে ভিক্ষা করতে এসেছিল-একমুঠো ভাত, দুটি দীর্ঘ সুমধুর রাত্রি-কয়েকটি সহজ নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস।' সুস্থজীবন ফিরে পেতে কাতর অনুনয় জানিয়ে নির্দয় ডাক্তারকে বলে-

'আপনি বিধাতার চেয়েও বড়ো। পারেন না ভালো করতে? সংসারে কত অল্পই চাই আমরা- শুধু টিকে থাকার, শুধু বুক ভ'রে নিঃশ্বাস নেবার সহজ ও সাধারণ আনন্দটুকু। দিনের পর রাত, আবার রাতের পর দিন- ঘুমোবার রাত আর খাটবার দিন- এর বেশি আর কিছুই চাই না। আমাকে ভালো করা সত্যিই কি যায় না, ডাক্তারবাবু?' (ইতি/৪৫১)

রেবতীর একটি সংলাপে ডাক্তারের মনোজগৎ এলোমেলো হয়ে যায়। 'রেবতী বলে- আমাকে এমন একটা সহজ ওষুধ দিতে পারেন যা সন্ধ্যাবেলা খেয়ে শুলে সকালবেলা আর ঘুম থেকে উঠতে হয়না? লোকে কেমন করে ট্রেনের তলায় বুক পেতে মরে আমি তা ভাবতে পারি না। ভয়ানকভাবে আত্মহত্যা করতে আমার

ভারি ভয় করে। বেশ আরামে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে আমার ম'রে যেতে ইচ্ছা করে। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত না। তেমনি একটা ওষুধ আমাকে দেবেন, ডাক্তার বাবু?'

আত্মবিশ্লেষণে প্রয়াসী হয় ডাক্তারবাবু। নিজের ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতা উপলব্ধি করে নিঃসহায় রেবতীর চিকিৎসায় নিজেকে ব্যপৃত করতে চায়। তার 'কেবলই মনে হয়- দু'খানি ব্যাধিজীর্ণ দুর্বল হাত ওর দিকে কে প্রসারিত করে আছে, ঘোলাটে দুই চোখে কি বিবর্ণ বেদনা, ওকে বলছে : আপনার কাছে আমি আমার জীবন ভিক্ষা করছি- আপনি বিধাতার চেয়েও বড়ো !' (ইতি/৪৫৩) দুঃসহ অস্বস্তিতে ভয় পেয়ে 'ভাবে-ভোর হ'লেই আবার রেবতীর সঙ্গে দেখা হবে। ভাবতেই ভয় হয়। সারারাত আর ঘুম হয়না।' (ইতি/৪৫৮) অপরাধবোধে বিধ্বস্ত মনের সাথে নিরন্তর চলে চিকিৎসক মনের যুদ্ধ। 'দিনের মুমূর্ষু আলোর' সাথে রেবতীর দেহগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করে ডাক্তার। অধৈর্য হয়ে রেবতীর বাড়ি গিয়ে অনুধাবন করে দারিদ্র্যের কদর্য বীভৎসতা। জীবনের বাস্তবতা উপলব্ধি করে পেশার দায়বদ্ধতা অনুভব করে। বিবেকের দংশনে ডাক্তার শুনতে পায়, 'রেবতী যেন লক্ষ লক্ষ করতল প্রসারিত ক'রে ওর কাছে তার প্রাণ ভিক্ষা করছে। যেন বলছে– যে-জীবন আমার নিলে, ফিরিয়ে দাও' ।(ইতি/৪৬৩)

আর্থিক দীনতাই জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে চিরকালের জন্য অচরিতার্থ রাখে, সুস্থ-স্বাভাবিক সাবলীল গতিকে বাধাগ্রস্ত করে এবং পরিণতিতে ওই জীবনকেই নিক্ষেপ করে অসীম শূন্যতার এক অতল গহ্বরে। অচিন্ত্যকুমারের জীবনরহস্যের জটিলতা উন্মোচনের প্রয়াস কেবল দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। আকস্মিক কোন ঘটনা কিংবা অবচেতন মনের অপরাধবোধ মানুষের সুস্থ জীবনধারাকে ব্যাহত করে, তার আচার-আচরণের সকল নিয়মকে ধ্বংস করে দেয়। তার পেছনে শুধু ঐ ঘটনাটিই দায়ী নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার মজ্জাগত নানা সংস্কার, আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত কিংবা তার জীবন-উৎস। লেখক বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি সিক্ত অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমে ডাক্তারের মনুষ্যত্বহীনতা ও রেবতীর গাঢ় গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন জীবনবোধকে নির্দেশ করেছেন। 'ধন্বন্তরি' গল্প সম্পর্কে গোপিকানাথ রায় চৌধুরী বলেছেন- 'এ গল্প কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত দরিদ্র রেবতী ও তার স্ত্রী শিপ্রার জীবনের কারুণ্যে পূর্ণ। কিন্তু অচিন্ত্যকুমার এখানে শুধু দারিদ্র্যের কান্নাই শোনান নি। ব্যাধি ও দারিদ্র্যের বীভৎস ছবিটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ডাক্তারের সম্পদ ও স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যের বৈপরীত্যে। সমাজের তথা জীবনের এই বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য লেখকের চোখে একান্ত নিষ্ঠুর বলে প্রতিভাত হয়েছে।'[১৩]

'দিনের পর দিন' গল্পে বিন্যস্ত হয়েছে বিমল-বিভার প্রচ্ছন্ন দাম্পত্য সংকট, চিররুগ্‌ণ বিভার নৈঃসঙ্গ্যচেতনা, নিরুপায়ত্ববোধের কাহিনী। স্বামী বিমলের আবেগহীন অবিচলত্বে, ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রীর মনঃক্ষোভ ও অন্তর্জ্বালা অচিন্ত্যকুমার অবলোকন করেছেন সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি সহযোগে। একটি বৃহৎ ফ্রেমে ঘটনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈচিত্র্যসহ বিস্তৃতভাবে রূপায়িত হয়েছে এ গল্পের সুসংহত কাহিনী।

আধুনিক জীবনসংলগ্নতার অন্তরালে বিমলের মনোগভীরে সুপ্ত ছিল জিঘাংসা মানসিকতার এক সুতীব্র অন্ধকার। স্ত্রী বিভার চিরঅসুস্থতা তার মনে জাগ্রত করে ভয়ংকর বিতৃষ্ণা। লেখকের বর্ণনায়–'বেশিক্ষণ একমনে নিজের দৈন্য দুর্দশার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বিমল বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। এত দুঃখ তাকে সইতে হবে কেন? এত বড় সৃষ্টির পক্ষে তার কি প্রয়োজন ছিল? প্রার্থনা একটা মনের মধ্যে পুঞ্জিত হয়ে ওঠে হয়ত, কিন্তু তা উচ্চারণ করবার আগেই সে দু'হাত দিয়ে অন্ধকার অনুভব করতে করতে উপরে চ'লে আসে।' (ইতি/৪৮১) অন্যদিকে লক্ষ করা যায়, বিমলের জীবনও অপ্রাপ্তির বেদনায় ধূসর। জীবনের আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত। চিররুগ্ণ শয্যাশায়ী স্ত্রীর সঙ্গে তার দাম্পত্যজীবনের যে চিত্র পরিবেশিত হয়েছে, তা যেমন অপ্রীতিকর, তেমনি দুর্বিষহ। শীর্ণা স্ত্রীর দুঃসহ সাহচর্য এড়াতে ক্লাবের আশ্রয় নিতে হয় তাকে। লেখক সে পরিস্থিতির বর্ণনা করেছেন এভাবে–

'বিভা বলে –আজ ত আমি ভালো আছি, ক্লাবে যাও না আজ।

– হ্যাঁ, আজকে একবার যাবো !

চকিতে বিভার মুখ মেঘলা হ'য়ে আসে। শিথিল হাতটা ধীরে কপালের ওপর রেখে সে চোখ বোজে। আলাপ আর জমে না।

-তুমি এখন একটু ঘুমোও। ব'লে বিমল উঠে পড়ে।

সুর যায় কেটে।' (ইতি/৪৯২)

অসুস্থ বিভা শঙ্কিত হৃদয়ে প্রত্যাশা করেছিল বিমলের 'না-বোধক' উত্তর। কিন্তু স্বামীর অপ্রত্যাশিত নির্বিকারত্ব বিভার দুঃখজর্জর হৃদয়তাপ আরও বৃদ্ধি করে। আবার প্রকৃতির শূন্যতা ও হাহাকারবোধের সঙ্গে নিজের দাম্পত্য জীবনের সাদৃশ্য লক্ষ করে বিমল। গাছের শীর্ণ ছায়ার সাথে শীর্ণ স্ত্রীর সাযুজ্য তাকে নতুন জীবনসঙ্কটের মুখোমুখি করে। তার অনুভূতি রূপ লাভ করেছে এভাবে– 'ঘর-দোর এলো, জানলাগুলি হাওয়ার হাহাকার করছে- নোনা-পড়া দেয়ালে রাস্তার গ্যাসের আলোয় একটা জাম-গাছের শীর্ণ ছায়া কিলবিল করছে- দেখে বিমলের গা কেমন ছমছম ক'রে উঠলো।...রাতের পর রাত অনিদ্রায় মস্তিস্ক তার ক্লান্ত হ'য়ে গেছে- এই ছায়া তার রাশি রাশি অমাবশ্যার ছায়া! কিম্বা তার জীবনে যে প্রেতিনী দিনের পর দিন পদচারণা করছে হয়ত তারই অশরীরী প্রতিচ্ছবি।' (ইতি/৪৮৫)

এখানে সকল মূল্যবোধ, নীতিবোধ ও ধর্মবোধকে ছাপিয়ে জীবনের স্নেহ-সহানুভূতিহীন নির্মম মানসিকতারই স্ফূরণ পরিলক্ষিত হয়। দুর্ভাগ্যলাঞ্ছিত বিভার জীবনপরিণতি কীভাবে করুণ সমাপ্তির পথে এগিয়ে গেছে লেখক তা দেখিয়েছেন। প্রচণ্ড দুঃখবোধ, দ্বন্দ্বকাতরতা, শূন্যতার আর্তনাদ প্রভৃতি আচ্ছন্ন করে রাখে বিভার চিত্তরাজ্যকে। তবু সবকিছু নতুনভাবে সাজানোর আগ্রহে উদ্দীপিত থাকে সে। স্বামীকে আঁকড়ে ধরে, তার হাত ধরে সুখের আঙিনায় পা রাখতে খুব ইচ্ছে করে তার। বাঙালি নারীর সংসারজীবনে স্বামী কেবল বন্ধু নয়, কেবল প্রণয়ী নয় তার অবস্থান সর্বব্যাপী- ইহলোক ও পরলোকময় ব্যাপ্ত। কিন্তু এই স্বামীর মন যদি অনুরাগের পরিবর্তে

বিরাগে, ভালোবাসার পরিবর্তে ঘৃণায় ভরে ওঠে তখন অসহায় নারীর চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। বিমলের জীবনবোধেও তাই বিভার কোন সম্মানজনক উপস্থিতি নেই। নিম্নোক্ত অংশে চমৎকারভাবে সে বিষয়টিই প্রতিফলিত হয়েছে- 'সেই রুগ্ণ শ্রীহীন লুণ্ঠিত লাবণ্য নারীদেহ, ঘরের দেয়ালে মৃত্যুর নিয়ত দোদুল্যমান ছায়া- বিমলের মন বিতৃষ্ণায় সঙ্কুচিত হয়ে এলো। সেই ঘরে এমন একটা চাপা বিশ্রী -গন্ধ আছে যা বিমলের জীবনকে একেবারে পঙ্কিল ক'রে ছেড়েছে। ওষুধের মতোই বিস্বাদ বিভার সান্নিধ্য।' (ইতি/৪৮৯)

প্রতিনিয়ত অসুস্থ স্ত্রীর মৃত্যুকামনা বিমলের অন্তরাত্মাকে কদর্যময় করে তুলেছে। মানবিকতা বিবর্জিত এই চাওয়া তার জীবনচেতনাকে কলুষিত করেছে বারবার। তার মনুষ্যত্বের ক্রমভঙ্গুরতা ও বিবেচনাহীন ভাবনা তার নিজ জীবনের অন্ধকার দিককেই প্রকট করে তুলেছে। লেখকের বর্ণনায় বিমলের সেই নিষ্ঠুর চাওয়ার প্রকাশ ঘটেছে এভাবে-'নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে না। নিমেষে বিমলের মনে হ'ল ঘর-দেয়াল, বাধা-বন্ধন সব ভেঙে-চুরে ছত্রখান হ'য়ে চারদিক একেবারে ফাঁকা পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। এখন তাকে চিৎকার ক'রে উঠতে হবে তার ভাবার্থ প্রতিবেশিরা ঠিক বুঝতে পারবে ত? শুভরাত্রির পর এত গভীর আনন্দে বিমল আর কোনদিন স্ত্রীর দেহ স্পর্শ করতে যায় নি। আকুল সম্ভাবনায় তার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'তে লাগলো।' (ইতি/৪৮৯)

গল্পের শেষ অংশে রুগ্ণ অসহায় স্ত্রীকে সমুদ্রের জলে ফেলে হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে বিমল তার শেষ মানবিকতাটুকু জলাঞ্জলি দেয়। বিভার বাঁচার তীব্র আকুতি 'আমি গেলাম। শিগগির আমাকে বাঁচাও' শুনেও তাকে মৃত্যুর মুখে ফেলে দিয়ে নির্বিকার বিমল তার জীবনবোধকে ক্লেদাক্ত ও বিষাক্ত করেছে নিস্পৃহভাবে। তার প্রতারণাপূর্ণ ও কাপুরুষোচিত নৈরাশ্যমগ্ন মনোভঙ্গির চিত্র অঙ্কণ করে অচিন্ত্যকুমার মূল্যবোধের নির্মম বিপর্যয়কেই উচ্চকিত করে তুলেছেন।

'নুরবানু' গল্পে দাম্পত্য জীবনের প্রচলিত সংস্কার লক্ষ করা যায়। কুরমান-নূরবানু দম্পতির মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় সংকীর্ণচিত্তের ঔদার্যহীনতাকে কেন্দ্র করে। তিক্ততা সৃষ্টি হয়, নূরবানুকে তালাক দেয়ার পরে উকিলদ্দির সঙ্গে রাত্রিবাসের স্মৃতি সংবলিত নতুন শাড়িতে দেহমণ্ডিত করে স্বামি-গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর। নূরবানুকে পরের বাসায় কাজ করতে না দেয়া, নতুন শাড়ি গ্রহণে বাধা দেয়া, শারীরিক অত্যাচারে রক্তাক্ত করা প্রভৃতি ঘটনা কুরমানের বিরুদ্ধে গেলেও গল্পের গভীরে স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসা লক্ষ করা যায়। প্রথাগত সমাজের ধর্মীয় সংস্কার ও অর্থবান পুরুষের নারী লিপ্সার কারণে, দারিদ্র্যের সংঘাতে তার ভালোবাসা পরাজিত হয়েছে। স্ত্রীর প্রতি উকিলদ্দির দৈহিক আকর্ষণ তার মনের মধ্যে বইয়ে দিয়েছে সন্দেহের স্রোতধারা। উকিলদ্দির কাছ থেকে সদ্য তালাক নিয়ে আসা নূরবানুর খুশির জলের স্রোতে কুরমান দেখে কাদা মাটির ঘোলা ময়লা, 'পচা দামের জঞ্জাল, মড়ার মাংসের গন্ধ'। দাম্পত্য জীবনের একই আবহে দুজনের অবস্থান হলেও দুজনের জীবনবোধে বৈপরীত্য দেখা যায়। স্বামী কুরমানের মানসিকতার ভিন্ন মেরুতে নূরবানুর অবস্থান। নূরবানুর কাছে দাম্পত্য ভালোবাসার মূল্য অসীম, তাই সে স্বামিগৃহে প্রত্যাবর্তনের শর্ত পূরণ করে স্বামীর সোহাগে ছোট ঘরের কোণে

ফিরতে চেয়েছিল। কিন্তু কুরমানের প্রাচীনপন্থী কঠোর অবস্থান তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নূরবানুর ভালোবাসার পরাজয় ঘটে কুরমানের বিদগ্ধ হৃদয়ের কাছে। জীবনবোধের সীমাহীন বৈপরীত্য তাদের দুজনকে পৃথক হতে বাধ্য করেছে।

আবহমান বাংলার শিক্ষাবঞ্চিত সমাজে দম্পতির মধ্যে স্ত্রীকেই সামাজিক ও পারিবারিক জটিল সম্পর্কগুলোর মূল্য দিতে হয় বেশি। স্বামীর হঠাৎ রাগান্বিত হওয়ার মূল্য, বিচ্ছেদের মূল্য, সতীত্বের প্রতি সন্দেহের মূল্য আর অন্যের ঘরে অনিচ্ছা সত্ত্বে যেয়ে আবার ফিরে আসার গ্লানিময় অবিশ্বাসের মূল্য। দুটি নরনারীর ভালোবাসার চেয়ে দেহগত শুচিতা তীব্র হয়ে উঠেছে 'নূরবানু' গল্পে। নারীমনে প্রথাগতভাবে গ্রোথিত থাকে স্বামীর প্রতি ভালোবাসার পূর্ণ মর্যাদাবোধ। অপেক্ষাকৃত সবল পুরুষ নারীর এই নম্র ভালোবাসকে দুর্বলতা মনে করে নিজের বাহুবলের জয় ঘোষণা করে। নুরবানু তার সহজাত নারী প্রবৃত্তি দিয়ে উকিলদ্দি রচিত দুর্ঘটনার প্রতিবাদ করেছে। সেই প্রতিবাদ মুখর মুহূর্তটি লেখক বর্ণনা করেছেন –

'কইগো বিবিজান, দেখ এসে কী এনেছি।

বেরিয়ে আসতে নুরবানুর চক্ষু স্থির। রূপোর জেওর দেখে নয়, চোখের উপরে বাঘ দেখে।

অনেক ভয় ডর নুরবানুর। এক নম্বর মালেক, দু নম্বর মুনিব তিন নম্বর দফাদার, চার নম্বর একটা মাংস খেকো জানোয়ার।

চলে যান এখান থেকে। চোখে মুখে আঁচ ফুটিয়ে ঝাপসা গলায় বললে নুরবানু।

তোমার জন্যে লবেজান হয়ে আছি। এই দেখ, জেওর এনেছি গড়িয়ে। দরকার নেই। আপনি চলে যান। নইলে সোর তুলব এখুনি।' (প্রে.গ/১৪৫) কিন্তু নূরবানুর এই প্রতিবাদের ভাষা বুঝতে অপারগ কুরমান একচেটিয়া রাগ আর অধিকার নিয়ে সহজাত সন্দেহের বশে তালাক দিয়ে বসে। তার কাছে 'মনে হল নুরবানুই যেন লাঠি মারলে। মনে হল কুরমানের মারের থেকে উকিলদ্দিকে বাঁচাবার জন্যেই তার এই চোটপাট। উকিলদ্দির গায়ে পড়ে তাই এত সাধ্য সাধনা। কুরমান দিশেহারার মত চেঁচিয়ে উঠল। এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক–বাইন।' (প্রে.গ/১৪৬)

ভালোবাসার মোহে ঈর্ষান্বিত কুরমান নুরবানুকে সমাজের প্রচলিত নিয়মে ভাসিয়ে দেয়। এখন নুরবানু তার কেউ নয়। যাকে ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, অনেক বকুনি আর নির্মম প্রহার করা যায়–সেই নুরবানু 'এক কাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল... যেন কুরমানকে গোর দেওয়া হয়েছে। পুঁতে রেখেছে মাটির নীচে।...সামান্য কটা মুখের কথা এমনি করে সব নাস্তানাবুদ করে দিতে পারে এ কি জানত! কুরমানের নিজের রাগ নিজেকে যেন কুরে কুরে খাচ্ছে।' (প্রে.গ/১৪৭)

অসহ্য ব্যথায় অসহায় কুরমান তাই প্রহর গোনে সামাজিক বিচার সালিশ শেষে কখন নুরবানু তার ঘরে ফিরে আসবে। কিন্তু 'কোথায় নুরবানু! চৈতী মাঠের মত বুকের ভিতরটা খাঁ খাঁ করে। কিন্তু রাত করে লুকিয়ে

একদিন আসে নুরবানু। যেন খুব একটা অন্যায় করেছে এমনি চেহারায়। কুরমানের থেকে অনেক দূরে সরে বসে আঁচলে চোখ চাপা দিয়ে কাঁদে।' ইচ্ছে করলেও এখন নুরবানুকে স্পর্শ করার তার কোন অধিকার নেই। যে ছিল এত কাছে এখন সে যোজন যোজন দূরে। 'কুরমানের ইচ্ছে করে পাখিটাকে বুকের উমে করে উড়াল দিয়ে চলে যায় কোথাও! কোথায় তা কে জানে? যেখানে এত প্যাঁচঘোঁচ নেই, যেখানে শুধু দেদার মাঠ আর দেদার আসমান।' (প্রে.গ/১৪৯)

নূরবানু পারেনি তার প্রিয় সঙ্গীকে স্পর্শ করে জ্বর অনুভব করার। এখন যে 'কুরমান পরপুরুষ। তবু প্রবল জীবন বোধে বিশ্বাসী 'নূরবানুর চোখে কত বিশ্বাস আর স্নেহ' স্বামীকে ফিরে পাবার কী তীব্র ব্যাকুলতা! অথচ এই স্বামী একদিন তাকে অবিশ্বাস করে তার ভালোবাসার ও একনিষ্ঠতার সম্মান না দিয়ে পর করে দিয়েছিল। আজ সেই স্বামীর কাছে ফিরে যাবার জন্য নুরবানুর প্রতীক্ষার প্রহর যেন শেষ হয় না।

বিকেলের রোদ উঠোনটুকু থেকে যখন যাই যাই করছিল সে মুহূর্তে নুরবানু প্রবেশ করল কুরমানের আঙ্গিনায়। ফিরে এসেছে সে তার আকাঙ্ক্ষিত আর বহু প্রত্যাশিত স্বামীর কাছে। কিন্তু তার পরনে জামরঙের নতুন শাড়িতে খুশির জলের যে স্রোত বইছে তাতে যে ঘোলা জলের চিহ্ন। কুরমানের মনে হয় সে জল স্নানের অযোগ্য। পরিশেষে তার নির্মম আদেশ– 'তুই ফিরে যা দফাদারের বাড়িতে।'

তথাকথিত পুরুষ সমাজের নিষ্করুণ প্রতিনিধি কুরমান নিজের খেয়াল খুশিতে, সন্দেহের আগুনে দগ্ধ হয়ে নিরপরাধ নুরবানুকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। আবার তাকে ফিরে পাবার জন্য তাকে যে সামাজিক নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে মনের আগোচরে সেই নিয়মেও নেই তার একনিষ্ঠতা। সে প্রতিবাদমুখর নয় আবার নিয়মের অধীনও নয়। শুধু নিয়মের মধ্যে পড়ে জীবনযন্ত্রণার দু:সহ গ্লানিতে সময় নির্বাহ করতে হয় অসহায় নারীদের। আর এই নারীর অসহায়ত্ব অত্যন্ত সাবলীলভাবে বিধৃত হয়েছে এই 'নুরবানু' গল্পে। দরিদ্র কুরমানের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী হিল্লা বিয়ের পর 'সারা অঙ্গে খুশির জলের স্রোতের' শাড়ি পরে ফিরে আসে। প্রিয়তমা স্ত্রীকে অচেনা মনে হয় তার। মনে হয় তার সারা অঙ্গে খুশির ঝিলিক উপচে পড়ছে। কিন্তু কুরমানের কাছে এ খুশির আলোতে রয়েছে অন্ধকারের আভাস। তার স্বামীত্ব মেনে নিতে পারেনি 'গত রাতের সুর্মা টানা' চোখের আকুতি। স্বামী স্ত্রীর পবিত্রতার বন্ধনে 'মড়ার মাংসের গন্ধ' বড় বেশি বেমানান। আর সে কারণেই ফিরে যেতে হয় তাকে। নূরবানু ভালোবাসার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছে কিন্তু বাধ সেধেছে দৈহিক পবিত্রতা। প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এই ভালবাসার কোন মূল্য নেই। ফিরে যেতে বাধ্য হয় নূরবানু কুরমানের জীবন থেকে। নূরবানু দৈহিক শুচিতার কারণে ভালোবাসাময় জৈবনিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে পারেনি আর যশোমতী দেহগত শুচিতাকে অগ্রাহ্য করে ভালোবাসাপূর্ণ জীবন সৃজনে প্রয়াসী হয়ে প্রথাগত সমাজের রীতিনীতিকে অতিক্রম করেছে।

জীবনের জটিলতার চিত্র অঙ্কন ও রহস্য বিশ্লেষণে গল্পকার অচিন্ত্যকুমার ছিলেন বস্তুনিষ্ঠ শিল্পী। ধূসর অমানবিকতা, নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের নিরুপায় ব্যর্থতা, ও শ্বাসরুদ্ধকর বিষাক্ত জীবনপ্রবাহের পরিচয় পাওয়া যায় এ

গল্পে। দ্বান্দ্বিক মানসিকতায়, দ্বিধার অবকাশে অমূল্য প্রেমের রত্ন নুরবানুকে জীবনের তরে হারিয়ে ফেলে কুরমান। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কর্ণধার পুরুষের খামখেয়ালিপনায় তথাকথিত সতীত্বের অজুহাত তুলে নারীত্বের তীব্র অবমাননা লেখকের জীবনবোধকে পীড়িত করেছে। কাহিনী বিশ্লেষণের অভ্রান্ত নৈপুন্য, আবেগের তরঙ্গায়িত ভাষা ও মর্মভেদী দৃষ্টির সাহায্যে অচিন্ত্যকুমার জীবনের রহস্যের মীমাংসা অনুসন্ধান করে ফিরেছেন প্রতিনিয়ত।

'দাঙ্গা' গল্পের মূল প্রেক্ষাপট দাঙ্গার আড়ালে মানবীয় জীবন চেতনার প্রকাশ। মমিনা জিন্নাত পরস্পরকে ভালোবাসলেও দুজনের জীবনবোধে অপরিমেয় পার্থক্য লক্ষ করা যায়। মমিনার চাঞ্চল্যে প্রেমের শাশ্বত রূপ ফুটে উঠেছে। ঘর বাঁধার স্বপ্নে বিভোর মমিনা দাঙ্গা কোলাহলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। দুজনের বিয়ে হলেই 'বাঁশের নড়বড়ে সাঁকো আবার শক্ত কাঠের পোল হয়ে উঠবে। দু গ্রামে ফিরে আসবে মিল মহব্বত।' কিন্তু মমিনার আশা আকাঙ্ক্ষা কিংবা চিন্তা ভাবনার সাথে জিন্নাতের মানসিকতার বৈপরীত্যের প্রতিফলন দেখা যায়। জিন্নাত মমিনার ভালবাসাকে অবহেলাভরে উপেক্ষা করে। তার সমস্ত ভাবনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে জমি আর চর দখল। সামান্য একজন মেয়েকে বিয়ে করে এমন বড় কোন্দল মিটে যাবে, এই বিষয়টি তার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে ঠাঁই পায়না। ভালোবাসার শক্তির অসামান্যতা সম্পর্কে সে অবগত নয়। ভালোবাসা পাষাণ হৃদয়ের মানুষের অনুভূতিতে নাড়া দিয়ে পরিস্থিতি নিমিষেই পাল্টে দিতে পারে। কিন্তু জিন্নাতের জীবনবোধে ভালোবাসার চেতনা অস্তিত্বহীন। সেখানে মমিনার মত মহৎ নারীর হৃদয়ের অনুভূতি তার কাছে অবহেলিত। তাই সে কাপুরুষের মত পালিয়ে গেছে ভালোবাসার এতটুকু প্রতিদান না দিয়ে। ভালোবাসার দায়িত্ব গ্রহণে অপারগ জিন্নাত কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে পরাজয় বরণ করেছে। তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখা চর দখলের চিন্তা তার জীবন বোধকে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করেছে।

ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ দাঙ্গাময় দুটি দলের অভ্যন্তরে অশান্তিময় ঝগড়া ফ্যাসাদের মাঝেও কীভাবে শান্তির সুশীতল বাতাস বইয়ে দেয়া যায় তাই ছিল মমিনার মনোভাবনা। শান্তির শ্বেতকবুতর মমিনা ভালোবেসে জয় করতে চেয়েছিল যুদ্ধবাজ দুই চরদখলদারদের মনোজগতকে। যাদের কাছে 'বুকের মাংসের চেয়ে জমি দামী আর স্বত্বের চেয়ে বড় দখল।' চরদখলের এই ভয়াবহ পরিবেশের কথা উঠে এসেছে লেখকের লেখনীতে--

'উঠন্ত রৌদ্রে ঝলসে উঠল অনেক পালিশ করা শানানো লৌহমুখ, উড়ল অনেক ধুলো মাটি, ফিনকি দিয়ে ছুটল অনেক কাঁচা রক্তের তোড়। যার আর্তনাদ করার কথা সেও উন্মত্ত, ক্রুদ্ধ উল্লাস করছে। অস্ত্র ফেলে দিয়ে যার মাটি নেওয়ার কথা সেও লাথি ছুঁড়ে মারে।' (প্রে.গ/১৫৩) এই হিংসাত্মক অনল প্রবাহের মাঝেও মমিনা ভালোবেসেছে জিন্নাতালিকে। মনে মনে ভেবেছে চরদখল নিয়ে এই যুদ্ধবিগ্রহের আগুন শুধু তারাই পারে নির্বাপণ করতে। তাই অবরুদ্ধ নির্যাতিত জিন্নাতালিকে মুক্ত করতে মুক্তির বারতা নিয়ে আসে মমিনা। প্রগাঢ় মমতায় স্পর্শ করে জিন্নাতালির জ্বরের কপাল। আর জিন্নাতালি অনুভব করে 'সত্যি, সমস্ত জ্বর জ্বালা, ব্যথা বেদনা যেন সব উবে গিয়েছে এক পরশে। ফুটন্ত গায়ের রক্ত ঝিমিয়ে পড়ল। চোখে লাগল যেন ঘুমের আমেজ। নতুন ফোটা কদমের

গন্ধ পাচ্ছে মৃদু মৃদু।' (প্রে.গ/১৫৪) কোন বাঁধন যে শুধু একজনের নয়, এ বাঁধন যে দুজনেরই তাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মমিনার সরল স্বীকারোক্তিকে। 'দড়ির গিঁট খুলে দিতে লাগল মমিনা। এ করছ কি মমিনা, বাঁধন খুলে দিচ্ছ গা থেকে? হ্যাঁ, ছোট ছোট আঙুলে বিন্দু বিন্দু স্পর্শের শিশির ঢেলে ঢেলে মমিনা বললে, এ বাঁধন যে আমাকেও বেঁধে রেখেছে আষ্টে পৃষ্টে।' (প্রে.গ/১৫৪) এই বাঁধন দুজনকে বাঁধবে। সৃষ্টি হবে মহামিলনের সঙ্গীত। যুদ্ধ মুখর দুই দলের মাঝে সূচিত হবে মৈত্রীর বাণী। হিংসা বিভেদ ভুলে সবাই গেয়ে উঠবে সৌহার্দ্যের রাগিণী। আর সে কথাই মমিনার মুখে উচ্চারিত হয়েছিল গভীর ভরসায়– 'আমাদের বিয়ে হয়ে গেলেই ঝগড়া বিবাদ মিটে যাবে দু পক্ষের। যে চর আমার বাজান বলেছে আমার, আর তোমার বাজান বলেছে তার, সে চর তারা দুয়ে মিলে আমদের দুজনকে দিয়ে দেবে।' (প্রে.গ/১৫৫)

কিন্তু নারী পুরুষের বৈষম্যের চিরন্তন প্রথা যে পুরুষ তার চেতনায় ধারণ করে সে কি এত সহজে মুক্ত হতে পারে নারীকে তার ভালোবাসার মর্যাদা দিয়ে? পারে না। আর সে কারণেই জিন্নাতালির এত হীনম্মন্যতা, এত আশঙ্কা। হিংসায় প্রমত্ত মানুষের কাছে মনুষ্যত্ববোধ তথা প্রেমময় জীবনবোধ তুচ্ছ। আর তাই জিন্নাতালি ভাবে–'এমনি করেই বুঝি সমাধান হবে, এত সব হাঙ্গামা-হুজ্জুতের, আক্রোশ আক্রমণের! একটা মেয়েকে বিয়ে করে! ঘরের বিবি বানিয়ে। এত হুড়-দঙ্গল, কলহ কোন্দল, চোট জখম, এত রক্তপাত–সব এমনি করে রফা নিষ্পত্তি হয়ে যাবে! এমনিভাবে ভুলে যেতে হবে হার মার, ঘায়ে মলম লাগাতে হবে মোলাম করে। বাজানকে গিয়ে বলবে, মোল্লার কাছে কেতাব কলমা পড়ে এসেছি আমরা, এবার ছোলেনামা দাখিল করে দাও আদালতে। সে না মরদের বাচ্চা?' (প্রে.গ/১৫৬) নারীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে ভালোবাসার মহিমায় মহিমান্বিত করে জীবনবোধ প্রতিষ্ঠা করতে জিন্নাতালির মত পুরুষের সীমাহীন কুণ্ঠা। আর তাইতো সাহসী দৃপ্ত পদচারণায় সকল অন্যায়ের প্রতিবাদী না হয়ে ভীরু কাপুরুষের মতো পালিয়ে যায় রাতের অন্ধকারে। জিন্নাতালির এই কাপুরুষতা তাকে যেমন অন্ধকার আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে তেমনি নির্ভীক প্রেমচেতনার কারণে মমিনা প্রতিভাত হয়েছে অন্ধকার আকাশে তারার মতোই দীপ্তিময়ী রূপে। মমিনা ভালোবেসে জয় করতে চেয়েছিল দুই পরিবারের দ্বন্দ্ব মুখরতাকে। কিন্তু নারীত্বের কাছে নিজের তথাকথিত পুরুষত্বকে বিকিয়ে দিতে চায়নি বলে জিন্নাত নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলে এসেছে মমিনার কাছ থেকে। একটা সাধারণ মেয়েকে বিয়ে করে যদি সমস্ত হাঙ্গামা হুজ্জতের অবসান হয় তবে তার পুরুষত্বের দাম থাকে না, তাই পালিয়ে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করেছে কাপুরুষের মত। মমিনা প্রেমময় জীবনচেতনায় যতটা উজ্জ্বল ও প্রভাময় জিন্নাত ততোটাই ম্লান ও নিষ্প্রভ। জিন্নাত প্রথাগত পুরুষ সমাজের অনুন্নত মানসিকতার অধিকারী। নারী এখানে অবহেলিত। আর সে কারণে মমিনার মত প্রাণবন্ত নারীর প্রেমচেতনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কাপুরুষের মত পালিয়ে যায় সে। এখানে নূরবানু ও মমিনা দু'জনই পুরুষদের খামখেয়ালী ও ঔদাসীন্যের শিকার।

এ গল্পের শিল্পসৌকর্য, প্লট উন্মোচন ও সমাপ্তি নির্মাণে লেখক বিস্ময়কর নৈপুন্য দেখিয়েছেন। বাহুবলের জয়কে টিকিয়ে রাখার জন্য বিবেককে বলি দিয়ে অন্যের অন্তরকে নিস্পৃহভাবে ক্ষত বিক্ষত করার যে নির্মমতা সে বিষয়টি এখানে শৈল্পিক ভাবে নিরূপিত। পুরুষের পেশিবলের কাছে নারীর ভালোবাসা ভূলুণ্ঠিত ও অবহেলিত হয়ে প্রতারণার সম্মুখিন হয়, মূলত এই দিকটিই অচিন্ত্যকুমারের জীবনবোধকে শাণিত করে পাঠকচিত্তকে স্পর্শ করেছে।

ভালোবাসাময় সুখাবহ মিলনবাসরে পরিণত না হয়ে কীভাবে পর্যবসিত হয় ক্রোধে আর তা থেকে জন্ম নেয় শোধবোধের-সে কথাই **'শোধ'** গল্পে সুনিপুণ সংলাপের মাধ্যমে বিধৃত হয়েছে। তোষিনীর বাবা যজ্ঞেশ্বরের অর্থলিপ্সা আর মিথ্যচারিতায় বিপর্যস্ত হয় দুটি জীবন। ভালোবাসাকে পরাজিত করে জয় হয় অন্য এক প্রবৃত্তির, যার তার নাম শোধ।

গরিব ঘরের কুমারী মেয়ে তোষিণী। প্রথম দর্শনে যাকে দেখা যায় 'গলার নিচে ব্লাউজের প্রান্তে ফাউন্টেন পেনের ক্লিপ আটকানো, একটি গ্রাম ঘেঁষা শাদাসিদে মেয়ে। পরনে ময়লা আটপৌরে শাড়ি, পায়ে কাদামাখা স্যান্ডেল। দেহখানি দারিদ্র্য ও অযত্ন দিয়ে ঢাকা– মনে হয় এই দারিদ্র্যে আর অযত্নে সৌষ্ঠব বেড়েছে মেয়েটির।' (এ.অ.এ.র্/৩১) গল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোষিণীর চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন ফ্রিস্টুডেন্টশীপ চেয়ে দরখাস্তের কোন উত্তর আছে কিনা তা জানার আশায় ছোট ভাইকে নিয়ে রথীনের কাছে আসে। যাবার সময় ছোট ভাইয়ের সাথে কথোপকথনের এক পর্যায়ে রথীন যখন জানতে পারে যে তারা পায়ে হেঁটে এসেছে তখন 'মানিব্যাগ থেকে একটা এক টাকার নোট বের করল রথীন। তোষিণীর হাতের মধ্যে গুঁজে দেবার চেষ্টা ক'রে বলল, 'কেন হাঁটবে? সটান বাসে ক'রে চ'লে যাও।' যেন সাপে কেটেছে এমনি আতঙ্কে সংক্ষিপ্ত আর্তনাদ করে উঠল তোষিণী। সারা শরীরে প্রতিবাদের ঝঙ্কার দিয়ে বললে, না, না, ছি, ছি, ওকি–'
হাত গুটিয়ে নিল রথীন। অভিমানমাখা মুখে বললে, 'এ তো আর কিছু নয়, সামান্য বাসভাড়া। এতে এত ক্রুদ্ধ হবার কি হয়েছে? কথা বলল না তোষিণী। বড়ো বড়ো পা ফেলে এগিয়ে যেতে লাগল।' (এ.অ.এ.র্/ ৩৯) প্রচণ্ড দীনতার মধ্যে অবস্থান করেও পরের অনুগ্রহ গ্রহণ না করার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তোষিণীর জীবনবোধকে অনন্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

আরেকটি ঘটনায় তোষিণীর প্রখর আত্মসম্মান বোধ পরিলক্ষিত হয়। ছলনা মিশ্রিত দানকে সহ্য করতে পারেনি তোষিণী। তাই তো মাকে বলে 'মা এসেছে। টাকাটা ফেরত দিয়ে দাও।'
হ্যাঁ, বাবা, তোমার টাকাটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও।' 'কিসের টাকা? পেটের কথা মুখের মধ্যে আটকে রেখে পাথর হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রথীন। 'যে পঁচিশ টাকা বই কেনা বাবদ তুমি দিয়ে গিয়েছিলে সেদিন–' আঁচলের গিঁট খুলতে লাগল নয়নতারা।
'সে কি?'

যা প্রাপ্য নয় যা শুধু দান তা আমরা পারব না নিতে। দুঃখে দারিদ্র্যে দিন যাচ্ছে বটে তবু পারব না ভিক্ষে নিতে। আমরা ওঁর কাছে সাহায্য চাইতে পারি কিন্তু ভিক্ষে চাই নি। তাছাড়া সে সাহায্যের সীমা-সংজ্ঞা নির্দিষ্ট ছিল। যে টাকার মধ্যে মিথ্যে মেশানো আছে, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে এবার স্পষ্ট উচ্চারণ করল তোষিণী, 'তার মধ্যে অপমানের ধুলো।' (এ.অ.এ.র/৪৩)

রথীন তোষিণীর প্রতি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে ভাবে 'আশ্চর্য, দুঃখে কষ্টে অভাবেও তখুনি-তখুনি টাকাটা ব্যয় হয় নি। যত্ন করে রেখে দিয়েছে মায়ে-ঝিয়ে। আগে যাচাই ক'রে নিতে চেয়েছে টাকাটা ঠিক হকের কিনা, সত্যের কিনা–শুদ্ধের কিনা। আশ্চর্য, এখনো এত সূক্ষ্ম হিসেব! নাচতে নেমে ঘোমটা! পরক্ষণেই তোষিণীর আবেগপ্রবণ উচ্চারণ 'আপনার টাকা ফেরত দিলাম বটে কিন্তু আপনাকে নয়।'

তোষিণীর কোন কোন সংলাপ তার জীবনচেতনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে। যেমন 'আমাদের অদৃষ্টে আবার ঘাস হয়ে চন্দ্রমল্লিকা!' কিংবা 'আপনি ধার দেবেন বাবাকে, ভিক্ষে দেবেন না।' আবার বলতে শোনা যায় 'বৃষ্টির শব্দ নিয়ে কত কবিত্ব শুনি। কিন্তু যখন টিনের চালের পরে পড়ে, উঃ সে কী ভীষণ যন্ত্রণা, শান্তি সুখ সব জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়।' (এ.অ.এ.র/৪০)

গল্পের শেষ পর্যায়ে দেখা যায় যজ্ঞেশ্বরের টাকা আত্মসাৎ কেন্দ্রিক মামলা। দলিল, দস্তাবেজ, নিরপেক্ষ সাক্ষী না থাকায় সেই মামলা ডিসমিস। আর তখনি আদালত প্রাঙ্গনে 'ঠিক রথীনের চোখের উপর কান্না ভর ভর চোখ ফেলল তোষিণী: এই অপমানের তুমি শোধ তুলবে না? আজও না, এখনো না? সত্যকে এমনি ক'রে হেরে যেতে দেবে? তোমার জন্যে সকলের সামনে এই লাঞ্ছনা সওয়া ব্যর্থ ক'রে দেবে?' (এ.অ.এ.র/৪৯) এ প্রশ্নের যথাযথ ভালোবাসা মিশ্রিত কোন উত্তর পায়নি তোষিণী রথীনের কাছ থেকে। কারণ, রথীনের কাছে তখন যজ্ঞেশ্বরের অর্থলিপ্সার বিষয়টি প্রকট হয়ে উঠেছে। একদিকে জমানো টাকার সবটুকু বিনষ্ট হওয়া, অন্যদিকে মিথ্যে মামলায় পরাজিত হওয়া - এই দুটি কারণ রথীনকে মারাত্মকভাবে ক্রোধান্বিত করে তোলে। বাধ্য হয়ে যজ্ঞেশ্বরের কদর্য মানসিকতার কুৎসিত আচরণের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে রথীন তার সুপ্ত ভালোবাসাকে জলাঞ্জলি দেয়। পিতার অপরাধে কন্যাকে ভালোবাসার ঘরে বরণ করে নিতে কুণ্ঠিত রথীন তাকে ফিরিয়ে দেয় অন্ধকারে। কঠিন হৃদয়ে বন্ধ করে দেয় ঘরের দরজা। সঙ্গে সঙ্গে তোষিণীরও ভালবাসা আর মমতাময় জগতের উন্মুক্ত দ্বার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। প্রতিশোধ ব্যর্থ করে দেয় রথীন ও তোষিণীর জীবন। যে জীবনে ভালোবাসার প্রদীপ জ্বালাতে অভাব হয়তো কোন বাধা হয়ে দাঁড়াতো না। কিন্তু প্রচণ্ড অর্থলোভ কঠিন বজ্রপাতের মতো স্তম্ভিত করে দেয় দুটি জীবনকে। বিচ্ছিন্ন হয় দুটি জীবনের গতিপথ, ধুলোয় লুণ্ঠিত হয় ভালোবাসার অপ্রস্ফুটিত পুষ্পদাম।

'তোষিণী' চরিত্রের বাস্তবানুগ বিন্যাস ও ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ ঘটিয়ে অচিন্ত্যকুমার তাঁর স্বকীয়তাকে চিহ্নিত করেছেন 'শোধ' গল্পে। দারিদ্র্য লাঞ্ছিত ভয়াবহ বর্তমান তোষিণীর ব্যক্তিত্বের উষ্ণতাকে তেজহীন করতে পারেনি

এতটুকু। নিগূঢ় গভীর জীবনদর্শন থেকে সৃষ্টি হয় লেখকের পরিমিতিবোধ বা সংযমচেতনা। রথীন-তোষিণীর প্রণয়বোধের দ্বন্দ্বময় বিকাশের রূপ অঙ্কন করে মানব মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম প্রান্তসমূহ লেখক উন্মোচন করেছেন এই চেতনারই পরম সাহচর্যে। যখন দুজনের সম্পর্কে মিত্রতা স্থাপনের ক্ষেত্রে পরস্পরনৈকট্য আর কোনভাবেই সহায়ক হয়ে ওঠে না, যখন নিজ নিজ মনের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য উভয়ের কিছুটা দূরত্ব ও সময় আবশ্যক তখন কিন্তু অচিন্ত্যকুমার সে বিষয়ের ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ না করে কেবল অনাসক্তভাবে তথ্য পরিবেশনেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন- এ তাঁর জীবনানুভূতিরই এক নির্মল রূপ, নি:সন্দেহে বলা যায়। এ গল্পের কাহিনীর গতি সৃষ্টিতে, পরিণাম নির্ণয়ে এবং সর্বোপরি রথীন-তোষিণীর প্রণয় সম্পর্কের টানাপোড়েনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে দারিদ্র্যের কঠোর বাস্তবতা। উভয়ের প্রাণস্পন্দনের এই অনুভব জীবনের সেই গভীর ও চিরায়ত সত্য প্রেমবোধকে যেন বাঙ্ময় করে তুলেছে অকৃত্রিমভাবে।

অর্থলালসা ও স্বার্থতাড়না মানুষকে চরম বিবেকবর্জিত ও মনুষ্যত্বগুণহীন করে তোলে। অর্থের কাছে পরাজয় বরণ করে সকল শুভবোধ, মানবীয় আবেগ-অনুভূতি, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের সৌন্দর্য। মানুষের বিপন্নতার সুযোগে মুনাফালোভী চক্রের অমানবিক ও নারকীয় কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে সংঘটিত হয় মানবতার লাঞ্ছনা। পরিলক্ষিত হয় সর্বগ্রাসী দুর্নীতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয়। অর্থ ও প্রতিপত্তির কাছে হৃদয়াবেগ, মায়া-মমতা-সবই মূল্যহীন। জাগতিক কদর্য লোভ মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে, তাদের অনুভূতিকে ভোঁতা ও নির্জীব করে দেয়, মানুষের নীতিধর্ম ও ঐতিহ্য অনুগত মূল্যবোধকেও বিপর্যস্ত করে দেয়। অসৎ মানসিকতার সমৃদ্ধিতে রুচিবোধ, সংস্কৃতি চেতনা, মূল্যবোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে অবক্ষয় দেখা দেয় তারই বাস্তবরূপ অঙ্কিত হয়েছে অচিন্ত্যকুমারের বিভিন্ন গল্প সমূহে।

অচিন্ত্যকুমারের **'ছুরি', 'হরেন্দ্র' ও 'তিরশ্চী'** গল্পে মফস্বলের বড় সাহেব ও ছোটসাহেবদের পরিচয় বিভিন্ন আভাস ইঙ্গিতে প্রতিভাত হয়েছে। কিন্তু তাঁদের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে 'অকারণ' গল্পে। শুধু সাহেবরাই নন, তাদের মেমরাও একে অন্যের সাথে রেষারেষিতে লিপ্ত থাকেন। হিংসা-দ্বেষ আর আভিজাত্যবোধের কমপ্লেক্স নিয়ে এদের অস্থিরতায় ভরা বিচিত্র জীবন। মফস্বলের অভিজাত এলাকায় আচার আচরণে, কথাবার্তায় ভদ্রতার মুখোশ পরা এক অদ্ভুত সামাজিক জীব এঁরা। আধুনিক কথাসাহিত্যে এঁদের চরিত্র চিত্রণে অচিন্ত্যকুমার অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন। এ গল্পে দাস-সাহেবের সঙ্গে রায় গৃহিণী সর্বাণীর অবাধ সখ্যই কুৎসামুখর কলগুঞ্জনের সৃষ্টি করেছে। এঁদের উন্নাসিকতা ও অসংযমের মুখোশ টেনে খুলে ফেলতে লেখকের ক্ষুরধার বক্রোক্তির ব্যবহার গল্পের প্রবহমানতাকে সাবলীল বেগে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু শুধু ব্যঙ্গ উপহাস হাস্য রসিকতাই নয়, মনস্তত্ত্বের অতল গভীরতায়ও শিল্পীর দৃষ্টি ডুব দিয়েছে। দাস সাহেব আর সর্বাণীর ঘনিষ্ঠতা নিয়ে কুৎসা রটনা কি নিতান্তই অকারণ? সর্বাণীর অনুযোগের ফলে দাস সাহেবের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের চক্রান্তে যে ভোজবাজি হয়ে যায় তারই অন্তিম দৃশ্যপটে সর্বাণীদের বিদায়লগ্নে মনের লুকোচুরি খেলার স্বরূপ উৎঘাটিত

হয়েছে। সর্বাণীরা উচ্চতর পদে অন্যত্র বদলি হয়ে যায়, সুতরাং এখন দাস সাহেবের অন্তরঙ্গতা, বন্ধুতা তার অনভিপ্রেত। স্বার্থসম্বন্ধ যেখানে তিরোহিত সেখানে সখ্য টিকিয়ে রাখা নিতান্তই বাতুলতা মাত্র। তাই দুপুরে দাস সাহেব যখন সর্বাণীদের গৃহে তার সাথে দেখা করতে যায় তখন সে স্পষ্টভাবে, দ্বিধাহীন চিত্তে রূঢ় ভাষায় জানিয়ে দেয়, স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন বন্ধুর সাথে দেখা করাকে সে শিষ্টাচার বহির্ভূত বলে মনে করে। দাস যেন আকাশ থেকে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হয়। তার এতদিনের আচার আচরণ, মোহময় নৈকট্য একমুহূর্তে সম্পূর্ণ অনাবৃত হতে দেখে তিনি রুদ্ধ আক্রোশে পশ্চাদপসরণ করেন। দাস সাহেবের চরিত্র চিত্রণে লেখকের পরিমিতিবোধের সূক্ষ্ম কারুকার্য গল্পটির মধ্যে বেশ চমৎকারিত্ব এনেছে। মফস্বলের আদালতের নৈমিত্তিক চিত্র অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে অঙ্কিত হয়েছে **'সাক্ষী'** গল্পে। মামলাবাজ ষষ্ঠী ভট্টাচার্যের মিথ্যা মামলার সাক্ষ্য দিতে যায় দুর্লভ প্রামাণিক। অত্যন্ত লোভী প্রকৃতির দুর্লভ ভাল করেই জানে তার সাক্ষ্যের ওপরই ভট্টাচার্যের মামলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে আছে। তাই এ সুযোগটা মোক্ষমভাবে কাজে লাগানোর জন্য যেভাবে পারছে জিনিসপত্র কিংবা সুবিধা আদায় করে নিচ্ছে। কখনো পান-সিগারেট কখনো টেপাবাতি, শার্ট, গায়ের চাদর কিনে দেবার জন্য বায়না ধরছে। ষষ্ঠী ভট্টাচার্যও স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের প্রাণপণ চেষ্টায় দুর্লভকে খুশী রাখায় নিয়োজিত। কিন্তু দুর্লভ প্রামাণিককেও বোকা বানাবার মত উকিলের ঘাটতি নেই আদালত প্রাঙ্গণে। ভট্টাচার্য মশাই যখন দুর্লভের মনতুষ্টির জন্য রঙিন চাদর সংগ্রহে ব্যস্ত তখন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিপক্ষের ধূর্ত উকিলের জেরায় দুর্লভ নাজেহাল, বিপর্যস্ত। আদালত জীবনে নিত্যলীলারসিক এসব প্রতিদিনের চরিত্রকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত চিরদিনের ভাষায় গ্রথিত করে তোলেন। তিনি 'একশ এক গল্পের' ভূমিকায় বলেছেন-'যদি মানুষ দেখতে চাও তো দু জায়গায় যাও, আদালতে আর যুদ্ধক্ষেত্রে। দু জায়গাতেই মানুষ যেমন হীন তেমনি মহান। যেমন দয়ালু তেমনি নৃশংস।'[১৪]

জীবনবোধের নাটকীয় দিকপরিবর্তনের লীলারহস্য **'জনমত'** গল্পটিকে ভিন্নধর্মী স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছে। এখানে নাট্যধর্মিতা প্রবল থাকায় গল্পের মূলসুরে জীবনচেতনা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বছর পাঁচেক জেলে ছিল কাবুলিওলা মামুদ খাঁ। ফিরে এসে অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে সে লক্ষ করে, তার লুণ্ঠনের অবাধ উপনিবেশের ক্ষেত্রটির সম্পূর্ণ পরিসর আকস্মিকভাবে বদলে গেছে। এত কিছুর দ্রুত পরিবর্তন তার কল্পনাকে ছাড়িয়ে গেছে। সে অনুধাবন করল, জনসমর্থন তার একেবারেই নেই। খাতকেরা একজোট হয়ে তাকে ঢিল ছুঁড়ে মারে। লোকের দরজায় দরজায় মামুদ খাঁ ধারের টাকা চেয়ে বেড়ায়। বিনিময়ে শুধু পায় গলাধাক্কা, চোখ রাঙানি। ভোজালি আর লাঠির দাপট তার মিথ্যা হয়ে যায়। শোষিত জনগণের বেদম প্রহারে জর্জরিত হয়ে মামুদ খাঁ পালিয়ে যায়। হঠাৎ তার চির প্রতিদ্বন্দ্বী মহেন্দ্র সাপুই-এর কীর্তিকাণ্ড দেখে তার বোধোদয় হয়। সে জানতে পারে সম্ভ্রান্ত বধূ নিত্যগোপীর ঘরে মহেন্দ্র দুর্ভিক্ষের হাসপাতাল থেকে একশখানি লাল মোটা কম্বল সরিয়ে রেখেছে। জনশোষণে মহেন্দ্র তার চেয়েও হীন ও কদর্য অনাচারে লিপ্ত। নির্বোধ জনমতকে রুচিহীন ও কুৎসিৎ কৌশলে সে আয়ত্ত করেছে বলেই শোষণের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছে। মামুদ খাঁর মনে হল, মহেন্দ্রদেরও কপাল একদিন তার মত

ফাটবে। সেদিনের প্রত্যাশায় আজকের অপমানিত পরাজয়ের গ্লানি সে অনায়াসেই ভুলে যায়। লেখক মামুদ খাঁর অনুভূতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন 'মামুদ খাঁ তার রক্তমাখা উপরের ঠোঁটটা চাটতে লাগল। যেন যে রক্তের স্বাদটা জেনে রাখছে। টক-টক, নোনতা-নোনতা লোভের রক্তের স্বাদ। মহেন্দ্রদেরও কপাল যখন এক দিন ফাটবে তখন অনায়াসেই মনে করতে পারবে সে সেই রক্তের স্বাদ। জল দিয়ে তা সে আজ ফিকে করবে না।'(এ.এ.গ./৫০৪) এ গল্পে শুধু মামুদ খাঁর মানসপটের পরিবর্তনই প্রধান হয়ে ওঠেনি, নিয়তিবিশ্বাসী শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত জনমতের স্বরূপ নির্ণয়েও লেখকের বক্রোক্তি শানিত হয়েছে।

'ম্যাজিক' গল্পে যাদুকর সদাশিবের অর্থনৈতিক ও সংসার জীবনের অসহায়তার পাদপীঠে দূর আত্মীয় রাসেশ্বরীর প্রতি আকর্ষণ তার জীবনে পরাভবের চিহ্ন মুদ্রিত করে দিয়েছে। রেলওয়ে কর্মচারী সদাশিবের সংসার-জীবন সাধারণভাবে অতিবাহিত হলেও কর্মচারী ছাঁটাইয়ের কবলে পড়ে তাকে চাকরিচ্যুত হতে হয়। সংসার চালানোর প্রয়োজনে তাকে বেছে নিতে হয় যাদুকরের পেশা। ম্যাজিক দেখিয়ে স্বল্প আয়ের মাধ্যমে সে সংসার চালানোর চেষ্টা করেও বাস্তবে পরাজিত হয়। বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ও দোকানে জিনিসপত্র কেনার দেনা তার পক্ষে শোধ করা কোনক্রমেই সম্ভব হয় না।

সদাশিবের স্ত্রী অনুপমা বাথরুমে পড়ে যাওয়ার পরে তার শরীরের একদিক অবশ হয়ে সে শয্যাশায়ী হয়। তার স্ত্রীর দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় রাসেশ্বরীকে তার স্বামী সাত বছর আগে পরিত্যাগ করে অদৃশ্য হওয়ার পর সে অনুপমার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে সদাশিব ক্রমশ রাসেশ্বরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। গল্পে লেখক তার দৈহিক বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নরূপ:

'দেহের স্তবকে স্তবকে হাসি, শাড়ির পরলে পরলে। ন্যাকড়ার আগুনের মতো নিবেও নিবতে চায় না।"(যতনবিবি ১০৪) রাসেশ্বরীর সর্বাঙ্গে স্বাস্থ্য যেন ধরে না। থোলো থোলো স্বাস্থ্য নয়, ছেঁচা মজবুত চেহারা।'-(যতনবিবি পৃ:১০৫)

রাসেশ্বরী দিদির বাড়িতে এসে তার ভাঙাচোরা সংসারের হাল ধরার চেষ্টা করে। সদাশিবের যাদুর কৌশল তাকে আকৃষ্ট করার পর সে তার কাছে যাদু শেখার মনোভাব প্রকাশ করে। তার মনে গোপন ইচ্ছার সঞ্চরণ ঘটে, যাদু শিখে সে তার স্বামীকে আবার সংসারে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে সদাশিব কল্পনা করে তাকে যাদু শিখিয়ে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন সম্ভব হবে। দুজনে একসঙ্গে যাদু দেখিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করবে এবং রাসেশ্বরী মহিলা মহলে যাদু দেখিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে।

সদাশিবের যাদু দেখানো যে শুধু কৌশল তা রাসেশ্বরী বুঝতে পারেনি। সে বিশ্বাস করেছিল যাদুর মাধ্যমে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। ইতোমধ্যে একদিন সদাশিবের অসুস্থ স্ত্রী অনুপমার মৃত্যু হলে

রাসেশ্বরী তার দিকে চেয়ে তীব্র স্বরে বলে, ‘কাঁদলে চলবে না। আপনার ম্যাজিক দেখান বলছি। আপনার শেষ খেলা। টবের মরা গাছে ফুল ফোটান আপনি, দিদির দেহেও তেমনি প্রাণ নিয়ে আসুন।’

সদাশিবের জীবনে ব্যর্থতা পূর্ণ হয় স্ত্রীর শবদাহের পর। প্রয়াত স্ত্রীর স্থানে রাসেশ্বরীকে এবং রাসেশ্বরীর চলে যাওয়া স্বামীর স্থানে নিজেকে স্থাপন করতে সে গভীর রাতে রাসেশ্বরীর ঘরে প্রবেশ করে ম্যাজিক দেখানোর জন্যে। রাসেশ্বরী তার হাতের কৌশলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। সে জানে ম্যাজিকের কৌশলে মানুষকে মুগ্ধ করে তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় কিন্তু বাস্তবে তা মূল্যহীন। সে সদাশিবের দিকে তাকিয়ে তীব্র কণ্ঠে বলে, ‘চলে যাওয়া লোককে ফিরিয়ে আনার ম্যাজিক দেখাতে এসেছেন? কিন্তু আপনি কি আমার সেই চলে যাওয়া লোক?’ রাসেশ্বরী তার চলে যাওয়া স্বামীর স্থানে সদাশিবকে কখনো কল্পনা করেনি, আর সদাশিব তার মৃতা স্ত্রীর স্থানে রাসেশ্বরীকে যেভাবে কল্পনা করেছিল সেই মিথ্যা প্রকৃত সত্যি হতে পারেনি। সদাশিব নারীর বিস্তীর্ণ মনের মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি। রাসেশ্বরী তাকে এই সত্যই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে চোখের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে মনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। সদাশিব যাদু দেখিয়ে বিভিন্ন মানুষকে মুগ্ধ করতে সক্ষম হলেও রাসেশ্বরীকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। যাদুর কৃত্রিম মুগ্ধতায় অনুপমা আকৃষ্ট না হয়ে জীবনের আদর্শকে বড় বলে মনে করেছে। ‘ম্যাজিক’ গল্পে সদাশিবের পরাজয় ঘটেছে নারীত্বের কাছে।

ফার্স্ট ক্লাস অর্জনের জন্য প্রথাবহির্ভূত আচরণ **‘থার্ড ক্লাস’** গল্পের সুমিত্রাকে সাধারণ নারী পর্যায়ের বাইরের অঙ্গনে নিক্ষেপ করে। স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে শিক্ষক ও শিক্ষক-পুত্রকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করাতে দ্বিধা বোধ করে নি সে। শিক্ষক না শিক্ষক পুত্র ‘কোন ঘরে বেশি আশা’-এ চিন্তাই তাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে রেখেছে কিছুটা সময়। লাভের অঙ্কটা যখন ভট্টাচার্য স্যারের দিকেই বেশি তখন শিক্ষক পুত্র অশোককে তুচ্ছ অজুহাতে ছুঁড়ে দিতেও সময় লাগে নি ফার্স্ট ক্লাস অর্জনের পর। ডক্টর ভট্টাচার্যের চোখে সুমিত্রা আভাসিত হয়েছে এভাবে–‘বেশ দেখতে তো মেয়েটা, চোখে মুখে বুদ্ধির শান দেওয়া। কালচে রঙের টান-টান চেহারা, ক্ষণিক যৌবনে উদ্ধত, বেশ একটা ব্যক্তিত্বের ঝলক আছে।’ (এ.এ.গ./৮৫)

এ গল্পে নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের তনয়া সুমিত্রার উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিচয় প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে তার নীতিবোধটিও বিসর্জিত হয়েছে বার বার। অতি আধুনিকতায় আচ্ছন্ন সুমিত্রা উপরের সিঁড়িতে পৌঁছানোর জন্য সাধারণ মানবিকতাবোধকে বিপর্যস্ত করেছে। নিজের স্বার্থ সুবিধার ষোলআনা বজায় রাখার জন্য ইঞ্জিনিয়ার অশোককে ছুঁড়ে ফেলতে যেমন তার সময় লাগেনি তেমনি ভট্টাচার্য মহাশয়ের পাশের আসনে বসতেও সে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেনি। কৌশলপ্রিয় সুমিত্রা খুব সাবধানে চোখের কাজলকে গালে লাগতে দেয় নি। প্রচলিত সংস্কার বোধকে এড়িয়ে, অবহেলা করে নিজের লক্ষ্যের দিকে ঠিকই এগিয়ে গেছে। অ-সাধারণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুমিত্রার কণ্ঠস্বরে তাই অশোকের প্রতি ঝরে পড়ে ক্ষোভ ও ঘৃণা-মিশ্রিত কথা গুলো ‘ কিন্তু তুমি কি

আমার যোগ্য? তুমি তো মোটে আই. এস. সি পাশ, অর্ধ শিক্ষিত। একটা জ্ঞানীগুণী প্রোফেসর হতে, তবু না হয় একটা কথা ছিল। তুমি তো একটা মিস্ত্রি- থার্ডক্লাস' ।(এ.এ.গ./৯১)

ওপরের কথা গুলো প্রমাণ করে মানুষের প্রতি সুমিত্রার তাচ্ছিল্যবোধ। শুধু ওপরে ওঠার জন্য তার এই সংকীর্ণ মানসিকতা তাকে নারী হিসেবে সার্থক করে নি, পরিণত করেছে অহঙ্কার ও দম্ভভরা ফার্স্টক্লাস পাওয়া ক্ষুদ্র নারী ব্যক্তিত্বে। প্রকৃত মানুষ হতে হলে মানুষকে মনুষ্যত্ববোধের অধিকারী হতে হয়। অনুধাবন করতে হয় যে, শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি। মনুষ্যত্বের পরিচয়হীন মানুষ অর্থ ও লোভের খাঁচায় বন্দি পাখির মত, যে মুক্ত জীবনের স্বাদ থেকে বঞ্চিত। মানুষের সকল শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানবসত্তার প্রবৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন। কিন্তু সুমিতা শিক্ষাকে অন্তরের মধ্যে ধারণ করতে না পারায় তার মধ্যে মূল্যবোধের উজ্জীবন ঘটেনি। চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রভৃতি মননশীল অনুষঙ্গগুলো সুমিতার জীবনবোধকে আলোকিত করকে পারে নি। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েও অন্তরের হীনতা ও মালিন্যকে কাটিয়ে উঠতে পারে নি, অর্জন করতে পারে নি চিরকালীন সত্য ও সুন্দরের চেতনাবোধ।

'গঙ্গাযাত্রা' গল্পে বিদেশি দুঃস্থ ব্রাহ্মণ ভিন গাঁয়ে এসে রোগগ্রস্ত হয়ে মারা যায়। তার শেষ ইচ্ছা ছিল গঙ্গাপ্রাপ্তি। অসহায় স্ত্রী প্রমীলা গাঁয়ের মাথাদের সে কথা জানালে সেখানে বাঁধে এক বিপত্তি। মড়া বহনকারীর দল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গোল পাকিয়ে তোলে। টাকা পয়সা চিড়া-মুড়ির দর কষাকষি হিসেবের তর্কাতর্কিতে 'খাটুলিসুদ্ধ মড়া মুখ থুবড়ে পড়েছে রাস্তার পাশে। রাস্তার পাশে নালার মধ্যে'। এ অবস্থায় দু'দল ভাবল 'বিরানা বিদেশির জন্য' আর গাঁয়ে গাঁয়ে ঝগড়া কেন? 'তুমি কে না-কে-বামুন, তোমার জন্যে আমরা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হতে পারবো না। এরা-আমরা চিরকেলে বন্ধু পাতানো'। এ উপলব্ধি শেষে তারা ঠিক করল তিরপুনির মাঠে নদীর একটা দ আছে। তারই গাবায় পুঁতে দিয়ে আসবে মড়াটাকে। 'দশে মিলি করি কাজ, হারিজিতি নাহি লাজ'। হৃদয়হীন ছলকারীরা গঙ্গাধারের কিছু মাটির বাসন কোসন ও অন্যান্য জিনিস পত্র সঙ্গে আনল, প্রমীলাকে গঙ্গাধারে দাহ করার প্রমাণ হিসেবে দেখাবার জন্য। কিন্তু অসৎ ও খল মানুষের বন্ধুত্ব চিরদিন টেকেনা। সে কারণে মড়া উপলক্ষে ভোজের মধ্যে ঝগড়া লেগে সত্যি ঘটনার স্ফূরণ ঘটে। প্রমীলার আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, এ সবকিছু গ্রামের লোকদের ধূর্ততা আর অমানবিকতার ঘৃণ্য আচরণ। মৃত মানুষের শেষ ইচ্ছার সামান্যটুকু সম্মান যাদের অন্তরে নেই, যারা তুচ্ছ স্বার্থে হানাহানি করে তারা অর্থলোভী, স্বার্থপর। তাদের কাছে আর কি ই বা চাইতে পারে প্রমীলা। তাই সে সুধীর নামের একজনকে টাকা দেয় স্বামীর একটি অস্থি আনবার জন্য। বিশ্বাস করে সেই অস্থিই না হয় ফেলে দিয়ে আসবে গঙ্গায়। মানবিকবোধশূন্য ও নির্দয় মানুষের প্রতি তার শেষকথা ছিল- 'উনি যদি এতটা বিশ্বাস করতে পারেন আমি কি তবে সামান্য এই এতটুকু করতে পারবো না?' এখানে চরিত্রগুলোর জীবন-পরিসীমায় নির্মম অর্থলিপ্সার আভাস প্রকাশিত। ক্ষুধা-অনাহার ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনে যে মানবিকতার চেয়ে একমুঠো খাবারের আবেদন অনেক বেশি। ছলজোচ্চুরি করে পাওয়া টাকা-পয়সায় তাই তারা

পায়না কোন অসততার ছোঁয়া। প্রগতিশীলতার বাইরে এভাবেই চলতে থাকে তাদের সংবেদনশূন্যতার জীবনধারা।

গল্পের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে মড়াদাহ নিয়ে রামহরি, দামোদর আর কানিকুড়দের মত অর্থলোভীদের সংকীর্ণতা আর নিমর্মতা। অজ্ঞানতার অন্ধকারে যারা নিমজ্জিত, স্বার্থের লোভে যারা অন্ধ, তাদের কাছে অর্থের ভাগবাটোয়ারা যে অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষিত। তাইতো মড়ার খাটুলি নিয়ে মারামারি করে নিজেদের কূপমন্ডুকতার প্রমাণ দেয়। সেই উদ্ভূত পরিস্থিতি বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এভাবে- 'খাটুলিসুদ্ধ মড়াটাকে নিয়ে চলল দুজন–দেবেশপুরের সুধীর আর মাতুনগরের দ্বিজপদ। দহের একটা বুনো-ঘাসে-ভরা নিরালা কোণ বেছে নিয়ে মড়াটাকে কাদার মধ্যে দাবিয়ে গুঁজে পুঁতে দিলে।' (এ.এ.গ/৩৫৯)

ঘুণে ধরা এই হিন্দু সমাজকাঠামো মানবতাহীনতায় নড়বড়ে হতে বসেছে। অথচ পরার্থপরতাই পারে সংসার-সমাজধর্মের অনুদারতাকে উদারতার পথে নিয়ে যেতে এবং রক্ষণশীলতার নিষ্ঠুর ও অকল্যাণময় অন্ধকার দিককে আলোর পথে ধাবিত করতে। ধর্মের নামে অধর্মের নিষ্ঠুরতা, কুসংস্কারের দৌরাত্ম্য এবং মিথ্যার বেসাতিতে অভ্যস্ত দামোদর, রামহরি ও কানিকুড়ের দল তাই 'গঙ্গাধারের মাটির বাসন কিছু কিনলে–কলসী কুজোঁ কলকে আর পাঁচচোরা, ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা করার ছোট জাঁতা, আর ভাবঘড়া। কান্দির বাজার থেকে মুড়িভাজা খোলা আর ঝাঁটার খিল আর ফুলকপি।' অসত্য আর বানোয়াট গল্প জুড়ে দেয় প্রমীলার কাছে। বলে-'এ বয়সে অনেক মড়া বয়েছি কিন্তু এত ভারী মড়া কখনও বইনি। একেবারে যেন নোহা, শিশের মত ভারী, কাঁধ কেটে বসে গেলছে। বললে খুদু মোড়ল। আর অমন পোড়াও কাওকে দেখিনি-ধন্যি পোড়া, বললে অধর: 'একেবারে মাহাতাপের মতন আগুনের রং। জমাট করে এক জায়গা ফাটে আর কড়কড় করে চর্বি বেরিয়ে দপ দপ করে পাঁচ হাত খাড়াই হয়ে আগুন উঠে পড়ে। ওই একবার কাঠ দিয়েই হয়েছে। আর নাগেনি।' (এ.এ.গ/৩৬০)

তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, সরস বিশ্লেষণধর্মিতা গল্পের চরিত্রগুলোর জীবনবোধকে করেছে উদ্ভাসিত। নীতিহীন সমাজ ও প্রীতিহীন ধর্মের অনুসারীরা প্রতারণার গ্লানিমায় নিজেদের অশুদ্ধ করছে প্রতিনিয়ত। মানবতার মহিমাকে অসম্মানিত করে বিধবা প্রমীলাকে ধোঁকা দিয়ে পঙ্কিলতায় আবৃত করেছে গোটা সমাজকে। অবিশ্বাস, বৈধব্য যন্ত্রণা আর হতাশা ফুটে ওঠে প্রমীলার কণ্ঠে রামহরির সাথে কথোপকথনের সময়।

'আপনি বলছেন গঙ্গাতীরে আমার স্বামীর দাহন হয়েছে?

'হ্যাঁ, বলছি বৈ কি। দাহন না হলে মাতুনগরের ওরা কাঠুরে সেজে ভোজ খেতে আসবে কেন?

বিশ্বাস করতে বড় ইচ্ছা হল প্রমীলার। ম্লানকণ্ঠে বললে, 'কিন্তু সুধীর নামে ঐ ছোকরাকে ডেকে আমি কটা টাকা দিয়েছি।'

'কেন, ভোজ খেতে?'

না। ঐ পাখমারা ডোব থেকে আমার স্বামীর- যদি খুঁজে পেতে পায়-এক আধটা অস্থি আনবার জন্যে।'

'হয়তো কোন জন্তু-জানোয়ারের হাড় নিয়ে আসবে?'

'আনুক। তবু বিশ্বাস করে তাই আমি নিজের হাতে করে গঙ্গায় গিয়ে ফেলে আসব।'

রামহরি মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল প্রমীলার দিকে। প্রমীলার দু'চোখ কান্নায় ভরে গেল: 'উনি যদি এতটা বিশ্বাস করতে পারেন আমি কি তবে সামান্য এই এতটুকু করতে পারব না?' (এ.এ.গ/৩৬২)

'গঙ্গাযাত্রা' গল্পে সংকীর্ণ মানবাত্মার কদর্য অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে। শবদেহের প্রতি অসহনীয় অবমাননা, অর্থলোভীদের পরস্পর কলহ-কোন্দল এবং পরিশেষে মৃতদেহকে নালায় ডুবিয়ে দেয়ার যে ঘটনা এখানে তুলে ধরা হয়েছে তা সত্যিই মানুষের জীবনবোধকে করে অপমানিত। মনুষ্যত্বের স্থান দখল করে লোভ, হিংসা, হানাহানি, লাঞ্ছিত হয় মানবতাবোধ।

এখানে জীবনের বেদনামিশ্রিত করুণ চাপাকান্নার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মানবিক নিপীড়ন, জীবনভাবনার দগ্ধ অনুভূতি, ক্ষুধার্তের হাহাকার, অর্থগৃধ্নু মানুষের লালসা-জীবনের এই কদাকার দিকগুলো মানবচেতনাকে কদর্য কুশ্রীতায় ম্লান করে দেয়। নিষ্পেষিত অন্তরাত্মা একটু একটু করে ক্ষয়ে যায়। জীবনাশায় তৈরি হয় দ্বিধান্বিত মনোভাব। শেষ অবধি সত্য ও সুন্দরের জয় অনিবার্যভাবে সংঘটিত হয়। আর আমরা ঔদার্যময় জীবনস্পন্দনে উজ্জীবিত হই।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কেবল কল্লোলগোষ্ঠীর লেখক হিসেবে অসামান্য নন, বিদগ্ধ সমাজ ভাবনা ও জীবনবোধের গভীরতা, সমাজধর্মের অসঙ্গতি, মানবাচরণের সহানুভূতিশীলতা প্রভৃতি বিচারেও তিনি সমান পারদর্শী। 'গঙ্গাযাত্রা' তাঁর অনুপম জীবনচেতনায় উদ্ভাসিত একটি চমৎকার গল্প। এখানে তিনি স্বার্থলোভী মানুষের ও সামাজিক সমস্যায় আক্রান্ত জীবনের বাণীমূর্তি অঙ্কন করেছেন নিপুণ দক্ষতায়। 'গঙ্গাযাত্রা' গল্পটি পাঠক মনকে আবেগঘন বিহ্বলতায় আন্দোলিত করে, মনে হয় কাহিনী, পটভূমি এবং চরিত্রগুলো একেবারেই জীবন্ত। অত্যন্ত সাধারণ কাহিনীর মধ্যেও কত জটিলসমস্যা, স্বার্থের তীব্র সংঘাত, কুটিলতা, ষড়যন্ত্র থাকতে পারে এ গল্পে রয়েছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সমাজবাস্তবতাকে অনুপুঙ্খভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম এর কাহিনী কাঠামো। লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পল্লীবাংলার হিন্দু সমাজকাঠামো এবং সে কাঠামোর অবক্ষয়প্রাপ্ত কুৎসিৎ দিকগুলোকেও এখানে তুলে এনেছেন। সে জন্য পটভূমি পেয়েছে চমৎকার এক সার্থকতা যা সচরাচর উৎকৃষ্টমানের গল্প ছাড়া সর্বত্র লক্ষ করা যায় না।

'সিঁড়ি' গল্পটি অসহনীয় অর্থকষ্টের অসহায় অবস্থার নিশ্চল প্রতিবিম্ব। গতানুগতিক সরল বর্ণহীন জীবনে নৈতিক সীমারেখা অতিক্রমকারী সুধাময় জুয়াখেলায় আসক্ত। অবিশ্বাস্য উজ্জ্বল ভবিতব্যের আশায় নিরলস ভাবে খেলে যায় সে। পারিবারিক নৈতিক শুচিতা অবমাননাকারী সুধাময় স্ত্রী কেতকীকে প্রচ্ছন্নভাবে উৎসাহ দেয় কদর্য জগতের দিকে পা বাড়াবার। আঁতকে ওঠে কেতকী। পারিবারিক জীবনবোধ যার কাছে অনেক বেশি

মূল্যবান তাকেই সুধাময়ের কুৎসিৎ প্রস্তাব! তার কাছে 'বেঁচে থাকাটাই একটা জুয়োখেলা। কেউ খেলে আলো জ্বেলে, কেউ খেলে অন্ধকারে।'...কারুরই কোন সম্পর্ক নেই। পরিচয় নেই। ভাগ্যের সঙ্গে জুয়ো খেলতে বসেছি সবাই। যার যার তাস আলাদা। তুরুপ নেই ফেরাই নেই– তুমিও হারছ, আমিও হারছি।'...সব খরচ হ'য়েও তবু কিছু থেকে যায়। তাই তুমিও একেবারে শেষ হ'য়ে যাওনি। তোমার আবরণ আছে, অন্ধকার আছে। ভদ্রতার আবরণ, নিষেধের অন্ধকার।' (এ.অ.এ.রূ/৭৭)

দারিদ্র্যের কদর্য কর্কশ বাস্তবতায় পিষ্ট হয়েও নারী কখনো তার সতীত্বকে বিসর্জন দেয়নি। এ গল্পে কেতকীর জীবনবোধ সতীত্বের একনিষ্ঠতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শত লাঞ্ছনার মাঝেও সে প্রতিবাদ করে সুধাময়ের বিকৃত মানসিকতার। 'তুমি আমার স্বামী না? লজ্জা করে না বলতে?' এই উদ্ধৃতিটির মাঝে নিরূপিত হয়েছে স্বামীর প্রতি অসহায় স্ত্রীরূপী নারীর নিদারুণ যন্ত্রণার করুণ দীর্ঘশ্বাস। নীতি ও আদর্শের শুচিবোধ কেতকীকে তাড়া করে ফেরে।'যার ভেতরে এত পাপ তার সংস্পর্শে সে আসবে না।'...'কিন্তু কেতকীর সাধ্য কি এর বেশি কিছু করতে পারে? রাত দশটার মধ্যে সংসারের সমস্ত পাট তুলে দিয়ে ছেলেমেয়ে গুলোকে ঘুম পাড়িয়ে শ্বশুরের জিম্মায় রেখে আবার তার পরিচিত সিঁড়ির ধাপটিতে এসে বসে। সাড়ে দশটা থেকেই টর্চ টিপে আসতে থাকে জুয়াড়িরা। তার শোবার ঘরের ভাড়াটেরা। সিঁড়ির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে জড়পুত্তলীর মতো ব'সে থাকে কেতকী।

এমনি রোজ। রাতের পর রাত।' (এ.অ.এ.রূ/৭৯)

জুয়ায় আসক্ত মনুষ্যত্বহীন সুধাময় একরাতে 'তাড়াতাড়ি ছুটে এসে কেতকীর হাত চেপে ধরল। সারা গায়ে ছটফটিয়ে উঠল কেতকী।

'দাও, দাও, শিগগির দাও–এই শেষ সম্বল, শেষ খেলা–' ব'লে জোর ক'রে বাঁ হাত থেকে রুলিগাছটা ছিনিয়ে নিল সুধাময়।' (এক অঙ্গে এত রূপ পৃঃ ৮০) আবার পরক্ষণই জয়ের আনন্দে উদ্বেলিত সুধাময়ের উচ্চারণ–'অনেক অনেক আজ পেয়ে গেছি। তোমার সোনার রুলি আজ আমার ভাগ্য খুলে দিয়েছে। তোমাকে বলেছি না, জুয়োয় যে জেতে সে শেষ পর্যন্ত জেতে না।' (এ.অ.এ.রূ/৮১)

জুয়ো খেলায় প্রথম জয় যার, শেষ জয় তার নয়- সুধাময়ের এ উপলব্ধি মানব জীবন চেতনার নানা দিককে উন্মোচিত করে। জগতের নিয়মে মানবজীবনের পরিক্রমন এক সরল রেখায় গতিময় নয়। নানা চড়াই উৎরাই এ জীবনকে করে কখনো ব্যথিত, রক্তাক্ত আবার কখনো আশাহীনতার মাঝে জাগায় প্রাণসঞ্চারী আশা,স্বস্তিময় নির্ভরতা। এই জীবনসঞ্জীবনী আশার মূর্ত প্রতীক কেতকী। মনুষ্যত্বহীনতায় আকণ্ঠ ডুবে থাকলেও সুধাময়ের ভেতরে দেখা যায় তার উপলব্ধিগত মনোকথন 'বসে থাকো। জুয়ো যে খেলে, যতই সে মাঝপথে জিতুক, শেষ পর্যন্ত সে হারে, ঘাল হয়। সেই শেষদিনটির জন্যে অপেক্ষা করো। জিতব আমরা।' (এ.অ.এ.রূ/৭৮)

আবার চূড়ান্ত আশাহীনতার অন্ধকারেও কেতকী ডুবে যায়। অনেক অনেক প্রত্যাশিত জুয়ো খেলার টাকায় শেষ পর্যন্ত তাদের বা তার জিত হবে কিনা সে বিষয়েও সে সন্দিহান। আর তাইতো 'হাতভর্তি টাকা নোট পকেটের মধ্যে ছেড়ে দিল কেতকী।' কেতকীর এই আচরণ প্রমাণ করে, জুয়াখেলার হারজিতের মতোই জীবনও তার নিজের গতিময়তার হিল্লোলে দোদুল্যমান, যেখানে সুখের অবস্থান নির্দিষ্ট নয়, স্পষ্ট নয় জাগতিক জীবনচেতনার আনন্দ উচ্ছ্বাস।

'এক অঙ্গে এত রূপ' গ্রন্থে জীবনের নানামুখি সমস্যা সংকট, রহস্য-বৈচিত্র্য, অসহনীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব, দাম্পত্য প্রণয়ের জটিলতা প্রভৃতি বিষয়গুলো অনিবার্যভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যর মানুষের বিশেষ বিশেষ চারিত্রিক গুণ ও মানসিক গঠন, কাছের মানুষদের প্রতি তাদের আচরণের বৈচিত্র্য এবং তাদের মনোবৈকল্যের কারণ-এ সবকিছুকে অচিন্ত্যকুমার এ গ্রন্থে স্বচ্ছতা দান করেছেন। 'সিঁড়ি' গল্পে কেতকী স্বামী সুধাময়ের জুয়াখেলা ও পরিণতিতে সংসারের আর্থিকসংকট মেনে নিলেও পরিণামে তার প্রতি স্বামীর প্রণয়শূন্যতা মেনে নিতে পারেনা। বিশাল-বিস্তৃত এই জগতের উদার কোলাহল ও চঞ্চলতা থেকে বিচ্ছিন্ন নারীর সংসারসীমায় আবদ্ধ জীবন পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি কর্তব্যপরায়ণ, আবেগায়িত ও উচ্ছ্বাসদীপ্ত। গল্পের সুধারও অবস্থান একই মেরুতে। জীবনানুভবের এই অবস্থানগত তারতম্যের ফলে জীবনের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির ক্ষেত্রেও সৃজিত হয় এক সুস্পষ্ট ব্যবধান যা অচিন্ত্যকুমারের জীবনবোধের অখণ্ডরূপকে ব্যতিক্রমী ও অসাধারণ শিল্পপ্রকৌশলে স্বতন্ত্র করেছে।

একই শিরোনামে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্পে বির্পযস্ত মূল্যবোধের মর্মস্পর্শী বিবরণ রয়েছে। সাংকেতিক ভাষায় প্রতীকীব্যঞ্জনার বিদ্যুৎচ্ছটা, রচয়িতার নির্লিপ্ত নিরাসক্তি, সীমিত পরিসরে কাহিনীবৃন্তে জীবনবোধের দীপ্তিময় প্রস্ফুটন প্রভৃতির মাধ্যমে তাঁর যেসব গল্প শিল্পসাফল্যের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়েছে 'সিঁড়ি' তার মধ্যে অন্যতম। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'মিতভাষণ ও ইঙ্গিতময়তায় এই গল্পে যে পাশবতার বিন্যাস ঘটেছে তার তুলনা দুর্লভ।'[১৫] ওঠা-নামা অর্থাৎ উত্থান ও পতন এই উভয়েরই প্রতীক সিঁড়ি যেমন নামকরণ হিসেবে সার্থকতার ব্যঞ্জক তেমনি এ গল্পের প্রায় বেশির ভাগ উপাদান ব্যবহারেই প্রতীকী-অর্থ দ্যোতনার তাৎপর্য সৃজনে লেখকের মনোযোগ লক্ষ্য করা যায়।। ত্রিতল অট্টালিকা, তার চৌষট্টি ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ি, প্রতি তলার ভাড়াটে গৃহস্থদের সচ্ছলতার ক্রমনিম্নমুখি অবস্থা, ছাদসংলগ্ন চিলেকোঠার উষ্ণতা, চরিত্রের যথার্থ নামকরণ, কেন্দ্রীয় চরিত্র ইতির শারীরিক পঙ্গুত্ব-এই সবকিছু পাঠকের অনুভূতির কাছে জীবনের বিপুলতর অভিপ্রায় অনুধাবনের অনুষঙ্গে সংকেতায়িত হয়ে ওঠে। ভয়াবহ দারিদ্র্যের ভীষণ রূপ এ গল্পে চিত্রিত না হলেও এর পরিণতিচিত্রে অভাবের অসহনীয় কারুণ্য, অমানবিক স্বার্থপরতা, ব্যক্তিত্ব বিসর্জনের অসম্মান পাঠকের বোধের কাছে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। চল্লিশ বছরের অবিবাহিত বাড়িওয়ালা মানবের কাছে আত্মনিবেদন ও ভালবাসার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে চার পাঁচমাসের বাকিভাড়ার বিব্রতকর পরিস্থিতিকে কাটিয়ে তার কাছ থেকে ঋণের নামে আরও অর্থ আদায়ের যে বন্দোবস্ত করে ভাড়াটে-কন্যা ইতি, তারই মর্মন্তুদ করুণ আলেখ্য এ গল্পের সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ দিক। সৈয়দ আজিজুল হক বলেন,‘একদিকে মানবের বিগত যৌবন, অন্যদিকে ইতির রূপহীন পঙ্গুত্ব-এই দুই দুর্বলতা উভয়ের নৈকট্যনির্মাণে সহায়ক হতে পারে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রতিমুহূর্তে আমরা অনুভব করি এই স্বাভাবিক প্রণয়াবেগের প্রকাশ কেবল পরস্পরকে ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যে-বরং এর অন্তরালে সক্রিয় রয়েছে একজনের অস্তিত্বরক্ষার ব্যক্তিত্বহীন অভিনয় আশ্রয়ী প্রয়াস এবং সেই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে অন্যজনের লালসা চরিতার্থ করার এক সুচতুর আবেগহীন পরিকল্পনা।’[১৬] এ গল্পের পরিসমাপ্তিতে ইতির মনের মধ্যে যখন সম্ভ্রমবিসর্জনজনিত অন্তর্জ্বালার উত্তাল তরঙ্গময়তা, ঠিক একই সময়ে মানবের মধ্যে আত্মগ্লানির পরিবর্তে লক্ষ্য করা যায় ভোগের উপাদানকে সুস্থ -সতেজ রাখার এক অস্বাভাবিক উদ্দীপনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রেম ও দাম্পত্যচেতনা

প্রেমের ভূমিকা মানবজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই কথাসাহিত্যেও তার বৈচিত্র্যময় অভিপ্রকাশ। প্রাচীন সাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্য পর্যন্ত-প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রেম বিচিত্রভাবে প্রকাশিত। প্রাচীন সাহিত্যিকদের জীবনদৃষ্টিতে প্রেমচেতনা যে ভাবকল্পে রূপায়িত, আধুনিক সাহিত্যিকরা হয়তো সে ভাবে না দেখে একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রেমচেতনাকে অবলোকন করেছেন। সম্ভবত এটা যুগের প্রভাব। কিন্তু কবি-সাহিত্যিকদের কাছে প্রেম চিরন্তন বা শাশ্বত বিষয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কল্লোলযুগের লেখক। তাই তাঁর লেখনীতে কল্লোলীয়দের বেগবান উচ্ছ্বাস ও ফেনিল যৌবনের উদ্দামতা লক্ষ করা যায়। তাঁর গল্পে মামলা-মোকদ্দমা, জায়গা-জমি,দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় যেমন বিশাল পরিধিতে স্থান পেয়েছে, তেমনি মানব-মানবীর প্রেমও পল্লবিত হয়েছে সাহিত্য বৃক্ষের শাখা প্রশাখা জুড়ে। তাঁর কিছু গল্পে নিটোল প্রেমের কাহিনী ব্যাপৃত, আবার কিছু কিছু গল্পের মধ্যে নর-নারীর অন্তর্লোকের ও সমাজ জীবনের জটিলতাও প্রতীয়মান হয়েছে। তিনি তাঁর কবিত্বময় ভাবুকতা ছেড়ে জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর ভর করে, নতুন জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রেমের বিচিত্র গতি-প্রকৃতিকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন তাঁর গল্পের মাধ্যমে। অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পে প্রেম অপূর্ব এক সৃষ্টি সহায়ক আত্মমুগ্ধতা।

'বিবিধ প্রসঙ্গে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন -'ভালোবাসা' অর্থে আত্মসমর্পণ নহে। ভালবাসা অর্থে, নিজের যাহা কিছু ভাল তাহাই সমর্পণ করা। ... প্রেম হৃদয়ের সারভাগ মাত্র। হৃদয় মন্থন করিয়া যে অমৃতটুকু উঠে তাহাই। ... ভালবাসা অর্থে ভাল-বাসা অর্থাৎ অন্যকে ভাল বাসস্থান দেওয়া, অন্যকে মনের সর্বাপেক্ষা ভাল জায়গায় স্থাপন করা।'[১৭]

প্রণয়দেবী আফ্রোদিতির দ্বৈতসত্তার কথা বলা হয়েছে Plato-র Symposium -গ্রন্থে। আফ্রোদিতির স্বর্গীয় সংস্করণ হলেন অযোনিসম্ভূতা Uranian আর আফ্রোদিতির পার্থিব সংস্করণ হলেন Zeus ও Dione-র সন্তান Pandemus. মানুষের আত্মায় Uranian এর অধিষ্ঠান আর মানুষের ইন্দ্রিয় বাসনায় Pandemus এর অধিষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথের বিবিধ প্রসঙ্গে এর সঙ্গে বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ প্রণয়তত্ত্ব সম্পর্কে নারী দার্শনিক Diotima-র বক্তব্য। তিনি বলেছিলেন- '... Wisdom is concerned with the loveliest of things; and love is the love of what is lovely...'[১৮]

প্লেটোনিক লাভের প্রবক্তা প্রেমতত্ত্ব সম্পর্কে সক্রেটিসের সঙ্গে ডিওটিমার সংলাপমালায় ডিওটিমাকে সক্রেটিস বলেছিলেন যে, ভালোবাসার মধ্য দিয়ে মানুষ কল্যাণের অধিকারী হয়, সৌন্দর্যের অধিকার পায়–তাহাতেই সুখ। আর ডিওটিমা নিজেই সক্রেটিসকে বুঝিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন যে, ভালোবাসা হলো

কল্যাণ ও সৌন্দর্যের অমৃতলোকে মরণাপন্ন জীবনের উজ্জীবন। সুতরাং প্রেম মানবমনের অমরত্ব অনুসন্ধানেরই নামান্তর।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই বৈষ্ণব পদাবলীর মূল উপজীব্য। রাধা ও কৃষ্ণকে নিছক মানব-মানবী হিসেবে কল্পনা করলে তাদের প্রেমলীলা পার্থিব নরনারীর জীবনেরই পরিচয় ফুটিয়ে তোলে। বৈষ্ণব পদাবলীকে পুরোপুরি মর্ত্যপ্রেমের নিরিখে বোঝা যাবে না, আবার শান্ত রসাস্পদ ভক্তির নিরাকাঙ্ক্ষা আত্মনিবেদনও এর একমাত্র পরিচয় নয়–উভয়ের সংমিশ্রণে, প্রেমের বিষামৃতের তীব্রতায় এ অনন্যসাধারণ। সুশীল ও শিক্ষানুরাগী বাঙালি সাহিত্যের রস ও আনন্দের সংবাদ পেয়েছে চণ্ডীদাসের পদাবলী থেকে। রাধার মনের বিচিত্র অনুভূতিকে মনোরম ভাষায় রূপদান করে বাঙালির সবসময়ের সমাদর লাভের উপযোগী করে গেছেন। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমানুভূতির মাধ্যমে ধর্মীয়চেতনা যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি এর বাইরে একটা সর্বজনীন আবেদনও রূপায়িত হয়েছে। চণ্ডীদাস রাধাকে কৃষ্ণপ্রেমে আত্মবিভোর রূপে চিত্রায়িত করেছেন। শরীরী কামনা বাসনা রাধাচরিত্রে প্রাধান্য পায় নি। কবি রাধার কামবিবর্জিত প্রেমচেতনাকে সাবলীল কথার মায়ায় এবং ছন্দে ও অলঙ্কারে প্রস্ফুটিত করেছেন। কবি রাধার চরিত্রে মিলনের আনন্দ উচ্ছ্বাসের চেয়ে বিচ্ছেদের যন্ত্রণাকে তীব্রতর করে রূপ দিয়েছেন। কবি এই অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন -

‘এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি
পরাণে পরাণ বান্ধা আপনি আপনি।
দুঁহু কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া’[১৯]

জ্ঞানদাস রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনার মাধ্যমে মানব মানবীর চিরন্তন ও শাশ্বত প্রেমবেদনার কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি কামবর্জিত তপস্বিনী রাধার স্নিগ্ধ মূর্তিটি নিরাভরণ ও নিরলঙ্কার ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন-

‘ রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে
পরাণ পীরিতি লাগি স্থির নাহি বান্ধে।’[২০]

প্রেমচেতনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্যাপতি দেহবিলাস এবং সম্ভোগ বর্ণনার কবি। সম্ভবত সৌন্দর্যপ্রীতির জন্যই দেহজ বর্ণনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে অনেকাংশেই তাঁর রচনায় রূপাসক্তি ভোগাসক্তিকে

অতিক্রম করে গেছে। তাঁর কাছে প্রেম একটি জৈবিক প্রবৃত্তি মাত্র নয়। ঈর্ষা, ছলনা, ভয়, লজ্জা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ইত্যাদি মানসিক প্রবৃত্তিগুলি তাঁর অঙ্কিত প্রেমবোধের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত।

প্রেমের মাধুর্যমণ্ডিত আলেখ্য নিয়ে যদি আলোচনা করতেই হয় তবে ময়মনসিংহ গীতিকার প্রতি দৃষ্টি আপনাতেই আবদ্ধ হয়ে যায়। এই গীতিকার কাহিনীগুলো প্রেমমূলক এবং তাতে নারী চরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে। নারীর ব্যক্তিত্ববোধ, আত্মবোধ, স্বাতন্ত্র্যবোধ, সতীত্ব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য এই সব গীতিকায় নান্দনিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এখানকার তেজোদীপ্ত নায়িকারা অপূর্ব প্রেমশক্তির অধিকারিনী হয়ে তাদের নারীধর্ম, সতীত্বধর্ম রক্ষা করেছে। প্রেমের জন্য কষ্ট-যন্ত্রণা,আত্মত্যাগ- তিতিক্ষা, সর্বসমর্পণ করে নারী যে কি অসীম মহিমা লাভ করতে পারে, গীতিকাগুলো তারই পরিচয় বহন করে। তাদের মিষ্টি স্বভাবের মাধুর্য ও সৌন্দর্যের সঙ্গে সর্বসংস্কারমুক্ত প্রেমের বিকাশ ঘটেছে।

আপাত দৃষ্টিতে রূপজ প্রেমে আকর্ষণ বেশি হলেও এর অন্তর্নিহিত শক্তি কম। কারণ রূপজ প্রেম কামবাসনার দোসর হওয়ায় তা অন্তরের চেয়ে শরীরের প্রতি মোহগ্রস্থ করে তোলে বেশি। দেহজ প্রেম সাময়িক উত্তেজনাময়, তাতে হৃদয়ের প্রশান্তি থাকে না। অন্তর পাখি হয়ে অসীম আকাশের নীলিমায় ডানা মেলে উড়তে পারে না, মাটিতেই মুখ থুবড়ে পড়ে বারবার। তাই রূপজ বা দেহজ প্রেমে প্রবল আসক্তি বিরাজ করলেও তার স্থায়িত্ব ততোটাই অপ্রবল, দুর্বল। বৈচিত্র্যময় হৃদয়ে উৎসারিত প্রেম নৃত্য-চপল, উল্লাস-চঞ্চল। তার সারা অবয়ব প্রথা-বন্ধন-মুক্ত বিচিত্র লীলায়িত প্রাণ হিল্লোলে তরঙ্গায়িত। মানুষের গতানুগতিক জীবনপ্রবাহে এই প্রেম যেন বিচিত্র অভূতপূর্ব ছন্দের নূপুর নিক্কণ, বিদ্যুৎশিখার ন্যায় উজ্জ্বল। সর্বোপরি প্রেমের এই সমস্ত রহস্যময় বৈচিত্র্যের কারণে দেহজ প্রেম অপেক্ষা অন্তরের প্রেমের শক্তি অপরিমেয়। রূপজ মোহ ক্ষণস্থায়ী ও শক্তিহীন। অপর পক্ষে হৃদয়গত প্রেমঐশ্বর্য মানব মনে সুগভীর রেখা অঙ্কন করে চিরকালীন আসন পাতে।

'প্রেমের গল্প' গ্রন্থের প্রেমনির্ভর গল্প **'একরাত্রি'** তে ভবদেব ও ক্ষণিকার প্রেম অভিসারের একটি বিশেষ দিক রূপায়িত হয়েছে। মিষ্টি মধুর নানা খুনসুটির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া প্রেমের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় - ভালোবাসার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। দু-জনের হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের গভীর অনুভূতিতে ভালোবাসার অসীম সৌন্দর্য রূপায়িত হয়েছে। প্রেম পরস্পরের জীবনবোধকে করেছে উজ্জ্বল, দীপ্তিময়। ভালোবাসার সেই অপূর্ব পুণ্যশ্রী ক্ষণিকাকে দিয়েছে তপস্যার স্নিগ্ধতা, আর ভবদেবকে দিয়েছে কঠোর সংযমের সীমাহীন মহিমা। প্রেম দুটি নরনারীর জীবনে শুধু অনির্বচনীয় সুখই আনে না বরং প্রেমের দ্বিধা কম্পিত অনুরাগ জীবনকে সৌন্দর্যে ভরিয়ে তোলে। কামজ প্রেম ভালোবাসার শান্তশ্রীকে কলুষিত করে, নির্মল পবিত্রতায় পাঁক ঢেলে দেয়। অন্যদিকে দেহজকামনাশূন্য প্রেম হৃদয়ে শুদ্ধতার দীপ্তি জ্বালে। এই দীপ্তিময় আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ভবদেব ও ক্ষণিকার অন্তর। ভালোবাসার মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই দু-জন নরনারী তাদের জীবনবোধে এনেছে প্রেমের অনিন্দ্য সুন্দর শুদ্ধ পরিণতি।

প্রেমবোধের অমলিন আর স্বচ্ছ ফল্গুধারা যেখানে বহমান সেখানেই ভবদেব ও ক্ষণিকার জ্যোতির্ময় অবস্থান। মহারাত্রির মহামিলন শুধু দুজন নরনারীর একান্ত নৈকট্য নয়, সেখানে বিরাজ করে স্পর্শহীন মৌন ভালোবাসার অসীম মহিমা। লেখকের বর্ণনায় –'যাকে ভালোবাসি তার সঙ্গে আজ দেখা হবে মহারাত্রির মৌনে, সমস্ত হিসেব কিতেবের বাইরে, কোন রকম কৃত্রিম মীমাংসা না মেনে এই উজ্জ্বলতাটুকু এই নবীনতাটুকু যদি সে উপহার দিতে না পারে, তবে তার দাম কি, তবে তার মহত্ত্ব কোথায়?' (প্রে.গ./৮) প্রণয়িনীর প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত ভবদেব ভালবাসার প্রহর গুনেছে নীরব অপেক্ষায়। ভালোবাসার স্নিগ্ধ পরশে আকাঙ্ক্ষিত রাত্রি মহিয়ান হয়ে উঠবে। দু'জন নরনারীর হৃদয়ের উষ্ণ অথচ সংযত প্রেম রাত্রিটিকে করে তুলবে আনন্দময়, শান্তিময়। ভবদেবের এই প্রেম প্রতীক্ষার মধ্যে নেই কোন ভোগলিপ্সা, কোন কামজ বাসনা। সত্যিকারের প্রেমের মহত্ত্ব তার উদারতায়, তার বিশালতায়। যদি ভালোবাসা কামজ চেতনার বেড়াজালে বন্দী হয়ে নরনারীকে তাড়িত করে বেড়ায় তবে তার না থাকে কোন সার্থকতা না থাকে কোন উজ্জ্বলতা। প্রেমের চিরসুন্দরের রূপ অবলোকন করে ভবদেব তার অনুভূতিকে করেছে প্রশান্ত ও প্রেমময়।

প্রথম প্রেমের মিষ্টি অনুভূতির কথা লেখক প্রকাশ করেছেন এভাবে–

'হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার মধ্যে হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার সুগন্ধ। নতুন দৃষ্টির সঙ্গে নতুন দৃষ্টির যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন সমস্তই যেন চক্ষুময় হয়ে ওঠে। অলক্ষ্য একটি নিমন্ত্রণের ভাষা নীরবে গুঞ্জরণ করতে থাকে। আশ্চর্য, যে চোখে আগে চকমকি পাথর ছিল তাতে এখন একটি লজ্জা একটি গম্ভীর কোমলতা দেখা দিয়েছে। একটি ধরা পড়ার প্রস্তুতির লাবণ্য। কি করে এ সম্ভব হতে পারে ভেবে পায়নি ভবদেব। কে রচনা করল এই রুক্ষ খাটির শ্যামায়ন ! নিষ্পাদপের দেশে অজানা পক্ষিকাকলি।' (প্রে.গ./৮)

নরনারীর অভ্যন্তরীণ প্রেমের নীরব ভাষা বিনিময় নেত্রযুগলের মাধ্যমেই। সেখানে অন্তরালে থাকে নিজেকে সমর্পণের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত, ধরা পড়ার সবটুকু ইচ্ছা। শাণিত চোখে দেখা দেয় মায়াময় দ্যুতি। প্রেমের কোমল পরশ নয়নে ছড়িয়ে দেয় ভালোবাসার নম্রতা। সেখানে নেই কোন অস্থিরতা, চঞ্চলতা। বরং অন্তর্নিহিত স্নিগ্ধতায় প্রস্ফুটিত হয় ভালোবাসার লাবণ্য, শ্যামলিমায় ভরে যায় রুক্ষ হৃদয়ের উষর প্রান্তর। ভবদেবের বিস্ময়ের ঘোর কাটে না, কীভাবে প্রেম দুজন নরনারীর জীবনে ঝড় নয় বরং বৃষ্টির সুশীতল অনুভব নিয়ে আসে। প্রেমানুভূতি কেমন করে জীবনানুভূতির সমগ্র চেতনাকে মহিমান্বিত করে তারই চিত্র এভাবে অঙ্কিত করেছেন লেখক - 'বাধা হয়তো আর কোথাও নয়, বাধা তার মনে। সে আত্মীয় হতে চায়, আপন হতে চায় না। সংহত তুষার পিণ্ড হয়ে থাকবে, হবে না সীমাতিক্রান্তা নির্ঝরিনী। এও একরকম অহংকার। আমি পবিত্র, আমি অব্যাহত, আমি অপ্রমত্ত এই অহঙ্কার' (প্রে.গ./১১)

ভালোবাসার দ্বৈতসত্তা এখানে রূপায়িত। আত্মার আত্মীয় হয়ে যে নিকটবর্তী সে তো ভালোবাসার প্রমত্ত স্রোতে প্রবহমান নয়, সে অপ্রমত্ত। উচ্ছল চঞ্চল স্রোতে বয়ে চলা ঝর্নার মত তার প্রেম নয়। সে যে সংহত,

সংযত বরফখণ্ড। 'সীমাতিক্রান্তা নির্ঝরিনী' রূপ প্রেম সুমহান প্রেমের গম্ভীর তাৎপর্যকে অগভীর করে তোলে, স্বাভাবিক গতিশীলতাকে রুদ্ধ করে দেয়। তাইতো ভবদেবের স্থিতবোধের উচ্চারণ–'আমি পবিত্র, আমি অব্যাহত।' একটি গোলাপের সৌন্দর্য ও বিহ্বলতার প্রতীকে লেখক ক্ষণিকার অন্তর্গত চেতনাকে রূপায়িত করেছেন। 'তোমাকে কী দিই বলো তো?' পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালে ভবদেব। খোলা জানলা দিয়ে হাত বাড়াতেই পেল সেই গোলাপ গাছ। বৃন্তাশ্রয়ে বিহ্বল একটি গোলাপ জেগে আছে। ঘ্রাণে বর্ণে গদগদ হয়ে। শুষ্ক গর্বরূপে নয়, সুধাসরস প্রেমরূপে। নিবেদনের বেদনায় আনন্দময় হয়ে।

সন্তর্পণে ফুলটি ছিঁড়ল ভবদেব। ক্ষণিকার স্তূপীকৃত চুলের মধ্যে গুঁজে দিল।' (প্রে.গ./১২)

চিরন্তন প্রেমসুধায় পরিপূর্ণ যে নারীর অন্তর সে তো কখনো প্রগলভ হতে পারে না। সে পরিপূর্ণতায় বিহ্বল, সুগন্ধ রূপে পরিপূর্ণ। এখানে নিবেদনের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও সে টা প্রকাশের অতিরঞ্জনে প্লাবিত হয়নি। বরং সেখানে ঠাঁই পেয়েছে ভালোবাসার চিরকালীন জীবনচেতনার অনিন্দ্যসুন্দর রূপ। এ রূপের প্রতীকী প্রকাশ গোলাপটিকে ক্ষণিকা তার স্তূপীকৃত চুলের ভেতর গুঁজে ভালোবাসার কোমল অনুভূতিকে শুধু সম্মানিত করে না, বরং তাকে অন্তরের সবটুকু রঙে রাঙিয়ে ভালোবাসার মর্যাদাকে বহুমাত্রায় বাড়িয়ে দেয়।

প্রেমের অন্তর্গত সৌন্দর্যের গভীরতা ব্যক্তিভেদে নানা রকম হয়। কেউ রূপগত প্রেমের পূজারী, কেউ শূচিতার মধ্যে প্রেমের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করে, আবার কারো কাছে প্রেমের সার্থকতা বিসর্জনে, কেউ বা প্রেম অনুভব করে স্নেহ মমতায়। অন্তরের মাঝে খুব সন্তর্পণে বয়ে যাওয়া ফল্গুধারার মতো মমতার স্রোত প্রেমের বৈশিষ্ট্যকে উদ্ভাসিত করে। মানব জীবনের এই প্রেমানুভূতির নানাবিধ বৈচিত্র্যকে লেখক সুনিপুণভাবে পল্লবিত করেছেন তাঁর ছোটগল্পে।

প্রেমের গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত গল্পগুলোতে প্রেমের বহুমাত্রিকতা লক্ষণীয়। এ গল্পে ভবদেব ও ক্ষণিকার প্রেমের নির্মল ও সংযত রূপের স্ফূরণ ঘটেছে। সেখানে উদ্দাম প্রেমের পরিবর্তে প্রেমের যোগী রূপের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তারুণ্যদীপ্ত নর-নারীর প্রেম শুধু কামনায় সীমাবদ্ধ নয়, যে ভালোবাসতে জানে সে জানে, প্রেম তপস্যার। প্রেম প্রতীক্ষার।

এখানে প্রেমের অজৈবনিক দিকটিও উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ভোগবিরত, শরীর না ছোঁয়া যে 'প্লেটোনিক লাভ' এখানে পরিলক্ষিত হয়েছে তা ভবদেব ও ক্ষণিকাকে সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। প্রাণের ঐশ্বর্যের শ্রেষ্ঠতা এখানে প্রস্ফুটিত হয়ে ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে করেছে ম্রিয়মান, নিস্প্রভ। দু'জনের কাছে প্রেম অনুভূত হয়েছে হৃদয়ের নিভৃত কোণের অপার্থিব সুখ হিসেবে।

ভাষা, উপস্থাপনা-রীতি, চিত্রকল্প: প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্যরকম অচিন্ত্যকুমারকে খুঁজে পাওয়া যায় এ গল্পে। লেখকের উপস্থাপনাগুণে এক তরুণের ভালবাসা আর দেহগত আসক্তি ত্যাগের অপূর্ব কাহিনী এবং এক তরুণীর ধৈর্যের প্রতীক্ষা অনন্য মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। গল্পের রোমান্টিকতা আর মানবিকতা পাঠক হৃদয়কে স্পর্শ

করে। প্রেম শুধু জাগতিক মোহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকেনা, তা শরীরী সীমানা অতিক্রম করে। ঐশ্বরিক ভাবাদর্শে পরিপূর্ণ হয়ে শান্ত আনন্দানুভূতিতে ব্যক্ত হয়। মূলত লেখকের এই জীবনবোধই অর্থপূর্ণ খণ্ডরূপের উদ্ভাসন ঘটিয়ে অসামান্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। 'অচিন্ত্যকুমারের পরবর্তী পরিণতি লক্ষ্য করলে ইহাই মনে হয় যে, বীভৎসতার প্রতি তাহার কোন স্বাভাবিক প্রবণতা নাই, বরং কুৎসিতের ঊষর মরু প্রান্তর অতিক্রম করিয়া এক দুরধিগম্য সৌন্দর্যলোকে উত্তীর্ণ হওয়াই তাহার প্রকৃত কাম্য।'[২১]

'মগের মুলুক' গল্পটিতে রয়েছে মগ সমাজের প্রেমের রীতি-নীতি। মগ সমাজের প্রেমের ধরন, বিয়ের নিয়ম ও জীবনবোধ নিয়ে রচিত 'মগের মুলুক' গল্পে রূপা ও পঞ্চমা পরস্পরের ভালোবাসার সঙ্গী। ঐ সমাজের রীতি অনুযায়ী কুড়ি বছরের মেয়ে স্বাধীন ভাবে যে কাউকে বর হিসেবে মেনে নিতে পারে। কিন্তু তার কম অর্থাৎ ষোল বছরের কম হলে ভালোবাসার মানুষকে নিয়ে চারবার পালাতে হয়। পরপর তিন বার পালিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি তাদের। প্রথমবার জঙ্গলে, দ্বিতীয়বার বর্ষায়, তৃতীয়বার জোৎস্নায় পঞ্চমা ভালোবেসে রূপার কাছে ধরা পড়তে চেয়েছিলো। কিন্তু ভালোবাসার পবিত্রতায় বিশ্বাসী রূপা নিয়ম মেনে শান্তির স্বপক্ষে অবস্থান নেয়। বলে, 'তোকে বুকে জড়িয়ে রাত কাটাবার দিন এখনো আসেনি। ধৈর্য্য ধরো, স্মরণ করো বুদ্ধ মানুকে'। কারণ সংযমী ভালোবাসার অপর নাম মধুর শান্তি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের দুর্বিপাকে পড়ে পঞ্চমাকে হাত বদল হতে হয়েছে। ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাস মেনে নিয়েও পঞ্চমা আর দশটা মেয়ের মতই গড়তে চেয়েছিল সুন্দর সংসার। প্রতারক সতীশের প্রলোভনে পড়েও জীবনে স্থিরতা আনতে চেয়েছিল। 'কিন্তু মানুষের বিশ্বাসঘাতকতার কী চেহারা তা সে কল্পনা করতে পারেনি।' দুর্ভাগ্যের হাতছানিতে বিভিন্ন পথ পরিক্রমণ শেষে পঞ্চমা ভালোবাসার মানুষ রূপার কাছে এসে পড়ে। মানুষের আচরণের কুৎসিত কদর্য রূপ পঞ্চমাকে বিয়ে পরবর্তী জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ করে তোলে। 'যে মেয়েকে নিয়ে সমস্ত মগ মুলুকে কলঙ্কের আগুন জ্বলেছিল সেই এখন একটা মলিন বাতি হয়ে মিট মিট করছে'। তাই সে রূপার দেয়া ভালোবাসার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। জীবনের ভোগ বিবর্জিত সংসারে ঈশ্বরের মহিমা কীর্তনের মধ্যেই পঞ্চমা খুঁজে পায় চিরপ্রশান্তির ঠিকানা। ভালোবাসার মানুষকে নিয়ে ভগবানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। জাগতিক সংসারের মোহ কাটিয়ে পঞ্চমা-রূপা নিজেদের বাঁধনহারা জীবনকে ভালোবাসার চিরবন্ধনে আবদ্ধ করে নেয়।

দুটি সংযমী প্রেমাকাঙ্ক্ষী নরনারীর হৃদয়ের ঐকান্তিক বাসনার কথা লেখকের বর্ণনায় রূপায়িত হয়েছে এভাবে-পঞ্চমার 'ফাঁপানো খোঁপায় একটু হাত বুলিয়ে' দিয়ে রূপা বলেছিল : 'ভেবে দেখ, আমাদের কত বড় পরীক্ষা। ... কিন্তু আমাদের তো বিয়ে নয়, আমাদের ভালোবাসা। আমাদের আরো কঠিন নিয়ম।' (প্রে.গ./২৫)

ভালোবাসার ভেতরেও যে কঠোর সংযম ও নীতিবোধ আছে তা রূপার বক্তব্যে বিধৃত হয়েছে। ভালোবাসা- জীবনবোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ অধ্যায়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা সংযমবোধে আচ্ছন্ন। যদি এ বোধের ব্যত্যয় ঘটে তবে প্রেমবোধের পবিত্রতা হয় প্রশ্নবিদ্ধ। ভালোবাসার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবে বিয়ের

পিঁড়িতে বসার যোগ্যতা লাভ করা যায়। ঠাণ্ডা মাটিতে শুতে কষ্ট হলেও পঞ্চমাকে ছোঁয়ার কোন অধিকার রূপার নেই। ভালোবাসার এই মহান ব্রতে দুজনই ব্রতী। অন্তরের ভালোবাসার প্রাবল্য অনুভব করলেও সংযমের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রয়াসী হয় দুজনেই।

ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তি স্থাপিত হয়েছে এ অংশে। 'যা নিয়ম তাই মানতে হবে। নিয়ম না মানলে শাস্তি'। কবে সেই শেষ কিস্তি আসবে কে জানে? নিয়মের না আছে মাথা, না আছে মুণ্ড। পরের রাত কবে আসবে তাই ভেবে আজকের এই রাত উড়িয়ে দিতে হবে? না দিলে কি হয়? কে জানতে আসছে? 'বুদ্ধ মানু' সব জানছেন। সব দেখছেন। হিসাব রাখছেন।' (প্রে.গ./২৬)

রূপা তাই প্রগাঢ় চিত্তে অনুভব করে ভালোবাসার কঠোর সংযমশীলতা। যেখানে রয়েছে পবিত্র প্রেমের নীরব মর্যাদা, রয়েছে অন্তরের স্নিগ্ধ ভালোবাসায় সিক্ত প্রবল নীতিবোধ। ভালোবাসার এই জীবনবোধ রূপা ও পঞ্চমাকে নিয়ে গেছে উচ্চতর মহিমান্বিত পর্যায়ে।

জীবনের যন্ত্রণাময় দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ শেষে পরম শান্তি প্রত্যাশায় পঞ্চমা নীরবে তার নব অনুভূতির সাথে পরিচিত হয়। মগ সমাজের নিয়ম কানুনের ওপর ভিত্তি করে রচিত 'মগের মুলুক' গল্পের লেখক দুজনের মনোবেদনার বিশেষ দিকটি স্পষ্ট করেছেন এভাবে–'শরীরে অসহ্য ক্লান্তি, অসহ্য যন্ত্রণা। তবু মনে হল আর দুঃখ নেই, ভয় নেই ,কিছু চেয়ে না পাওয়ার দুঃখ, কিছু পেয়ে হারানোর ভয়। যেন আর লাঞ্ছনা নেই, বঞ্চনা নেই। অন্তরে শুধু নীরবতা আর নিবৃত্তি। তাকাল একবার বুদ্ধমূর্তির দিকে। নীরবতা আর নিবৃত্তির দিকে।' (প্রে.গ./৩৬)

পঞ্চমা চেয়েছিল ভালোবাসায় আবৃত একটি সুখের ঘর। যাকে নিয়ে এই সুখের ঘর রচিত হবে সেই রূপাও মগ সমাজের বিচিত্র নিয়ম পালন করে যায় শুধু পঞ্চমাকে ভালোবেসে। কিন্তু অদৃষ্ট আর পরিবেশের রূঢ় আচরণে বিচ্ছিন্ন হয় দুজন নরনারী। সতীশের মতো কপটচারী মানুষের প্রবঞ্চনায় হতবুদ্ধি, যন্ত্রণাকাতর পঞ্চমার যেন ধীরে ধীরে আসক্তির বাঁধন খুলে যায়। মনে হয় সে যেন সমস্ত জীবনযন্ত্রণার উর্ধ্বে ওঠা কোন মানুষ। জগতের সাথে চাওয়া পাওয়ার কোন হিসেব নেই, দুঃখ পাওয়ার কষ্ট নেই, হারানোর ভয় নেই, ভালোবাসার দাবী নিয়ে কারো কাছে দাঁড়াবার নেই, কোন মুখোশধারী মানুষের কাছে লাঞ্ছনা পাওয়ার নেই, শুধু আছে অসীম নীরবতা, যা তাকে আরো শক্তিময়ী করে তুলেছে। জীবনের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির মাঝে সে যেন নিরাসক্ত কোন শান্তমূর্তি।

প্রগাঢ় জীবনবোধের অন্তরালে রয়েছে পরমেশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন। আর সেই বিষয়টিই এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে লেখকের বক্তব্যে – 'নবজীবন সত্যি চাও পঞ্চমা?' পরিপূর্ণ স্নেহে পঞ্চমার মুখের দিকে তাকাল রূপা: 'তবে বলো তো ফুঙ্গি ভেঙ্গে দিই? ফিরে যাই সংসারে। আজ আর আমাদের কে ঠেকায়, কে আটকায়।' তেমনি প্রগাঢ় স্নেহেই দৃষ্টি প্রত্যর্পণ করল পঞ্চমা। বললে, না। আমাদের নব জীবন এই ঠাকুরঘরে। বুদ্ধদেবের পদতলে।' (প্রে.গ./৩৭)

নিরাসক্তি ভালোবাসাও মাঝে মাঝে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে, যা পরিলক্ষিত হয় এ দুজন নরনারীর মাঝে। জীবনের বহু চড়াই উৎরাই পথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে তারা একত্র হয়েছে ঠাকুর ঘরে। যেখানে ভক্ত খুঁজে পায় অপার্থিব ভালোবাসা। সেখানে কামনা বাসনা তিরোহিত হয়ে ভক্ত হৃদয় উদ্বেলিত হয় অসীম আনন্দের জোয়ারে। আর এই সুখের সন্ধান পায় পঞ্চমা। ভালোবাসার সঙ্গীকে নিয়ে ঘরবাঁধার স্বপ্ন-আনন্দের চেয়ে অনেক বড় এই সুখানুভূতি। এখানে নেই কোন জাগতিক চিন্তা, পাওয়া না পাওয়ার অবর্ণনীয় কষ্ট। তাই সে ভালোবাসার মানুষ রূপার ঘর বাঁধার প্রস্তাবকে সযতনে ফিরিয়ে দিয়ে বুদ্ধদেবের পদতলেই বাকি জীবন কাটাবে বলে স্থির করে। কারণ পঞ্চমা এটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, নিরাসক্ততাই মুক্তির চিরন্তন পথ।

এ গল্পে ভালোবাসার মোহে ঘর বাঁধার স্বপ্নে জীবন যুদ্ধে পরাজিত রূপা ও পঞ্চমার ভালোবাসা কিন্তু স্তিমিত হয়ে যায়নি। বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ না হয়েও ভালোবাসার যে দীপশিখা চিরদীপ্যমান, তা তারা দেখিয়েছে।'একরাত্রি' গল্পের মতো 'মগের মুলুক' গল্পেও প্রায় একই ধরনের জীবনচেতনার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু সেখানে ভবদেব ও ক্ষণিকার মত নিস্তরঙ্গ জীবন প্রবাহ নেই। রূপা আর পঞ্চমার প্রেম ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ের সাথে যুদ্ধ করে করে স্থির হয়েছে ভোগরহিত প্রেমের অপার সৌন্দর্যের সীমানায়। রূঢ় বাস্তবতা তাদের জীবনাচরণে বিরাট পরিবর্তন সাধন করলেও প্রেমের মোহময় প্রীতিময় রূপের ঐশ্বরিক সৌন্দর্যকে অস্বীকার করতে পারে নি। জীবনের শেষ প্রান্তে প্রেমচেতনাকে অটুট রেখে জৈবনিক জীবনের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে নিজেদের সমর্পিত করেছে পরমকরুণাময় সৃষ্টিকর্তার বেদীমূলে।

এ গল্পের চরিত্র-সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ও পরিস্থিতি-সৃষ্টি-বৈচিত্র্য দেখে স্বীকার করতে হয়, গল্পের প্লট তৈরিতে লেখকের মুন্সীয়ানার অভাব নেই। প্রবল প্রাণশক্তির নিঃশব্দ সমারোহ, বিপুল বিশ্বের জীবনবেগ ও জীবনচেতনা গল্পলেখকের স্বগত চিন্তায় ব্যক্ত। দুর্বার প্রেমাসক্তির তুলনায় কামনাবর্জিত গভীর প্রেম জীবনকে শুদ্ধ করে তোলে। প্রেমের এই বর্ণিল রূপকে অচিন্ত্যকুমার তাঁর জীবনচেতনায় ধারণ করে পরম সন্তুষ্টি লাভ করেন। 'জীবনকে যেমন করে দেখেছেন,তৎক্ষণাৎ সেই রূপটিকে নিজস্ব এক ভাবালু দৃষ্টি আর অতি ঝংকৃত কথকতার ভাষায় মুক্তি দিয়ে তবে নিজের মুক্তি খুঁজে পেয়েছেন।'[২২]

দুটি ভিন্ন ধরনের বঞ্চনার আবহকে ঘিরে **'তিরশ্চী'** গল্পটির প্লট তৈরি হয়েছে। গল্পকথক বিয়ের পাত্রী হিসেবে নয় বরং ভালোবাসার একান্ত সঙ্গী হিসেবে পছন্দ করেছে সুমিতাকে। কিন্তু সুমিতা তার ভালোবাসার ঐশ্বর্য সযত্নে আগলে রেখেছে অন্যজনের জন্য। পরিণতিতে দুজনের কেউই তাদের ভালোবাসার মধুরতম স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে দুজনের জীবনচেতনায় নেমে আসে অপরিচিতের স্পর্শ, যাকে কেউ অবহেলা করে জীবনের আঙিনা থেকে সরিয়ে দিতে পারেনি।

১৩৩৭ সালে প্রকাশিত গল্পে দুটি পর্যায় লক্ষ করা যায়। এক গল্পকথকের বিবাহ-পূর্ব বিচিত্র কল্পনা, তাকে ঘিরে রঙিন স্বপ্ন বুনন, পরিশেষে হৃদয় মাঝে লালিত প্রেয়সীর কাছ থেকে প্রাপ্ত আঘাত। অন্যদিকে সুমিতার

ভালবাসার পুরুষের জন্য অধীর আগ্রহ, তাকে চিরকালের করে পাবার আকাঙ্ক্ষায় একের পর এক পাত্রপক্ষকে চিঠি লিখে বিদায় করা, অবশেষে পরাজিত হয়ে অন্যজনের জীবনে যুক্ত হওয়া।

গল্পটি যাকে ঘিরে আবর্তিত সেই সুমিতার পরিণতিকে কেন্দ্র করে পাঠক হৃদয় যেমন বিষাদগ্রস্ত হয় তেমনি আবার তার পরাভবও তাদেরকে বিচলিত করে তোলে। তার এই জীবনচেতনা স্খলিত হয়ে অসম্মানিত হয় গল্পকথকের চেতনার কাছে। গল্পের প্রথম দিকে বিবাহপূর্ব রঙিন কল্পনায় ভেসে বেড়ানো গল্পকথকের হৃদয় পটে এক অন্যরকম আনন্দের ঢেউ তরঙ্গায়িত হয়। তার ভাষায়–'বলতে গেলে, বইয়ের থেকে মুখ তুলে সেই আমার প্রথম বাইরের দিকে তাকানো। শরীরে মনে এত সচেতন হয়ে জীবনে এর আগে কোনদিন কোন মেয়ের মুখ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বিয়ে করব, এই ঘটনাটার মধ্যে এত চমক নেই, কিন্তু মুখ ফুটে একবার একটি 'হাঁ' বললেই এত বড় পৃথিবীর কে একটি অপরিচিতা মেয়ে এক নিমিষে আমার একান্ত হয়ে উঠবে–এটাই নিদারুণ চমৎকার লাগছিল। আমি ইচ্ছে করলেই তাকে সঙ্গে করে আমার বাড়ি নিয়ে আসতে পারি, কারুর কিছু বলবার নেই, বাধা দেবার নেই। অহরহই তো আমরা 'না' বলছি, কিন্তু সাহস করে একবার 'হাঁ' বলতে পারলেই সে আমার।' (এ.এ.গ. /৬৯১)

প্রত্যেক পুরুষের জীবনচেতনাতে স্ত্রী সম্পর্কে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত একটি স্বপ্নময়তা গুঞ্জরিত থাকে, আর সে যদি হয় স্বচ্ছ সারল্যময় স্নিগ্ধ নারীমূর্তি তবে সে প্রতীক্ষা যেন সহস্রগুণ বর্ধিত প্রাপ্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যে কোন পুরুষের এ রকম উপলব্ধি অনির্বচনীয়। গল্পকথকের ভাবনায় 'চক্ষু থেকে শ্রবণেন্দ্রিয়টাই এখন দ্রুত ও তীক্ষ্ণ কাজ করছে। অস্পষ্ট করে অনুভব করলুম পাশের ঘরেই মেয়ে সাজানো হচ্ছে–বিস্তৃত শাড়ির খসখস ও চুড়ির টুকরো টুকরো টংটং আমার মনে নতুন বৃষ্টির শব্দের মত বিবশ একটা তন্দ্রার কুয়াশা এনে দিচ্ছিল। তার সঙ্গে অনেকগুলো চাপা কণ্ঠের অনুনয় ও তার অনুচ্চারিত গভীরে কার যেন রঙিন খানিকটা লজ্জা। সেইলজ্জা গায়ের উপর স্পর্শের মত স্পষ্ট টের পেলুম।' (এ.এ.গ./৬৯২) ... মনে মনে হাসলুম। দিন কয়েক নেহাত আগে হয়ে পড়ে, নইলে ঐ তার পাখির পাখার মত মুক্তিতে বিস্ফোরিত উড়ন্ত আঁচলটা মুঠিতে চেপে ধরে অনায়াসে তাকে স্তব্ধ করে দিতে পারতুম, কিংবা আমিও যেতে পারতুম তার পিছু পিছু। আজ যে এত বিমুখ সে-ই একদিন অবারিত, অজস্র হয়ে উঠবে ভাবতেও কেমন একটা মজা লাগছে। যে আজ পালাতে পারলে বাঁচে, সে-ই একদিন আমার কণ্ঠতট থেকে তার বাহুর ঢেউ দুটিকে শিথিল করতে চাইবে না।' (এ.এ.গ./৬৯৪)

অনিন্দ্য স্নিগ্ধ লাবণ্য আর সারল্যের মূর্ত প্রতীক সুমিতার কল্পনায় গল্পকথকের অন্তর্জগত যেন অসম্ভব প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় তুমুল ভাবে আলোড়িত হয়ে ওঠে। মনোজগত আচ্ছন্ন করা কল্পনায় বিভোর গল্পকথকের সময় হরিণীসম ধাবিত হয়ে চলে সম্মুখপানে। তার আত্মোপলব্ধিতে বর্ণিত হয়–'পাশাপাশি সে কটা দিন রাত্রি আমার একটানা একটা তন্দ্রার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। কে কোথাকার একটি অচেনা মেয়ে পৃথিবীর অগণন জনতার মধ্যে থেকে হঠাৎ একদিন আমার পাশে এসে দাঁড়াবে তারই বিস্ময়ের রহস্যে মুহূর্তগুলি আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। তার

জীবনের এতগুলি দিন শুধু আমারই জীবনের একটি দিনকে লক্ষ্য করে তার শরীরে মনে স্তূপে-স্তূপে সঞ্চিত হয়ে উঠেছে। পুরীতে যখন সে সমুদ্রে ডুব দিত তখনও সে ভাবে নি তীরে তার জন্যে কে বসে আছে। ঘটনাটা এমন নতুন, এমন অপ্রত্যাশিত যে কল্পনায় অসুস্থ হয়ে উঠতে লাগলুম। কাজের আবর্তে মনকে যতই ফেনিল করে তুলতে চাইলুম, ততই যেন অবসাদের আর কূল খুঁজে পেলুম না।' (এএ. গ./৬৯৫) সুমিতার অনিবর্চনীয় স্নিগ্ধ মাধুর্য এবং অকলঙ্ক নিবিড় মনের সৌন্দর্য গল্পকথককে তার প্রতি ভালোবাসায় আপ্লুত করেছিল। তাইতো সমাজ তথা পারিবারিক চেতনার বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়েও নিজের জীবন অনুভূতির কথা দ্ব্যর্থহীন বাক্যে প্রকাশ করতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। বলেছে– 'তোমরা ঠাট্টা করতে পার, কিন্তু বলতে আমার দ্বিধা নেই, সুমিতাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। কথাটা একটু হয়ত রূঢ় শোনাচ্ছে। কিন্তু ভাললাগার একটা বিশেষ অবস্থার নামই কি ভালোবাসা নয়? তাকে এত ভাললেগেছে যে তার সমস্ত ত্রুটি, সমস্ত অস্পূর্ণতা সত্ত্বেও তাকে আমি বিয়ে করতে চাই, এইটেই কি আমার ভালোবাসার প্রমাণ নয়?' (এ.এ.গ./৬৯৫) সুমিতাকে অন্তরে ঠাঁই দিয়ে গল্পকথকের মনে অনাবিল আনন্দ ও অভূতপূর্ব আবেগের প্লাবন বয়ে যায়। সুমিতার অপূর্ণ শ্যামলিমা গল্পকথককে আবেগমদিরতায় আচ্ছন্ন করে দেয়। ভাবে হয়তো সুমিতাও তাকে নিয়ে একই ভাবে স্মরণরেখা অঙ্কণ করছে। বুনে চলেছে ভালোবাসার প্রীতিময় রঙিন স্বপ্নজাল। 'হয়তো সুমিতারও মনে এমনি দক্ষিণ থেকে হাওয়া দিয়েছে। বাইরে থেকে কে কোথাকার এক অহঙ্কারী পুরুষ নিমিষে তার অন্তরের অঙ্গ হয়ে উঠবে এর বিস্ময় তাকেও করেছে মুহ্যমান। হয়ত সেদিনের পর থেকে তার চোখের দীর্ঘ দুই পল্লবে কপোলের উপর ক্ষণে ক্ষণে লজ্জার শীতল একটু ছায়া পড়ছে, হয়ত আয়নাতে চুল বাঁধবার সময় তার শুভ্র সীমারেখাটির দিকে চেয়ে সে একটি নি:শ্বাস ফেলছে, হয়ত আমারই মত রাতের অনেকক্ষণ সে ঘুমুতে পারছে না। (এ.এ.গ./ ৬৯৫)

কিন্তু সুমিতার দিক থেকে প্রচণ্ড এক ঝড়ো বাতাসের ঝাপটায় গল্পকথকের বোনাস্বপ্ন মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে যায়। যাকে হৃদয় উজাড় করে ভালোবেসেছিল, মনের আঙ্গিনায় ঠাঁই দিয়ে যাকে সম্মানিত করেছিল সে কিনা হৃদয়ের মনিকোঠায় অন্যজনের জন্য প্রদীপ জ্বালে? সুমিতার চিঠি পেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ না হয়ে বরং ভালোবাসার পূর্ণ মর্যাদায় সুমিতাকে উপলব্ধি করেছে গল্পকথক। দগ্ধ মনে অনুধাবন করেছে ভালোবাসার সমুজ্জ্বল মহিমা। অন্তর্যাতনায় কাতরোক্তি 'কিন্তু এদের পাঁচজনকে আমি কী বলে বোঝাই? শুধু নিজের মনকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপি-চুপি বোঝাতে পারি, সুমিতাকে আমি ভালবেসেছি। সুমিতাকে আমি ভালবেসেছি, নিশ্চয়, ভালোবেসেছি তার ঐ প্রেম। তাই তাকে অপমান করব, আমার সাধ্য কী! তাকে যে আমার কেন এত পছন্দ হয়েছিল, এ কথা এখন কে বুঝবে?' (এ. এ.গ./৬৯৭)

নিজের সমস্ত দুঃখ ব্যথা, বেদনা সর্বান্তঃকরণে বুকের মধ্যে চেপে সুমিতাকে বিসর্জন দেয় গল্পকথক। শুধু স্বার্থপরের মত নিজের সুখ শান্তিকে বড় করে না দেখে সুমিতার প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে বিয়েটা ভেঙ্গে দেয়, তাতে যদি সুমিতা তার প্রিয়জনের সান্নিধ্য লাভ করে জীবনকে পরিপূর্ণ করতে পারে, তবেই তো

বিসর্জনের মহিমা উদ্ভাসিত হবে। নইলে ভালোবাসাহীন জীবনে কোথাও সম্মান থাকে না। চিরকালীন বিরহ ব্যথায় উচ্চারিত হয় 'আমার সঙ্গে তার বিয়ের সম্ভাবনাটা সমূলে ভেঙে দিলুম। নিরীহ একটি মেয়ের অকারণ সর্বনাশ করছি বলে চারিদিক থেকে একটা নিদারুণ ধিক্কার উঠল, কিন্তু আমি জানি ঈশ্বর জানেন, আমার এই আত্মবিলাপের অন্তরালে কার একখানি বেদনায় সুন্দর মুখ সুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কাউকে ভাল না বাসলে আমরা কখনও এতখানি স্বার্থত্যাগ করতে পারি না। সুমিতাকে এত ভালবেসেছিলুম বলেই তার জন্যে নিজের এত বড় ঐশ্বর্য অনায়াসে ছেড়ে দিয়ে এলুম। আমার ত্যাগ তার প্রেমের মতই মহান হয়ে উঠুক। প্রাগবিচার করা বৃথা, জীবনে সত্যিই সুমিতা সুখী হতে পারবে কিনা; কিন্তু প্রেমের কাছে সুখের কল্পনাটা সূর্যের কাছে দেয়াশলাইয়ের একটা কাঠি। তার সেই প্রেমকে জায়গা ছেড়ে দিতে আমি আমার ছোট সুখ নিয়ে ফিরে এলুম।' (এ.এ.গ./৬৯৮)

গল্পের অন্তিম পর্যায়ে সূচিত হয় প্রচণ্ড এক বিদ্যুৎস্পৃষ্টতা। সুমিতার জীবনচেতনায় আবির্ভূত হয় মহাকালের অমানিশা। ভালোবাসার মানুষের পরিবর্তে বিয়ে হয় অন্য একজনের সাথে। লোভী, নীতিভ্রষ্ট পশুপতিকে নিয়ে যাপিত জীবনের সবটুকুতে জুড়ে রয়েছে দারিদ্র্য, রয়েছে ভালোবাসাহীন জীবনে রূঢ় বাস্তবতার আলোহীন মেঘলা পারিপার্শ্বিকতা। পরিবর্তিত সুমিতার দ্বিতীয় দর্শনে গল্পকথকের মনে হল 'সেই সুমিতা আর নেই। যেন অনেক ক্ষয় পেয়ে গেছে। আগে তার শরীরে বয়সের যে একটা বোঝা ছিল তা-ও যেন খসে শিথিল হয়ে পড়েছে। সে আজ শুধু কালো নয়, কুৎসিত। পরনের শাড়িটাতে পর্যন্ত আটপৌরে একটা সৌষ্ঠব নেই। হাত দুখানি দুটি মাত্র শাঁখায় ভারি রিক্ত, অবসন্ন দেখাচ্ছে।... চিত্রার্পিতের মত তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সেই সুমিতা আর নেই, হাসি মিলিয়ে যাবার পর সে যেন একরাশ স্তব্ধতা। তার ভঙ্গিতে নেই আর সেই ত্বরা। রেখায় নেই আর সেই তীক্ষ্ণতা। মুখের ভাবটি তৃপ্তিতে আর তেমন নিটোল নয়। তার জন্যে মায়া করতে লাগল।' (এ.এ.গ./৬৯৯)

সুমিতার এই অধ:পতনে স্তম্ভিত গল্পকথকের শ্লেষভরা কণ্ঠে অভিমান ঝরে পড়ে। বলে, 'তুমিই বা নিজের সুখ দেখলে না কেন? কেন গেলে ওকে বিয়ে করতে?

–পারলুম না, হেরে গেলুম। একেক সময় মানুষে আর পারে না। সুমিতা নিচের ঠোঁটটা একটু কামড়াল। বললুম–আমার বেলায় তো মরবার পর্যন্ত ভয় দেখিয়েছিলে, তখন মরলে না কেন? হাসবার অস্ফুট একটি চেষ্টা করে সুমিতা বললে, –মরতে আর কি বাকি আছে। –না, না, তোমার এই ফ্যাসানেবল মরা নয়, সত্যি সত্যি মরে যাওয়া। প্রেমের জন্যে তবু একটা কীর্তি রেখে যেতে পারতে।' (এ.এ.গ./৭০০) কথোপকথনের এক পর্যায়ে স্বামী পশুপতিকে বাঁচাবার জন্য সুমিতা আকুতি জানালে গল্পকথক সরোষে তা প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, সেদিনের প্রেম এখন আর নেই। তাছাড়া সুমিতার জীবনচেতনায় সেই তেজস্বিতা, বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ আর নেই। তাই বেদনাহত, আশাহত সুমিতার নিস্তরঙ্গ অন্তর্ধান ঘটে। গল্পকথক নাটকের শেষ অঙ্কের বর্ণনা দিয়েছে এভাবে 'মুমূর্ষু দীপশিখার মত সুমিতা একবার কেঁপে উঠল। কী কথা বলতে গিয়ে চমকে বলে ফেললে, – না আলোর দরকার হবে না।

আমি একাই যেতে পারব। দরজার কাছে এসে সুমিতা তবু একবার থামল। ঘরের চারদিকে মৃত, শূন্য চোখ চেয়ে একবার চোখ বুজল। কী যেন আরও তার বলবার ছিল কিন্তু একটি কথাও সে বলতে পারল না।' (এ.এ.গ./৭০১)

দাম্পত্য জীবনের জটিলতা, প্রেম ও বাস্তবজগতের মুখোমুখি মানুষের জীবনজিজ্ঞাসা, অপ্রকাশ্য সামাজিক ক্ষত, শহুরে প্রেমের গভীরতা -অগভীরতা অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পের প্লটকে করেছে সুসংহত ও সমৃদ্ধ। ব্যক্তিজীবনের জটিলতা বিশ্লেষণে, দুর্জ্ঞেয় মনের রহস্য উন্মোচনে ও মানব হৃদয়ের অনুভূতি রূপায়ণে তিনি নিপুণ শিল্পী। 'তিরশ্চী' গল্পের সুমিতা বাস্তবতাকে অস্বীকার করে রোমান্টিকতার কল্পলোকে ভেসে বেড়াতে চেয়েছে। কিন্তু এই প্রত্যাশার মধ্যে কোন বুদ্ধিমত্তার ইঙ্গিত নেই, আছে বাতুলতা- অচিন্ত্যকুমারের জীবনদৃষ্টিতে সে দিকটিই আলোকিত হয়ে উঠেছে।

সাহিত্যিকের সৃজনশীলকর্মে অচিন্ত্যকুমারের সামগ্রিক জীবনবোধের রূপায়ণ ঘটে অনিবার্যভাবে। মানুষের অখণ্ড জীবন মন্থিত হয়ে শিল্প ও সাহিত্যকর্মে সেই জীবনের প্রকাশ ঘটে স্বভাবসিদ্ধ প্রক্রিয়ায়। জীবনাভিজ্ঞতার আলোকে নির্মিত সাহিত্যকর্মে শিল্প ও আঙ্গিকরীতির সংশ্লিষ্টতা সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিণাম। এই অভিজ্ঞতা অর্জন ও জীবনচেতনা গঠনে প্রত্যেক লেখকের থাকে সুনির্দিষ্ট জীবন পরিপ্রেক্ষিত। এই পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করে যে কোন রচনাকর্মের মূল্যায়ণে যৌক্তিক সমাধানে উপনীত হওয়া যায়। সেই নিয়ম সূত্রে অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পের জীবনচেতনা ও শিল্পরীতি বিশ্লেষণের পূর্বে তাঁর সাংস্কৃতিক চেতনা, পারিবারিক আবহ, গুণীজনের সান্নিধ্য ইত্যাদি অনুষঙ্গ পর্যালোচনা করে নিরূপিত হয়েছে অচিন্ত্যকুমারের শিল্পিসত্তার কিছু বৈশিষ্ট্য। প্রথমত, প্রগতিবাদী ও মানবতাবাদী জীবনচেতনার অধিকারী অচিন্ত্যকুমার। দ্বিতীয়ত, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী- পেশার মানুষ পর্যবেক্ষণে তিনি অর্জন করেন প্রভূত অভিজ্ঞতা। তৃতীয়ত, বর্হিজগত ও অন্তর্জীবনের বস্তুচিত্র তিনি দেখেছেন প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গিতে। জীবন জিজ্ঞাসায় ও জীবনের বৈচিত্র্য নিরূপণে তাঁর শিল্পিচেতনা সমকালীন সাহিত্যধারায় স্বাতন্ত্র্য অর্জনে সমর্থ হয়েছে।

'ধরা বিয়ে' গল্পে গ্রামের উচ্ছলা তরুণী দিব্যমণির মনের মানুষের পরিবর্তে অপরিচিত গ্রামের তরুণ ভক্তদাসের সঙ্গে বিয়ের পর সে প্রকৃতির পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিকলবন্দী জীবনের অসহায়ত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। ভক্তদাস নববিবাহিত স্ত্রীর মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর সেখান থেকে চলে গিয়ে তার মুক্ত জীবন আবার ফিরিয়ে দিয়েছে।

এ গল্পে মানব মনের সূক্ষ্ম রহস্য আবর্তিত। চঞ্চলতার মধ্যেও দৃঢ় আকাঙ্ক্ষার ছায়া পরিলক্ষিত হয় দিব্যমনির মধ্যে। 'সাঁতরা বাবুর ভাগ্নে'কে নীরব ভালোবাসার কারণে ভক্তকে কোন ভাবেই মেনে নিতে পারে না সে। ভক্তকে বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও অপারগ দিব্য 'দুষে যাওয়া পান' বলে নিজের চরিত্রের ওপর কলঙ্ক লেপন করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। তার হৃদয়ের বিচিত্রতা প্রকাশ পায় যখন সে ভক্তকে বলে 'চুমু খাবি তো? খানা

যটা তোর খুশি'। ভক্ত কিন্তু পারে নি প্রাক বিবাহ ঘনিষ্ঠতায় সায় দিতে। কিন্তু দিব্য রক্ষণশীলতাকে তোয়াক্কা না করে নিজের 'আমিত্ব' কে বাঁচাতে চেয়েছে বারবার। সংস্কারহীন দিব্য পারেনি নিজের ভালোবাসাকে অর্জন করতে। 'রোদ লাগা পানের মতো ঝুমরে ঝিমিয়ে পড়েছে'। বন্ধনহীন দুরন্ত দিব্যমণি ধরা বিয়েতে যেন প্রাণহীন শুষ্ক হয়ে পড়ে। দুটি জীবনের স্তব্ধতার ছোঁয়াতে প্রকৃতির রাতও ঘোলাটে হয়ে গেছে। জ্যোৎস্নায় পূর্ণিমার আভা নেই। ময়লা অনুজ্জ্বল আলোতে তেঁতুল গাছে বসে একটা ভুতুম ডেকে চলেছে বারবার অখণ্ড নিস্তব্ধতার ভেতর শব্দের মহিমায়। উচ্ছ্বাসহীন জীবন দেহকে স্থবির করে দেয়। বোবা কষ্ট, চাপা কান্নার বেদনা বুকের ভেতরে থাকে অপ্রকাশের যাতনা নিয়ে। ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জায় সঙ্কুচিত দিব্যমনি ধরা দিতে চায়নি। অব্যক্ত কষ্টের যন্ত্রণা দিব্যমনির রক্তিমাভা মুখে এনে দিয়েছে ফাঁসিকাঠে লটকানো মৃতের সাদাশূন্যতা। বিয়ের শ্মশানে এসে স্বামীরূপী ভক্ত উপলব্ধি করে, দিব্য আসলে বন্ধনহীন বিহঙ্গের মতো, বন্ধন তার কাছে আনন্দহীনতা। হৃদয়ের সকল অনুভূতি দিয়ে ভক্ত কামনা করে দিব্য মুক্তি পাক আনন্দহীন ধরা বিয়ে থেকে।

এ গল্পে প্রকৃতির মত মুক্ত এক তরুণীর বদ্ধ জীবনের প্রতি অনাসক্তি সত্ত্বেও পারিবারিক কারণে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করলেও তার মুক্তি মিলেছে সদ্য বিবাহিত স্বামীর পক্ষ থেকে। তার মানসপ্রকৃতি গভীরভাবে অবলোকনের পর তাকে স্বাধীন করার সিদ্ধান্তে উপনীত হয় ভক্ত।। এক বিয়েতে বরযাত্রী হিসেবে আসার পর ভক্তের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে গ্রামের এক উচ্ছল তরুণী। বিয়ে শেষ হওয়ার পরও তার কথা বিস্মৃত হতে পারে নি, প্রতি মুহূর্তে তার মনে আন্দোলন তুলেছে সেই তরুণী। তার চঞ্চলতা ও বন্ধনহীন আচরণ লেখকের বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'আঁচল অসামাল করে ছুটে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া। কখনো রশিতে টান মারা, কখনো বা ডাবা হুঁকোয় ছুঁচলো করে ঠোঁট রাখা। ঘাসের মতো পান চিবানো। শব্দ করে পিক ফেলা। বারে বারে নিচেকার ঠোঁট উলটিয়ে দেখা। শাড়ির এখানে ওখানে পানের ছোপ লাগানো। মনে লেগে আছে তার সেই পান খাওয়া লাল দাঁতের হাসি, সেই ফচকেমি।' (য.বি./৩১)

দিব্যমণির বাবা সুধন্য পাল ভক্তকে পছন্দ করে ফেলে নিজের দুরন্ত মেয়ের জন্যে। ভক্তদাসের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়েছে সে তার মেয়ের জন্য উপযুক্ত।

'যেন ছাঁচে ফেলে হাতের আদরে গড়েছে সে মুখ। টানা চোখ, টিকালো নাক, টাটকা স্বাস্থ্য। বয়েস একুশ বাইশের বেশি নয়। খালি পা, খাটো ধুতি, বুক- খোলা আধা শার্ট।'

ভক্ত মামার বাড়িতে মানুষ এবং মাটির বিভিন্ন তৈজসপত্র তৈরিতে সহায়তা দান করে। ভক্তের মতো উপযুক্ত পাত্রের হাতে সুধন্য মেয়েকে সম্প্রদান করতে চায়। জাত-ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে এখন সে পানের বরজ আর জমি করে অনেক অর্থসঞ্চয় করেছে। মেয়ের বিয়ের জন্য ব্যয় করতে সে দ্বিধাবোধ করবে না। সুধন্যর মেয়ে দিব্যমণিকে ডাকার পর সে ভক্তদাসের সামনে এসে দাঁড়ানোর সময় লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে :

'একটি চোদ্দ পনেরো বছরের মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন কাঁপছে, ফেটে পড়ছে। চুল খসা, শাড়ি বেগোছ। মুখে লেগে আছে হাসি আর দুই ঠোঁটের ফাঁকে পান খাওয়া সেই লাল দাঁত।'

বর্ণনায় বন্ধনমুক্ত এক কিশোরীর চিত্র প্রকাশিত। সংকোচহীন, দ্বিধামুক্ত ও বাচালতা যার বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই ভক্তকে দেখার পর দিব্য তার বাবাকে প্রশ্ন করতে দ্বিধাবোধ করেনি, 'কে এই ছোঁড়াটা বাবা?'

সুধন্য পাত্র হিসেবে ভক্তকে হাতছাড়া করতে চায়নি বলে তাকে বাড়িতে রেখে তার মামাকে আনার জন্যে লোক পাঠিয়েছে। সুধন্য ভক্তকে দু'দশ বিঘে জমি ও পানের বরজ উপহার দিয়ে তাকে ঘরজামাই করে রাখার প্রস্তাব দেয়। সে ভক্তের মামাকে বিয়েতে রাজি করানোর জন্যে অনেক টাকাকড়ি দেওয়ার পর আর কোনো আপত্তি করে না।

বিয়ের আগে পানের বরজের মধ্যে ভক্তের সঙ্গে দেখা হয় দিব্যমণির। ভক্তকে যে তার অপছন্দ তা সে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করে। ঝাঁঝালো সংলাপের মধ্যে দিয়ে তার মনোভাব স্পষ্ট করে তোলে।

'তুই তো একটা বাঁদর। মুক্তোর মালা গলায় পরতে এসেছিলি।'

'সরে পড় সময় থাকতে, নইলে ভাল হবে না।'

'কিন্তু শোন, তোকে বলে রাখি খাঁটি কথা, 'তোকে আমার একটুও পছন্দ হয় না, তোকে আমি ভালোবাসতে পারব না একরত্তি।

ঐ পানটা দুষে গেছে। শোন তবে কানে কানে, আমিও তেমনি দুষে গেছি। ... তা না হলে অমন রাস্তা থেকে বর ধরে এনে বিয়ে দেয় সাত তাড়াতাড়ি?' (য.বি./৪৩)

চোখে ঝিলিক মেরে বলে দিব্যমণি, ' চুমু খেলেই হবে? ...আমার মুখে খুব মিষ্টি পান। শিগগির, সাঁটে মেরে নে চট করে। তারপর বাড়ি পালা।' (য.বি./৪৬)

দিব্যর চরিত্রহীনতা ও অপছন্দের দিক তুলে ধরার পরও ভক্তদাস তাকে বিয়ে করার মনোভাব ত্যাগ করতে পারে না। প্রথম দিন দিব্যকে দেখার পর তার মনের মধ্যে যে মুগ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে তাকেই সে ধরে রাখে। দিব্যর নানা অপূর্ণতা জানা সত্ত্বেও তাকে সে বিয়ে করতে অগ্রসর হয়। কিন্তু বিয়ের আসরে দিব্যকে দেখে বিস্মিত হয় ভক্তদাস। দুরন্ত, দুর্বার দিব্য বিয়ের পিঁড়েতে বসেছে মাথা নিচু করে, অনেকাংশে নিস্তেজ, রোদ- লাগা পানের লতার মতো ঝিমিয়ে পড়েছে। বিয়ের রাতে দিব্য চোখ বুঁজে থাকে, ঠোঁট দুটো মনে হয় ফ্যাকাশে। দিব্যর পরিবর্তনে ভক্ত হতভম্ব হয়ে যায়। লেখক এই দিকটি বিস্তৃত করে দেখিয়েছেন-

'একি পান খাওনি?'

'না, আজ আমার উপোস, আমার বিয়ে।'

'তুমি তো ও সব মানো না।'

'না মানি। এখন মানি।' দিব্যমণির কথায় অবাক হয় ভক্ত। আগের দিব্যর সঙ্গে এখন দিব্যর কোন মিল নেই। নতুন দিব্য বিনীত, নিয়মনিষ্ঠ ও আত্মসমর্পিত। ভক্ত স্পষ্ট অনুভব করে পূর্বের উজ্জ্বল, বন্ধনহীন দিব্যর মৃত্যু হয়েছে বিয়ের বন্ধনের মধ্য দিয়ে। ভক্ত দিব্যের কাছে এসে তার মুখের দিকে তাকায়। মরার মত শাদা মুখ, অনেকটা যেন ফাঁসিকাঠে লটকানো মুখ। চোখে জলের দাগের মতো রক্তের কালো দাগ যেন লেগে আছে জায়গায় জায়গায়। ভক্তদাস উপলব্ধি করে সে দিব্যর যোগ্য পাত্র না। সে এক রাতের মিথ্যে দুঃস্বপ্ন থেকে দিব্যকে রক্ষার জন্যে ঘরের দরজা খুলে বের হয়ে যায়।

'ধরা বিয়ে' ভক্তদাস ও দিব্যমণি উভয়েরই স্বপ্নভঙ্গের করুণ ইতিহাস। ভক্ত মুগ্ধ হয়ে যাকে জীবনসঙ্গিনী করতে চেয়েছে সে তো জীবনে বন্দিত্ব স্বীকার করে বাঁচতে চায়নি। তাই দু জনের আশাভঙ্গের মর্মান্তিক পরিণতির মধ্যে দিয়ে কাহিনী সমাপ্তির পথে প্রবাহিত হয়েছে।

দিব্যমণি মুক্ত পরিবেশের চঞ্চল মানসিকতার স্বচ্ছ ও সাবলীল প্রতিভূ। প্রকৃতির মত সরল স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত দিব্য মন ও মননে এক অনন্যসাধারণ নারী। কিন্তু বন্ধন নামক বৈবাহিক সম্পর্ক দুঃসহ যাতনায় তাকে তিলে তিলে ক্ষত বিক্ষত করে জর্জরিত করেছে। ভক্তদাসের মুক্তি ও বন্ধনের পার্থক্য উপলব্ধি প্রকৃতপক্ষে লেখকের জীবনচেতনারই পরিশীলিত স্নিগ্ধরূপ। 'জীবনের রূপবৈচিত্র্য দেখতে ও দেখাতে অচিন্ত্যকুমারের নৈপুণ্য এইসব গল্পে প্রতিষ্ঠিত। তিনি অভিজ্ঞতার শিল্পী।'[২৩]

'দর' গল্প 'এক অঙ্গে এত রূপ' গল্পগ্রন্থের একটি ভিন্নধর্মী প্রেমবিষয়ক গল্প। এখানে রমলাকে আবর্তন করেছে দুটি পুরুষ চরিত্র। একজন সফল পুরুষ হিসেবে রমলাকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়েছে উকিল সুহাস, অন্যজন জীবনের কঠিন বাস্তবতায় ধাক্কা খেয়ে খেয়ে পরাজিত পুরুষ মুরারি।

'দর' অর্থাৎ 'কত নেবে' - কথাটি গল্পের বিভিন্ন অংশে বিচিত্র তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। প্রথম অংশে মুরারির 'কত নেবে' প্রশ্নটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উৎসুক্য। উচ্ছেদের মামলায় পড়ে উকিল সুহাস অর্থাৎ রমলার স্বামীর ফি কত-তাই জানবার আকুল আগ্রহ। গল্পের অন্য অংশে 'কত নেবে' কথাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সুহাস-রমলার প্রথম দেখার স্মৃতিময় দিন। সুহাসের উদ্দেশ্য এখানে খুব স্পষ্ট নয় কিন্তু ঘটনাটিকে স্পষ্টতার দিকেই ছুটতে দেখা গেছে। সুহাসের ভাবনা আর লক্ষ্যের দিকে খেয়াল করলে দেখা যায় রমলার সম্মান সেখানে আড়ষ্টবোধে কুণ্ঠিত। তার একটাই কারণ, আর তা হল সেই প্রশ্নটা। 'কত নেবে?' আবছা হয়ে আসা দিনের আলোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে তেমনি ধূসরস্বরে জিগগেস করল সুহাস। মেয়েটি দরজার পাশটিতে স'রে দাঁড়াল। 'যাব?' এক মুহূর্ত কি ভাবল মেয়েটি। স্বরে সমীচীন অস্পষ্টতা এনে বললে, 'আসুন।'

আসুন! সুহাসের বুকের ভিতরটা দুলতে লাগল তাণ্ডবের মতো। কত পকেটে আছে মানিব্যাগে ঠিক মনে করতে পারছে না। কোন পাহাড় চূড়ার দাম চেয়ে বসে তার ঠিক কি। মনে হ'ল সেটা মোটেই প্রশ্ন নয়। মনে হ'ল অদ্ভুতের দেশে এ আশ্চর্যও সম্ভব, এমন আকাশ-কুসুমও চয়ন করা যায় মর্তের ধূলিতে! সোনালী মেঘ ধরা যায়

হাত বাড়িয়ে, হয়তো বা পাহাড়ের মুকুট, কিন্তু ফণাতোলা সাপের মাথার মণি ছিনিয়ে নেওয়া যায় এ কল্পনার অতীত। সজ্ঞান শরীরে চিন্তা করা ও যেন কষ্টকর' (এ.অ.এ.রূ./১৪)

অসম্মানে ছোঁয়া প্রশ্নে আত্মসম্মান যখন ভুলুণ্ঠিত তখন ঘটে যায় এক অপ্রীতিকর ঘটনা। রমলার দুই ভাই গায়ে হাত তুলল সুহাসের। 'নাটক চাও না, সার্কাস চাও?' বলে নাকের ওপর ঘুষি মেরে বসে রমলার বড় দাদা। আর সুহাস 'সেদিন অমনি ক'রে অপমান করেছিল বলেই তো দুর্মদ প্রতিজ্ঞা করেছিল, যে করে হোক, পেতেই হবে রমলাকে। যে ডাকে অথচ ধরা দেয় না ধরতে হবে সেই অধরাকে। নিমন্ত্রণ করেও যে উপবাসী রাখে লুট করতে হবে তার অন্নভাণ্ডার।' (এ.অ.এ.রূ./১৯)

একটু একটু করে নিজেকে তৈরি করল সুহাস শুধু রমলার জন্য। যে রমলা 'জোরালো রেখায় এক টানে আঁকা সরল দীর্ঘাঙ্গিনী। গায়ের রংটি ক্ষমাহীন কালো। কিন্তু সে কালোয় অগ্নিশিখার রক্তিমা।' 'তুই ওর মধ্যে দেখলি কি?' বন্ধুদের এমন প্রশ্নের জবাবে সুহাসের নির্লিপ্ত উত্তর 'আশ্চর্যকে দেখলাম। যাকে লোকে মানতে চায় না অথচ জানতে চায়, দেখলাম সেই অলৌকিককে।' (এ.অ.এ.রূ./২১)

গল্পের শেষের দিকে আরো একবার এ প্রশ্নের অবতারণা ঘটনাটিকে আরো বিস্তৃত করে। যেমন-'কত নেবে?' বিয়ের রাত্রে নিবিড় স্পর্শের মধ্যে নিমন্ত্রণ ক'রে রমলাকে জিগগেস করে সুহাস। 'আরো কত নেবে? কত শ্রম, কত ধৈর্য, কত নিষ্ঠা, কত সংকল্প?' (এ.অ.এ.রূ./ ২১) কিন্তু গল্পের প্রান্তে মুরারির জীবনবোধে এক অদ্ভুত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। দাম না নিয়েই সে নথিটা রমলার হাতে তুলে দেয়। বলে, 'আমি উচ্ছেদ হই তো হব, তোমায় উচ্ছেদ করি কেন? আমি যতই অভাবী হই আমার ভাবের ঘর ভরা থাক'। গল্পের সারা অংশের চেয়ে এখানে মুরারীর জীবনবোধ ভালোবাসা ও ত্যাগের লালিত্যে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে।

পরিশেষে আর একবার সুহাসের প্রশ্নটি পাঠকমনকে কৌতূহলী করে তোলে। রমলার পূর্ব ইতিহাস হয়তো সুহাসের অবিদিত ছিল না। সব জেনেই রমলাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে অবলোকন করেছে সে, আর শেষোক্ত কথাটি সে বিষয়েরই ইঙ্গিত প্রদান করে। এ দিক থেকে সুহাসের উদারতা অনস্বীকার্য। জীবনের বিচিত্র পথ পাড়ি দিতে গিয়ে যদি এক হৃদয়ের ভালবাসা অন্য হৃদয়ে আবেশের নির্ঝরিণী প্রবাহিত করে তবে সেখানে হয়তো ভুলের কিছু নেই। যদি সে সম্বন্ধ সময়ের পরিক্রমায় অন্য হৃদয়ে আসন পেতেও বসে হয়তো সেটাও দোষের নয়। এই আদর্শের প্রেক্ষাপট থেকে শ্রেষ্ঠ দিকপাল হিসেবে সুহাস ক্ষমাশীল থেকেছে ভালোবাসাপূর্ণ বিশাল হৃদয় নিয়ে। রমলার 'ঝরঝর করে কেঁদে' ফেলা সুহাসের প্রতি পরম মমতা মিশ্রিত ভালোবাসরই সজল প্রকাশ। আর এখানেই সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় দু'জনের আন্তরিক সম্পর্কের স্নিগ্ধ মুধরতা।

'দর' গল্পটিকে যদি অখণ্ডভাবে অনুধাবন করা যায় তবে এর অন্তর্গতবোধ, মর্মার্থ ও সৌন্দর্যশক্তি অবশ্যই প্রত্যক্ষভূত হবে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর কাহিনী বিনির্মাণে তাৎপর্যময় জীবনভাবনার স্ফূরণ ঘটিয়েছেন, নি:সন্দেহে রুক্ষ বাস্তবতাই তার মূল ভিত্তি। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে নিজ জীবনবোধের প্রদীপ্ত আলোকে

যাচাই করে নিয়ে সাহিত্যে মনোহর করে তোলার জন্য যেমন নির্জনচিন্তার অবকাশ প্রয়োজন তাঁর ক্ষেত্রে কখনও তার অভাব ঘটেনি। সে কারণে তিনি ছোটগল্পের বিষয় হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন সংকটে পরিপূর্ণ জীবন, রোমান্টিক ভাবময়তা, মানব মনস্তত্ত্বের নানা অপ্রকাশিত প্রান্ত, অর্থলিপ্সা, নিরাপত্তাহীনতা, ক্ষুধা ও দরিদ্রতা প্রভৃতিকে। জীবনবিচ্ছিন্নতায় নয় বরং জীবনসংযোগের মধ্য দিয়েই তিনি সামগ্রিকতা অর্জন করতে চেয়েছেন। নিম্নমধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তের জীবন-স্বরূপের প্রতিচিত্র অঙ্কনে তাঁর প্রয়াস অনায়াসসাধ্য। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে রমলা-সুহাস-মুরারি এই চরিত্র তিনটি অচিন্ত্যকুমারের স্বত:স্ফূর্ত সৃজন-প্রতিভা ও মৌলিক চিন্তাশক্তিরই পরিচায়ক।

এ গল্পগ্রন্থের **'ঘৃণা'** গল্পটি রূপায়িত হয়েছে একজন নারীর সংস্কার আবৃত জীবনবোধকে কেন্দ্র করে। সুকণ্ঠী ও পরাশর দুজনই কর্মজীবী। কর্মক্ষেত্রের বাইরে এদের দু'জনের আর একটা পরিচয় আছে। সুকণ্ঠী সুন্দর গান করে অর্থাৎ গাইয়ে আর পরাশর সাহিত্য রচনা করে অর্থাৎ লিখিয়ে। দৈনন্দিন কর্মমুখী জীবনাচরণের বাইরে তাদের মধ্যে রয়েছে হৃদয়ের সম্পর্ক। সেখানে 'একজনের চোখের উঠোনে আরেকজনের চোখের রোদ খেলা করে।' আবার 'লজ্জার গাঢ় পদ্মরাগও মাঝে মাঝে সুকণ্ঠীর চোখে বিশ্রাম করতে বসে।' সুপ্ত ভালোবাসার দ্যুতিময় বর্ণচ্ছটা দু'জনের অন্তরকেই আলোকিত করেছিল। তাদের আটপৌরে জীবনে প্রেমের অনুভূতি ছিল 'সেই মেঘ মাখানো সন্ধ্যা। সেই মিটিমিটি লণ্ঠনের আলোয় অনেক পোকার মধ্যে একটি মানুষী প্রজাপতি।' লেখকের ভাষায়–'যে ছবির চোখ একবার তোমার চোখের দিকে তাকিয়েছে তাকে দূরে সামনে যে কোণ থেকেই দেখ না কেন, সব সময়েই সে তাকিয়ে থাকবে চোখের দিকে। তেমনি যাকে একবার ভালো লেগে গিয়েছে, সব অবস্থাতেই সে জ্বালিয়ে রাখবে সেই ভালোলাগার আলো– যে আলো মাটিতেও নেই সমুদ্রেও নেই।' (এ.অ.এ.রূ./৮৮)

গল্পের মধ্যভাগে সুকণ্ঠীর প্রবল সংস্কারবোধের কারণে বাধাগ্রস্থ হয় প্রেমবোধ। অফিস থেকে বাসায় ফেরার পথে ট্যাক্সিতে 'পরাশরের হাতের মধ্যে সুকণ্ঠীর হাতখানি ভয়ে কুঁকড়ে রইল। বিস্কুটের মতো গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে গেল।' মনে মনে ভাবল,–'পুরুষের স্বভাব কি কিছুতেই যাবে না?

হাত ছেড়ে দিয়েছে হাত। কাঁধের উপর উঠে এসেছে। মুহূর্তে পরাশরের সান্নিধ্যকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এক কোণে ছিটকে পড়ে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ক'রে উঠল সুকণ্ঠী; এই, রোকো। রোকো–' এমনটি কোনদিন শোনে নি ড্রাইভার। গাড়ি আস্তে করল।' মুহূর্তে সুকণ্ঠীর অন্তরে লালিত ভালোবাসার রক্তপদ্ম ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না পরাশরের এই আচরণ। অনুরাগের স্পর্শ কোনভাবেই নৈতিকতার সীমাকে অতিক্রম করে না। সৌজন্যবোধকে অবহেলা করে না। পবিত্র ভালোবাসায় স্পর্শ সম্মানের বারতা নিয়ে আসে। হৃদয়ের অনুভূতিকে সম্মান না করে স্পর্শ করা মানবিক সম্পর্ককে অসম্মান করার নামান্তর। আর সেই কারণেই সেদিনের 'সন্ধ্যায় রাগ মরে নি সুকণ্ঠীর। বাড়ি ফিরে এসে ছোটো অ্যাটাচি কেসটা খুলে বসল। দৈনিক পত্রিকার ক'টা

কাটিংস জমিয়েছিল সুকণ্ঠী, যেখানে যেখানে পরাশরের বক্তৃতার সারাংশ বেরিয়েছিল তার টুকরো। ক'টা ছবি। ক'টা বিজ্ঞাপন। অন্যের থেকে ভিক্ষা ক'রে আনা অটোগ্রাফের পৃষ্ঠা। ধারালো নখে সব ছিড়ঁতে বসল সুকণ্ঠী। টুকরো টুকরো ক'রে।... ছেঁড়া অংশগুলি আবার ছিঁড়ল, কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ল।... দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে পোড়াতে বসল সে ছিন্নস্তূপ।' (এ.অ.এ.রূ./৯২)

রাগে-অভিমানে-সংস্কারপ্রিয়তায় সুকণ্ঠী মুষড়ে পড়ে। ভালোবাসার অবস্থান পাল্টে যায়। স্থাপিত হয় গভীর বেদনামিশ্রিত ক্রোধ। সুকণ্ঠীর এই জীবনাচরণে প্রতিফলিত হয় নারী সমাজের সংস্কারবোধ। নারী ভালোবাসার ক্ষেত্রে অসংকোচ স্পর্শতাকে কোনভাবেই গ্রহণ করে না। আড়ষ্ট ভাব, হৃদয়ে গভীর অনুভব, ব্যাকুলতা অথচ মুখের নীরব ভাষা, স্পর্শে অদ্ভুত সংযম- এই তো ভালোবাসার চিরন্তন অনুভব। আর এই অনুভূতির সঙ্গে যখন প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনবোধের বিস্তর পার্থক্য সূচিত হয়, তখনই ঘটে অনিবার্য সংঘাত, যা সুকণ্ঠীর চরিত্রে প্রত্যক্ষ করা যায়।

গল্পের শেষাংশে লক্ষ করা যায় সুকণ্ঠীর মানসিক অবস্থানের পরিবর্তন। সুকণ্ঠী তার প্রিয়জনের সাথে আচরণ সম্পর্কে সীমাহীন অভিমানে স্তব্ধ হয়ে গেলেও সম্ভবত ভালোবাসার স্বল্পতা ছিলনা এতটুকু। আর তাইতো ট্যাক্সির ভেতরে বসে থাকা পরাশরের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করতে পারেনি কিছুতেই। ট্যাক্সিতে 'উঠতে উঠতে বললে, 'আমার কেমন মনে হচ্ছিল আপনার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাবে।'

'বর্ষায় সমস্ত হিসেব মুছে যায়। কুম্ভকর্ণের মতো অসম্ভবেরও ঘুম ভাঙে।' বললে পরাশর।

'হবে'। দরজা বন্ধ করল সুকণ্ঠী।

বেশ মেলে-ঢেলেই বসেছে মাঝখানে। ভঙ্গিটা আর কাঠ কাঠ নয়, কাঠগোলাপ - কাঠগোলাপ। বেশ অনায়াসেই ডান হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল পরাশর।

'ভিজে গিয়েছ দেখছি।'

'ও কিছু নয়–'।(এ.অ.এ.রূ./১০২)

অসীম অন্ধকারের অনিশ্চয়তার মধ্যে ভালোবাসার প্রিয় মানুষের হাত ধরে অনেকটা পথ হয়তো যাওয়া যায়। এই পথ পরিক্রমায় থাকে স্বস্তি, ভালোবাসার অনুভব আর নির্ভরতা। আর এই অনুভবের সুর ধ্বনিত হয় সুকণ্ঠীর হৃদয়ে। 'তবু যেন এতটুকু দুশ্চিন্তা নেই সুকণ্ঠীর। এই অজস্র বর্ষণ, পথঘাট ডোবানো বাড়িঘর ভোলানো জল, এই অনিশ্চয়ে থেমে থাকা–কিছুই যেন দুরূহ নয়।' (এ.অ.এ.রূ./ ১০৩)

এ গল্পে জীবনের অর্থপূর্ণ খণ্ডরূপের ব্যঞ্জনা সৃজিত হয়েছে যা লেখকের জীবনদর্শনের প্রতিফলন ঘটেছে। জীবন পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে চিন্তা, অনুভূতি ও উপলব্ধি মুহূর্তে ভাষারূপ পায় তাঁর ছোটগল্পে।

'জন্মান্ধ' গল্পে প্রেমের অচরিতার্থতার একটি ভয়ংকর পরিণতি প্রকাশিত হয়েছে। প্রেমের সুরে শুধু মিলন সঙ্গীত রচিত হয় না, বিরহের তীব্র বিষেও জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে

অমলেশের নাম উল্লেখযোগ্য। গল্পের প্রথম পর্যায়ে দেখা যায়, অমলেশ-মহুয়া অপরিণত বয়সে কলেজে পড়ার সময় দুজন দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। নবীন বয়সে প্রেমের অনুভূতি ছিল বাস্তবতার বাইরে কল্পনার রঙে রাঙানো। রঙিন প্রেমে মোহগ্রস্ত হয়ে মহুয়া অমলেশকে চিঠিতে লিখেছিল ‘আর কাউকে বিয়ে করবো না, আর কোথাও বিয়ে হলে আত্মহত্যা করবো।’ (এ.অ.এ.রূ./ ১২৫) কিন্তু সময়ের আবর্তনে অপরিণত প্রেমবোধ হয়েছে অনেক পরিণত। কাঁচা বয়সের উজ্জ্বল আবেগানুভূতি এখন আর মহুয়াকে স্পর্শ করে না। এখন তার কাছে জীবন হল ‘নতুন শাড়ি, নতুন গয়না, নতুন বিছানা, নতুন সিঁদুর।’ (এ.অ.এ.রূ./ ১২৬) কিন্তু অমলেশ প্রেমহীন নি:সঙ্গ জীবন বয়ে বেড়াতে অনিচ্ছুক। সে মৃত্যুর সঙ্গে পরমতম ছুটি কাটানোর জন্য ইন্টারভিউ দিতে এসেছে মহুয়ার শ্বশুরবাড়ি। প্রতি মুহূর্তে মহুয়াকে মৃত্যুপথে সঙ্গী করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। বলে ‘আমি তো মরবই। আমি তুমি দুজনে মরব। এক ঘরে এক বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে। তারই জন্যে খুঁজতে খুঁজতে এসেছি তোমার শ্বশুরবাড়ি। এই বিদেশ বিভুঁয়ে। পকেটে বিষ নিয়ে।’–(এ.অ.এ.রূ./ ১২৬)

অপরদিকে মহুয়ার কাছে ‘যে আত্মহত্যা করে সে কাপুরুষ।’ নতুন ঝলমলে সুখের জীবনে মহুয়া ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিমান। স্বামীর জন্য দিন গোনা, তার চিঠির জন্য অপেক্ষা করার ভেতর যে সুখের লহরী তা আর অন্য কোথাও বয়ে যায় না। স্বামী সোমনাথের চিঠি পাবার জন্য তার অভিব্যক্তি ছিল– “প্রসন্নবদান্য চিঠি। উৎসবের বর্ণিল ভাষায় স্বপ্নময়। আদরে সোহাগে আবেগে আবেশে প্রভূত দক্ষিণ। এমন একটা চিঠি পাবার আজ যেন ভারি দরকার ছিল। যেন কত নির্ভর কত অভয় কত শান্তি এমনি ক’রে অনুভব করবার জন্যে চিঠিটা রেখে দিল বুকের মধ্যে।’ (এ.অ.এ.রূ./ ১৩১)

এই সুখের রাজ্য থেকে অমলেশ কীভাবে মহুয়াকে নিয়ে যাবে মুত্যুর অন্ধকার পুরীতে? তবুও হার না মানা প্রেমিকের মতই উচ্চরিত হয় তার কণ্ঠে ‘তুমি পরিবারের সঙ্গে যুদ্ধ ক’রে হেরে গেছ, বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছ মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আজ, এখন মরতে তোমার বাধা কি? এক মুহূর্তে নিশ্চিন্ত মৃত্যু। এক মুহূর্তে সে কোন দেশান্তরে চ’লে যাওয়া। নতুন অদ্ভুত, না জানি কোন আরেক রকম অনুভূতি। আরেক রকম আকাশ, আরেক রকম জলস্থল।’ (এ.অ.এ.রূ./ ১৩৪) কিন্তু একসময় তো মহুয়া ভালোবেসেছিল তাকে! প্রাণ উজার করে প্রেমটুকু উপহার দিয়েছিল তাকে! সেই অমলেশকে মরিয়া হয়ে বাঁচাবার শেষ চেষ্টাতেও থাকেনি মহুয়ার এতটুকু ত্রুটি। ‘নিচু হ’য়ে হঠাৎ পায়ে পড়ল মহুয়া। কান্নালাগা ঝাপসা গলায় বললে, ‘আমি তুচ্ছ আমি হীন আমাকে বাঁচাও। তুমি যদি নিজেকে বাঁচাও তা হ’লেই আমি বাঁচব। একটা ক্ষুদ্রপ্রাণ মেয়ের সাধ-ক’রে গড়া খেলাঘর ভেঙ্গে দিয়ে তোমার লাভ কি। তুমি মহৎ তুমি নি:স্বার্থ–’ (এ.অ.এ.রূ./ ১৩৫)

না, মন গলেনি অমলেশের। মহুয়াকে সে বলেছে ‘অকারণে তুমি আমাকে অতিরিক্ত মূল্য দিয়েছ যার জন্য নিজের প্রাণকে মনে করেছ ধুলো। আসলে আমি তুচ্ছ আমি অসার আমি অপদার্থ। অন্তত আজ এখন, এই মুহূর্তে তুমি আমাকে তুচ্ছ করে দাও। অপদার্থ করে দাও। যাতে নিজেকে ঠিক মূল্য দিতে পারো। যাতে আমাকে

ছুঁড়ে ফেলতে পারো ফলের ছিবড়ের মতো, তরকারির খোসার মতো। যাতে আমি এক নিমেষে তোমার কাছে নিঃশেষ হ'য়ে যেতে পারি।' (এ.অ.এ.রূ./১৩৭)

গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায় অমলেশের মর্মান্তিক পরিণতি। মেঝেতে মরে পড়ে আছে। 'কি জঘন্যভাবে মৃতদেহটাকে নিয়ে গেল মর্গে। একটা কুকুর বেড়ালের মতো। ছোট ময়লাফেলা গাড়ির মধ্যে পুঁটলি পাকিয়ে। একটু ফুল নয়। চন্দন নয়। এক ফোঁটা চোখের জল নয়।' (এ.অ.এ.রূ./ ১৩৯)

অমলেশের মৃত্যু কারো হৃদয়ে সমবেদনা জাগাতে পারেনি। না মহুয়া না নিজের বাবার কাছে। এত কুৎসিৎ ভাবে মৃত্যুবরণের জন্য জন্মদাতা বাবা লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চেয়েছে মহুয়ার শ্বশুরমশাইয়ের কাছে। 'কোনোই নীতিশিক্ষা ধর্মশিক্ষা হয়নি। ছেলেবয়স থেকেই পথভ্রান্ত। তাই এই পরিণাম, আপনাদের সম্ভ্রান্ত পরিবার, আপনাদের বাড়িতে উঠে আপনাদেরকেই বিব্রত করল লাঞ্ছিত করল, আমার এ দুঃখও দুর্বহ।' (এ.অ.এ.রূ./ ১৪২) আর মহুয়া, যার জন্য এত নাটক, ভালোবাসার এক পাক্ষিক জীবনাবসান সে আত্মরক্ষার চেষ্টায় দৃঢ়তার সাথে বলেছে 'হ্যাঁ, আমাকে ভালোবাসত, কলেজের ছেলে ছোকরারা যেমন বাসে। মফস্বলের এক শহরে পাশাপাশি বাড়ি, যেমন হ'য়ে থাকে। চিঠি লেখালেখি হ'ত। পকেটে যে চিঠি পেয়েছেন, তা আমারই লেখা। অমনি এক আধখান নয়, ঝুড়ি-ঝুড়ি লিখেছি।

লোকটিতে ভালো লাগত ব'লে নয়, চিঠি লিখতে ভালো লাগত ব'লেই চিঠি লেখা। মনের কাঁচা রঙিন অবস্থার সঙ্গে প্রেমে পড়া। অল্পে সুখ নেই, আমাকে বিয়ে করতে চাইল। তৈরি ছেলে নয়, আমার বাবা মা রাজি হলেন না। তাঁদের সেই অসম্মতিতে আমারও সমর্থন ছিল। আমাকে বলেছিল অপেক্ষা করতে। কতদিন করতে হবে, তার কোন স্থিরতা নেই। আমি রাজি হলুম না। আমার যোগ্য ঘর-বর মিলে গেল, বাবা-মা বিয়ে দিয়ে দিলেন। সুখের রাজ্যে পা দিলুম। সেই থেকেই রাগ। সেই থেকেই আমাকে খুন করার মতলব। আমাকে মারতে না পেরে শেষে নিজে মরল।" (এ.অ.এ.রূ./ ১৩৯)

পুরনো দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা ইচ্ছে করে ভুলে গিয়ে নতুন দিনের সুখের আবাহনে ভীষণ উৎসুক মহুয়া। স্বামীর কাছে নিজেকে বাঁচানোর অভ্রান্ত কৌশল বর্ণনা করে বীরত্বের প্রশংসা শোনা, 'পর্বতের চূড়ার মতন স্বামীকে ফেলে একটা ট্যামট্যামির' সঙ্গে চলায় বিস্ময়বোধ করা, 'স্বামীর সোনার থালে অভিমানের জাউ' না খাওয়া – এ বিষয়গুলো মহুয়ার জীবনবোধে তীব্র ছাপ ফেলেছে। মহুয়া 'কেবল হাসে। কথায়-অকথায় হাসে। এক মুহূর্ত তার স্তব্ধ থাকার, বিমনা থাকার, গম্ভীর থাকার উপায় নেই। সব সময় সে হাসে। সাজে-গোজে। উৎসবের মশাল জ্বেলে বেড়ায়।' (এ.অ.এ.রূ./ ১৪৩)

এত আনন্দে থাকা অভিনয়ের মাঝে মহুয়া ভুলে যায় তার জন্মদিনের তারিখ। ভুল তারিখে জন্মদিনের উৎসব পালন– তার ইচ্ছে করে আনন্দে ডুবে থাকার ভান। আসলে এই ভানের মধ্যে নিহিত আছে মহুয়ার নিজের সঙ্গে নিজের যুদ্ধ করার প্রচেষ্টা। যা সকলের অগোচরে নিরন্তর ভাবে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্বমুখর করে তুলেছে মহুয়াকে।

কিন্তু মহুয়ার এই দ্বান্দ্বিক মানসিকতা স্বামী সোমনাথের কাছে আড়াল হয়ে থাকেনি। তাই 'সোমনাথের মনে হ'ল সবই মরে। দিন মরে রাত মরে রূপ মরে যৌবন মরে কাম মরে প্রেম মরে, কিন্তু কান্না মরে না।' (এ.অ.এ.রূ./ ১৪৫) এই কান্না অবিরল বর্ষণে ঝরে যায় মহুয়ার হৃদয়ে। প্রতিবেশের সবাইকে সুখ দিয়ে সুখী করে নিজের ভেতর যে যন্ত্রণার ধারা সে লালন করেছে সেই ধারায় অবগাহনে মহুয়া যেন অন্য নারী। যেন সুখের গৌরবে ঝলমল আনন্দের প্রতিমার ভেতরে নি:সঙ্গ দয়িতার প্রতিমূর্তি।

'জন্মান্ধ' গল্পে খুব সূক্ষ্মভাবে অঙ্কিত হয়েছে মহুয়ার বিবাহপূর্ব ও বিবাহোত্তর মানস প্রতিক্রিয়ার ছবি। বিভিন্ন পর্যায়ে তার মনোগত জটিলতার প্রতিটি ধাপকে স্পষ্ট করে একটি পূর্ণায়িত রূপ পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। তার মনশ্চাঞ্চল্য কিংবা মনবিক্ষোভের প্রতি বর্ষিত হয়েছে লেখকের অকৃত্রিম সহানুভূতি। প্রকৃতপক্ষে, কোন চরিত্রের প্রতি শিল্পীর গাঢ়-নিবিড় মনোযোগ ও মমত্ববোধের ফলে ওই চরিত্র প্রবলভাবে উদ্ভাসিত হওয়ার সুযোগ পায়। মানবমনের চিন্তনক্রিয়া, ভাবনা ও কল্পনাসূত্র কত সূক্ষ্ম, জটিল, অতলস্পর্শী ও রহস্যময় হতে পারে মহুয়ার মানসবিশ্লেষণে তার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যার সমান্তরালে অচিন্ত্যকুমার চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতির অনিবার্য প্রবহমানতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমগ্রতাস্পন্দী জীবনচেতনার পরিচয় দিয়ে শিল্পিত সম্প্রকাশ ঘটিয়েছেন এ গল্পে।

সাহিত্যে কল্লোলীয় ভাবোচ্ছ্বাসে জীবনবাস্তবতার অনুসন্ধান, দারিদ্র্যজীবনপ্রীতি, মধ্যবিত্ত মানসের অসঙ্গতি অনুধাবন প্রভৃতি অচিন্ত্যকুমারের জীবনবোধের নানা বৈচিত্র্যময় অনুষঙ্গ। তাঁর অন্তর্ভেদী অনুসন্ধিৎসা মানবমনের নিগূঢ় তাৎপর্যকে বাঙ্ময় করে তুলতে তাঁকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করেছে। চরিত্র নির্মাণসূত্রে, জীবন-অনুধ্যানে তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি ও বহুমাত্রিক বৈচিত্র্যকে সহজেই অনুমান করা যায়। সমাজের সাধারণ মানুষের সংস্কার-বিশ্বাস-অস্তিত্ব-সংশয়-বেদনা-ভালবাসা ও বঞ্চনার ক্ষুদ্রচিত্র সমন্বিত শিল্পিত অভিপ্রকাশ অচিন্ত্যকুমারের জীবনচেতনার বিশিষ্টতাকে আলোকিত করেছে।

'ছুরি' গল্পটি একটি প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলের এক টুকরো কাহিনীকে ঘিরে বিন্যস্ত হয়েছে। গল্পটির শাখা-প্রশাখা ততোটা বিস্তৃত নয়। একমুখী ছোট ঘটনা বর্ণিত হয়েছে জীবনানুভূতির বিশালতার ব্যাপ্তি নিয়ে। লোকজ পটভূমিতে অবতীর্ণ গৌরিয়া ও মহকুমার হাকিম সাহেব– দুটি চরিত্রে দু'ধরনের জীবনাশা রূপায়িত। গৌরিয়া নিষ্ঠুর পৃথিবীর পোড় খাওয়া বাস্তববাদী নারী, যাকে জীবিকার অন্বেষণের সাথে সাথে নিজের পবিত্রতাকেও রক্ষা করতে হয়। যেহেতু পুরুষশাসিত সমাজে সাক্ষর-নিরক্ষর কোন নারীরই সম্ভ্রম রক্ষার কোন নিশ্চয়তা নেই সেহেতু অক্ষরজ্ঞানহীন এই নারী নিজেকে লোলুপ পুরুষের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে 'ছুরি'র প্রতিই বেশি বিশ্বাস স্থাপন করে। এই ধারালো উপকরণটি কাছে থাকলে নির্বোধ কামুক পুরুষের কুনজর থেকে নিস্তার পাওয়া যায় সহজেই। অন্যদিকে মহকুমার বাবুসাহেব সাধারণত কোন নারীর প্রতি আসক্তি বোধ করে না। আর সে কারণেই অমূল্য

পাত্র সেজে অজস্র মেয়ে দেখে বেড়ায়। নারীর প্রতি এই অসম্মানবোধ তার কাছে নৈমিত্তিক বিষয়ের মতোই সাধারণ।

গল্পের প্রারম্ভে বাবুসাহেব গৌরিয়ার অপূর্ব রূপ মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। তার সেই দৃষ্টিতে গৌরিয়া রূপায়িত হয় এভাবে 'মেয়েটি হিন্দুস্থানি, বয়েস আঠারো থেকে বাইশের মধ্যে। গায়ে পীড়াদায়ক আঁট একটা কাঁচুলি, সাদার উপরে কালোর ছাপ তোলা ফুরফুরে পাতলা একটা শাড়ি পরনে। রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ডের থেকে শুরু করে রৌদ্র ঝলকিত নিষ্কাশিত তলোয়ারের সঙ্গে নারীদেহের বহু উপমা দেখেছি, কিন্তু ওর সেই ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিময় শরীর কথায় বোঝাতে পারি এমন কথা মানুষের ভাষায় তৈরি হয় নি। ওর সমস্ত অসাধারণত্ব ছিল ওর দুই চোখে–সে কী আশ্চর্য চোখ– যেন গায়ের চামড়া ভেদ করে হাড় পর্যন্ত এসে বিদ্ধ করে। সেই চোখে এতটুকু সুকোমল মোহ নেই, যেন বা কঠিন নিষ্ঠুর একটা বিদ্রুপ। যার দিকে তাকায় তাকেই যেন সে চোখ শানিত সঙ্কেত করেঃ ধরা পড়ে গেছ।' (এ.এ.গ./৬৮৬)

কঠিন জীবনবৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক হয়েও গৌরিয়া নিজের আত্মসম্মানের সৌন্দর্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেছে সব সময়। শালীনতাবোধ পবিত্র জীবনভাবনারই একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। তাই নিজের সম্ভ্রমের প্রতি যত্নশীল গৌরিয়ার আচরণে সে দিকটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বাবু সাহেবের উপলব্ধিতে–'আমাকে দেখতে পেয়ে উচ্চ কলহাস্যে ও ডেকে উঠল: 'ও লখনা রে।' ছ-সাত বছরের একটা ছেলে কোত্থেকে এলে ছুটে। তাকে চাপা গলায় কি একটা ইসারা করতেই দুই হাতে মেয়েটির মাথায় সে পিঠের আঁচলটা অগোছাল করে তুলে দিল। বাহু দিয়ে টেনে টেনে সেটাকে সুসঙ্গত করে মেয়েটি তার বসায় একটা কাঠিন্য আনলে। ছেলেটাকে সামনে দাঁড় করিয়ে রাখলে উদ্ধত প্রহরীর মত। মনে মনে প্রচণ্ড একটা মার খেলুম।' (এ.এ.গ./ ৬৮৬)

সুন্দর কোন কিছু দৃষ্টিগোচর হলে তা তুলে এনে অনুভব করার ইচ্ছেটা বোধহয় প্রবহমান কালের প্রথাগত পুরুষের বৈশিষ্ট্য। সে কারণেই 'কালো দুটি আয়ত চোখ' আর তরল হাসির ঢেউয়ে উছলে পড়া' গৌরিয়াকে একান্তে পাবার বাসনাটাও তীব্র হয়ে ওঠে। মহকুমার বাবুসাহেব মনে মনে ভাবেন–'দূত পাঠাই, নির্জন রাতে অন্ধকার বাংলোয় বসে তাকে অভিসারিনী করে তুলি।' (এ.এ.গ./৬৮৬) হয়ত সে জানেই না যে, পৃথিবীর সব সৌন্দর্য- কামনার বিষয়ানুষঙ্গ নয়, তা অনুভবের বিষয়। এই উপলব্ধির নির্মলতা মানবমনকে কামনার অগ্নি থেকে মুক্তি দিয়ে সুশীতল পরশে হৃদয়কে অপার্থিব আনন্দে ভরিয়ে দেয়। এ আনন্দ উপভোগে ব্যর্থ বাবুসাহেব তাই কামজ জীবনতৃষ্ণার পিপাসার্ত পথিক। অপরদিকে অশিক্ষিত গৌরিয়ার জীবনস্পৃহায় বাবুসাহেবের প্রতি রয়েছে অতল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। শান্ত -স্মিত সে বোধে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন যেন দুর্লক্ষ নয়। অন্তরের প্রগাঢ় প্রণয়কে আড়ালে রেখে নিজেকে আরো বেশি দুর্বোধ্য করে তোলে সে। এই দুর্বোধ্যতা তাকে আরো বেশি ব্যক্তিত্বময়, গাম্ভীর্যময় ও প্রেমময় করে প্রতিফলিত করে বাবুসাহেবের অন্তর্মূলে। যেখানে কখনো নারীর প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। হৃদয়মূলে আঘাত হানা গৌরিয়ার সংলাপগুলো তাই তাকে হতবিহ্বল করে তোলে।

গৌরিয়া ব্যথিত চোখে চেয়ে বললে 'আপনিও এবার বাড়ি যান, বাবুসাহেব। নইলে, এরপর আবার কোন লোক যদি আসে, তবে তাকে তাড়াবার জন্যে আপনার ছাতাটাই তাকে দিয়ে দিতে হবে। সেটা ভালো হবে না। আপনি বাড়ি যান। কথার চেয়ে কথার সুরটি ভারি ভাল লাগল। বললুম, 'বৃষ্টিটা না ধরা পর্যন্ত তোমার এখানে একটু বসতে দিতেও তোমার আপত্তি আছে?'

'আছে', গৌরিয়া নিষ্প্রাণ গলায় বললে, 'জায়গাটা ভাল নয়।'

'তাতে আমার কী! বাইরে জল পড়ছে, তাই এখানে আমি একটু বসে যাচ্ছি বই তো নয়, ।'

কিন্তু গরিবের ঘরে মুক্তের হার দেখলে লোকে তা চোরাই মাল বলেই সন্দেহ করে, বাবু সাহেব!' গৌরীয়ার সমস্ত ভঙ্গিটি বেদনায় যেন নম্র হয়ে এল: তাতে গরিব আরও গরিব হয়, আর তাতে মুক্তোরও সেই দাম থাকে না। আপনি বাড়ি যান।' (এ.এ.গ./৬৮৯)

নীরব আর সুপ্ত ভালোবাসার মাঝেও যে শ্রদ্ধাবোধ বিরাজিত তা আরো একবার স্পষ্ট হয় গল্পের শেষ পর্যায়ে গৌরীয়ার আত্ম উপলব্ধিগত সংলাপ থেকে। অপ্রদর্শিত প্রেম, মিছে তাচ্ছিল্যের অভিনয়, দায়িত্বের প্রতি মমত্ববোধ তাকে অসাধারণ জীবনস্পন্দনের অধিকারী করে তুলেছে। কোন কলঙ্কের কালিমার ছিটেফোঁটা যেন তার পরমজনের চারিত্রিক অবয়বকে কলুষিত করতে না পারে সে জন্য তার আপ্রাণ প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। নিত্য শুভার্থী গৌরীয়ার কণ্ঠে তাই করুণ আকুলতা–'কিন্তু আমার ভয় হয় বাবু সাহেব, এখানে এসে না তুমি বিপদে পড়।' এখনও অনেক পসারীর সওদা নিয়ে যেতে বাকি। বৃষ্টির জন্যে পথে কোথাও নিশ্চয় আটকা পড়েছে। তোমাকে তারা এখানে দেখবে, শুকনো ছাতা আর শুকনো বর্ষাতি নিয়ে মোড়ার ওপর শুকনো মুখে বসে আছ, এ আমি কিছুতেই দেখতে পাবো না। আমি ছোট আছি, কিন্তু তুমিও ছোট হবে এ দেখতে বুক আমার ফেটে যাবে, বাবু সাহেব।' (এ.এ.গ./৬৮৯)

বাবুসাহেব বদলি হয়েছেন। কিন্তু গৌরীয়ার চোখের তারার ঝিলিক ছুরির মতোই বিঁধে আছে তার অন্তরে। সে ছুরির তীক্ষ্ণতা তার অন্তর্জগতের উপলব্ধিকে করেছে শানিত। অব্যক্ত প্রণয়ের অনুক্ত বাণী তার হৃদয়-আঙ্গিনাকে করেছে আলোড়িত, যা তার সারাজীবনের এক অনন্য প্রাপ্তি হিসেবে অর্জিত। বাবুসাহেবের জীবনাকাঙ্ক্ষায় গৌরীয়ার অপ্রকাশিত প্রেমবোধ নিরন্তর গীতি হয়ে ঝংকৃত হতে থাকে। তার আত্মগত উপলব্ধি বর্ণিত হয় এভাবে- 'দেখলুম, পাশের সেই পুকুরধারে শাখা বাহুল্যবর্জিত কি একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে সে আমার যাওয়া দেখছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে অল্প একটুখানি হাসল। সেই অল্প একটুখানি হাসা যে কী অপরূপ তা বুঝিয়ে বলি এমন শক্তি নেই। আজকের ভোরবেলাটির মতই বিষাদে নির্মল, বিরহে সকরুণ সেই হাসি। দুঃখকে, ক্ষতিকে, অপরিসীম শূন্যতাকে সামান্য হাসি দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে এমন যদি কোন পরীক্ষা থাকে সংসারে, তবে সেই পরীক্ষায় গৌরীয়া ফুল মার্ক পেয়েছে। একদৃষ্টে এতক্ষণ ধরে ও কোনদিন আমার দিকে তাকায়নি। আজ দেখলুম তাতে কত বিষাদ, কত স্নেহ, কত শান্তি! গাড়িটা অনেক দূর চলে এসেছে। বললুম,

চললুম গৌরীয়া।' গৌরীয়া হয়ত শুনতে পেল না, কিন্তু যাবার সময় কিছু একটা তাকে বলে গেছি মনে করে সে আঁচলে চোখ চেপে ধরল।

এত দিনে মনে হল বিদেশে চাকরি করতে যাচ্ছি।' (এ.এ.গ./৬৯০)

এ গল্পে প্রখর বাস্তববাদী নারীচরিত্র গৌরিয়ার জীবনসংগ্রামের চিত্র বিধৃত হয়েছে। মহকুমার বাবুসাহেবের প্রেমাসক্তি ও তার নিরুত্তাপ আচরণের বহিঃপ্রকাশ এখানে অনন্য শিল্পমাত্রা যুক্ত করেছে। তাই এগল্পটিকে বলা যায় অতল জীবনচৈতন্যের এক উজ্জ্বল শিল্পকর্ম। প্রেমের গল্পগুলোর মধ্যে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, গল্পগুলোর চরিত্র গুলোর মধ্যে পুরুষ চরিত্রের চেয়ে নারী চরিত্রের দৃঢ়তা অনেক বেশি। সে কারণেই নারী চরিত্রের জীবনবোধে যুক্ত হয়েছে অসামান্য প্রেমদ্যুতি। সেই দ্যুতিতে ভাস্বর নারীরা প্রেমের নিটোল আভায় পরিপূর্ণ অবস্থানে অবস্থিত। কোন বিত্তের বেড়াজালে বন্দী হয়ে নয় বরং বিত্ত বর্হিভূত প্রেমের অনির্বচনীয় শিখা তাদের দীপ্তিময় করে তুলেছে, করেছে স্বমহিমায় মহিমান্বিত।

জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রকাশ অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পগুলো। স্বল্প পরিসরের মাঝেও বহুলাঙ্গিক জীবনচিত্র ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পে। বিশুদ্ধ মানবিক সম্পর্ক সেখানে শৈল্পিক অভিব্যঞ্জনা তৈরিতে অনুকূল ভূমিকা রেখেছে।

'খেলাওয়ালী' গল্পে বেদে সম্প্রদায়ের যাপিত জীবনের দিনলিপি তুলে ধরা হয়েছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে। ফলের আঁটি, পাখির ঠোঁট, মানুষের হাড়, গোরুর শিং দিয়ে এ সম্প্রদায় কথিত 'ব্যারাম' নামায় শিঙা টেনে। বিভিন্ন প্রকারের বকশিস যেমন নারকেল, সুপুরি, সাদা পাতা- শুকনো কাঠ ইত্যাদি নিজেদের প্রয়োজনে না লাগিয়ে হাটে বিক্রি করে টাকা পায়। লোক ঠকিয়েও টাকা উপার্জন করে তারা। এমনই এক বেদেকন্যা তরীর প্রেমে পড়ে ইয়াসিন নামের এক যুবক তাদের নৌকায় যায়। নিভৃতে কিছুক্ষণ সময় কাটায়। লোকের সঙ্গে মিথ্যে ভালোবাসার অভিনয় করতে করতে তরীও সত্যিকার ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন কৌশলে টাকা আদায়কারী তরী এক সময় নিজের অজান্তে ইয়াসিনের ভালোবাসার সাগরে হারিয়ে যায়। দিব্যির ঘর যেন কৌশলের ফাঁদ নয় বরং ভালোবাসার নিবিড়তম আবাস। কিন্তু আত্মদ্বন্দ্বে পরাভূত ইয়াসিন শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হয় ভালোবাসার কাছে। খেলাওয়ালী তরী যে জলের, সে ডাঙ্গার ইয়াসিনকে নিয়ে স্থলে সুখের নীড় রচনা করতে পারে না। দিশেহারা হয়ে ইয়াসিন দেখে হালিয়া সেকেন্দর দাঁড় টানার, মাছ ধরার, কাঠ কাটার মানুষ হয়ে তরীদের সাথে নৌকায় ভেসে চলেছে। হতবুদ্ধি ইয়াসিন জলের মানুষকে মাটির মানুষ করে রাখতে পারে না। দু'জনের জীবনাচরণের বিস্তর পার্থক্যের কারণে তরীর মনে ভালোবাসার জন্য সাহসের বীজ রোপিত হয়নি। তার 'চুপ চুপ' মন্তব্যে তাই পাওয়া যায় কেবলই ভয় ও সাহসহীনতার আভাস।

বেদে সম্প্রদায়ের জীবনধারা, তাদের সংস্কৃতি, রীতিনীতি, প্রতারণা ও ভাসমান অবস্থার ওপর ভিত্তি করে রচিত 'খেলাওয়ালী' গল্পে দু'তিনটি চরিত্রের ক্রমবিকাশের মাধ্যমে মূলকাহিনী সাবলীলভাবে অগ্রসর হয়েছে।

সমাজের নানা স্তরের কর্মজীবীদের জীবিকা নির্বাহের উপায় বিভিন্ন রকম হয়। শিক্ষা-অশিক্ষা, কুসংস্কার, প্রথাগত নিয়ম-নীতি দ্বারা পরিচালিত হয় সামাজিক জীবনাচরণ কিংবা জীবনযাপনের পদ্ধতিসমূহ। এই ধারার অন্তর্গত জীবনালেখ্যে কখনও নীতিবোধ পরিলক্ষিত হয় আবার কখনও সরল প্রতারণাও দৃষ্টিগোচর হয়। সেই প্রতারণায় মানবিকবোধ যে একেবারেই নেই তা বলা যায় না। আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে রূপায়িত হয়েছে 'খেলাওয়ালী' গল্পটি। 'কত রাজ্যের জল ঠেলে-ঠেলে ভাসছে তারা-বাদিয়ানীরা। বাড়ি-ঘর নেই, জায়গা-জমি নেই, সীমানা-সরহদ্দ, নেই। কেবল অফুরন্ত জল। নৌকোয়ই তাদের ঘর-সংসার, বিয়ে-সাদি, ইষ্টিকুটুম। নৌকোই তাদের সমাজ। ওটা মামার বাড়ি, ওটা শ্বশুর বাড়ি, ওটা বান্ধবের বাড়ি। শুধু মরবার পর সাড়ে তিন হাত মাটির দরকার। মাটির সঙ্গে শুধু এইটুকু তাদের কায়েমী সম্পর্ক।...তারা সব দেশেই বিদেশী। তারা ভবঘুরে।' (এ.এ.গ./৪৮৯)

এ গল্পের শুরুর দিকে কাঞ্চনী, তরী ও তাদের মায়ের আবির্ভাব ঘটে গ্রামের মধ্যে। অপূর্ব কোকিল কণ্ঠে গান করে তরী, তাতে গ্রামের মানুষ প্রথমেই মুগ্ধ হয়। গানে গানে বর্ণিত হয় পৌরাণিক আখ্যান বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী। তরীর মা সহজ সরল গ্রামীণ মহিলাদের দুর্বল জায়গায় আঘাত করে কাজ হাসিল করে নেয়। কারো কোমরে শিং লাগিয়ে ফুঁ দিয়ে ব্যথা নামায়, পাটাপুতায় শিকড় বেটে কাউকে খেতে দেয়, কারো কারো বাজুতে তাগা বেঁধে দেয়। শিক্ষাবঞ্চিত এসব নারীরা সরলমনে এদের কত কথাই না বিশ্বাস করে! তাইতো খুশি মনে টাকা, চাল, নারকেল, সুপুরি, সাদাপাতা, তামাক, মুরগি বিলিয়ে দিতে এতটুকু কার্পণ্য নেই। যেটুকু দরকার কিংবা তার চেয়ে বেশি জোগাড় হয়ে গেলেই সরে পড়ে এই বেদেনীর দল। প্রতারণায় ঘেরা জীবনসংগ্রামে আরও কিছু পাবার লোভে মায়ের তিরস্কার-পুরস্কার দুটোই জোটে। যেমন বুড়িমায়ের মন্তব্য-

'ঘড়া-ঘড়া টাকা ওই ভুঁইয়ার, শুনে এলাম পাকাপাকি। কী ছাই খেলা দেখাতে পারলি তবে? বুড়ি ঝাঁজিয়ে উঠল। কি, দিব্যির ঘরে ছিল তো?'

'দিব্যির ঘর না হলে টিপে-টিপে বের করতে পারব কেন? হাসতে হাসতে বলল এবার তরী: 'এই দেখ আরও দশ টাকা। লুকিয়ে আদায় করে নিয়েছি বকশিস।' হাতের মুঠ খুলে তরী টাকা দেখাল।

আহ্লাদে উথলে উঠল বুড়ি। বললে, 'এই তো আমার আসল খেলাওয়ালী!' টাকা পঁচিশটা প্যাঁটরার মধ্যে রাখতে রাখতে বললে, 'কালকে আরও বেশি চাই। পঞ্চাশ টাকা।' (এ.এ.গ./৪৯১)

গল্পের মধ্যভাগে পরিলক্ষিত হয়, ইয়াসিন আর তরীর পারস্পরিক আকর্ষণবোধ। যে পেশায় মানবিকবোধ, প্রেমবোধ, মমতাবোধ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ সেখানে তরী কীভাবে তার ভালোবাসার মানুষ ইয়াসিনের কাছে পৌঁছুবে? কাঞ্চনী আর বুড়ি মায়ের তীব্র রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেও তরী ইয়াসিনের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা অনুভব করে। তার জীবনবাসনা ভালোবাসার প্রবল স্রোতে প্লাবিত হয়। তরী বলে, 'এই একঘেয়ে জল আর ভাল লাগে না। ঘর বেঁধে সংসারি করতে সাধ যায়।... ঘাসের ডগা বুলুতে বুলুতে তরী বললে, 'আমাকে নিয়ে চল তোমাদের ঘরে। সেই আমার সংসারী ঘর। নৌকোয় কি ঘর হয়? ছইকে কি ছাদ বলে?' (এ.এ.গ./৪৯২) এই

শঠতা আর পানির জীবন তরীর ভালোলাগেনা। তার ‘ইচ্ছে করে মাটিতে একটা বীজ পোঁতে নিজের হাতে। দেখে, কেমন করে জলজ্যান্ত গাছ হয়ে ওঠে একটা। মাটির জন্যে এত মন পোড়ে তরীর। হাসিল-পতিত, ভিটাবাস্তু, দীঘি-পুকুর, বাগ-বাগান, ইট-ইমারত, বৃক্ষ-লতা, পাখি-পাখালি। জলে আর সুখ নেই।’ (এ.এ.গ./৪৮৯)

গল্পের শেষ অংশে অঙ্কিত হয় তরী আর ইয়াসিনের বিচ্ছেদ পর্ব। তরী অবগত আছে যে, পেশাগত কাজে প্রাণের আবেগের কোন মূল্যায়ন নেই। এখানে আছে ক্রমাগত প্রতারণা করে অপরের জিনিস হস্তগত করা। অন্তরের পবিত্রতা, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা এখানে বেমানান। তাই তরী সর্বান্তঃকরণে চেয়েছে তার প্রিয়জন ইয়াসিন যেন তাদের সহযাত্রী না হয়। ইয়াসিনের প্রতি মুগ্ধ থেকে, তাকে ভালবেসে তরীর এই সম্মানবোধ তাকে বেদে সম্প্রদায়ের অন্যান্য চরিত্র থেকে স্বতন্ত্র করেছে। তরীর ‘চুপ! চুপ!’ শব্দ যুগলে রয়েছে অজস্র প্রেম, বিচ্ছেদ আর বেদনা! সমস্ত বিসর্জন দিয়ে তরী হালিয়া অর্থাৎ কৃষক সেকেন্দরকে নিয়ে বেদে বহর ভাসিয়ে দেয় জলে। শেষ দৃশ্যে লেখকের বর্ণনায় দুজন নরনারীর বিচ্ছেদপর্ব এভাবেই চিত্রায়িত হয়, যবনিকাপাত হয় স্থল আর জলের মানুষের সুপ্ত ভালোবাসার।

‘সকাল বেলার জোয়ারে বহর ছেড়ে দিল। তরী আর কাঞ্চনী হাল-দাঁড় নিয়ে বসল। পারে দাঁড়িয়ে ইয়াসিন। জলে নামবে, না হাত ধরে তরীকে ডাঙায় তুলে নিয়ে আসবে, যেন দেহ-মনে দু-ভাগ হয়ে যাচ্ছে। ...
‘সে কি! তুই যাচ্ছিস কোথা?’ ইয়াসিন চমকে উঠল।

‘আমি চলেছি নৌকোর মানুষ হয়ে নয়, সাধারণ চাকর হয়ে। দাঁড় টানব, মাছ ধরব, কাঠ কাটব। মন্তর শিখব। বাদিয়া হয়ে যাব। আসবেন আপনি?’

চুপ! চুপ চোখ পাকিয়ে তরী ধমক দিয়ে উঠল সেকেন্দরকে।’ (এ.এ.গ./৪৯৩)

‘খেলাওয়ালী’ গল্পে প্রতারণার মধ্যেও সত্যিকারের ভালোবাসার সন্ধান পায় তরী। কিন্তু তার পারিপার্শ্বিকতা ভালোবাসার বিপরীত মেরুতে অবস্থান নেয়ায় অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় প্রেমপুষ্প। আর তাইতো হৃদয়ের অব্যক্ত যন্ত্রণা নিয়ে সে হারিয়ে যায় ইয়াসিনের জীবন থেকে চিরদিনের মত।

মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত রচনা বা একটি চরিত্রের পূর্ণায়ত নির্মিতি অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পের উদ্দিষ্ট নয়। তাঁর অন্বিষ্ট হলো জীবনের বা ঘটনার অথবা পরিস্থিতির খণ্ডচিত্রের শিল্পিত রূপায়ণ। এ গল্পে তা-ই অঙ্কিত হয়েছে অসাধারণ শিল্পকুশলতায়।

‘পাশা’ গল্পটি ভালোবাসার অনুভূতিতে গ্রন্থিত। প্রেমের নিটোল অনুভূতি ছড়িয়ে রয়েছে গল্পের পরিসমাপ্তিতে। ভালোবাসা শুধু দৈহিক সীমানায় আবদ্ধ নয়, তার একটা বিশাল পরিমণ্ডল আছে যার খোঁজ সবাই পায় না। মৃদলার কাছে ভালোবাসার সংজ্ঞা ছিল বহুমাত্রিক রূপের বর্ণময়তা। সেই রূপের ছটায় প্রেমিক পুরুষ মোহগ্রস্ত থাকবে, তাকে ভালোবাসবে আর থাকবে দেহগত সৌন্দর্যের বিলাস। কিন্তু রণেন অতসীর মাঝে খুঁজে

পায় ভালোবাসার মহাসাগর আর তা মৃদুলার মতো সংকীর্ণ নয়, আবদ্ধ নয় কোন নির্দিষ্ট সীমানায়। অসীমপ্রেম রণেনের হৃদয়কে ভরে দিয়েছিল প্রশান্তিময় অনুভূতিতে। প্রেমের সংকীর্ণতা মানব মানবীর প্রাণে কোন সুখের প্রদীপ জ্বালাতে পারে না, নিয়ে যেতে পারে না কোন বন্ধনহীন পবিত্রতার আঙ্গিনায়। মৃদুলা তাই অতসীর কাছে পরাজিত হয়েছে তার মানসিকতার ক্ষুদ্রতায়। 'হারতে হারতে জিতে এলাম সর্বস্ব'- মৃদুলার জয় লাভ হয়নি বরং পরাজিত হয়েছে সে অসীম প্রেমের কাছে। কারণ প্রিয় মানুষের দুর্দিনে তার পাশে না থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে পালিয়ে বেড়ানোর মধ্যে কোন গৌরব থাকে না।

'পাশা' গল্পটিকে একটি খেলার নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এর অন্তর্নিহিত একটি বৈশিষ্ট্যকে উচ্চকিত করে তুলেছেন। এখানে তিনজন চরিত্রের মধ্যে ক্রীড়াগত অবস্থান হল -একজন উদ্যমী, একজন নিষ্ক্রিয় ও একজন মাঠ বহির্ভূত খেলোয়াড়। গল্পটির সারা অবয়বজুড়ে রয়েছে প্রেমতৃষ্ণার্ত মৃদুলার দুঃসাহসী মনোভাবের দুর্দান্ত আচরণমালা। এখানে অতসী ও রণেন ক্রীড়াঙ্গনে নিষ্ক্রিয় থাকলেও শেষ পর্যন্ত জয় হয় তাদেরই। কারণ তাদের জীবনবাসনায় মিশে ছিল সনাতনী আদর্শের মূল্যবোধ যা তাদের সঠিকভাবে পথ নির্দেশনা দিয়েছিল। আর অন্যদিকে করুণভাবে পরাজয় বরণ করে তথাকথিত আধুনিকতার নামে গা ভাসানো মৃদুলা যার কাছে সংযত ভালোবাসার কোন মূল্যবোধ নেই, যার জীবনস্পৃহায় পুরোপুরি ভাবে মিশে আছে প্রেমের নামে উচ্ছৃঙ্খলা, উদগ্রতা।

গল্পের প্রথমে দৃষ্টিগোচর হয় প্রেম অভিসারিকা মৃদুলার জীবন-যাপন প্রণালীর উদ্ধত ও দর্পিত ভঙ্গিমা। মায়ের গ্রামসুবাদে এক দাদার ছেলে রণেনের প্রেমে পড়ে মৃদুলা। এক পাক্ষিক প্রেমে কোনভাবেই সাড়া না পেয়ে মরিয়া হয়ে বলে ফেলে হৃদয়ের গোপন কথা। তাতেও পরিলক্ষিত হয় রণেনের অপরিসীম ঔদাসীন্য। যেমন-

' মৃদুলা বললে, 'আমি ভালবাসি'।

'অপূর্ব কথা'। এবার কেন কে জানে জিগগেস করে ফেলল রণেন: 'কাকে?

'তোমাকে'

'বেশ তো, বাসো না।' যেন কোন ঝঞ্ঝাটে রাজি নয় এমনি নিস্পৃহভাবে বললে রণেন। 'আপত্তি কি? মনে মনে বাসো' (স্বাদু স্বাদু পদে পদে পৃঃ-৩৪)

রণেনের এই অবহেলা মিশ্রিত উত্তরে দমিত না হয়ে মৃদুলার আবার দেহজ প্রেমের উচ্চারণ।

'রণেন, আমার প্রেম অতীন্দ্রিয় নয়, রতীন্দ্রিয়। তুমি কেন আমাকে চাইবে না? আমি কি এতই বাজে, এতই কুচ্ছিত?'

'কে তা বলেছে।' ঢোক গিলল রণেন : কিন্তু আমার ভালোবাসা ঐশ্বরিক।'

'ঈশ্বর-ফিশ্বর মানি না।'

'ঈশ্বর না মানলেও ঐশ্বরিক প্রেম মানা যায়।' 'বাজে কথা, আমি জানি তুমি ওসব মানো না। তুমি সাফল্য চাও, সংসার চাও, সন্তান চাও। আমি-আমিই সব দিতে পারব তোমাকে।' (স্বা.স্বা.প.প./৩৫)

মৃদুলার অকারণ স্নেহহীন প্রেম যন্ত্রণায় অস্থির রণেন পালিয়ে মুক্তির আনন্দ পেতে চায়। কিছুতেই নিজেকে সমর্পণ করতে চায়না প্রেমহীন কামবাসনায় অস্থির মৃদুলার কাছে। তার মনে হয় 'যা সমীচীন নয়, ছন্দোময় নয় তা সুন্দরও নয়। কিন্তু মৃদুলা উপেক্ষাকারী রণেনের আচরণের কোন সদুত্তর খুঁজে পায়না। তার মনের ভেতর বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম হয়।

'কেন, কেন এত উপেক্ষা,ঔদাসীন্য,এত প্রত্যাহার? শুধু ছন্দই সুন্দর? উচ্ছৃঙ্খলতা সুন্দর নয়? মেঘই মনোহর? ঝড় মনোহর নয়? কেন, কেন রণেন জাগবে না? উঠে দাঁড়াবে না? এক স্তূপ বসনের মত বুকের মধ্যে কেন নেবে না আঁকড়ে?' এসব প্রশ্নের মাঝেও নিজের সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও সরে আসে নি মৃদুলা। প্রেমিক পুরুষের কাছে এবার এসেছে নিজেকে সমর্পণ করতে। আদর্শহীন, মমত্ববোধহীন, জীবনবোধহীন আত্মসমর্পণ। যার মধ্যে নেই এতটুকু আত্মসম্মান। পরের অনুগ্রহ পাওয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কোন মর্যাদা নেই। মৃদুলার সংলাপে সেই সম্মানহীনতা বার বার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন- 'এইভাবে না হলে কিছু হবে না। আর ইনিয়ে-বিনিয়ে নয়, আমি এবার ছিনিয়ে নিতে এসেছি। গায়ের জোরে জিততে এসেছি এবার। গায়ের জোরে-যৌবনের জোয়ারে প্রেমের উন্মাদনায় উন্মত্ত মৃদুলা আবার মুহূর্তে সমর্পিত-'তোমার যা ইচ্ছে তাই কর। বন্যতম, ভদ্রতম, যা তোমার খুশি আমাকে ধর, মার, কাট পিষে ফেল, পুলিসে ধরিয়ে দাও - নয়তো ঘুম পাড়াও, বুকে করে রাখ। একটা কিছু কর আমাকে নিয়ে।' (স্বা.স্বা.প.প./৩৮)

মাত্রাতিরিক্ত ভাবাবেগের স্রোতে ভাসমান মৃদুলার কাছে একটি অপ্রত্যাশিত তথ্য ধরা পড়ে। জীবনের রঙিন চেতনায় উড্ডীন মৃদুলা কোনভাবেই রোগগ্রস্ত জীবন বহন করতে রাজি নয়। তাইতো রণেনের আকস্মিক ছলের আবর্তে ঘূর্ণায়মান মৃদুলা নিজেকে সামলে নেয়। দাঁত নড়ার রক্তকে যক্ষ্মা ভেবে অতিরিক্ত সতর্কতায় নিজেকে সরিয়ে নেয়। যেন সমুদ্র মুহূর্তে পুকুর হয়ে গেল। 'নিঃস্বত্বের মত পড়ল হুড়মুড় করে' নিজের ঘরে নিজের বিছানায়। বান্ধবী অতসীকে নিজের বেঁচে আসার কাহিনী বর্ণনা করে এভাবে -'পড়তে পড়তে সামলে এলাম। হাঁপধরা লোক যেন হাওয়ায় চলে এসেছে এমনি স্ফূর্তি এখন মৃদুলার : 'হারাতে হারাতে জিতে এলাম সর্বস্ব। লোকটার টি-বি। অত কাব্য করে বলবার কী হয়েছে? যক্ষ্মা। তাই ওই ঢঙ, ওই বীরত্বের ছদ্মবেশ। দাঁত নেই বলে মাংস ছাড়া। তাই ঐশ্বরিক প্রেম। বেদান্তের বকুনি। কাঁধে মোহমুদ্গর নিয়ে ব্রহ্মচারী সাজা। কিছুতেই আমি টলি না নড়ি না, আমি অনতিক্রম্য-এই অহঙ্কারের ঝিলিক দেওয়া। বেঁচে গিয়েছি। খতম হইনি, ফতুর হই নি। আস্তসমস্ত আছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাঁকে না মানলেও তিনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন।' (স্বা.স্বা.প.প./৩৯)

এখানে লক্ষণীয় যে মৃদুলার জীবনবৈশিষ্ট্যে কোন ভালবাসা, মায়ামমতার অস্তিত্ব নেই। সেখানে বিরাজিত শুধু ভোগলালসার অপরিসীম কামনা। মাধুর্যহীন কামনায় কখনো প্রণয়ের স্বপ্নগাঁথা থাকে না, প্রতীয়মান হয় না

প্রণয়ীর জন্য কোন মমত্ববোধ। অনুরাগের অপর নাম স্নেহমায়া, কামনা নয়। তাইতো চিরকালীন প্রণয়ের কাছে সাময়িক কামনা অত্যন্ত কদর্যভাবে পরাজয় বরণ করে। মৃদুলার মোহনীয় কৌশল অর্পিত হয়েছে শুধু প্রেমিক পুরুষকে শরীরীভাবে পাবার বাসনায়-অন্তর্জগতের সন্ধান সে কি করে পাবে? হৃদয়ের সুপ্ত প্রেমের অসাধারণ মহিমা -সে কি করে অনুভব করবে? আর তাইতো ক্ষণিকের অবহেলায় চিরন্তনকে হারিয়ে মূঢ়তাকে প্রশ্রয় দিয়ে তার জীবনবোধকে করেছে অসম্মানিত।

অবশেষে প্রতিষ্ঠিত হয় আদর্শবাদী ও নিয়ম নিষ্ঠায় অবিচল এক যুগল অতসী-রণেনের জীবনবন্ধন। অতসীর কাছে প্রেম হল অপেক্ষা, ধৈর্য আর সহমর্মিতার গ্রন্থন। চিরকালীন শুদ্ধ সামাজিক প্রথা অনেক সময় অন্ধকারে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা করে। তাতে নিজেকে রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের আত্মসম্মানবোধ ও শালীনতা রক্ষা পায়। আর যাদের জীবনে এই নিয়মনীতির চেতনা অনুপস্থিত তারা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন কিনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। অতসী ও মৃদুলার কথোপকথনে সেই ধারনার একটু আভাস পাওয়া যায়। যেমন-

'এই, যাবি?' অতসীর গায়ে ঠেলা মারল মৃদুলা। বইয়ের থেকে মুখ তুলে অতসী হাঁ হয়ে রইল। বললে, 'কোথায়?'

'সিনেমা।'

'সিনেমায়? এখন?

'কেন, নাইট শোতে যায় না কেউ?'

'যায় হয়তো। কিন্তু হোস্টেলের মেয়েরা নয়।'

'কেন, হোস্টেলের মেয়েরা কি রাত জাগতে অপটু? তারা কি খুকি?

'না, একশোবার নয়। কিন্তু তাদের দায়িত্বজ্ঞান আছে, আছে শালীনতার চেতনা-' থমথমে মুখ করল অতসী।

'হোস্টেলের কি একটা বাজে আইন লঙ্ঘন করতে চাচ্ছি বলেই শালীনতার অভাব হল?

'বাজে আইন মানে'?

'তাছাড়া আবার কি। রাত সাড়ে আটটার মধ্যে সুড়সুড় করে বাড়ি ফিরে আসা চাই, ন'টাতে গেট বন্ধ, এ বর্বর আইনের কোন মানে হয়? (স্বা.স্বা.প.প./২৫)

আবার প্রেম অভিসারিকার বেশে যখন যাচ্ছে রণেনের কাছে তখন একটু লজ্জাবনত একটু সংকোচবোধে আচ্ছন্ন হওয়া শোভন ছিল। কিন্তু সেখানেও তার উদ্ধত উৎকট অশোভন কথামালা বিন্যস্ত হয়েছে এভাবে -

'আমি তো আর কারু কাছে যাচ্ছি না, আমি যাচ্ছি রণেনের ঘরে। তার একলার এক ঘরে।'

'তোর লজ্জা করছে না বলতে?...না, আর করছে না, যা সত্য, তাই নগ্ন। আমার গায়ে যদি আগুন লাগে আর আমি যদি সব আবরণের আবর্জনা ছুঁড়ে ফেলে দিই, তা হলে তুই বলবি তোর লজ্জা করে না নির্লজ্জ হতে? বলবি? চিকিৎসা করাতে এসে লজ্জা ঢাকবার কোনও মানে হয় না।' (স্বা.স্বা.প.প./২৮)

... ভস্মের মধ্য থেকে খুঁচিয়ে স্ফুলিঙ্গ বার করতে চলেছি। আর, এক কণা আগুন পেলেই দাবাগ্নি। অলসকে নিয়ে আসব বিলাসে'-

'বিলাস কে'? ঘাড় বেঁকাল অতসী।

'নিয়ে আসব উল্লাসে। দেখছিস না আমার সাজগোজ'? (স্বা.স্বা.প.প./২৮)

... ছি ছি ছি ছি। এই কি ভদ্রতা, শালীনতা?'

'আহা-হা, রাখ তোর টিপ্পনী। ভদ্র প্রেম, বৈধ প্রেম, শুদ্ধ প্রেম এমন কিছু আছে নাকি সংসারে? ভদ্র প্রেম না সোনার পাথর বাটি। বৈধ প্রেম না কাঁঠালের আমসত্ব। আর শুদ্ধ প্রেম, কি বলব, অশ্বডিম্ব। প্রেম প্রেম। প্রেমের কোনও বিশেষ্য-বিশেষণ নেই।' (স্বা.স্বা.প.প./৩০)

অন্যদিকে রণেনের জীবনসীমা ব্যাপ্ত হয়েছে শালীন ও সংযত ব্যক্তিত্ববোধে। অন্ত:সারশূন্য নারীর প্রেমাচরণে যে ভালোবাসার কণামাত্র উপস্থিত নেই এই চরম সত্যটি তার অনুধাবন করতে এতটুকু দেরি হয়নি। মৃদুলার অতি চঞ্চল প্রণয় প্রবৃত্তির অন্তরালে যে গভীর শূন্যতা রয়েছে তা অনুভব করতে অতসী ও রণেন কিছুমাত্র দ্বিধান্বিত হয়নি। কারণ গভীর ও অন্তহীন ভালোবাসার প্রতি এ দুজনেরই ছিল পরম বিশ্বাস ও নির্ভর চেতনা। আর সে কারণেই উভয়ই শুধু নীরবে পর্যবেক্ষণ করে গেছে মৃদুলার হালকা ও চটুল জীবনবাচ্যে দুরন্ত প্রণয় প্রবৃত্তি। মিষ্টি অতলস্পর্শী ভালোবাসার যে পবিত্র সৌরভ আমোদিত করে রাখে চতুর্পাশ, যে স্বপ্নকল্পনায় লীলায়িত হয় হৃদয়পাশ সে দুর্লভ অনুভবশক্তি গল্পের মৃদুলার জীবনভাবনায় অনুপস্থিত। আত্মসমর্পণ নয় বরং আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রেম-চেতনার অন্য শক্তি। অথচ এই বোধের বিপরীত মেরুতে তার অবস্থান। মৃদুলা ও অতসীর কথোপকথনে সেই বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

'হঠকারিতার একটা সীমা আছে।

হ্যাঁ আছে। আত্মসমর্পণই তার সীমা। সর্বশ্রেষ্ঠ যে ধনী, সর্বোত্তম যে বীর, কী সে দিতে পারে শেষ পর্যন্ত? ওই, ওই আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণই সেরা ধন, সেরা শক্তি। তাই এবার আমি দিয়ে দেব উজাড় করে।'...'যা অলঙ্ঘ্য অনিবার্য, তাকে নইলে পাই কি করে বল?' (স্বা.স্বা.প.প./৩১)

দুর্নিবার প্রেমচেতনার চেয়ে নীরব অপেক্ষার নিস্তরঙ্গ অতল ভালোবাসার জয় ঘোষিত হয় অতসী ও রণেনের বিবাহ সমাপনের মধ্য দিয়ে। এ পরিণতি গল্পরসের ভারসাম্যতা রক্ষা করে এ দুজনের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থানকে স্বচ্ছ করে গল্পটিকে একটি সুন্দর সাবলীল গতি এনে দিয়েছে, পাশাপাশি এ তিনটি চরিত্রের স্বতন্ত্র জীবনচেতনা অত্যন্ত তীব্র ও তীক্ষ্ম হয়ে পরিস্ফুট হয়েছে এ গল্পের পরিসমাপ্তিতে। বিষয়-বৈচিত্র্যের কারণেই অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্প স্বতন্ত্র শিল্পরীতিকেই অকুণ্ঠভাবে গ্রহণ করেছে। তাঁর কল্পনার বিস্তার ও চিন্তার সূক্ষ্মতা বিন্যাসসূত্রেই স্বাধীন শিল্পভঙ্গির জন্ম দেয়। কল্পনার সাথে কল্পনার, ভাবনার সাথে ভাবনার, নিজের সাথে নিজের মোকাবেলায় যে কথামালার বুনন তা পরিবেশিত হতে দেখা যায় এ গল্পে।

‘চোখের চাতক’ গল্পে লেখকের অন্তর্গত স্বপ্নকল্পনার বাণী জীবনবোধের আলোয় আভাসিত হয়েছে অনুপম সৌন্দর্যে। গল্পকথক, তার হৃদয় মাধুর্যে রাঙানো কল্পিত প্রেয়সী ‘রাত্রি’ ও তার স্বামীকে ঘিরে গল্পের পরিপ্রেক্ষিত গড়ে উঠেছে। গল্পকথক নৈঃসঙ্গ্যের ভেলায় ভাসতে ভাসতে তমস জগতে নির্মাণ করেছেন রাত্রিকে। কল্পিত মানসীকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনে চলে নিরন্তর। ভালবাসার অবিনাশী জীবনচেতনায় স্নাত হন। মনে মনে ভাবেন -‘ মেয়েটির নাম রাত্রি। দলিত কাজলের মত কালো আয়ত বিষণ্ন দুটি চোখ এই শীতের সন্ধ্যার মত সজল ম্লান, ওর মুখখানি ঘিরে পুঞ্জীকৃত অন্ধকারের মতো ঘন চুলগুলি মুর্চ্ছিত হ’য়ে প’ড়ে আছে। এই মেয়েটির নাম আমি রাত্রি রাখলাম, এই নামটি নিয়ে শুয়ে শুয়ে খেলা করতে ভারি ভালো লাগে।... ওকে দেখে আবার আশা হচ্ছে, পৃথিবীকে ভালো লাগছে, নীল আকাশের কোল ভ’রে হাওয়ায় যেন মিঠা মাটির গন্ধ ভাসছে, মনে হচ্ছে কাকে যেন ভালোবাসতে শিখলাম।’ (টুটাফুটা/৩৪৯) সীমাহীন একাকীত্ব ও নৈঃসঙ্গ্যবোধ তার মানসমৃত্তিকায় ছিল আমূল প্রোথিত। রোগজর্জর শরীর প্রিয়জনের স্পর্শ কামনায় অধীর হয়, নির্বাসিত পরিবেশে প্রিয়তমার নিবিড় ছোঁয়া পাবার জন্য ব্যাকুল হয়। ‘মনে হচ্ছে কে যেন পাশে এসে বসল। ওর কালো চুলগুলি মুঠি ক’রে একবার স্পর্শ করলাম, ওর আঁচলের খানিকটা হাওয়ায় বুকের ওপর এসে পড়ল। কত কথা বলতে চাইলাম, পারলাম না, শুধু একটা ক্ষীণ উচ্চারণ কেঁপে কেঁপে ঝরে গেল, রাত্রি।’ (টুটাফুটা/৩৫০) বৈরী ও বিরুদ্ধ প্রতিবেশ পরিবার-সমাজ -স্বজনহীন একাকী গল্পকথককে করে তুলেছে আত্মসমাহিত। তাই এ নিভৃতচারী প্রেয়সীর সঙ্গে কথোপকথনের মালা গাঁথে নিজের অজান্তে। অন্তরের চাপা কষ্টগুলো, বেদনায় নীল হয়ে থাকা যন্ত্রণাগুলো কথামালা হয়ে ঝরে পড়ে ‘রাত্রির’ সামনে। মনোলোক থেকে নিঃসৃত অসীম একাকীত্ববোধ তাকে আরো বেশি অন্তর্মুখী করে তোলে। সংসারবিচ্ছিন্ন গল্পকথক বিচূর্ণিত জীবনভাবনায় বিলীনের দিকে এগিয়ে যায়। সেবা আকাঙ্ক্ষী মন কারো নিবিড় পরশের অপেক্ষায় থাকে। লেখক শৈল্পিকভাবে বিষয়টি এভাবে চিত্রিত করেছেন- ‘মেয়েটি তেমনি ব’সে আছে আর আমাকে দেখছে। আমি ওর সঙ্গে কথা কইতে চাই, কিন্তু কথা আসেনা, চুপ ক’রে শুয়ে শুয়ে আমিও দেখি। দেখার খেলা করি, চেয়ে চেয়ে কথা কই। আমি মেয়েটির সমস্ত কথা বুঝতে পারছি।

মেয়েটি বলে- তুমি এমনি ক’রে দিন-রাত শুয়ে থাক কেন? কি তোমার অসুখ?

বলি- কি অসুখ তা ত’ জানি না। ডাক্তার অনেক চেষ্টা করলে, বুঝতে পারলে না।

মেয়েটি বলে- তোমার এত অসুখ, কই, কাউকেও ত’ তোমাকে সেবা করতে দেখি না।

বলি- আমার কে আছে যে সেবা করবে?

মেয়েটি কান্না-ছলছল চোখে তাকায়, বলে-কেউ নেই?

তেমনি তাকিয়ে বলি- না, কেউ নেই।’

মেয়েটির স্নেহভরা উচ্চারণে পীড়িত হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় প্রেম। গল্পকথকের ভাবনায় এই মমতাময় প্রেয়সী যখন স্বামীর রূঢ় আচরণে নিগৃহিত হয়, তার অন্তর তখন বেদনায় কানায় কানায় পূর্ণ হয়। বিপন্নতার মাঝে প্রেমের অনির্বান শিখায় প্রজ্জ্বলিত হয় হৃদয়, অনুভব করে 'মনে হচ্ছে , কে যেন আমাকে ভালোবাসে।'

অন্যদিকে জীবনের বাস্তবতা নিংড়ে যন্ত্রণা জোগায় রিক্ততার সাথী দারিদ্র্য। কুষ্ঠব্যাধি-জর্জর ভিখারিনীকে তথাকথিত ভদ্রলোকের নির্দয়ভাবে লাঠিপেটা করা, ছ্যাকড়া গাড়ির শ্রান্ত ঘোড়াটিকে নির্মমভাবে চাবুক চালানো, বড়লোকের মটরগাড়ি পথের ঘুমন্ত কুকুরকে নিষ্ঠুরভাবে মাড়িয়ে যাওয়া প্রভৃতি দৃশ্য গল্পকথকের জীবনস্পন্দনের মর্মমূলে তীব্র আঘাত হানে। দুঃসহ জীবনযন্ত্রণায় পীড়িত গল্পকথকের বেদনার্ত অনুভূতি প্রকাশিত হয় এভাবে- 'আজকে আবার দেখলাম নিঃসহায়া ব্যথিতা নারীর চোখে সুগভীর অতল বেদনার ছায়া! জীবনে কত পাপ, কত দারিদ্র্য, কত অত্যাচার, কত রোগ, তারপর আবার এই দুঃখিনী নারীর চোখে রহস্যনিতল নিবিড় ব্যথার স্বপ্ন!' (টুটাফুটা/৩৫১)

অচিন্ত্যকুমার এ গল্পে শীত ও বসন্ত ঋতুর প্রসঙ্গ এনেছেন অনিবার্যভাবেই। যেমন- 'শীতের হাওয়া শাখায় হা হা করছে।' কিংবা 'বসন্ত পৌঁছুবার আগেই হয়ত আমি চললাম।' শীত রিক্ততার প্রতীক। প্রকৃতি পাতাশূন্য হয়ে পড়লে সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীর মত মনে হয়। নিঃস্ব ও আবরণহীন প্রকৃতি অলঙ্কারবিহীন মানবীর মত। এখানে শূন্য জীবনবোধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার বসন্তে প্রকৃতি পত্র-পুষ্প মঞ্জরীতে অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়। ফুলের বুকে ভ্রমরের গুঞ্জরণ, কাননে বাতাবিনেবু ফুলের সুবাস, কুঞ্জে কুঞ্জে আম্র মঞ্জরীর সুগন্ধ প্রকৃতিকে করে তোলে উন্মাতাল। অথচ এই বসন্ত ঋতুর মধুময় স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হওয়ার উৎকণ্ঠায় শঙ্কিত গল্পলেখকের মনোজগৎ।

শেষপ্রান্তে অপ্রিয় বাস্তবতার মুখোমুখি হয় গল্পলেখক। অত্যাচারী স্বামীকে নয় বরং প্রিয়তম স্বামীকে দায়িত্বশীল পত্নীর আসনে আসীন হয়ে সেবা করার চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়। প্রকৃত সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পায়, মৃত'স্বামীর বুকটা শুভ্র সুগঠিত বাহু দিয়ে বেষ্টন করে রাত্রি চিৎকার করে কাঁদছে।' (টুটাফুটা/৩৫৩) আর নির্বিকার উদাসীন গল্পকথক ভালোবাসার রঙিন হর্ষকে চিরদিনের মত তিরোহিত করে দয়িতাকে দেখার একমাত্র জানলা বন্ধ করে দেয়। এ প্রসঙ্গে গোপিকানাথ রায় চৌধুরীর একটি মন্তব্য স্মর্তব্য - 'একালের অবক্ষয়ী হতাশ যুবচিত্তে নারী সম্পর্কে একটা স্বপ্ন ছিল। পুরুষ জীবনসংগ্রামে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে, আহত রক্তাক্ত হচ্ছে- তার সেই ব্যথা ও ব্যর্থতার ঊর্ধ্বে জীবনতৃষ্ণা চরিতার্থতার প্রতীক হিসাবে তার রোম্যান্টিক মনে বিরাজ করেছে নারী। সে নারীর কোন স্পষ্ট সংজ্ঞা বা রূপ পুরুষের কাছে পরিস্ফুট নয়। তবু সেই অস্পষ্ট রহস্যময়ী 'নারী'-র সন্ধানে সে যুগের যুবচিত্ত মানসযাত্রা করেছিল।'[২৪]

অচিন্ত্যকুমার যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনবোধকে প্রেম ও প্রকৃতির রূপমাধুর্যে নান্দনিক ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। কল্পিত প্রেয়সীর প্রতি তীব্র আবেগ আর প্রাত্যহিক জীবনের যাতনা এই দুই পরস্পরবিরোধী বিষয়বস্তুকে

সার্থকভাবে উপস্থাপনার যে পারঙ্গমতা- 'চোখের চাতক' গল্পে তা লক্ষণীয়। ভাবের পরিকল্পিত বিন্যাস, উপস্থাপন শৈলী, বিপরীত সুষ্ঠু আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে যথাযথ ভারসাম্যতা এ গল্পকে কাব্যিক ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত করেছে। সংবেদনশীল দ্বৈত ঘটনাপ্রবাহ অসামঞ্জস্যতার ভারে আক্রান্ত হয়নি বরং তাঁর নিজস্ব জীবনবোধকে প্রতিষ্ঠিত করেছে মানবিক অনুভূতির অসীম বর্ণাঢ্যতায়।

বাঙালি নিম্নমধ্যবিত্তের কষ্ট-যন্ত্রণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা ও ব্যর্থতার অক্লান্ত রূপকার অচিন্ত্যকুমার। বৈচিত্রহীন দারিদ্র্যেঘেরা মধ্যবিত্ত জীবনের উত্থান-পতন তিনি মোলায়েম স্নিগ্ধতায় অঙ্কন করেছেন। জীবনের গ্লানির মধ্যে শিল্পের অমৃতধারা ছড়িয়ে দিয়ে জীবনচেতনাকে নান্দনিকভাবে রূপায়িত করেছেন। দারিদ্র্যজনিত অসমর্থতা, অনিশ্চিত ভবিষ্যত সম্পর্কিত অনুভূতি, অস্তিত্বসংকটের পীড়নে ক্ষত-বিক্ষত রোগগ্রস্ত স্বামীর মানসবিবর্তনের সূক্ষ্ম ও কুশলী অন্তর্বয়নই **'সন্ধ্যারাগ'** গল্পের কাহিনীকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। এখানে প্রকৃতির বিবর্ণতা কিংবা বিষণ্নতার সমান্তরালে দৈন্যপীড়িত মধ্যবিত্ত জীবনের অস্থিরতা ও অসহায়তার করুণ জীবনালেখ্য রচিত হয়েছে। বিপন্ন ও অভাবগ্রস্ত মানবমন নিজেদের রুক্ষ ও দুঃসহ জীবনের চিত্র খুঁজে পায় রিক্ত ও নিঃস্ব প্রকৃতির ক্যানভাসে। জীবনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত সেসব মানুষের মনে হয় প্রকৃতি ও মানবজীবন যেন একসূত্রে গ্রথিত।

জীবনীশক্তি ফুরিয়ে আসা ও দূরারোগ্য জ্বরে ভোগা মমতার স্বামীর কাছে প্রকৃতির সৌন্দর্য, প্রতিটি দিনের তাৎপর্য মায়াময় জীবনসুষমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অসুস্থ অবস্থায় যার স্নেহকোমল মুখটি তার মনের মুকুরে ভেসে ওঠে সে- মা। এখানে মেঘের উপমায় জীবনের দ্বৈতরূপের আভাস স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। প্রথমত, মায়ের স্নেহমাখা পরশের অনুভূতি মেঘের প্রতীকে রূপায়িত হয়েছে এভাবে – 'দূরে শেফালিগুচ্ছের মতো একখণ্ড শাদা মেঘ প্রভাতের নির্মল রৌদ্রে স্নান করছে, যেন শাদা পালকওয়ালা একটা বক তার দু'টি পাখা বিস্তার ক'রে শুয়ে আছে। ঐ মেঘটা যেন মা'র রাশীকৃত সুকোমল পবিত্র ভালোবাসার মতো !' (টুটাফুটা/৩৭৩) দ্বিতীয়ত, মেঘ এখানে কালো অন্ধকারের প্রতীকে আভাসিত। কাজল রঙের মেঘ খুশির উজ্জ্বল আলোকে ম্লান করে দেয়, প্রাত্যহিক দীনতার সাথে মিতালি তৈরি করে। অভাবের হাহাকারের সাথে মেঘের নিনাদ একাকার হয়ে যায়। সেখানে 'শরতের নির্মুক্ততা ও জ্যোতির্ময়তার স্থান' নেই। আছে 'পুঞ্জ পুঞ্জ বেদনার মতো কালো নিবিড় মন্থর মেঘস্তূপ'। আবার প্রতিটি দিন স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়েছে। জীবনবৃক্ষ থেকে ঝরে যাওয়া পাতার মতো দিনগুলো ভিন্ন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছে লেখকের কাব্যময়তায়- 'এই পচিশ বছরের জীবনে শতদলের পাপড়ির মতো একটির পর একটি ক'রে কতদিন এসেছিল– কোনোটি সূর্যোদয়ে পলাশের মতো রাঙা, গোধূলিতে বিরহবেদনার মতো মধুর, কোনোটি ঘনঘোর মেঘে প্রিয়ার ব্যথিত দৃষ্টির মতো শীতল, নক্ষত্রদীপ্ত রহস্যগভীর অন্ধকারে দুঃখের মতো প্রশান্ত, কোনোটি বা পূর্ণিমার প্রচুর জ্যোৎস্নায় যুথিকার মতো প্রফুল্ল, কোনোটি মধ্যাহ্নের দগ্ধ নির্মম রৌদ্রে বৈরাগ্যসুন্দর সন্ন্যাসীর মতো উদাসীন ! কত দিন হারিয়ে গেছে !' (টুটাফুটা/৩৭৪) সন্ধ্যামেঘের

রক্তিমার মতো সব মুছে গেলেও ভালোলাগার সুখস্মৃতি থাকে হৃদয়ের ডোরে বাঁধা। ছোট ছোট বর্ণিল স্বপ্নগুলো যেমন মনের গহীনে যত্নে থাকে তেমনি তাদের হারাবার বেদনাও জীবনবোধকে করে বিষণ্ন। ম্রিয়মান ব্যথায় স্মৃতিগুলো অনুভূতিতে নাড়া দেয় এভাবে–'মনে পড়ে, এক বিয়ে বাড়ির নিমন্ত্রণে গিয়ে একটি চঞ্চলা সদাহাস্যময়ী কিশোরীর সঙ্গে ভাব ক'রে রাত্রে তারার পানে চেয়ে চেয়ে তার নাম রেখেছিলাম সন্ধ্যাতারা ; মনে পড়ে এক বছর বাদে তার বিয়ে হ'য়ে গেলে অকারণে চোখে জল এসেছিল, সে রাতে ঘুমুতে পারে নি। সে রাত ব্যর্থতাবোধের কি অপার সুখেই যে কেটেছে !' (টুটাফুটা/৩৭৪) ভালোবাসার রঙে আবৃত পৃথিবীতে কেউ চলে গেলে জীবনধারার গতি কোথাও এতটুকু শিথিল হয় না। বেদনার্ত হৃদয়ে লেখক অনুভব করেন–'আমি যখন যাব, তারপরেও ত' কত দিন কত রাত্রি আসবে, আমার জন্যে ত' একটি তৃণাঙ্কুরেও ঈষৎ রোমাঞ্চ উঠবে না। সে রাত্রে বিরহী কাঁদুক, কবি কবিতা লিখুক বীণা বাজাক, শিল্পী প্রতিমা গড়ুক, ব্যবসাদার হিসাব মিলাক, কেরাণী তার দুঃখিনী স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করুক, সেইখানে আমার স্থান কোথায়? কোথাও না। ভাবছি আজ পর্যন্ত এই নীল আকাশের তলে কোটি কোটি মানুষ হারিয়ে বিস্মৃত হয়ে গেল। তাদের এতটুকু চিহ্নও কোথায় প'ড়ে রইল না।' (টুটাফুটা/৩৭৬) জীবনের প্রতি এই তীব্র আকাঙ্ক্ষাবোধ মমতার স্বামীকে একদিকে যেমন জীবনের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে তেমনি মৃত্যু পরবর্তী জীবনে মমতার বেঁচে থাকার সামর্থ্য নিয়ে চিন্তাশীল করে তুলেছে। আবার অনুতাপে দগ্ধ হৃদয়ে ভেবেছে -'এই মমতাকে কতদিন অকারণে তীব্র তিরস্কার করেছি। কত রাতে ওকে একা বিছানায় ফেলে অস্থির হ'য়ে ছাতে টহল দিয়েছি। ও সমস্ত রাত ঘুমায় নি, বালিশে বুকটা চেপে ধ'রে খালি কেঁদেছে। কী করুণ তাপসীর মূর্তি ওর আজ ! আজ ওকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেল!' (টুটাফুটা/৩৭৬)

মমতার রোগক্লিষ্ট স্বামীর নৈঃসঙ্গ্যচেতনা ও পরার্থপরতা গল্পের মধ্যে ভালোবাসাময় মহানুভবতার সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছে। সে আত্মচিন্তায় আবিষ্ট না হয়ে নিজের অন্তরের উদারতাকে জাগ্রত রেখেছে। 'মমতা'র কল্যাণের প্রতি নিজেকে ব্যাপৃত রেখে পরমাত্মার সাযুজ্যলাভে ব্রতী হয়েছে। চিরাচরিত নিয়মে দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত স্বামী তার স্ত্রীর পরবর্তী জীবন নিয়ে চিন্তিত হয় না। এক্ষেত্রে সন্তানের প্রসঙ্গ এলেও স্ত্রীর প্রসঙ্গ একেবারে অনর্থক। কিন্তু এগল্পে যতীন অর্থাৎ মমতাকে যে ভালোবাসে, সেই পুরুষের হাতে মমতাকে মনে মনে সঁপে দেবার অভিপ্রায় পোষণ করে রুগ্ণ স্বামী। কোন হীনতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা তার মনে ঠাঁই পায়নি, বরং তার জীবনভাবনা বিবেকবোধ ও মনুষ্যত্ববোধকেই সমুন্নত রাখে। তাইতো ভালোবাসার মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার প্রত্যয় অনুভব করে নীরবে দূরে চলে যায়। কিন্তু পরিণামে তার জীবনাশার সাথে বৈপরীত্য তৈরি হয় প্রথাগত বাঙালি সংস্কারবোধের সঙ্গে। সনাতন ধর্মের গৃহবধূর জীবনসীমায় স্বামীই পরম ধ্যান-জ্ঞান বিবেচিত হওয়ায় রোগক্লিষ্ট স্বামীর মনস্কামনা পূর্ণ হয় না। পালিয়ে গিয়েও পরিত্রাণ পায় না। সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বেড়াজাল ডিঙিয়ে অবারিত জীবনচেতনার নির্মল আঙিনায় মহামিলনের সঙ্গীত রচিত হয় মমতা ও তার রোগক্লিষ্ট স্বামীর। ভালোবাসার অনুভূতিতে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে তাদের নীরব মিলন–' মমতা আমাকে দেখে বুকের ওপর ছোট খুকীর

মতো ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। ওর চুলগুলির ওপর হাত রাখলাম। ওকে কিন্তু আজ ওর নাম বদলে আর একটা নামে ডাকতে ইচ্ছে করছে।' (টুটাফুটা/৩৯৩)

অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পে তথাকথিত নিচুতলার মানুষের জীবন-বৈচিত্র্য, নৈরাশ্য ও অন্ধকার দিকগুলো বিস্তৃত। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনচেতনা রূপায়ণে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও মানস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি যেভাবে অন্ত্যজ মানুষের জীবনবেদনা তাঁর লেখনীতে রূপায়িত করেছেন তা একদিকে যেমন চিরকালীন অন্যদিকে তেমনি হৃদয়গ্রাহী। ভূদেব চৌধুরী বলেছেন-'সন্ধ্যারাগ' ('কল্লোল'-১৩৩২ পৌষ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত) -এর মধ্যে মৌল পার্থক্য আর কিছু নেই- সেই নরনারীর দেহমনের আকর্ষণ ও অর্থনৈতিক অপঘাত।...'সন্ধ্যারাগ'-এ মনস্তত্ত্ব - সমর্থিত যৌন প্রতিভাস বা যৌন প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব প্রখরতর হলেও কথার উচ্ছ্বাস আর যৌবনের উন্মাদনাই তার মুখ্য উপাদান।'[২৫]

জীবেন্দ্র সিংহরায় মন্তব্য করেছেন - অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'সন্ধ্যারাগ' (বিষয়-যক্ষ্মারোগীর কবিত্ব) -এর মতো গল্পে মনস্তত্ত্বের মোড়কে কবিজনোচিত ভাবোচ্ছ্বাসকে ধরে রাখবার চেষ্টা আছে।'[২৬]

'আঘ্রাণ' গল্পের কাহিনী গড়ে উঠেছে দুটি অসমবয়সী নরনারীর প্রত্যাশার বৈসাদৃশ্যমূলক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। সংলাপধর্মী সাবলীলতা এ গল্পের একটি বৈশিষ্ট্য। আইনজীবী নীলাঞ্জন দুশ্চরিত্র, লম্পট, মাতাল নামে খ্যাতিমান হলেও সে অন্তরে লালন করে অপরের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধ, 'জাঁদরেল রাগী লোক বলে নামডাক' থাকলেও হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়া দরিদ্র অসহায় দেবলার প্রতি ছিল তার সংযত আচরণ। দেবলা নীলাঞ্জন সম্পর্কে 'ভয়ের কিছু আছে ব'লে তো শোনে নি। শুনেছে সকলের থেকে আলাদা হ'য়ে একা-একা থাকে হালদার। স্ত্রীর থেকে আলাদা, ছেলের থেকে আলাদা। দুর্গম অরণ্যে ক্লান্ত, পরিত্যাক্ত পর্বত।' (এ.অ.এ.রূ. /১০৭)

কিন্তু ধরা দেয়ার ইচ্ছায় আসা দেবলা ধরা পড়ছে না কোনভাবেই। জীবনের দুঃসহ বাস্তবতার কাছে অসহায় দেবলার একাকীত্বে যেন কোনভাবেই সঙ্গী হিসেবে আসছে না নীলাঞ্জন। দেবলার মনে হল 'আপিস ঘরের দরজাটা বন্ধ হ'ল শব্দ করে।

এক গাছ পাখি থরথর ক'রে কেঁপে উঠল, আকাশ কালো ক'রে ঝড় আসছে। পারের কাছে নদীর জল কুলকুল ক'রে উঠেছে, শাদা চাদর উড়িয়ে এল বুঝি অমাবস্যার কোটাল।

এবার আসবে নীলাঞ্জন।' (এ.অ.এ.রূ /১০৮)

কিন্তু অপেক্ষার প্রহর অতিক্রান্ত হয়। 'আশেপাশে কোথাও এতটুকু হাঁটাচলা নেই। স্তব্ধতা যেন ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে চারদিক থেকে।' একসময় উৎকণ্ঠিত দেবলার উৎকণ্ঠা নিরসন হয়। অপেক্ষারত দেবলার দিকে তাকিয়ে নীলাঞ্জন বলে 'আমার জন্যে কেউ বসে আছে এ ভাবতে ভারি সুখ হয়। সুখ জিনিসটাই ভাবনার মধ্যে, জিনিসের মধ্যে নয়।' একাকী নিঃসঙ্গ নীলাঞ্জন দেহজ সুখে বিশ্বাসী নয়। মানবিক সুখ হৃদয়কে ভরে দিতে পারে অপরিসীম আনন্দে। ক্ষণস্থায়ী সুখের সীমা অতিক্রম করে তাইতো সে ভালোবাসার অনির্বচনীয় সুখের

রাজ্যে বসবাসে প্রয়াসী। আর সে কারণেই তাকে বলতে শোনা যায় ‘ভালোবাসার কথা কতদিন শুনি নি, বলতেও ভুলে গেছি। হোক মিথ্যে কথা, তবু বলতে সুন্দর, শুনতে সুন্দর। মিথ্যে কথা গুলিই তো জীবনকে রঙিন ক’রে রেখেছে।’ (এ.অ.এ.রূ/১১২)

বিত্তশালী নীলাঞ্জন দেবলাকে তাই কোন অসম্মান না করে সময় টুকু কাটিয়ে যাওয়ার দাম দিয়ে দেয়। বিহ্বল বাকরুদ্ধ দেবলা সম্পূর্ণ অপরিচিত এ আচরণ মন থেকে মেনে নিতে পারে না। কারণ, অভাব-অনটনের নির্মম কশাঘাতে ব্যতিব্যস্ত দেবলা অনন্যোপায় হয়েই এ জীবনে পা বাড়িয়েছে। এ জীবনের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে থাকবে ভালোবাসাহীন উত্তাপের বিষবাম্প-এ কথা জেনেই সে নিজেকে যুক্ত করেছে এ পথে। অসহায় ছোট ছোট ভাইবোন, বাবা, মায়ের মুখের অন্ন জোগাবার আর কোন সংস্থান তার জানা নেই। কিন্তু এখানে এসে সে আবিষ্কার করে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পুরুষ। যার মুখে ‘কেমন একটা আত্মনিমগ্ন শিশুর ভাব।’ ভালোবাসার চিরন্তনতায় প্রবলভাবে বিশ্বাসী নীলাঞ্জন তাই তার চেতনায় ধারণ করে ‘ভালোবাসার বয়স নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই, যে ভালোবাসা কিছু চায়না, কেবল দেয়। কারণ, ভালোবাসা যে কিছু বিচার করে না, অভিসন্ধি করে না।’

এ গল্পের এক পর্যায়ে দেখা যায় নীলাঞ্জনের গভীর মানবিক জীবনবোধ। এ পরিচয় তার ব্যক্তিত্বে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য সংযোজন করে। লেখকের বর্ণনায় ‘সেদিন আকাশ উপুড় করা বৃষ্টি, তারই মধ্যে চলে এসেছে মেয়েটা।

‘একি, ভিজে গেছ নিশ্চয়ই। কি হবে!’ চঞ্চল হল নীলাঞ্জন। ‘বেশি নয়–এ শুকিয়ে যাবে এখুনি।’

না, না, ভীষণ–ভীষণ অসুখ করবে। বদলে ফেল, শাড়িটা বদলে ফেল শিগগির–’

‘বেশ বলেছেন! এ বাড়িতে শাড়ি পাব কোথায়?’ খিলখিল ক’রে হেসে উঠল দেবলা, ‘আছে শাড়ি। তোমার জন্যে কিনেছি একখানা।’ (এ.অ.এ.রূ./১১৬)

দেহজ কামনায় লোভাতুর কোন পুরুষ যেমন কোন নারীকে প্রলুব্ধ করার জন্য ফাঁদে ফেলার দুরভিসন্ধিতে কোন উপহার দেয়, এ যেন তা নয়। যেন উপহার দেয়ার জন্য বৃষ্টিটার বড় প্রয়োজন ছিল। দেবলার প্রতি সলজ্জবোধ, মমত্ববোধ নীলাঞ্জনকে অনন্য মহিমায় মহিমান্বিত করেছে। দেবলার প্রতি তার একান্ত অনুরোধ বারবার ধ্বনিত হয়েছে গল্পের মধ্যে ‘সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে বটে কিন্তু নিজেকে ফুরিয়ে ফেলো না।’ সত্যিকার অর্থে মানুষ অপার সম্ভাবনাময়। জাগতিক তুচ্ছতায় মানুষ কখনো নি:শেষ হতে পারে না। হৃদয়ের অসীম ভালোবাসা, পবিত্র স্নেহানুভূতি, অপরের প্রতি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে দীর্ঘকাল। নিজের এই পরিপূর্ণতার অনুভূতি সময়কালও হরণ করতে পারে না। তাই দেহজ কামনার বাইরে যে মানুষের বিশাল এক অন্তর্জগৎ আছে সেখানের অবস্থিতির গভীরতাই প্রকৃতপক্ষে মানুষকে দেয় স্নিগ্ধ শান্তির অতলস্পর্শী আনন্দ। আর এই আনন্দময়তাই হোক দেবলার পথ চলার পাথেয়–নীলাঞ্জনের শেষোক্তিতে সে কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

'নীলাঞ্জন' চরিত্র অঙ্কনসূত্রে অচিন্ত্যকুমার একজন চরিত্রহীন মানুষের সাংসারিক জীবনের নানা বৈচিত্র্য পরিবেশনের মাধ্যমে তার একটি সমগ্র রূপকে ধারণ করতে চেয়েছেন। বাইরের নির্মমতা, অন্তরের কোমলতা প্রভৃতি যেমন নীলাঞ্জনের জীবন বিশ্লেষণের জন্য অপরিহার্য অনুষঙ্গ তেমনি একজন চরিত্রহীন সম্পর্কে বাইরের মানুষ কী ভাবে, তার প্রতি কী আচরণ করে সেটিও নীলাঞ্জনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিঃসন্দেহে। তার লম্পট বা চরিত্রহীন পরিচয়টি বাহ্যিক আবরণমাত্র। সবকিছুর উর্ধ্বে সে-ও যে মানুষ- এ সত্যই লেখকের কাছে মুখ্য ও অর্থবহ। প্রকৃতপক্ষে, একজন শিল্পীর কাছে ব্যক্তির সব ধরনের পরিচয় ছাপিয়ে তার মনুষ্য পরিচয়টিই প্রাধান্য অর্জন করে। সে কারণে শিল্পী যখন কোন চরিত্র নির্মাণ করেন তখন ওই চরিত্রের মনুষ্যত্ব অনুসন্ধানই তাঁর প্রথম লক্ষ্য হয়ে ওঠে। অচিন্ত্যকুমারের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। জীবনের পঙ্কিল কদর্যতার মধ্যেও পদ্মের প্রস্ফুটন যে সম্ভবপর, তার-ই শাশ্বত জীবনচেতনার শিল্পিত ভাষ্য 'আঘ্রাণ' গল্পে নবতর মাত্রা সংযোজন করেছে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত মানসের চিত্তসঙ্কট, স্মৃতিমুগ্ধতা, মনোজৈবনিক কামনা-বাসনা, দাম্পত্য-বিচ্ছিন্নতার তীক্ষ্মমুখ যন্ত্রণা এবং সৃজনশীলচৈতন্যের সংবেদনার শিল্পরূপ নির্মাণ করেছেন। প্রেমের আধারে তিনি যেমন জীবন সন্ধান করেছেন তেমনি প্রেমচেতনার মাধ্যমেই প্রতিফলিত করেছেন তাঁর প্রাতিস্বিক জীবনচেতনা। প্রেমের আশ্রয়ে মানবমনের রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাস, গীতিময়তা, অন্তরাবেগ এবং মধ্যবিত্ত মানসের জীবনচৈতন্যের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।

অচিন্ত্যকুমার তাঁর ছোটগল্পে প্রেমানুভূতির একটি ভিন্নদিকের স্বরূপ উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছেন, যাকে দাম্পত্য-বহির্ভূত প্রণয় সম্পর্ক বলা যায়। নরনারীর সহজ, সরল প্রেমের মাধুর্যমণ্ডিত আলেখ্য এখানে রচিত হয় না। সমাজে নারী-পুরুষের স্বাধীন প্রেমের যে স্বীকৃতি রয়েছে তা এই নীতিবর্জিত সম্পর্কে অনুপস্থিত। এখানে প্রেমের জন্য দুঃখ, তিতিক্ষা ও আত্মত্যাগ করে মহিমা অর্জন প্রায় অসম্ভব। প্রেমের গতি যে কত বিচিত্র ও জটিল, অন্তঃপ্রবৃত্তির সঙ্গে বহিঃসংস্কারের সংঘাত যে কত প্রবল তা তাঁর নিম্নলিখিত গল্পগুলোর মধ্যে বিদ্যমান। গ্লানি ও মালিন্য মেঘের মতো ছেয়ে থাকে সেই সম্পর্কের আকাশে। বঙ্গীয় সমাজে অদৃষ্টপূর্ব মূল্যবোধের উপস্থাপনায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে পাশ্চাত্য মনোবিদ্যা এবং সাহিত্যপাঠে সমৃদ্ধ লেখকের এ গল্পগুলোকে নিরীক্ষাধর্মী বলা যায়।

সামাজিক প্রেক্ষাপট লক্ষ করলে **'কাঁটার মুকুট'** গল্পে দেখা যায় সাংসারিক মানুষের পরনারী প্রীতি। সমাজের অলক্ষ্যে, সংসারের অলক্ষ্যে, স্ত্রীর অলক্ষ্যে অণিমার প্রতি সহদেবের রয়েছে এক অনৈতিক বাসনা। জীবনের খুব সহজ প্রয়োজন গুলো মিটিয়ে নেয়ার জন্য অণিমাও হাত বাড়ায় অসাধুতার প্রতি। সমাজকে উপেক্ষা করলেও মনের অতলে লুকানো কোন এক বিশেষ অনুভূতিকে হয়তো অবহেলা করতে পারেনি দুজনেই। এই কারণে কোথাও গিয়ে শান্তি ও স্বস্তির দেখা পায়নি। অনুভব করতে পারেনি প্রেমের অনির্বচনীয় অনুভূতি।

সামাজিক ভয়ের বিধি-নিষেধ তাদের 'মহাশূন্যেই' ঘুরতে থাকে। সহদেব অণিমার নীতি বিরোধী প্রেম-পরিণতি সুখকর হতে পারেনি। বিস্ময়ের তীব্রতায় যে প্রেমের জন্ম তেমনি বিস্ময়ের বিহ্বলতায় তার মৃত্যু হয়।

'স্বাদু স্বাদু পদে পদে' গল্পগ্রন্থের 'কাঁটার মুকুট' নীতি বিবর্জিত প্রেম কাহিনীর কথকতায় মুখরিত। গল্পের অভ্যন্তরে কাহিনীর দুটি স্রোত প্রবাহিত। সেসন জজ সহদেব সরকারের আইনের দিক অর্থাৎ পেশাগত দিক আর তার ব্যক্তিগত দিক। দুই পাশেই তিনি একই ঘটনার একাধারে বিচারক ও ধারক। যদি কোন ব্যক্তির হৃদয়-অভ্যন্তরে শুদ্ধতা অবস্থান না করে তবে সে ব্যক্তির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, অন্তত বিবেকের আদালতে। সে দিকের প্রতিই আলোকপাত করা হয়েছে এখানে।

অণিমার স্বামী শশধর মফস্বলী কোর্টের আমলা, সহদেবের অধীনে কাজ করে। শশধরের স্ত্রী অণিমার প্রতি সহদেবের অনৈতিক আকর্ষণ গল্পের প্রধানতম দিক। চা খাওয়ার নিমন্ত্রণে 'অণিমার ঢেউটা সরল সীমা পেরিয়ে ছুঁয়েছিল সহদেবকে, সেই পুরনো সঙ্কেতলাস্যের ঢেউ, সেই ছুটে চলার বা থমকে দাঁড়িয়ে থাকার -আর, আসল ঢেউতো চোখে, ইচ্ছে করলে চোখ যা বলতে পারে এক রাজ্যের কথা দিয়ে তা বোঝানো যায়না -আর, এক চাউনিতেই ঈশ্বর আছে কি নেই, সাম্রাজ্যের উত্থান না পতন, এক মাঠ চোরকাঁটা না এক আকাশ নক্ষত্র।' (স্বা.স্বা.প.প./১০)

কাহিনীর প্রয়োজনে সাবিত্রী ও কালাচাঁদের প্রসঙ্গ এলেও সহদেব ও অণিমার অন্তর্গত নীতিবিরোধী কথামালাই বারবার ব্যঞ্জিত হয়েছে সাবলীল প্রবাহে। মনুষ্যত্ববোধের যখন বিপর্যয় ঘটে তখন পাপ-পূণ্যবোধের সকল অনুভূতি হ্রাস পায়। কৌতূহলী মানবমন সেই পাপবোধের মধ্যেও খোঁজে যুক্তির সার্থকতা। যেমন সহদেবের মনোকথনে পাপ এসেছে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা নিয়ে।

'পাপ কী সুন্দর কী উজ্জ্বল কী মধুর !

পাপ না থাকলে কে বাঁচত শুধু এই পূণ্যবানের কোট গাউন পরে, গলায় টুঁটি-টেপা কলার এঁটে!

আর, যাই বল, তাকেই তো মানায় এই পাপ। যে সমাজের শীর্ষের লোক, যে একজন প্রধান রাজপুরুষ, যে বুক ফুলিয়ে চলে বিদ্যুৎবেগে, রাস্তার মাঝখান দিয়ে, অন্যের মন্থর গাড়ি কাটিয়ে, যাকে আঙুল দিয়ে দেখায় পরস্পর, যাকে পেলে প্রথম লাইনের চেয়ার পড়ে-তাকেই তো মানায় এই সম্পদ। এ তার বুকের কৌস্তভ, মাথায় শিখীপুচ্ছ, গলায় বনমালা।

এ পাপ যাকে তাকে মানায় না।

যে সাহসী, যে অবস্থাকে সাজাবার নৈপুণ্য জানে, যে শিল্পী, যে স্রষ্টা, যে সম্বলসবল তাকেই এ শোভা পায়।'

...'শুধু একটা নিষেধ আছে বলেই তার এত মূল্য। একটা সর্বস্বহানির বিপদ আছে বলেই এর মাহাত্ম্য। হ্যাঁ, সর্বস্বহানি- সুনামই তো সর্বস্ব। সেই নিষেধ, সেই বিপদ যেমন আছে বরফ ঢাকা হিমালয়ের চূড়ায়, ঝড়তোলা

সমুদ্রের গভীরে। তাই বলতে পার পাহাড়ে-সমুদ্রে যাচ্ছি। তাই বলতে পার যাচ্ছি দুরূহের সাধনায়। পাপ সহজ হয়েও দুরূহ।...পাপের কথা মানেই অনিমার কথা।' (স্বা.স্বা.প.প./১১,১২,১৩)

গল্পের অন্য চরিত্র অণিমা সধবা স্ত্রী হয়েও অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত। সাধারণত সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীরা পতিব্রতা হয়। অণিমা এখানে ব্যতিক্রম। কারণ রক্ষণশীলতা, আত্মসম্মানবোধ ও প্রখর ব্যক্তিত্ববোধ তার চরিত্রে অনুপস্থিত। স্বামীর প্রমোশনের অজুহাত তুলে অন্য পুরুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার মধ্যে কামনা বিরাজ করে, নিটোল প্রেম নয়। আত্মমর্যাদাহীন অণিমা লেখকের বর্ণনায় আভাসিত হয়েছে এভাবে -

'একটা চাউনিতেই সব। এক শতাব্দীর ইতিহাস।...একটু ঘন করেই তাকাল সহদেব। বেশবাসের শৈথিল্যটা যে যত্নকৃত বিন্যাস বুঝতে দেরী হলনা।...সাহস করে বললে সহদেব-'তোমাকে তো দিলাম কিন্তু আমি পাব কী?'

কথা কইল না অণিমা। নিজের ডান হাতখানি সহদেবের ডান হাতের মুঠোর মধ্যে পুরে দিল।

শিথিল, অসতর্ক বাঁ হাত নয়, সক্রিয় স্বাধীন সমর্থ ডান হাত-নিটোল স্পর্শে আত্মস্থ হবার আগেই পালিয়ে গেল অণিমা।'

অপরাধপ্রবণতা মানবমনকে হীনম্মন্য করে তোলে। শুদ্ধপ্রেম বিসর্জিত অনৈতিক প্রেমবোধে জেগে থাকে কাঁটার মতো পীড়াদায়ক অনুভূতি, যা কখনো সুখের স্বপ্নাঞ্জন এঁকে দিতে পারে না দুচোখে। সহদেবের কল্পনা বুননে সে বিষয়েরই বিবরণ পাওয়া যায়।

'সহদেব অণিমার আঁচল ধরে চলে এল এক বন্ধুর পাবর্ত্যদেশে বেড়াতে। এক ভয়ের দেশ, আনন্দের দেশ। রাত নেই কিন্তু কুয়াশায় ঢাকা। বিস্ময়ের রৌদ্রকে ঢেকে রহস্যের কুয়াশা চড়াই-উতরাই অনেক করল কিন্তু পেলনা গুহার আশ্রয়, নির্ভয় নিভৃতি। নদীর পারে এসে দাঁড়াল, নির্জনতার নদী, জল তুলে তুলে চোখেমুখে ছিটোলো, ধুলো হাত পা, কিন্তু অবগাহন স্নান হলো না কোনওদিন। অবতরণের ঘাট পেল না কোথাও।

একটা উল্কা উদ্যত হয়ে আছে, মহাশূন্য পেরিয়ে পরতে পেলনা মাটিতে। মহাশূন্যেই ঘুরতে লাগল।' (স্বা.স্বা.প.প./১৬)

মানবিক মূল্যবোধে যা কিছু সুন্দর,শাশ্বত ও চিরন্তন তারই ঠাঁই হয়, অন্য কিছু নয়। ঔচিত্য ও অনুচিত্য দুটো বিষয় আপেক্ষিক হলেও নীতিবোধের মানদণ্ডে যদি তাদের উভয়কে পরিমাপ করা যায় তবে বিভাজন যে দৃষ্টিগোচর হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে আদর্শচ্যুত সহদেবের মত হাজারো পুরুষমানুষের হয়তো পাপ-পূণ্যের বিষয়ে অন্য ব্যাখ্যাও আছে যেমন-

'উচিত তো কত কিছুই। আসল উচিত ধরা না পড়া। আসামী না হওয়া। নীতির পালন নিজের জন্যে নয়, অন্যকে উপদেশ দেবার জন্যে। এখন যেমন সে দিচ্ছে কালাচাঁদকে। তুমি নিজে যত পার ধার করেও ঘি খেয়ো। যদি পার তামাদি আইনের মারপ্যাঁচে মহাজনকে কলা দেখিয়ো। যা কিছু সুখপ্রদ তাই আচরণ কোর। শুধু সাবধানে কোর,

গোপনে কোর, যেন কেউ না দেখে, না ধরে। বিপদ-আপদের কুটোটিও কোথাও রেখো না। বোকামিই পাপ। সুখভোগ যদি নির্বিঘ্ন হয় তা হলেই পূণ্য। (স্বা.স্বা.প.প./২২)

স্বামীর জ্ঞাতসারে অন্যপুরুষের সঙ্গে স্ত্রীর প্রেমে কোন রোমাঞ্চ নেই। লুকোচুরিতে যে 'এডভেঞ্চার' থাকে তা এখানে অনুপস্থিত। চটকদার, অস্থির আনন্দ সততা বহির্ভূত অন্তরঙ্গতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই গল্পের পরিসমাপ্তিতে সহদেবের হৃদয়মাঝে ধ্বনিত হয় 'স্বামীর স্বীকৃতি আছে, সম্মতি আছে, স্বয়ং সজ্ঞানে পৌঁছে দিচ্ছে হাতে করে। কনসেন্ট বা কনাইভেন্স থেকে যাচ্ছে। তা হলে আর অপরাধ কই? ফৌজদারী কই? ভাস্বর সুন্দর পাপ কই? শিল্পসুষমা কই?' (স্বা.স্বা.প.প./২৪)

'কাঁটার মুকুট' গল্পে কিছু উদ্ধৃতি মানবিক জীবনবোধে যুক্ত করেছে ভিন্নমাত্রা। যেমন-

ক. 'চলে যাবার জন্যেই তো আসা। ভুলে যাবার জন্যেই তো ভালোবাসা।'

খ. 'হাড়মাংসই বুড়ো হয় কিন্তু আকাঙ্ক্ষা বুড়ো হয়না।'

গ. 'আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকলে যৌবনও জেগে আছে।'

মানব সম্প্রদায় গড়ে ওঠার নেপথ্যে নৈতিক মূল্যবোধের অবদান অসীম। মানুষের জীবনের যাবতীয় কল্যাণকর শুভবুদ্ধি ও শুভচিন্তা এবং তার বিপরীত বুদ্ধি ও চিন্তা বিচারের আপেক্ষিক মানদণ্ডই হলো নৈতিক মূল্যবোধ। নৈতিকতা অন্যায় ও বন্ধুর পথ থেকে বাঁচায়, আত্মস্বার্থ, লোভ-হিংসা, ভোগ বাসনা থেকে মুক্ত রাখে, ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করে। ধর্মের কল্যাণধর্মিতাকে আদর্শ করে নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। কিন্তু মানবিক উৎকর্ষ সাধনের হাতিয়ার নামক এই নৈতিকতা সহদেবের চরিত্রে অনুপস্থিত। মূল্যবোধের অবক্ষয় তাকে পরিয়ে দিয়েছে কাঁটার মুকুট। এ মুকুটের অবস্থান হলো -ন্যায় নীতি, মানবিক মূল্যবোধ ও মহৎ আদর্শ বিবর্জিত। সম্মানহীনতার এ মুকুট সহদেব ও অণিমার জীবনভাবনাকে করেছে প্রশ্নবিদ্ধ। আর তাই বিকৃত রুচির বিনোদনে লিপ্ত এই দুজন নিজেদেরকে কলঙ্কিত করেছে প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি ক্ষণে।

টেলিফোনের পরিচয়ে পরিচিত অরুনিমা ও জয়ন্ত। সামাজিক দৃষ্টিকোণে অরুনিমা ও জয়ন্তর পরিচিতিটা তেমন নীতিমূলক নয়। হাজার হলেও বিবাহিত পুরুষের নারীবন্ধুর সঙ্গে আলাপচারিতা তৎকালীন সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ভালোবাসার মোহে আবেগপ্রবণ একজন নারী কীভাবে অন্য একজন নারীর সংসার ভাঙ্গার প্রস্তুতি গ্রহণ করে তা দেখা যায় এই **'রং নাম্বার'** গল্পটিতে। নারীর ভালোবাসার পরিণতি হল বিয়ে। তাইতো অরুনিমা সিঁদুরের কৌটা জয়ন্তের দিকে বাড়িয়ে দেয়। যদিও সিদ্ধান্তহীন মানসিকতার অধিকারী জয়ন্ত কোন আশ্বাসবাণী দিতে পারেনি অরুনিমাকে। তারপরেও আবেগে আপ্লুত মন কিছুতেই মেনে নিতে চায় না অন্য কোন বাধা। কিন্তু এ গল্পের অপর নারী চরিত্র নীলাক্ষীর মহৎ মানসিকতা গল্পের মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়। স্বামীর পরনারী আসক্তির কথা জেনেও গতানুগতিক স্ত্রী চরিত্রের মতো সংসারে অশান্তির ঝড় তোলেনি। বরং অরুনিমার অশান্ত আবেগী মনে যৌক্তিক বারতা পৌঁছে দিয়েছে। যার জন্য অরুনিমার মুখে জয়ন্তর প্রতি বলতে শোনা যায়

'আর কিছুই চাই না। শুধু মনে রেখো'। নীলাক্ষীর ব্যক্তিত্বময় আচরণ, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, অনুভূতির প্রাবল্য অরুনিমা ও জয়ন্তর নীতিহীন সম্পর্কের মাঝখানে সমাপ্তিরেখা টেনে দিয়েছে।

'রং নাম্বার' গল্পটি সামাজিক অবস্থানে ভিন্ন দু'জন নরনারীর পরকীয়া প্রেমের উপাখ্যান। বিবাহিত জয়ন্ত অবিবাহিত অরুণিমার হৃদয়ঘটিত প্রেমের মধ্যে বৈধতার সীমারেখা নিরুপণ করা যায় না। অপ্রতিরোধ্য, দুর্বার, প্রবল প্রেমের কল্লোলে জীবনসীমার বৈধ রেখা অতিক্রম করেছে দুজনই। ভিন্ন মেরুতে অবস্থানকারী দুটি নারী চরিত্র গল্পটিকে সাবলীল গতিময়তায় প্রবাহিত করেছে। আপাতদৃষ্টিতে গল্পের তৃতীয় চরিত্র নীলাক্ষীকে অপ্রধান বা গৌণ মনে হলেও গল্পের পরিসমাপ্তিতে তার স্থিরতা ও ধৈর্যের সম্মিলনে একটি অনন্য শিল্পমাত্রা সংযোজিত হয়েছে। চতুরতা বা শঠতা নয় বরং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে দুটি প্রেমপিয়াসী নরনারীর অশান্ত ও পরিণতিহীন জীবনে এনে দিয়েছিল স্বাভাবিক ঔচিত্যের সীমারেখা। দুটি ভিন্ন জীবনবৈশিষ্ট্যে উদ্দীপ্ত দুজন নারীর চেতনায় প্রেম বিষয়টি এসেছে সম্পূর্ণ বিপরীত আঙ্গিকে। একজনের কাছে প্রেম হল-অন্তরে নিরন্তরের অবস্থান। অন্যজনের কাছে প্রেম হল -গার্হস্থ্য জীবনে নিটোল শান্তি। যেখানে অস্থিরতার হিল্লোলে সুখের ব্যত্যয় ঘটে না।

অবিবাহিতা অরুণিমা প্রবল ভাবে অনুরক্ত বিবাহিত জয়ন্তর প্রতি। তার মধুকণ্ঠের সম্বোধনে বিহ্বল অরুণিমা স্বপ্নের মধ্যে হারিয়ে যায়। তার মনে হয় 'ছটা অঙ্ক এদিক ওদিক সন্নিবেশ করার পরই চকিতে শোনা যাবে সেই মধুক্ষরণ কণ্ঠস্বর। শোনা যাবে সেই ডাক, অরুণ, অরুণ, আমার ভোরের অরুণ, লজ্জার অরুণ, কামনার অরুণ- পুরুষের নাম ধরা ডাক শুনতে কী অদ্ভুত যে লাগে। প্রায় সূচ্যগ্র স্পর্শের মত। তুলবে নাকি রিসিভার? মুহূর্তে দেখবে নাকি আশ্চর্যকে? কত দূরে আমি কতদূরে সে। মাঝখানে কত মাঠ, কত রাস্তা, কত শব্দ, কত অন্ধকার। কত বিধি, কত বাধা। কিন্তু ছটা অঙ্কের সন্নিবেশ করলেই হৃদয়ের কানে হৃদয়ের মুখ রাখা। আমি তাকে ডাকব জয়, সে ডাকবে অরুণ, আরও একটু গাঢ় হলে রুনি।' (স্বা.স্বা.প.প./৪২)

প্রেমচেতনা জীবনচেতনারই অনুষঙ্গ। জীবনের সুন্দরতম বোধের মনোরম প্রকাশ এই প্রেমচেতনা। কিন্তু যখন এখানে সৌন্দর্যবোধের পরিবর্তে অবৈধ লুকোচুরির আড়ালে প্রেমের প্রকাশ ঘটে তখন সেখানে সম্ভবত 'পবিত্র' বিষয়টি হারিয়ে যায়। যেন মনে হয় শুধুমাত্র সময় কাটানো, নিছক স্বপ্ন কল্পনার ফানুস ওড়ানো আর যেন কিছু নয়। অথচ স্বর্গীয় প্রেম ধূলির ধরণীকে করে দিতে পারে পুষ্পময়, আর মানব মানবীর জীবনে এনে দিতে পারে বিকশিত পুষ্পের সার্থকতা। অপরের সাজানো সংসারে অশনি সংকেত হয়ে আবির্ভূতা অরুণিমা বিবাহিত জয়ন্তকে নিজের করে পাবার বাসনায় উদগ্রীব। কোন বাধা- নিষেধের বেড়াজাল তাকে আটকাতে পারেনি নিজের অভিপ্রায় থেকে। আর তাইতো নিজের অধিকারটুকু পুরোপুরি বুঝে নেবার প্রত্যয়ে ব্যক্ত করে হৃদয়ের রুদ্ধদ্বারে আবদ্ধ ভীরু আকাঙ্ক্ষাকে।

'বলে, 'আমি তোমার কাছে একটা ছোট জিনিস চাই।'

'ছোট্ট'?

হ্যাঁ, বলতে পারো সূচ্যগ্র। একটা স্থায়িত্বের চিহ্ন।'

'সে আবার কি?'

হাতব্যাগ থেকে ছোট একটা রুপোর কৌটা বার করল অরুণিমা। খুলল। খুলে দেখাল। আলোতে জয়ন্ত দেখল, সিঁদুর। খোলা কৌটা এগিয়ে দিয়ে অরুণিমা বললে, 'তোমার আঙুল করে এক এক ফোঁটা আমার কপালে আর সিঁথেয় দিয়ে দাও।'

হো-হো করে হেসে উঠল জয়ন্ত। বললে, চাঁদ ওঠে নি তো আকাশে? এ বুঝি চাঁদ সাক্ষী করে বিয়ে করা'।

'তা জানিনা। কৌটা সরিয়ে নিল না অরুণিমা। 'তুমি ভাবছ এমনি একটা ফোঁটা তিলক কাটলেই তুমি আমার অ্যাডিশনাল বউ হয়ে গেলে।'

'তাছাড়া আবার কি। লোকের তো একাধিক বউ থাকে। আর স্ত্রী হয়ে আমি তো তোমার কাছ থেকে ভরণ পোষণ চাইব না। স্বর দৃঢ়তর হল অরুণিমার ঃ আমি একাই দাঁড়াতে পারব নিজের পায়ে। শুধু কপালে একটা জয়টীকা পরে বেড়ানো। ঝুঁকি যে নিতে পারি তার সাইনবোর্ড এঁটে চলা। নির্ভয় হয়ে চলা।' (স্বা.স্বা.প.প./৪৭)

অন্যাসক্ত, কাপুরুষ জয়ন্ত দায়িত্বহীন ভাবে দিনের পর দিন সময় কাটিয়েছে তরুণী অরুণিমার সাথে। প্রেমের সাথে সংসার ধর্মের একত্রীকরণ নারীর সহজাত ধর্ম। এই ধর্মে চিরন্তন পরিবার প্রথার ভালোবাসাময় রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু পুরুষের আচরণে সেই শাশ্বত রূপের প্রকাশ দেখা যায় না। তাদের সংসারে লক্ষ্মী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও মনের অস্থির চঞ্চল বিহঙ্গ উড়ে বেড়ায় অন্যের মন আকাশে। তখন লক্ষ্মী স্ত্রীর নামে অপরের কাছে অপবাদ দিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না। বলে 'পুরনো হয়ে গিয়েছে। একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে, নানাভাবে জীবনে নানা উৎপাত ঘটাচ্ছে। প্রতি পদক্ষেপে সন্দেহের কাঁটা, কে চিঠি লিখল, কে ফোন করল, কোথায় কী কার কথা একটু লিখলাম ডায়রিতে, কেন বাড়ি ফিরতে উৎরে গেল সন্ধ্যা। জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে।' (স্বা.স্বা.প.প./৪৯)

দাম্পত্যজীবনের সম্মানবোধকে এখানে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে জয়ন্ত। প্রেয়সীর কাছে নিজের নাজুক অবস্থানকে আবৃত করার জন্য স্ত্রী নীলাক্ষীকে ছোট করতে এতটুকু কার্পণ্য করেনি সে। কোন অবস্থানই তাকে সুদৃঢ় আসনে আসীন করতে পারে নি। না প্রেমিক না স্বামী। প্রেমিক হিসেবে অরুণিমার কাছে প্রেমের দায়বদ্ধতা স্বীকার করে সম্মান জানাতে পারেনি সে, আর পবিত্র সংসার ধর্ম পালন করে স্ত্রী নীলাক্ষীর কাছে দাঁড়াতে পারেনি স্বামীর সুমহান আদর্শ নিয়ে। এই দোদুল্যমানতা তার জীবনচেতনার মূল্যবোধের অবমূল্যায়ন করেছে।

দুরন্ত প্রেয়সী অরুণিমা দুর্বার প্রস্তাব নিবেদন করে জয়ন্তকে। সাধারণত সনাতন নারীরা সংস্কারবশত যে ধারণা পোষণ করতে কুণ্ঠা বোধ করে সে ধারণার প্রতি অরুণিমার অনুরাগ গল্পটিতে নূতন চেতনার একটি দিক উন্মোচন করে। অরুণিমার সেই দুঃসাহসী প্রেমাকুতি বিধৃত হয়েছে এভাবে-

'শোন-যেন কোন সাজানো শহরে আগুন লেগেছে এমনি একটা মিলিত কোলাহলের স্বর, 'শোন, তোমাকে না পাই তোমার সারসত্তাকে চাই। আমি তোরে ভালবাসি অস্থিমাংসসহ সেই প্রেমের কথা পড়নি। তোরে, তোমারে

নয়। আমারও সেই ক্ষুধা। অস্থির, অস্থি-র ভালবাসা। আমি ছিন্নমস্তা, নিজের মাথা কেটে নিজের রক্তে স্নান করি। শোন, আমাকে অবৈধই দাও।... ভালোবেসে কত জিনিসই তো দেয়, নেয়, পায় এই সংসারে। তোমার কাছে না হোক, আমার কাছে প্রমাণ হোক। একটি শুধু প্রমাণ দাও আমাকে।'

কিসের? আমার ভালোবাসার?

না, আমার ভালোবাসার। আমি যে তোমাকে ভালবাসলাম তার স্থির প্রত্যক্ষ বাস্তব প্রমাণ। যদি কলঙ্কসাগরে নাই ভাসতে পারলাম তাহলে কিসের ছাই আমার ভালবাসা?' (স্বা.স্বা.প.প./৫২)

'...স্পর্শমনির মনে কোন দ্বৈধ নেই এ লোহা কসাইয়ের খড়্গের না পুরোহিতের পূজার। তেমনি প্রেমের মনেও কোন বিচার নেই এ বৈধ না অবৈধ। আমি বাবাকে বলে দিয়েছি আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ঈস, যদি একটা জীবন্ত প্রমাণ থাকত, যদি অন্তত একটা শিশু থাকত আমার...' (স্বা.স্বা.প.প./৫০)

অরুণিমার ও জয়ন্তর এ পর্যায়ের কথোপকথনের রেশ ধরে সহজেই অনুমিত হয় যে, প্রেম সম্পর্কের যে কোন দায়িত্ব নিতে কত অপারগ জয়ন্ত। তার জীবনাচরণে না আছে কর্তব্যনিষ্ঠা না আছে পারিবারিক সম্পর্কের মূল্যবোধ। কত অবলীলায় হালকা হাস্যরসে নিজেকে সমর্পণ করেছে সময়ের গতিস্রোতে। অরুণিমার প্রবল প্রেমাকাঙ্ক্ষা কিংবা নীলাক্ষীর পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম জয়ন্তর জীবনবোধে সসম্মানে কোন ঠাঁই পায়নি।

অন্তিম পর্যায়ে একটি ভিন্ন ধরনের দৃশ্যপট গল্পের শেষদৃশ্যে আভাসিত হয়। জয়ন্তর স্ত্রী নীলাক্ষীর হৃদয়ের উদারতায় মুগ্ধ অরুণিমা হতবিহ্বল হয়ে যায়। ভাবাবেগের আতিশয্যে যখন অরুণিমা আর জয়ন্ত লুকোচুরি করে প্রণয় অভিসারে মগ্ন হতে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় নীলাক্ষীর আগমনে পরিবেশের অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। তার সহজ স্বাভাবিক আন্তরিক কথাগুলো অরুণিমার ভেতরে চরম বাস্তবতার ঝড় তুলে দিয়ে যায়। যেমন 'আপনিই বুঝি অরুণিমা? রুনি? তা আপনি তো বেশ দেখতে। কী বা বয়েস? পঁচিশ? তিরিশ? সেই মফস্বলী হাকিম মন্দ ছিল কী? মধুরিমাকে কেন? আগে অরুণিমা পরে মধুরিমা!

'শোন। ওকে কিছু না খাইয়ে ছেড়ে দিয়োনা।' দরজার বাইরে গিয়ে আবার ফিরল নীলাক্ষি : 'কালিম্পং কবে যাচ্ছেন? আমি সব তৈরি করে রেখেছি মিটসেফে। খুলে দিতে পারবে তো? চাকরটা কোথায়, বাইরে? ডাক না ওকে। চলে যাবার আগে মিষ্টিমুখ করে যেতে হয়। আমি ভাই থাকতে পারছি না। খেয়ে যেয়ো কিন্তু-' (স্বা.স্বা.প.প./৫৬)

এ গল্পের পুরো জায়গা জুড়ে ছিল জয়ন্তকে ঘিরে অরুণিমার তীব্র প্রেমবোধ। হালকা মানসিকতার অধিকারী জয়ন্তর প্রতি তার প্রত্যাশা ছিল একটু সিঁদুর, একটা স্থায়িত্বের চিহ্ন, তারপর না পাওয়ার বেদনায় মরিয়া হয়ে চাইল, একটি ঐশ্বর্যময় শিশু। পরিশেষে মহীয়সী নারী নীলাক্ষির মনের ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়ে তার গন্তব্যের গতিরেখা মিলিয়ে গেল। মনে হল শরীরী প্রেম কিংবা অবৈধ মানবিক প্রেম কোন কিছুই উর্ধ্বে নয় সামাজিক

সম্পর্কের চেয়ে। আর এ সত্যটি উপলব্ধি করেই অরুণিমার শেষ কথা ছিল-‘ শুধু মনে রেখো। মনে স্থান দিয়ো।’ হৃদয়ে আবাসস্থান নির্মাণ করার বাসনা শেষ পর্যন্ত অরুণিমাকেও মর্যাদাপূর্ণ করে তুলেছে।

সন্দেহ প্রবণতার মধ্যেই দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয় **‘জানালা’** গল্পের যুথিকা ও বিভাস দম্পতির। জয়ার সশব্দে জানালা বন্ধ করাতে যে সন্দেহের সূত্রপাত হয় মূলত সে সন্দেহ অমূলক নয়। সুন্দরের প্রতি মানবমনের দুর্বলতা চিরকালের। যুথিকার নানা বিধি নিষেধের আড়ালে বিভাসের ‘দগ্ধ মাঠ’ সম মন ‘সবুজ ঘাসের ডগার জন্যে আকুপাকু’ করে। তাই নিরালায় জয়ার স্পর্শ পেতে চায় বিভাস। কিন্তু সংসার নীতির বাইরে অন্য কোন নারীকে ঘিরে সম্পর্কের অনুমতি প্রচলিত সমাজ দেয় না। তবু পুরুষমন সর্বদাই নতুনত্বের জন্য ব্যাকুল, আকাঙ্ক্ষী। সামাজিক বিধির বাইরে মন স্পর্শিত হয় না অন্য কোন মনের সাথে ; কোন পবিত্রতার বন্ধনে। মধ্যবিত্ত আবেগ নিয়ে যে জয়া তার স্বকীয়তা ধরে রেখেছিল সেও কাজের প্রয়োজনে ‘ট্যাক্টফুল’ হয়ে হাসিমুখে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে পথ চলা শুরু করে। বুঝতে পারে নিজেকে গুটিয়ে নয় বরং নিজেকে যৌক্তিক প্রকাশ করে সামনে এগিয়ে চলাই হলো জীবন।

অকল্পনীয় মনস্তাত্ত্বিক উদারতায় আবৃত ‘স্বাদু স্বাদু পদে পদে’ গল্পগ্রন্থের ‘জানলা’ গল্পটি। গল্পের যূথিকাকে আবহমান কালের চিরন্তন নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল দেখা গেলেও খুব সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে অন্তর্নিহিত যে তথ্যটির সন্ধান পাওয়া যায় তা বিস্ময়কর। স্বামী বিভাসকে সব সময় আগলে রাখার প্রবণতা তার হৃদয়-মনে বিরাজ করলেও শেষ পর্যন্ত অন্য এক জীবনবাসনায় তাকে আচ্ছন্ন থাকতে দেখা যায়। নিজের প্রতি স্বামীর আকর্ষণ লুপ্ত হবার পর অন্য নারীর প্রতি আসক্ত স্বামীকে তার ভালোলাগার পথে চলতে সাহায্য করা যে কোন স্ত্রীর পক্ষে দুর্বিষহ যন্ত্রণার অনুষঙ্গ। আর এই ভীষণ যন্ত্রণাময় কর্তব্য সম্পাদন করতে এগিয়ে এসেছে গল্পের অন্যতম চরিত্র যূথিকা।

পাশের বাড়ির মেয়ে জয়ার সশব্দে জানলা বন্ধ করার ভেতর দিয়ে সন্দেহ নামক বীজ উপ্ত হয়ে যূথিকার মনের গহীনে। জয়ার কার্যকারণের উত্তরে অসন্তুষ্ট যূথিকা স্বামী বিভাসকে সন্দেহের জালে আবদ্ধ করে। লেখকের বর্ণনায়-

‘হঠাৎ তুমি তোমার দিক থেকে সজোরে ছুঁড়ে মারলে জানলাটা –’

একটু জোরে হাসতে চেষ্টা করল জয়া। বললে, ‘শব্দ করে বন্ধ করলাম।’

হ্যাঁ, তাই। তাই-বা কেন?

বাঃ জানলার উপরে দেওয়ালে একটা টিকটিকি ছিল, সেটাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে।’ হাসির ঢল নামাতে চাইল জয়া। কিন্তু কোথায় কোন কুণ্ঠা না কষ্টের পাথরে আটকে গেল জল।’ (স্বা.স্বা.প.প./৬১) বাড়ি ফিরে বিভাসের ‘চোখে চোখ রাখল যূথিকা: ‘তুমি কি টিকটিকি?’

‘বা, আমি টিকটিকি হতে যাব কেন?’

ফ্যাকাশে মুখ করল বিভাস।' (স্বা.স্বা.প.প./৬৩)

জয়ার সামগ্রিক আচরণে যে শৈথিল্য তা যূথিকার অগোচরে ছিল না। রূপ মাধুর্যে 'জয়ার রঙ কালো বটে কিন্তু কেমন একটা আলো আলো ভাব। যেন নতুন ধানের থোরে শরতের সোনা ভরা। সবুজ সজীব। কয়েক মাস পিচের রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে শরীর একটু শুকনো শুকনো হয়েছে কিন্তু টান-টান তাজা ভাবটা একটুও ঝিমিয়ে পড়ে নি। যে নীল-নীল আকাশ ভরা নরম রোদ এনেছিল গাঁ থেকে তার আভাস এখনও গায়ে মাখা আছে।' কিন্তু এখন 'নবীন নিবিড় মেয়েটা, জল ভরা ঘট, কেমন যেন শুকিয়ে গিয়েছে একদিনে। শরীরের খেলায় যে খোলা ছুরির ঝলক ছিল, তা যেন লোপাট হয়ে গিয়েছে। চোখে কালো জ্বালার ধার।' (স্বা.স্বা.প.প./৫৮)

যূথিকার অনুসন্ধিৎসু মন কিছুতেই হিসেবে মেলাতে পারে না। তাইতো ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাওয়া যূথিকা আবার জয়ার কাছে ফিরে আসে। গল্পের এ পর্যায়ে যূথিকার জীবনচেতনায় মেঘ স্ফুলিঙ্গ আঘাত হানে। জয়ার মুখ নিঃসৃত ঘটনা বর্ণনায় স্তব্ধ যূথিকা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়। 'উনি হঠাৎ পিছন থেকে এসে আমার পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালেন। আমার হাত ধরলেন। আর কানের কাছে মুখ এনে'-

'কি, চুমু খেলেন?'

'এত যন্ত্রণাতেও হাসল জয়া। বললে, 'না। অতদূর নয়। শুধু তাঁর নিঃশ্বাসটা গালের উপর পড়ল।'

'শুধু নিঃশ্বাসটা?'

'হ্যাঁ, আর বললেন, তুমি ভারি মিষ্টি মেয়ে। তোমাকে খুব ভালবাসতে ইচ্ছে করে। তোমার কখনও করবে আমাকে? কি, করবে?'

'তা তুমি কী বললে?'

'আমি একটা ঝটকা মেরে তাঁর হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। বললাম, ছিঃ আপনি সম্ভ্রান্ত বিবাহিত পুরুষ, এ আপনার কী ব্যবহার! পালিয়ে চলে গেলাম ঘরের মধ্যে।' (স্বা.স্বা.প.প./৬৭)

বজ্রাহত যূথিকার মনোহৃদয়ে অচিন্ত্যনীয় এ ঘটনা গভীরভাবে রেখাপাত করে। অথচ স্বামী বিভাসকে ভালোবেসে সযত্নে সুরক্ষিত করে রাখতে এতটুকু কার্পণ্য করে নি সে। লেখকের বর্ণনায় 'সন্দেহ কি, স্বামীকে যূথিকা কড়া শাসনে সন্নেসী করে রেখেছে। নইলে আর শান্তিতে সংসার করতে হত না। যে জানালায় প্রতিবেশী আছে সে জানলায় দাঁড়াতে পায় না। রাস্তায় বেরুলে ছাড়পত্র নেই কোন চলন্ত দীপশিখার উপর দৃষ্টিটা স্থির করে। না, বিভাসের একটাও কোন মেয়ে বন্ধু নেই। এমন কেউ নেই যার কাছে একটু শ্রীমান হয়ে বসতে পারে, নিজের কানে শোনে নি এমন মোলায়েম সুরে বলতে পারে কথা। যা দু-একজন অনাত্মীয় আলাপী মেয়ে আছে, তাও ক্লাবের মেম্বার হয়ে, আর সেই ক্লাবে যূথিকাও তার সহযাত্রী। এমন কেউ নেই যে, কাগজে কালিতে না হোক, রঙিন ভাষায় একটা আধটা চিঠি লেখে- তেমন যদি নাকের ডগায় গন্ধ লাগে নিজেই চিঠির মোড়ক খুলে ফেলে যূথিকা। যদি তেমন কেউ বাড়িতে দেখা করতে আসে, যূথিকাই গায়ে পড়ে আগে থেকে তার ভার নেয়।

আলাপের পরিধি-পরিমিতি তদারক করে। মোট কথা সঙ্গে রঙে, প্রকাশ্যে-নেপথ্যে, অনৈক্য-আধিক্যে। নিজেকেই সে করে রেখেছে একচ্ছত্রী।'

'...বিভাসের জীবন দেওয়াল দিয়ে নিরেট গেঁথে দিয়েছে যূথিকা, জানলা খুলে রাখেনি একটাও। গানের মধ্যে রাখেনি একটু মিশ্ররাগের অবকাশ। তুমি এখন সাংখ্যের পুরুষের মত উদাসীন থাক আর আমি ধাত্রীভাবে দেখি শুনি তোমাকে। এই এখন শান্ত শালীন সুস্থ অবস্থান'। (স্বা.স্বা.প.প./৬৪)

প্রাত্যহিক জীবনচেতনার সবটুকু সুষমা দিয়ে স্বামীকে ঘিরে রাখতে চেয়েছে যূথিকা। নারী হৃদয়ের অনাবিল অসীম প্রেম দিয়ে বেঁধে রাখতেও চেয়েছে। কিন্তু পুরুষ শুধু গুণে তৃপ্ত নয়, রূপেও সে তৃপ্ত হতে চায়। কিন্তু যূথিকা তার নয়ন যুগলকে স্বামী ছাড়া অন্য কোন হৃদয়ের অভ্যন্তরে একটি বারের জন্যও আশ্রয় নিতে দেয়নি। ভেবেছে মানবিক মমতাই সব, রূপজ মোহ কিছু নয়। হঠাৎ ভুল ভাঙে তার। ভীষণ ভুল। সংসারের সহযাত্রীর কাছ থেকে এতবড় প্রবঞ্চনা থমকে দেয় তার জীবনস্পৃহাকে। নিঃস্ব যূথিকা নিজের সম্পর্কেও অবহিত ছিল না এতদিন, 'ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের মুখটার উপর হঠাৎ নজর পড়ল যূথিকার। মনে হল আগন্তুক কে এক মহিলা বিনানুমতিতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ছে! চমকে উঠবে কিনা ভাবছিল, কিন্তু না, এ ত সে নিজে। সে নিজে? তা ছাড়া আর কে। বিভাসের জীবনের রসমঞ্জরী। আনন্দের মূল সম্পদ। মাথার চুল উঠে গিয়ে টাক পড়ার মত হয়েছে। কটা দাঁত নড়তে নড়তে এগিয়ে এসেছে মাড়ি ছেড়ে। গাল দুটো ভেঙে গিয়ে মুখে মাংস ঝুলিয়ে দিয়েছে। থলে জাগছে চোখের কোলে। দেহের উপর নিচে কোথাও আর নেই বৃত্তাভাস।' (স্বা.স্বা.প.প./৬৫)

নিজের অবস্থানের এত করুণ পরিস্থিতি যূথিকার মনোজগতকে এলামেলো করে দিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ভাবাপন্ন হয়ে সে খেয়াল করে 'বিভাস পঞ্চাশ পেরোলেও এখনও কেমন ঋজু ও প্রশস্ত। বর্ণ ও বল, সুর ও ছন্দ, গতি ও যতি সমান প্রস্ফুট। কোথায় বিরূপ বক্রতা নেই, দৌবল্য শৈথিল্য নেই। তবু সব ফুরিয়ে-ফেলা নিঃস্বের মত বসে আছে-দেখাচ্ছে। চলে যাচ্ছে থাক এমনি স্পৃহাহীন স্বাদহীন তরঙ্গহীন স্রোতে গা ভাসিয়েছে। জীবনে গাঢ়তা ও গূঢ়তা যে রস দিতে পারে যূথিকার সঙ্গে আপোস করতে গিয়ে তাই যেন খুইয়ে এসেছে। শুধু শমিত নয়, স্তিমিত।' (স্বা.স্বা.প.প./৬৫) অন্যদিকে রোমান্টিক প্রেম চেতনার ধারক বিভাস রাতকে মনে করে 'রহস্য হংসী। যে কোন রোমান্টিক পুরুষের কাছে রাতের একটা গভীর তাৎপর্য আছে। প্রেমের মতো রাতও ধোয়াঁশা, দুর্বোধ্য। আকাশে তারকারাজির নিবিড় সখ্য রাতের বেলায় দৃশ্যমান। সুনীল আকাশ কৃষ্ণকালো আকাশ হয়ে যায় এই রাতের বেলা। প্রেমের কবিতা পড়ার প্রহর উন্মুখ হয় এই রাতের বেলা। অথচ এ মোহময় অপরূপ রাত যূথিকার কাছে একতাল কালো ঘুম।' দাম্পত্য জীবনালেখ্যর এই বৈপরীত্য সুখের সংসার রচনাতে টানাপোড়েন তৈরি করে।

স্বামী স্ত্রীর এই মানসিক অসামঞ্জস্যতা দূরত্ব বাড়িয়ে দেয় দু'জনের মধ্যে। আর এ বিষয়টি নিবিড়ভাবে অনুধাবন করে যূথিকা শরণাপন্ন হয় জয়ার। তার চিরআকাঙ্ক্ষিত চাকরি জোগাড় করে আনে যূথিকা। বললে,

'বেশ ছিমছাম ফিটফাট থাকবে। ঝিকমিক করবে। চট করে বস এর যাতে সুনজরে পড়ে যাও। যস্মিন দেশে যদাচারঃ। যেমন রেওয়াজ তেমনি আওয়াজ। চাকরি করতে আসাই উন্নতির জন্যে। আর উন্নতি মানেই উপরওয়ালার নেকনজর।' (স্বা.স্বা.প.প./৬৮) প্রাতিষ্ঠানিক বসের প্রতি কর্তব্যের উপদেশ দিতে দিতে পুরুষের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন করতেও এতটুকু কার্পণ্য করেনি যূথিকা। তার ভাষায় 'পুরুষ মানেই ক্লান্ত, অপূর্ণ। বাড়ির বাইরে একটু বাগান চায়, পাঠ্যপুস্তকের বাইরে একটু বা চুটকি রচনা। ঠিক উড়তে না চাইলেও হয়তো বা একটু ফুরফুর করতে চায়। তারই জন্যে এক চিলতে আকাশ হওয়া, একফালি মাঠ হওয়া ... ইংরেজিতে যাতে বলে ট্যাক্টফুল হওয়া। বিতরণ নয়, একটু বিকিরণ করা। আঁট সাঁট কঞ্জুস সংস্কারগুলো একটু ঢিলে করে দেওয়া। ... জল একটু ছুঁক ক্ষতি নেই, মাছ ধরতে না চাইলেই হল ... নিজে সাবধান থাকলেই জগৎ সাবধান। তারই মধ্যে যদি হালকা কটা তুলির টানে একটা মরা রঙকে জাগিয়ে দিতে পারি তো মন্দ কি' (স্বা.স্বা.প.প./৬৯)

শেষদিকে পাঠক অনুভব করে বিস্ময়কর এক চমক। জয়ার অনেক অনুরোধে যূথিকা তাকে দিয়ে যায় অফিসের বসের কক্ষের সামনে। দুরুদুরু বক্ষে ভেতরে প্রবেশ করে জয়া। 'ধুলো পড়া সাপের মত স্থির হয়ে সে দেখে, বস আর কেউ নয় স্বয়ং বিভাস। পুরনো কথার রেশ ধরে সে জিজ্ঞেস করে 'কি, কাজ করবে তো এখানে'? যূথিকা প্রদত্ত অনেক শিক্ষার শিক্ষায় প্রশিক্ষিত জয়া হাসিমুখে বললে, করব'।

মধ্যবিত্ত জীবনচেতনায় যূথিকার এমন আত্মত্যাগ খুব একটা সহজ বিষয় নয়। অথচ সে এ কাজটা দ্বিধাহীনভাবে সমাপন করে গেল স্বামী বিভাসের জন্য যে 'দগ্ধ মাঠ হয়ে' গিয়েছে, একটা সবুজ ঘাসের ডগার জন্য আঁকুপাঁকু করছে।' যূথিকা নিজের অবস্থানকে সুনির্দিষ্ট করে অনুভব করেছে যে, যাকে সে এত ভালোবাসে সে তার কাছে বাঁধা ছিল বটে তবে সে বন্ধনে ভালোবাসার অস্তিত্ব ছিল না। একটা বাধ্যগত হয়ে থাকার প্রবণতা ছিল স্বামী বিভাসের মধ্যে। সেই বাধ্যগত মন হঠাৎ বাঁধন ছাড়া হয়ে গেল পাশের বাড়ির মেয়ে জয়ার উপস্থিতিতে। পুরুষ চিরকাল নতুনত্বের পূজারী। ভালোবাসার চিরন্তন মহিমার চেয়ে ক্ষণিকের চমকলাগা বৈচিত্র্যে সম্ভবত এদের বিশ্বাস। তাই যূথিকা ভালোবাসার মানুষকে সীমাবদ্ধতার গণ্ডীর বাইরে মুক্ত বাতাসে 'সবুজ ঘাসের ডগার' কাছে পৌঁছে দিয়ে নিজের অভিনব মানসিকতার ঔদার্য প্রকাশ করেছে।

১৩৬০ সালে রচিত **'পাপ'** গল্পটিতে বিবেক ও আবেগের মধ্যে এক ধরনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ লক্ষ করা যায়। হরবিলাসের বউ এর আহ্বান অমিতাভ কোনভাবেই এড়িয়ে যেতে পারেনি। পরস্ত্রীর লাল সবুজের আবরণের মধ্যে সে উপলব্ধি করে ভয়ের নিমন্ত্রণ। বিবেকের নানা নিষেধবাণী উপেক্ষা করে দৃঢ় চিত্ত হয়ে সে বলে 'মানি না। চিনি না। কেউ জানে না, কেউ চেনে না। শুধু এইটুকু জানি সে ডাকে। মহামনুষ্যলোকে সে এক দুর্বারণ ডাক। এক দুঃসাধ্য প্রলোভন।' যে সর্ম্পকের মাঝে নীতিবোধ বিসর্জিত হয় তা কোন শুভ লক্ষণ বয়ে আনতে পারে না। যে জীবনতৃষ্ণা বিবেকের বাণীকে অগ্রাহ্য করে সে বোধে পাপের অবস্থান অনিবার্য। বিবেককে যে অনুভূতি পীড়িত করে সেই তো পাপবোধ। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝে সেই পাপ নামক রিপুর যে জয়গান গীত হলো সেটা তো পবিত্রতার

পরিচায়ক হতে পারে না। ‘শেষ শৃঙ্গে উঠেছে অমিতাভ। এর পরেই শূন্য’ সত্যের পথ পিছলে যেতে পারে ভেবে তারপরও তার নির্লজ্জ উচ্চারণ ‘আমাকে টেনেছে। ডেকেছে, পথ ফুল-মসৃণ করে দিয়েছে, তাই গিয়েছি। এখন যদি আর না ফিরি তো না ফিরব।’ (এ.এ.গ./৩৩৭) অন্ধকারের পথ বরাবরই মসৃণ আর পিচ্ছিল হয়। সে পথে একবার পা বাড়ালে ফিরে আসা খুব শক্ত কাজ। আবেগের উত্তেজনায় হরবিলাসের বউ এর কাছে যাবার জন্য অসাবধানবশত পায়ের জুতো ফেলে চলে এসেছে। তার ‘মনে হল মন্দিরে উঠেছে, এখানে মানাবে না জুতো। পাপের রমনীয় মন্দির। হরবিলাসের বউ যখন চাপা গলায় বলল ‘জুতো’- তখন অমিতাভের বোধোদয় ঘটল সত্যিই তো জুতোয় সে পাপের প্রমাণ থাকলো। অবশেষে জুতো আর তোলা হয় না। আবেগ আর বিবেকের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত বিবেকের জয় লাভের কারণে আর উপরে ফিরে যাওয়া হয়না অমিতাভের। সুস্থ ও পবিত্র জীবনভাবনার কাছে পাপবোধের পরজয় ঘটে।

মনস্তাত্বিক জটিলতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত নৈতিক ও অনৈতিকতার দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি রূপায়িত হয়েছে ‘পাপ’ গল্পটিতে। এখানে লেখক শুদ্ধ শুভবোধের কাছে অশুভ নীতিহীনতার শোচনীয় পরাজয়ের দিকটি স্বচ্ছ করার প্রয়াস পেয়েছেন। মানবিক জীবনস্পন্দনে, বিবেকের শাসন এড়িয়ে অশুভচিন্তা মানুষের হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করতে পারে, সামগ্রিক ব্যক্তিত্বিবোধকে বিপর্যস্ত করতে পারে নিমিষেই। তবুও মানুষ অর্ন্তদ্বন্দ্বে পরাস্ত হয়ে ছুটে চলে অনৈতিকতার মোহে মোহাবিষ্ট হয়ে অন্ধ হতে। আবার বিবেকবোধে তাড়িত হয়ে চৈতন্যোদয় হলে ফিরে আসে নিজের ফেলে আসা চিরচেনা শান্তি ও প্রশান্তিময় স্থান নিজ ঠিকানায়। মানুষের অন্তর্জগতে শুভ ও অশুভ, নৈতিক ও অনৈতিক, পাপ ও পুণ্যের চিরকলহ বিদ্যমান। সেখানে বিবেক শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সঠিক পথ দেখিয়ে দিলেও অবাধ্যছাত্রের মত মন সব সময় সে দিক নির্দেশনা মেনে নেয় না। তখনই শুরু হয় রক্তাক্ত যুদ্ধ। আর এ যুদ্ধে পরাভূত হয় কখনো শুভআত্মা আবার কখনো অশুভআত্মা। ‘পাপ’ গল্পে দেখা যায় অশুদ্ধ চেতনার জয় হতে গিয়েও বিবেকের ভীষণ দংশনে আহত অমিতাভ ফিরে আসে শুদ্ধচেতনার জয় জয়কার করে। প্রকৃতির রহস্যময় লীলায় জীবনসীমার সামগ্রিকতায় সঞ্চারিত হয় অমলিন স্নিগ্ধবোধ।

প্রতিবেশী হরবিলাসের বউ এর প্রতি তীব্র আসক্তি অমিতাভের। সে বউ এর কোন নাম নেই, কারণ সে পরস্ত্রী। তার মোহনীয় সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে এভাবে– ‘ঘোমটা–ঢাকা মুখে দু-একবার পড়ে গিয়েছিল কাছাকাছি। তারই মধ্যে এক পলকের জন্যে হলেও চোখ দুটি রেখেছিল ঠিক চোখের উপর। হৃদয়ের মধ্যেই যে অতল সাগর তা ঐ চোখ দেখলেই বুঝি বোঝা যায়। কৃষ্ণায়ত, কটাক্ষগর্ভ চোখ। কিছু বলে না ধরে ফেলে, কিছু চায় না নিয়ে নেয়, কিছু দেয় না দেবার আগেই পেয়ে গেছে বলে হাসে! লালরঙের শাড়ি আর গায়ের জামাটা বুঝি সবুজ। একটু সাজগোজ করেছে। লাল হচ্ছে ভয়, সবুজ হচ্ছে নিমন্ত্রণ। ভয়ের নিমন্ত্রণ। আবার হাতে আগুন। এ কি আশ্বাস না সর্বনাশের ভস্মশেষ!’ (এ.এ.গ./৩৩৫) অধরা সৌন্দর্যের আহ্বানে অভিভূত অমিতাভ বিবেকের নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে অনির্বচনীয় মুগ্ধতার অবগাহনে উদ্যত। পবিত্র জীবনবাসনাকে এতটুকু মূল্য না দিয়ে

উন্মত্তের মত ছুটে চলা। অমিতাভ নিজেকে শাসিত করতে পারে না কিছুতেই, মনপ্রাণ এক নিঃসীম আনন্দের শিখরে স্থিতি লাভ করায় সে স্বজগতে প্রত্যাবর্তন করতে পারে না। অনিবার্য আহ্বানকে অগ্রাহ্য করতে ব্যর্থ অমিতাভের মনোজগতে দ্বান্দ্বিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। লেখকের বর্ণনায়– 'কি দুর্দান্ত উজ্জ্বলন্ত সাহস! মৃদু মৃদু হাতছানি দিয়ে ডাকছে।...এ কে ডাকছে? যেন ডাকছে কোন নির্জন সমুদ্র তীর, নিষ্প্রবেশ অরণ্য, গহন গিরিগুহা। যেমন রক্তকে ডাকে ছুরি, মাটিকে ডাকে ভাঙনের নদী, ফলের নিগূঢ় রসকে ডাকে সূর্য। শোন, যেয়ো না। বিচার করে দেখ তুমি কে। তুমি এ মহকুমার সেকেণ্ড অফিসার। কত বড় সম্মানের, দায়িত্বের পদে বসে আছ। যদি জানাজানি হয়ে যায়, কান কাটা যাবে। সমাজ-সংসারে মুখ দেখাতে পারবে না। স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-পরিজনের মুখ ছোট করে দেবে। শুধু তাই নয়, চাকরি চলে যাবে। তারও চেয়ে বেশি, জেল হয়ে যাবে। শোন, বিচার করে দেখ।' (এ.এ.গ./৩৩৫)

কিন্তু যে হৃদয় অন্যাসক্ত, অধরা প্রেমের প্রতি অনুরক্ত, সে কীভাবে বিচার করবে? সে তো কলুষ নিষ্কলুষতার পার্থক্য নিরূপণে ব্যর্থ। বিবেকের নিষেধের ক্ষেত্রে সে বিদ্রূপ আর তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বিচারের কার্যকারিতার অসাড়তা প্রমাণ করতে উন্মুখ। সে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে 'বিচার থাকে না। বিচার পচে যায়। যে রসময় গৃহীকে সন্ন্যাসী হতে ডাকে তারও এই ডাক। এই হাতছানি। বীরকে ডাকে ফাঁসি কাঠে প্রাণ দিতে, রাজার ছেলেকে চীরবাস পরতে, বিষয়ীকে পথের ভিক্ষুক হতে। সেও এই ডাক। এই হাতছানি। ভগবান! ভূমা! পাপ! পরস্ত্রী। একই সেই দুর্নিবার আকর্ষণ। একই সেই দুর্মোচ্য রহস্য। একই সেই ভীষণ সুন্দরের ডাক।' (এ.এ.গ./৩৩৫)

আবার দোদুল্যমান মন অনিশ্চিত প্রেম-সৌন্দর্যের প্রতি ধাবিত হয়েও চিরকালীন শুদ্ধ মূল্যবোধকে অস্বীকার করতে পারে না। আর তাইতো প্রত্যাবর্তন করে প্রদীপ্ত বিবেকের নৈতিকতার দোরগোড়ায়। ভাবে 'বিচার করবে না তো, বিদ্যাবুদ্ধি কিসের জন্য? আত্মসংযম করতে পারবে বলেই তো যুক্তি-তর্ক, শাস্ত্র-পাণ্ডিত্য। অন্তত আইনকানুন। শোন, লেখাপড়া শিখেছ বলেই সমাজ তোমাকে আরও বেশি দায়ী করবে, দোষী করবে। মৃত্যুকে কে দমন করতে পারে? কে দমন করবে অপ্রতিরোধ্যকে? (এ.এ.গ./৩৩৬)

শুদ্ধ নীতিবোধের কাছে পরাজয় মেনে চঞ্চল মানবমন কুহেলিকা প্রেয়সীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ব্যাকুল হয়ে যায়। নীতিহীন অপ্রতিরোধ্য আহ্বান জীবনাশাকে বিপর্যস্ত করে দেয়। অলঙ্ঘনীয় সে দুর্নিবার আকর্ষণ। মানবচিত্তের শুদ্ধাশুদ্ধিকে দ্বিধাগ্রস্থ করে তোলে অন্তর্যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট অমিতাভের আত্মোপলব্ধি– 'কেউ ভাবেনি। আগুনে দগ্ধ করেছে। শূলে বিদ্ধ করেছে, কুঠারে ছিন্ন করেছে! কেউ ফিরে তাকায় নি। সে মহা মহিমের ডাক এসে পৌঁছলে কেউ পারেনি হিসেব মেলাতে। সে জীবনসর্বস্বের কাছে বিসর্জন দিয়েছে সব প্রিয়বস্তু। কিন্তু এ একটা কে!

মানি না, চিনি না। কেউ জানে না, কেউ চেনে না। শুধু এইটুকু জানি সে ডাকে। মহামনুষ্যলোকে সে এক দুর্বারণ ডাক। এক দুঃসাধ্য প্রলোভন।' (এ.এ.গ./৩৩৬)

সংযম আত্মশক্তির প্রধান অলঙ্কার। শুচিস্নিগ্ধ নৈতিকতায় যখন কালির প্রলেপ পড়ে তখন সেখানে শুদ্ধতার আত্মহনন সংঘটিত হয়। অনৈতিক সম্পর্কের প্রথম দর্শনে তাইতো মৃত্যুর প্রচ্ছন্ন ছায়া মিশ্রিত বিচিত্র অনুভূতির স্বগতোক্তি– 'যদি কাছে গিয়ে পড়ি, কী না জানি কথা বলবে প্রথম সম্ভাষণে! যখন গলা জড়িয়ে ধরে পরিপূর্ণ মমতায়, কী বলে ডাকে, কী কথাটি প্রথম উচ্চারণ করে! না কি কিছুই বলে না! না কি নিবিড় চুম্বনে রক্তিম অধর শুধু পাণ্ডু করে দেয়।' (এ. এ.গ./৩৩৬)

নিজের মনকে ছলনায় প্রলুব্ধ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায় অমিতাভের মধ্যে। বিচক্ষণ, যুক্তিবাদী সর্বোপরি বিচারক হওয়া সত্ত্বেও আসক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তি মেলে না কিছুতেই। ঘূর্ণায়মান আবর্তে ঘুর্ণনরত হৃদয়ের দিশাহারা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের মনকে প্রবোধ দেয় –'তবে এক কাজ করো। ধীরে ধীরে এগোও। ভাবখানা দেখাও হাওয়া খেতে বেরিয়েছ। এমনি দেখতে পেলে হঠাৎ খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রমহিলা, যেন কি সাহায্যের আশায়, তুমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করতে গেলে, কি ব্যাপার? শুধু এই একটু অভিনয়। তার মানে, একটু কথা কয়ে নিলে বাইরে থেকে। বুঝতে পেলে পরিবেশটা। যদি বুঝলে নিরাপদ, ঢুকলে। যদি বুঝলে গোলমাল আছে, কেটে পড়লে।' (এ.এ.গ./৩৩৬)

রোমাঞ্চে রোমাঞ্চিত হয়ে অস্থিরতায় উন্মুখ হয়ে নিবিড় মোহে আচ্ছন্ন হয়ে মরীচিকার পেছনে ছুটে চলা অমিতাভ চৈতন্যের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে পারে না কিছুতেই। তার জীবনাগ্রহে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে পরস্ত্রী হরবিলাসের বউ এর দুরতিক্রম্য আহ্বান। বিধিনিষেধের জাল ছিন্নকারী এই আহ্বানকে অমিতাভের পক্ষে উপেক্ষা করা দুরূহ বিষয়। আর একারণেই আকুল করা হৃদয় মথিত এই আহ্বানের জন্য ব্যাকুল অমিতাভের নিজের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ–'তোমার দ্বিধাকে বলিহারি। ঝাঁপ দিয়ে পড়ব। তীর যেমন লক্ষ্যের দিকে ছোটে তেমনি ছুটব। শরবৎ তন্ময় হব। বেগ না থাকলে রোমাঞ্চ কি? সহসা-অভাবনীয়কে নেব বুক ভরে। বিপদ না থাকলে কী সুখ সুখ পেয়ে! তাই দ্বিধা করবার সময় দেব না। সেই উৎফুল্ল পুলকোচ্ছ্বাস নেব অপরিমান অসঙ্কোচে। জীবন ফুরিয়ে যাচ্ছে সেই ত্বরায়। হয়ত এমন রাত আর আসবে না। এমন ডাক আর শুনব না জীবনে।' রোমাঞ্চিত পুলকিত অমিতাভ ভাবাবেগের আতিশয্যে ভাবে 'হ্যাঁ আলোটা জাগা থাক। ঘরে ফিরিয়ে আনা নিরাপদ আশ্বাসের মত। আর যদি সব যায় তো যাক। আমি তো জোর করে যাইনি গায়ে পড়ে। আমাকে টেনেছে। ডেকেছে, পথ ফুল-মসৃণ করে দিয়েছে, তাই গিয়েছি। এখন যদি আর না ফিরি তো না ফিরব।' (এ.এ.গ./৩৩৬-৩৩৭)

'পাপ' গল্পটিতে উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী তে অবলোকন করা কিছু উদ্ধৃতি অমিতাভের জীবনচেতনায় সংযোজিত করেছে অপরূপ ব্যঞ্জনা। যেমন–

ক. মানুষ ছাড়তে চাইলেও মহাশক্তি তাকে ছাড়েনি। যেমন আকাশে আছে তেমনি আবার বাসা নিয়েছে তার ক্ষুদ্র বুকের মধ্যে। অন্ধ, তবু দেখছে। বোবা, তবু কথা কইছে।' (এ.এ.গ./৩৩৩)

খ. মহাশক্তি নয় তো কি? মহাশক্তি না হলে এমন পরিবেশ তৈরি হয়? চারদিক থেকে আসে এমন নি:সঙ্গ সুন্দরমুহূর্ত? এমন কোমল আনুকূল্য?' (এ.এ.গ./৩৩৫)

গ. 'নিজের থেকেই দরজা খুলে দিয়েছে আধখানা। নিজেকে আধখানা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে অনন্তের ছায়ামূর্তি হয়ে।' (এ.এ.গ./৩৩৬)

ঘ. 'শেষ শৃঙ্গে উঠেছে অমিতাভ। এর পরেই শূন্য।' (এ.এ.গ./৩৩৭)

ঙ. 'মনে হল কে যেন সবলে তার গায়ের উপর জুতো ছুঁড়ে মেরেছে। সে হরবিলাসের বউ না আর কেউ?' (এ.এ.গ/৩৩৭)

অমিতাভের অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় নির্মল ও পবিত্রচেতনার। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে, মানুষের জীবনবৈশিষ্ট্যে অনৈতিকতা খুব বেশিক্ষণ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। চিরন্তন কল্যাণবোধের জয় সুনিশ্চিত হয়। স্বামীর অবর্তমানে পরস্ত্রীর মোহনীয় হাতছানিতে চঞ্চল অমিতাভ বিবেকের শুভ্রতাকে পরাস্ত করে পাপবোধের দৃশ্যমান প্রতীক জুতো পরে হরবিলাসের বউ এর অভিমুখী হয়। যেখানে যাওয়ার প্রমাণ স্বরূপ জুতো খুলতে ভুলে যায় সে। যখন আবার জুতো লুকিয়ে রাখতে নিচে যায় তখন আর ফেরা হয় না তার 'পাপের রমণীয় মন্দিরে'। বিবেকের তীব্র কষাঘাতে, আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি পেতে ছুটে চলে আসে নিজের পরিত্যক্ত বিছানায়। পবিত্র জীবন অনুভবের শুভ্র মঙ্গলমন্ত্রে আলোকিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে নিজের ঘরে। আর এভাবেই অমিতাভের নির্মল অনুভূতির উজ্জ্বল আলোর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয় কোমল চৈতন্যবোধ ও নিষ্কলঙ্ক জীবনবোধ। পরকীয়া আসক্তি জীবনচেতনাকে সমৃদ্ধ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে পারে না। তার বাস্তব রূপায়ণ 'পাপ' গল্পে দেখা যায়। অপবিত্র প্রেমবোধ জীবনের পরিমণ্ডলকে যেমন কলুষিত করে তেমনি হৃদয়কে করে তোলে ভঙ্গুর, কদর্যময়। আর তাই শাশ্বত সুন্দরের প্রতি অমোঘ টানে বারবার ফিরে আসতে হয় অপার্থিব সুশৃঙ্খল জীবনবোধে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাৎসল্যচেতনা

সন্তান-বাৎসল্য অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পের বিষয়-প্রকরণকে পূর্ণতার প্রাচুর্যে ভরে তুলেছেন। মাতৃহৃদয়ে সন্তান বাৎসল্যে যে চিরন্তন মাতৃত্ব ও মানবতা অঙ্কুরিত হয় তা যেন ছায়াময়ী বৃক্ষ হয়ে চারপাশে পল্লবিত হয়। পরিলক্ষিত হয় মাতৃমুখে পরিতৃপ্তির আভা, কোমল স্নিগ্ধতা আর দয়া সঞ্চারকারী এক নিবিড় উষ্ণতা। শুধু মাতৃহৃদয়ে নয়, পিতৃহৃদয়েও নিঃশব্দে প্রবাহিত হয় স্নেহের এই স্রোতধারা। ছোটগল্পের মধ্যে বাৎসল্যচেতনাকে তিনি সূক্ষ্ম জীবনবোধ ও শিল্পদৃষ্টি দিয়ে এঁকেছেন পরম মমতাভরে। এই বোধ যেখানে উজ্জ্বল, সুস্নিগ্ধ সৌরভ সেখানে চিরবিরাজিত।

'হুইসল' গল্পে মাতৃস্বরূপা ঊষার মনস্তাত্ত্বিক সংকট রূপায়িত। একদিকে প্রেমের নিটোল অনুভূতি অন্যদিকে ভাই বোনের প্রতি দায়িত্ব ও কতর্ব্যবোধ ঊষাকে এক স্বতন্ত্র অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কিশোরী মনে প্রেমের স্বাভাবিক আগমন কীভাবে গৌণ হয়ে যায় মাতৃত্বচেতনার কাছে তা এক বিস্ময়কর বিষয়। মাতৃহীনা জীবনে পিতার স্নেহহীন সংসারে অপূর্বর আর্বিভাব তাকে মুহূর্তে অন্য জীবনের সন্ধান দেয়। 'তার চোখের সামনে ছোট, পরিচ্ছন্ন একটি সংসার-নিকেতনের ছবি উঠল ভেসে। সেখানে সে সর্বময়ী কর্ত্রী, তার কিনা অপূর্বর মত স্বামী'। কিছুটা ভাববিহ্বলতায় কিছুটা আবেগ-রোমাঞ্চে ঊষা অন্য জগতে বিচরণ করে। কিন্তু মাতৃত্ববোধের পিছুটান তাকে সন্তানতুল্য ভাইবোনের মুখোমুখি করায়। মধ্যবিত্ত জীবনবোধের এই মনস্তাত্ত্বিক সংকট তাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে। সে প্রেমের অনুভূতি অনুভব করার আগেই মাতৃত্ববোধ পথ আগলে দাঁড়ায়। 'বিমূঢ় চোখে চেয়ে থেকে বুড়ি নিস্প্রাণ গলায় বললে, - কে, ছনু কেঁদে উঠল না?' অপূর্বর সাথে চলে যাওয়ার আগে সে চিন্তা করে, সকালে উঠে ওরা কী খাবে, লণ্ঠনটা শুধু শুধু জ্বলছে, মশারি টাঙ্গানো হয়নি ইত্যাদি বিবিধ বিষয়। তার এই পিছুটান প্রেমের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে যেতে পারেনি ভালোবাসার মানুষের কাছে। তবে তার বিবেকবোধ, তার জীবনবোধ তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে অবুঝ ভাই বোনের মাঝে, যা সে উপেক্ষা করতে চায়নি বরং সেটিই ছিল তার আকাঙ্ক্ষিত অধ্যায়। প্রেমের গল্পগুলোর মধ্যে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, চরিত্রগুলোর মধ্যে পুরুষ চরিত্রের চেয়ে নারী চরিত্রের দৃঢ়তা অনেক বেশি। সে কারণেই নারী চরিত্রের জীবনবোধে যুক্ত হয়েছে অসামান্য প্রেমদ্যুতি। সেই দ্যুতিতে ভাস্বর নারীরা প্রেমের নিটোল আভায় পরিপূর্ণ অবস্থানে অবস্থিত। কোন বিত্তের বেড়াজালে বন্দী হয়ে নয় বরং বিত্ত বর্হিভূত প্রেমের অনির্বচনীয় শিখা তাদের দীপ্তিময় করে তুলেছে, করেছে স্বমহিমায় মহিমান্বিত।

মাতৃহীন একটি সংসার স্নেহ ও শৃঙ্খলার অভাবে ছন্নছাড়া হয়ে যায়। আর এমনি এক উদাসী, নিষ্করুণ আর গভীর রাতে ঘরে ফেরা স্নেহহীন পিতার মাতৃহীন সংসারে বড়মেয়ে ঊষা অধিষ্ঠিত হয় মাতৃস্বরূপা হয়ে। সন্তানদের প্রতি স্নেহবিমুখ জন্মদাতা রতিকান্ত প্রকৃতপক্ষে বাবা হতে পারেন নি। তিনি মাতৃহীন সংসারকে নিজের স্নেহ শীতল ছায়া দিয়ে পারতেন আগলে রাখতে। অথচ তিনি তা না করে তাদের প্রতি হয়েছেন সীমাহীন রূঢ়। আর ঠিক সেই সময়ে ঊষা মাতৃরূপিনী হয়ে ছনু আর সাবির দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় ঐটুকু ছোট বয়সে। সংসারের

মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে দুটি ছোট ভাইবোনকে কোলে পিঠে করে ধীরে ধীরে বড় করে তোলে। কখন যে ছোট্ট ঊষা বড় হয়ে গেল তা বোঝা যায় অপূর্বর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। তার কাছে অপূর্বকে মনে হয়-'প্রচণ্ড শীতের রোদে সে কুড়িয়ে পেয়েছে একটি আগুনের কণা-তাকেই সে আঁচলের আড়ালে বাঁচিয়ে রাখবে, জীবনে যা দেবে তাপ, আলো, আনন্দ। সমস্ত শরীর তার সেই আগুনে উঠল ঝলমল করে।' (প্রে. গ./১৮৬) অপরিণত বয়সে সংসারের কঠিন হাল বইতে বইতে প্রচ্ছন্ন ক্লান্তিতে ঊষা যখন পরিশ্রান্ত তখন 'পরিচ্ছন্ন একটি সংসার নিকেতনের ছবি' তার চোখে স্বপ্নের মায়াজাল বোনে। মনে হয় 'মানুষের জীবনে এমন সুযোগ অনেক আসে না।' কিন্তু নিজের সুখের চেয়ে সে বড় সুখ এই ছোট্ট ভাইবোনদের সংসার। নিজে স্বার্থপরের মত সুখ বেছে নিয়ে সে পারবে না অনাথ ভাইবোনদের অকূল পাথারে ভাসিয়ে দিতে। আর তাইতো 'প্রথম রাতটা বুড়ির স্বপ্নে কাটল বিভোর হয়ে, কিন্তু আজ সন্ধ্যা থেকেই তার চারপাশে ঘনিয়ে উঠছে অজানা অন্ধকার। দিনের বেলায় দ্রুত, উচ্চকিত পদক্ষেপগুলি ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে এল, সর্বাঙ্গে জড়িয়ে গেল কুণ্ঠার কুয়াশা। অন্ধকারে সত্য যে আরো স্পষ্ট, আরো উলঙ্গ হয়ে উঠল-দিনের আলোয় যা ছিল স্বপ্নে রঙিন, অনুভবে প্রচ্ছন্ন-এখন যেন সেই চেতনাটা তার বুকে এসে আঘাতের মতো লাগছে।' (প্রে.গ./১৮৬)

রাত্রির আগমনে ধীরে ধীরে স্বপ্ন ধূসর হতে থাকে। সকাল বেলার রঙিন স্বপ্ন অন্ধকারে মলিন হয়ে যায়। দিনের বেলায় বিচ্ছিন্ন স্বজন রাতে একত্র হতে থাকে। সার্বক্ষণিক দায়িত্ব আরো কেন্দ্রীভূত হয়। মমতায় ঘেরা পরিজন স্নেহের নৈকট্য লাভ করে। পরার্থপরতার এই যে স্বাক্ষর তাতে কি স্বার্থপরতা স্থান পায়? না পায় না। আর প্রায় না বলে নিজের স্বার্থসুখকে জলাঞ্জলি দিয়ে অবচেতন মনে লালিত স্বপ্নপুরুষ অপূর্বর সাথে পালিয়ে যেতে পারে না। স্নেহময় মমতাময় জীবনবোধ পথ আগলে দাঁড়ায় ব্যক্তিসুখের। অনাথ শিশুদের একা করে, তাদের সমস্ত নির্ভাবনা হরণ করে সে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। তাই পিছুটান বারবার থেকে থেকে তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। লেখক সে পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন -'অন্ধকারে সমস্ত পৃথিবী যেন নিরাশ্রয় শূন্যচারী একটা বিন্দুর মতো দুলতে লাগল। অপূর্বর আকর্ষণের মাঝে হাত শিথিলতর করে দিয়ে ম্লান গলায় বুড়ি বললে, - কিন্তু দরজাটা যে খোলা রইলো-

থাক খোলা, কয়েদি যখন পালায় তখন বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে পালায় না। তাড়াতাড়ি চলো, স্টেশনের এই এক পা পথ পেরিয়ে গেলেই আমরা নতুন মানুষ।

-কিন্তু, বুড়ির হাতের পাঁচটি আঙুল কাকুতি করে উঠলো: লণ্ঠনটা শুধু শুধু জ্বলবে,ওটা নিবিয়ে দিয়ে আসি।

জ্বলুক না। তুমি চলে এসো।

-এখুনি কী? আরেকটু দাঁড়াও। কী মনে করে বুড়ি মুহূর্তের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ালো: কাল সকালে উঠে ওরা কী খাবে কিছুই যে এখনো বন্দোবস্ত করে রাখিনি।

কাল কোরো। এখন তুমি চলো।

–দাঁড়াও, আর এক সেকেন্ড। ওদের মশারিটা একবারটি টাঙিয়ে দিয়ে আসি।' (প্রে.গ./১৮৯)

অবশেষে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন জীবনবোধ মমতার কাছে হার মানল ঊষা। স্নেহময়ী ঊষা যে হৃদয়ে অপূর্বর জন্য ভালবাসা সঞ্চয় করে রেখেছিল সে হৃদয়স্থান যে আগে থেকেই পূর্ণ সন্তানতুল্য ভাইবোনদের প্রতি কর্তব্যবোধে তা বুঝতে হয়তো একটু দেরীই হয়েছিল ঊষার। যখন বুঝতে পারল তখন 'অপূর্ব প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে গেছে, গাড়ি দাঁড় করিয়েছে হয়তো। অন্ধকারে এ বাড়ির দিকে সংকেত করে হাতছানি দিচ্ছে ঘন ঘন। কিন্তু সেই ডাক অনুসরণ করে পথ ভুলে বুড়ি চলে এসেছে ঘরের মধ্যে। তার ছনুর বিছানায়।' (প্রে.গ./১৯০)

হুইসল অর্থাৎ বাঁশির সুর হলো আহ্বানের সুর। সেই সুরে উদ্বেলিত হয় হৃদয়বোধ, জীবনবোধ আর কর্তব্যবোধ। এই কর্তব্যবোধের সঙ্গে যখন হৃদয়বোধ একত্র হয় তখন জীবনবোধ হয় পরিপূর্ণ। আর এই পরিপূর্ণ জীবনবোধই পৌঁছে নিয়ে গেছে তাকে মায়াময় কুটিরের একান্ত নির্জন দ্বারে। যেখানে ছনু আর সাবি নামের সন্তানতুল্য ভাইবোনদের কাছ থেকে মাতৃরূপী উষাকে কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

অচিন্ত্যকুমারের চরিত্রচিত্রণে রয়েছে দরদ ও ভাবাবেগের প্রাচুর্য, রয়েছে অপূর্ব শিল্পনৈপূন্য। 'হুইসল' গল্পে সবচেয়ে আকর্ষণ তার কোমল ভাষারূপ। গল্পের উপস্থাপনা ও বিন্যাস, ভাষারীতি ও সমাপ্তি - সবটা মিলিয়ে এক অখণ্ড শিল্পরূপ। বাংলা ছোটগল্পের জীবনবৈচিত্র্য আর মননশীল উৎকর্ষ দেখাতে হলে এই গল্পটির উল্লেখ অনিবার্য। জীবনের প্রতি ও মানুষের প্রতি ভালবাসার অঙ্গীকার তাঁর ছোট গল্পের জগতকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই ভালবাসার বিচিত্ররূপ তাঁর গল্পে উদ্ভাসিত। স্নেহময়ী ঊষা তাঁর ভালবাসার স্রোতধারায় সন্তানসম ভাইবোনদের নিয়ে অবগাহন করে পরিতৃপ্ত। গর্ভধারিণী মা-ই শুধু সবক্ষমতার আধার নয়, মায়া ও ভালবাসা দিয়ে আগলে রাখা বড় বোনও যে মাতৃত্বের সিংহাসনে অধিষ্ঠাত্রী হতে পারে-এ জীবনচেতনাই অচিন্ত্যকুমার মনেপ্রাণে ধারন করেছেন 'হুইসল' গল্পে। এখানে নরনারীর ভালোবাসার বিকাশ সাধিত হয়নি। বিকশিত হয়েছে মানব প্রেমের পরিবর্তে মাতৃপ্রেম। ছোট ভাই বোনকে সন্তানতুল্য মনে করে বড় বোন কীভাবে মাতৃস্থানীয় হয়ে ওঠে সেটাই এখানে প্রতীয়মান হয়েছে। এ গল্পের একটি অভিনব দিক হল প্রেমচেতনার স্নেহচেতনায় রূপান্তরিত হওয়া। মমত্ববোধ, কর্তব্যবোধ ও দায়িত্ববোধ কীভাবে প্রেমাসক্তির প্রাবল্যকে নিস্তরঙ্গ করে দেয় তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ এ গল্পটি। মমতাময়ী রূপের এই অনন্য বৈশিষ্ট্য উষাকে সবার চেয়ে ভিন্ন অবস্থানে অধিষ্ঠিত করে। এ গল্পের কাহিনী বিন্যাস. প্লট নির্মাণ ও চরিত্র চিত্রণ লেখকের অত্যুজ্জ্বল দক্ষতার স্বাক্ষর বহন করে।

মাতৃত্ব প্রেষণা কেমন করে একটি নারীর জীবনকে আমূল পাল্টে দেয় তারই প্রামাণ্য রূপ 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে' গল্পগ্রন্থের **'একরাত্রি'** গল্পটি। মাতৃহীন অসুস্থ বালক শোভন সুজাতার প্রতি মাতৃজ্ঞানে অন্ধ, তাকে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে। অথচ এই সুজাতারই নির্মম ব্যবহারে ব্যথিত শোভন নিজেকে অসহায় ও বিপন্ন বোধ করে। হাতের স্পর্শ, মুখের কথায় শোভন অনুভব করে 'মা' অন্য ধরনের অনুভূতি, স্নেহময়, মমতাময়, আশ্রয়ময়। যদিও নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গী করে থাকা শোভন কাউকে বুঝতে দেয় না যে, সে ভীষণ একাকী। বিবাহপূর্ব

সম্পর্কের প্রতি সুজাতার প্রবল আসক্তি না থাকলেও মোহ যে আছে সেটা অবলীলায় বলা যায়। ইন্দ্রনীলের সাথে সুজাতার সময় কাটে কল্পনার আবেগময়তায়, সেখানে প্রিয়ব্রত ও শোভন উপেক্ষিত নয় বরং তাদের অবস্থান অগোচরে। প্রেমের বিরহকাতর জীবন নয়, তারচেয়ে ঢের বেশি প্রিয় সুজাতার বর্তমান জীবন। কারণ, সেখানে আশা আছে, স্বপ্ন আছে। গর্ভধারিণী না হয়েও পরের ছেলের মমতার কাছে পরাজিত হয় সুজাতা। কর্তব্যের প্রয়োজনে নয় মাতৃত্বের প্রেষণায় সুজাতা অনুভব করে আপন মাতৃত্ববোধ। যে সন্তান মায়ের সম্মান বাঁচায়, মাকে সামাজিক অপরাধের হাত থেকে বাঁচায় সে- ই তো প্রকৃত সন্তান। সুজাতা উপলব্ধি করে মাতৃত্বের চিরায়ত মমতা, অপরিসীম ভালোবাসা। মাতৃত্বের অনুরণনে ঝংকৃত 'একমাত্র' গল্পটিতে তাই দেখা যায়, শোভনকে একমাত্র ভেবে বুকের মধ্যে আশ্রয় দিতে একমুহূর্ত দেরি হয় না সুজাতার।

ব্যতিক্রমী ভালোবাসার এ গল্পের শুরুতেই দেখা যায় মা ছেলের কথোপকথনে নানা বিষয়ের আবির্ভাব। সেখানে ছেলে ভোলানো গল্প দিয়ে এক মা তার রুগ্ন সন্তানের মানসিক পরিতৃপ্তি সাধন করছেন। কিন্তু তার মধ্যেও লক্ষ করা যায় তাদের অন্তরঙ্গতার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ব্যবধান। বিমাতা সুজাতার ভেতর ছেলে শোভন কেন যেন মমতাময়ী মাকে সম্পূর্ণ খুঁজে পায়না। কেন যেন 'মনে হয় কী যেন এক অদৃশ্য ব্যবধান শুয়ে আছে তার আর মা'র মধ্যে। কিছুতেই যেন মা'র বুকের মধ্যে, মা'র কোলের মধ্যে ডুবে যেতে পারে না। আগে-আগের কথা মনে নেই, খুব শিশুকালের কথাও, কিন্তু যতদূর মনে করতে পারে, সবল-সমর্থ হবার পর থেকে মা আর তাকে টেনে নেয়নি বুকের মধ্যে! যেন কোনদিনই নেয়নি। হাত বাড়াতে গেলে বলেছে, তুমি এখন দিব্যি বড় হয়ে উঠেছ না?' (স্বা.স্বা.প.প./১০৭)

ছোট্ট রোগগ্রস্ত শিশু শোভন তাই কখনো নিজের অস্তিত্বে মায়ের স্নেহকে আবিষ্কার করতে পারে না। ও চায় মা তার কাছে থাকুক। তার পাশ ঘেঁষে শুয়ে থাকুক। কিন্তু সুজাতা বিমাতা বলে কঠিন রুক্ষ স্বরে ধমকে ওঠে। বলে, 'ডাক্তার বলে গেছে বেশিক্ষণ ঘুমাতে, তা একটু পরে পরেই জেগে ওঠা। অবাধ্য ছেলে, মন্দ ছেলে, বাজে ছেলে, নিজে শুধু ভুগছে না, সবাইকে জ্বালিয়ে মারছে। আমার কি আর কাজকর্ম নেই, আমার কি আর আশপাশের ঘর থাকবে না?' (স্বাদু স্বাদু পদে পদে ১১৫ পৃ) অসহায় শোভন স্নেহময়ী মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষায় দুঃসহ যন্ত্রণার কষ্ট বুকে নিয়ে থাকে। তার মনে হয় 'মা যখন বকে তখন কী নির্মমের মত বকে। তখনই মনে হয় মা'র বুক যেন পাথরবাধা, কোল যেন বিদেশ। এখন অসুখে পড়া বলে না হয় মারে না, ভালো-থাকা অবস্থায় কত দিন মেরেছে কথা না শুনলে। তখন মনে হয়েছে সে যেন আর কেউ। পরের পর, দূরের দূর। ইচ্ছে করছে চলে যাই আর কোথাও।' (স্বা.স্বা.প.প./১১৫)

আর সুজাতারও জীবনভাবনায় তৈরি হয় নানা জটিলতা। পূর্ব প্রেমিক ইন্দ্রনীলের সঙ্গে লুকিয়ে কথা বলা, নিজের সন্তান না হওয়া, বড় হয়ে শোভন তাকে আশ্রিত মনে করে কিনা এই বিষয়গুলো নানা অস্থিরতা তৈরি করছে তার নিজের জগতে। নিজের অস্তিত্বের সংকটে মনস্তাত্ত্বিক দুর্ভাবনায় বিহ্বল সুজাতা মগ্ন হয়ে থাকে

আপন মনে। সে ভাবে 'যত বড় হবে ততই দূরে চলে যাবে শোভন। ততই স্পষ্টতর করে বুঝতে শিখবে সে তারপর, তার নিঃসম্পর্কের। একটি উদাসীন সম্ভ্রম দিলেও দিতে পারে বা- ক্রমে ক্রমে সেটা ঠাণ্ডা অবহেলায় এসে দাড়াঁবে। তারপর প্রিয়ব্রত যদি তার আগে মরে, যতই কেন না সে রেখে যাক দিয়ে যাক, ছেলের সামনে সুজাতাকে মনে হবে অনধিকারিনী, যেন ভিখারিনী হয়ে রাজ্য জুড়ে বসেছে। কে জানে হয়তো মামলা হবে শোভনের সঙ্গে। আর সে এমন মামলা নয় সে সুজাতা ছেড়ে দেবে। দুজনেই লড়বে নখে দাঁতে।' (স্বা.স্বা.প.প./১১৮)

মা ছেলের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক অনুপস্থিত বলে সুজাতা স্বীয় অধিকার সংকটে ভুগেছে প্রতিনিয়ত। মনস্তাত্ত্বিক দোদুল্যমানতা তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বামী সন্তান বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পূর্বপ্রেমিক ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আলাপচারিতায় এই দিকটি স্পষ্ট। 'আমাদের ভালোবাসা আমাদের সেদিন বিয়ের ঘাটে পৌঁছে দেবার আগেই আমার ভাগ্যের নৌকো আমাকে নিয়ে গেল বিদেশে।' পাশের কৌচে বসে বলতে লাগল ইন্দ্রনীল : 'আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যানও করিনি, ফিরে আসবও না বলিনি, ভালোবাসাটা প্রবল করবার জন্যেই দূরে গেলাম ক'দিনের জন্যে আর তোমার তর সইল না - দুচোখে গঞ্জনা পুরে তাকাল ইন্দ্রনীল।

'কি রকম সব অস্পষ্ট হয়ে গেল, অসার্থক হয়ে গেল। অপরাধীর মত মুখ করে সুজাতা বললে খেলা শেষ হবার আগেই খেলা ভেঙ্গে গেল।' - (স্বা.স্বা.প.প./১২১)

সুজাতার অপরাধী মন আবার ধাবিত হয় সন্তানতুল্য শোভনের দিকে। যেন গোপন অভিসারিনীর বেশে নয়, মাতৃত্বের চিরন্তন স্নেহের প্রতি ব্যাকুল সুজাতা ইন্দ্রনীলের প্রেমের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করে দিয়ে বলে 'লক্ষ্মীটি আজ নয়। এখুনি নয়। কাল। আমি এখনো তৈরি হইনি –

'মৃত্যুর জন্যে প্রতি মুহূর্তে আমরা তৈরি।' সুজাতার কানের কাছে মুখ আনল ইন্দ্রনীল। তবু শিথিল হয়ে সরে আসতে পেরেছে সুজাতা। বললে 'পূজার যোগ্য সাজ করিনি, প্রসাধন করিনি, রচনা করিনি পরিবেশ। যে মন মধু সে মন এখনো খুঁড়ে আনি নি গভীর থেকে' - বলে চলে গেল পাশের ঘরে, শোভনের কাছে।' (স্বা.স্বা.প.প./১২২)

রূপকথার গল্পের কাহিনীকে কেন্দ্র করে কল্পনার জাল বোনা ছোট শোভনের মানসপটে তন্দ্রাচ্ছন্নতায় উপস্থিতি হয় ইন্দ্রনীল চোরের বেশে। তার মনে হয় পাশের ঘরে কথোপকথনরত চোর তার মাকে ক্লোরোফর্মের রুমাল চেপে ধরেছে। ভয়ার্ত শোভন প্রিয় মাকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্বলতায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। ধমকে ওঠে বিমাতা সুজাতা। জ্ঞান ফিরলে অন্য নাটকের অবতারণা হয়। অন্য পুরুষের প্রেমে আসক্ত সুজাতা স্বামী প্রিয়ব্রতের কাছে ধরা পড়ার আশঙ্কায় সতীনের ছেলে শোভনের দিকে বার বার ইঙ্গিত দিয়েছে ঘটনা না জানানোর জন্যে। 'অশ্রুভরা চোখে এক ঘর মমতা নিয়ে তাকে দেখেছে সুজাতা। যাতে প্রিয়ব্রত দেখতে না পায় এমনি ভাবে ঘুরে গিয়ে দুই ব্যাকুল চোখে ইশারা করছে, যেন না বলে, যেন না বলে, যেন না বলে–' (স্বা.স্বা.প.প./১২৫) অথচ ছোট

রোগাক্রান্ত শিশু শোভন অপরিসীম মমতার পরিচয় অঙ্কিত করে দেয় সুজাতার কঠিন হৃদয়ে। সুজাতা তাকে বিমাতা সুলভ দৃষ্টিভঙ্গীতে অনুভব করলেও শোভনের অন্তর্জগতে সে ছিল চিরন্তন মাতৃরূপিনী। আর সে কারণেই মায়ের সমস্ত অন্ধকার পরিচয় ঢেকে দিয়ে সবার সামনে উন্মোচন করে আলোকের দীপমালা। যদিও সুজাতার অন্তরে সর্বক্ষণ ধ্বনিত হতো কি যেন নেই। ‘সব আছে মন নেই। রক্ত আছে মাংস আছে, ভালোবাসা নেই। ফুল, বৃন্ত, কোষ সব আছে। গূঢ়তম কেন্দ্রে মধুটি নেই। কথা আছে, ছন্দ আছে, কল্পনা আছে, সুরটুকু নেই, নুনটুকু নেই।’ (স্বা.স্বা.প.প./১১৬) আজ সেই শূন্যতার মাঝে মায়ের প্রতি সম্মান আর মমতা দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয় শোভন। আর তাইতো ‘রাত্রে, অন্ধকারে আধো ঘুমের মধ্যে শোভনকে সুজাতা নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিল গাঢ় করে। অনর্গল আদরে বলতে লাগল তপ্তকণ্ঠে ‘তুই আমার শোভন, তুই আমার সাধন, তুই আমার একমাত্র।’

পরিসমাপ্তিতে শোভনের জীবনসীমায় মাতৃত্বের সুমহান স্থান অঙ্কিত হয়েছে। অন্যের সন্তান পরিচয়ে পরিচিত শোভনকে সুজাতা নিজের আত্মার আত্নীয় করতে ব্যর্থ হলেও মাতৃস্নেহআকাঙ্ক্ষী শোভন সুজাতাকে কখনও ভিন্ন পরিচয়ে অভিষিক্ত করেনি। তার কাছে ‘মা’ শব্দটি চিরন্তন স্নেহময় জীবনস্পন্দনে উচ্চারিত। সেখানে মায়ের সম্মান আর ভালোবাসা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। বয়সে ছোট শোভন মাতৃমমতায় পরিণত বোধের পরিচয় দিয়েছে। শোভনের জীবনে মায়ের প্রতি এ মর্যাদা ও মমতাবোধ তাকে অসাধারণ মহিমার দীপ্তিতে ভাস্বর করেছে।

‘কালো রক্ত’ গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত **‘সাহেবের মা’** (১৩৫৫) গল্পে জীবনস্পৃহা আরো সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ম হয়েছে। লেখনী হয়েছে সরল ও শাণিত। আধ পাগলা বুড়ি সাহেবের মায়ের ছিল তিন ছেলে আর ছিল ‘আল্লা’। তিনটি ছেলে মারা গেছে মন্বন্তরে ঘাস, পাতা ছাতা-মাথা অখাদ্য খেয়ে, আর ‘আল্লা’ অবস্থান নিয়েছে বড় লোকের পকেটে, কোঠাবাড়িতে। দেশকর্মী অমূল্য নিয়ে গেল নিরাশ্রয় বৃদ্ধাকে পাশের গ্রাম ডুমুরতলায় , সেখানে পুনর্জীবন পাচ্ছে পুরানো পল্লী। ‘সাহেবের মা’ নামে পরিচিত বৃদ্ধার একটি ছেলের নামও সাহেব ছিল না। নামকরণের সময় সরলপ্রাণ চাষা হয়ত আশা করেছিল, সাহেব নামে সৌভাগ্য আসবে তার মেয়ের সংসারে। নাতি তার লাট সাহেব হবে। শেষে হলনা কিছুই শুধু নামটিই অদৃষ্টের পরিহাস হয়ে রয়ে যায়। আর এই পরিহাস প্রহসনের জীবন নাটকের চূড়ান্ত দৃশ্যে বৃদ্ধা তার সাহেব ছেলের দেখা পায়। মহকুমার ছোকরা - মুনিব জীবেশ এসেছে ডুমুরতলা গ্রাম পরিদর্শনে। চারিদিকে রব উঠল, সাহেব এসেছে, সাহেব। বৃদ্ধা কাগজের ঠোঙ্গা বানাচ্ছিল। কে তাকে পরিহাস করে বললে ‘তোর ছেলে এসেছে, সাহেবের মা।’ কিন্তু কোন অভিমানে মা চিনবে তার ছেলেকে? সারাদিনের পরিশ্রম শেষে অমূল্যকে জীবেশ মুখ ফুটে বলতে বাধ্য হল ‘এবার যাই অমূল্যবাবু। অফিস থেকে এখনো বাড়ি যাই নি। খিদে পেয়ে গেছে।’ কথাটি লাগল যেয়ে ঠিক সাহেবের মায়ের হৃদপিণ্ডে। সন্তান বৎসলা জননী কাগজের ঠোঙ্গায় চিনির বাতাসা নিয়ে ছুটে গেল তার ছেলের কাছে। সবাই অবাক এই পাগলি মায়ের কাণ্ড দেখে। কিন্তু সাহেব মাতৃত্বের এই অদ্ভুত ‘কিউরিও’ তার মাকে দেখাবার জন্য নিয়ে গেল তাকে গাড়িতে তুলে।

কত সুন্দর, কত সুন্দর বাগান। বাড়িতে পা দিয়েই ছেলে উচ্ছল আনন্দে ডেকে উঠল মাকে। সেই ডাকটা একটা দগ্ধ সেলের মত লাগল এসে সাহেবের মায়ের বুকে। এ অহংকারের ডাক কিছুতেই তার ছেলের হতে পারে না। সাহেবের মা অনুভব করল, বালির উপরে রোদ্দুরে তার জলভ্রম হয়েছে। উপলব্ধির সূক্ষ্মতায় 'সাহেবের মা' গল্পটি অবিস্মরণীয়। কিন্তু বুভুক্ষার যে অভিজ্ঞানে দরিদ্র জননী তার সন্তানকে চেনে শিল্পী অচিন্ত্যকুমারও সেই অভিজ্ঞানেই এ যুগের জীবনচেতনার স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। আর শিল্পী হৃদয়ের কৌতূহল বশেই তাঁর জীবনজিজ্ঞাসা রসপিপাসায় রূপান্তরিত হয়েছে।

১৩৪৫ সালে প্রকাশিত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **'অপূর্ণ'** গল্পটি এক অসহায় মা ও প্রিয়জন হারা ব্যথাতুর সন্তানকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। নিঃসন্তান গৃহকর্ত্রী অসীমার সঙ্গে বাসায় কাজ করতে আসা বালক ভৃত্য দেবেন্দ্রের মধ্যে অজান্তে মাতা-পুত্রের সম্পর্ক তৈরি হয়। সন্তানহীনা নারীর তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে দেবেন্দ্রকে দেখে মাতৃত্ববোধ জেগে ওঠে। গৃহকর্ত্রীর সীমাহীন স্নেহ পেয়ে অনাথ দেবেন্দ্রের প্রাণ যেন ভরে গেল। তাই সে মায়ের কাছে একটু একটু প্রশ্রয় পেয়ে নিজ সন্তানের স্থানটুকু দখল করতে শুরু করে। মা যেমন সন্তানকে সংসারের নানা অনাহূত ঝামেলা থেকে আগলে রাখে তেমনি অসীমাও দেবেন্দ্রকে নিজের কাছে স্নেহবন্ধনে বেঁধে রাখে। 'নিজের সংসারে নিজে খাটব এর চেয়ে বড় সুখ আর মেয়েদের কী হতে পারে'-এ উক্তির মধ্যে দেবেন্দ্রকে বাঁচানোর মমতা মিশ্রিত প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাকে একটু একটু করে পড়তে শেখানো, ভদ্রতা শেখানো, অতিথি এলে বাড়ির ছেলেরা যে কাজ করে তা শেখানো- কোন কিছুতেই ক্লান্তি ছিলনা অসীমার।'বিশৃঙ্খলাটাকে সন্ধের আগে অসীমা কেমন সমাদরে গুছিয়ে রাখে, যেন সে একটা উদ্বেল ভাবাবেগকে কোমল একটি কবিতাতে সংযত, সুসম্বন্ধ করে আনছে।' হাসি-আনন্দ-মান-অভিমানের মধ্যে দিয়ে বেশ ভালই কেটে যাচ্ছিল মা ছেলের দিনগুলো। কিন্তু হঠাৎ একটানা সুরের মধ্যে ছন্দপতন শুরু হলো অসীমার সতীনের ছেলের আবির্ভাবের পর থেকে। এতদিনের যাপিত সংসারের পরিচিত জীবনে দেবেন্দ্রই যেন ছিল অসীমার চোখের মণি। কিন্তু যখন সত্যব্রত এসে দেবেন্দ্রের এতদিনের সবকিছুর মধ্যে অংশীদার হলো তখন যেন ধৈর্যের বাঁধ গেল ভেঙ্গে। সবচেয়ে কষ্ট পায় তখন যখন অসীমা সবার সামনে ছেলের আসন থেকে নামিয়ে চাকরের আসনে বসিয়ে দেয়। বলে, 'চাকর, তুই আমার ছেলে হতে যাবি কোন লজ্জায় রে, মুখপোড়া? এই তো আমার ছেলে।

... যতই নাই দেওয়া যায় ততই কুকুর মাথায় এসে ওঠে, না? যা এখান থেকে।' বজ্রসম এই কঠিন উচ্চারণ বালক দেবেন্দ্রের ভেতরে দুর্বহ বেদনার ঝড় বইয়ে দেয়। যাকে মনে প্রাণে মা বলে এতদিন ধ্যান করে এসেছে সেই মা তাকে 'চাকর' বলে গাল দিল, তাই বুকভরা অভিমান নিয়ে পথের মধ্যেই হারিয়ে যায় দেবেন্দ্র। পার্থিব জগতের টাকা -কড়ির মায়া তাকে ফেরাতে পারেনি। সংসারের ধন সম্পদের চেয়ে অন্তরের ভালোবাসা যে তার কাছে অনেক বড়। সেই আদরটুকু যেখানে নেই সেখানে ফিরে যাওয়া আত্নহননের সামিল। তাই না বলা কষ্ট, দুঃখ, বেদনা এবং মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও অভিমান নিয়ে বহু দূরে চলে যায় সে।

'অপূর্ণ' গল্পের নামকরণের মধ্যেই রয়েছে এর সার্থকতা। অপূর্ণ অর্থাৎ পূর্ণ নয় যা। আর সেই অপূর্ণতাই অসীমার জীবনাশাকে করে তুলেছে নি:সঙ্গ, হাহাকারময়। সন্তানহীনতার বেদনাবোধ তার অন্তর্জগতকে তিলে তিলে ক্ষয় করে দেয়। স্বামী সুরেশ্বর পিতৃত্বের স্বাদ পেলেও দ্বিতীয় স্ত্রী অসীমার অপূর্ণ মাতৃত্ববোধ শিশুভৃত্য দেবব্রতকে ঘিরে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। বাইরে রুক্ষ, রাগী মেজাজীর অসীমার ভেতরে স্নেহের অতল সমুদ্র বয়ে চলেছে নিরবধি, আর সেখানে অবিরাম স্নান করে চলে সন্তানরূপী দেবব্রত। শেষ পর্যন্ত এই মাতৃমমতা পূর্ণতা না পেয়ে মিলিয়ে যায়, শূন্যতায় হারিয়ে যায় অন্ধকার দিগন্তের সুদূরে। পুনরায় একাকী হয়ে যায় অসীমা। অপূর্ণতার দু:সহ যন্ত্রণায় পরিব্যাপ্ত হয় জীবনের সীমারেখা।

অসীমার অন্তরের সুপ্ত মাতৃত্ববোধ জেগে উঠে দেবব্রতের সান্নিধ্যে। ছোট ছোট জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে শঙ্কিত মাতৃচেতনা ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হতে থাকে। কাজের ছেলে নীরবে হয়ে ওঠে ঘরের ছেলে। মা যেমন ছেলেকে আগলে রেখে ঘরের সমস্ত কাজে নিয়োজিত থাকে তেমনি অসীমাও দেবব্রতকে সংসারের সমস্ত কাজ থেকে আড়াল করে রাখে। অসীমার জীবনবোধে সন্তানের চিরকালীন মাতৃপ্রশ্রয়ে আশ্রয় পায় দেবব্রত। সুরেশ্বর আর অসীমার কথোপকথনে সে বিষয়টি স্পষ্ট হয়, 'আর বাকি সমস্ত কাজ তুমি নিজে করবে?' সুরেশ্বর নিজের প্রশ্নটাকেই যেন অবিশ্বাস করছে। 'কেন, খুব একটা দোষের কাজ করব নাকি?... সেদিন খবরের কাগজে পড়লাম, বসে থেকে থেকে মেয়েদের আজকাল ডায়াবেটিস হচ্ছে। বলতে বলতেই জুতোর ফিতেটা সে সমূলে ছিঁড়ে ফেলল। উল্লাসে দেবেন্দ্র উঠল লাফিয়ে, কই মারো দেখি তো এবার মাকে। 'চুপ কর, দেবু।' অসীমা ধমকে উঠল। কিন্তু সুরেশ্বর দেখল তাতে শাসনের চেয়ে স্নেহের বেশি প্রকাশ।' (এ.এ.গ./৬৫৪)

দেবব্রত অসীমার মাতৃত্বের অপূর্ণতা কানায় কানায় ভরে দিয়েছে। তার ছোট্ট বালকসুলভ আচরণে মাতৃহৃদয় সারাক্ষণ দোলায়িত হতে থাকে। দেবব্রতের জীবনধারায় নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। পরিধানের শার্ট প্যান্ট থেকে শুরু করে থাকার ঘর, পড়াশুনা, কাজের পরিধি, সর্বত্র বাড়ির ছেলে হয়ে ওঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। গৃহকর্তা সুরেশ্বরেরও চোখ এড়ায়নি এই পরিবর্তনের ছোঁয়া। লেখকের দৃষ্টিতে বর্ণিত হয় এভাবে- 'টিফিন করা বা টিফিনের সময় বাড়ি আসার রেওয়াজ ছিল না সুরেশ্বরের। কিন্তু এখন মাঝে মাঝে সে দু-দশ মিনিটের ফাঁক খুঁজে উঠে আসে উপরে। দেখে, মেঝের উপর পাটি পেতে অসীমা শেলেট-পেন্সিল নিয়ে দেবুকে আঁকা শেখাচ্ছে। অসীমার চুলগুলি খোলা, আঁচলটা বহুদূর পর্যন্ত স্খলিত, সমস্ত চেহারায় কেমন মাতৃত্বের তন্ময়তা, আর দেবুর দুই চোখে কৌতূহলের যেন সীমা নেই। শেলেটের উপর পেন্সিলের কটা চিহ্ন যেন তার কাছে আকাশের গায়ে তারার রহস্যের মত। যেমন নিঃশব্দে আসে তেমনি নিঃশব্দে সুরেশ্বর চলে যায়।' (এ.এ.গ./৬৫৬) দেবব্রত মাতৃরূপী অসীমার অপার মমতায় নিজের কর্তৃত্বের জায়গাটুকু তৈরি করে নেয়। পিতৃমাতৃহীন দেবুর বেড়ে ওঠা কোন আদর -যত্নের পরিবেশে না হওয়ায় নিজের জীবনসীমায় কোন ভালোবাসার কিরণ সে উপলব্ধি করতে পারে নি। নিষ্ঠুর পৃথিবীর নিষ্করুণ আলো ছায়ায় সে কখনো মমতার উৎসারণ দেখেনি, তাইতো অসীমার মাতৃময়তায় 'দেবু এবার

তাই উপরেও নির্বাধ জায়গা পেয়েছে। সেই আজকাল ক্যালেন্ডারের তারিখ বদলায়, মাস ফুরুলে পাতা ছেঁড়ে, ঘড়িতে চাবি দেয়, অ্যালার্মের কাঁটা ঠিক করে রাখে, ডিসক ঘোরায় গ্রামোফোনের, তার রুচি দিয়ে অসীমার রুচিকে নিয়ন্ত্রিত করে। সকাল বেলায় দু'এক ঘণ্টার জন্যে যা সুরেশ্বর তার বসবার টেবিলে জায়গা পায়, বাকি সময়টা তার উপরে দেবুর দুর্দান্ত কর্তৃত্ব।' –(এ.এ.গ./৬৫৮)

সুরেশ্বরের প্রথম ঘরের ছেলে সত্যব্রতের আগমনে দেবব্রতের এতদিনের সাজানো গোছানো সংসারে হঠাৎ যেন শনির দশা লেগে যায়। তিল তিল করে গড়া এ ভালোবাসায় কোন ভাবেই ভাগ বসাতে দেয় না দেবব্রত। কাজের ছেলের বাড়ির ছেলে হয়ে ওঠার এ পদমর্যাদা যে কোন মূল্যে ধুলোয় মিশিয়ে ফেলবে না সে। তৈরি হয় অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি। সত্যব্রত এ বাড়িরই বড় ছেলে। তাই সে চাকরের এ অন্যায় আবদার মেনে নেয় না কিছুতেই। অসীমার বুকের ভেতরটা অন্তহীন বেদনায় প্লাবিত হয়ে যায়। সে কাউকে বোঝাতে পরে না যে দেবুর উপরেই তার সমস্ত মায়ামমতার প্রসারণ। সত্যব্রত এ বাড়ির ছেলে হলেও দূরদর্শনের জন্য মমতাবোধ তীব্র হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়নি। তাই বালক দেবব্রত সন্তানসম হয়ে সবটা জুড়ে ছিল সন্তানহীনা মায়ের। তীব্র মাতৃত্ববোধ মানসিকভাবে শঙ্কিত অসীমার জীবনাগ্রহে তৈরি করে এক ধরনের নাজুক, দিশেহারা মনোভাব। দুর্দান্ত সাহসী অসীমা মাতৃরূপে রূপান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিমেষে কোমল স্নেহময়ী রূপে বদলে যায়। প্রকাশে অক্ষম অন্তর্জগতটা শুধু সন্তানবাৎসল্যে পরিপূর্ণ হয়ে রয়। তার উদ্বেলিত স্নেহের কাছে দেবব্রতের কোন অজুহাতই খাটে না। যেমন: 'অসীমা এগিয়ে এসে দেবুর চুলে হাত বুলুতে বুলুতে বললে, 'বাড়ির চাকর না থাকলে বুঝি ঘরের ছেলে বাজার করে আনে না? যারা গরিব, যাদের চাকর রাখবার মুরোদ নেই, তাদের ছেলেরাই তো বাজার করে।' দেবু অসীমার মুখের দিকে মুগ্ধের মত চাইল, এক মুহূর্ত। হাত পেতে বললে,'দাও।' এবং মুঠোর মধ্যে পয়সা পেয়েই সে বসন্তর দোকানের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল। জুতো দূরের কথা, গেঞ্জিটা পর্যন্ত সে গায়ে দিল না।' (এ.এ.গ./৬৬২)

নিরতিশয় অভিমান নিয়ে দেবব্রত চলে যায় দূরান্তে। যাকে মাতৃরূপে এতদিন ভক্তিভরে পুজো করে এসেছিল সেই মা তাকে 'চাকর' বলে তাচ্ছিল্য করে দূরে ঠেলে দিল! যার মধুর কথায় এতদিন অল্প অল্প করে তার নিজের অধিকারটুকু গুছিয়ে নিচ্ছিল সে-ই তাকে প্রথম ঘরের ছেলে সত্যব্রতের সামনে অপমানিত করে তাড়িয়ে দিল! ছোট্ট বুকে অসীম অভিমান সঞ্চিত করে আবার নিষ্ঠুর পৃথিবীর দিকে পা বাড়ায় অভিমানী দেবব্রত। একদিকে অসীমা সত্যব্রতের কাছে নিজের স্নেহের ধনকে তুচ্ছ করতে চায়নি কিছুতেই অন্যদিকে তার সামনে দেবব্রতকে স্নেহের আসনে অধিষ্ঠিত করতেও কুণ্ঠিত ছিল। এই দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির দোটানায় পড়ে অসহায় অসীমা অপারাগ হয়ে নিজের স্নেহের আধারের ওপরেই স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে দেবব্রতকে গালমন্দ করে। সেই গালমন্দের ভেতরে যে অপরিমেয় মমতা লুকিয়ে ছিল তা বোধগম্য হয়ে ওঠেনি তার। তাই দেবু যেমন মায়ের

ওপর অভিমান করে নিজের হৃদয়কে অপূর্ণ রেখে দূরে হারিয়ে যায়, তেমনি অসীমাও সন্তান আকাঙ্ক্ষায় নিজের অন্তরকে অপূর্ণ রেখে নিরন্তর বেয়ে চলে সময়ের তরণী।

'অপূর্ণ' গল্প মাতৃত্ব আকাঙ্ক্ষার একটি বিষাদ বাণীমূর্তি। সন্তানহীনা নারী অসীমা হৃদয়ের সবটুকু স্নেহ ঢেলে দিয়েছিল দেবব্রতকে। অনাথ অসহায় ছেলেটিও সর্বান্তঃকরণে মাতৃস্বরূপা অসীমাকে ঠাঁই দিয়েছিল অন্তরের অন্তঃস্থলে। কিন্তু পারিবারিক প্রথা স্নেহের সূত্রটিকে ধরে টান দিলে মা ছেলের নিটোল মমতার জগতে অভিমানের অন্ধকার নেমে আসে। এই অন্ধকার কেটে দু'জনের জীবনচেতনায় আর কখনো আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখা দেয়নি।

জীবন-সর্বস্বতা অচিন্ত্যকুমারের শিল্পকৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য আর এর রূপায়ণে তিনি প্রায়ই নির্বাচন করেন নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি। এ কারণেই তাঁর ছোটগল্প সমূহ পাঠকের চিন্তায়, মননে ও অনুভূতিতে পৃথক জায়গা তৈরি করে নেয়।

নয়-দশ বছরের ছোট একটি ছেলের মৃত্যুশয্যাকে কেন্দ্র করে **'চিতা'** গল্পটি গড়ে উঠেছে। এ গল্পে মৃতদেহের সৎকারকে উপলক্ষ করে কিছু মানুষের ভেতরের চেহারা স্বচ্ছভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মৃতদেহের সৎকারের নামে 'চোখে নিরাশ্রয়ের চাউনি' এবং 'ক্লান্তি ও ম্লানিমা' নিয়ে সন্তোষ যে চাঁদা তোলে তাতে ভাগ বসায় রায় সাহেবের অগ্রপন্থী ছেলে নারায়ণ। সে শবযাত্রায় পয়সা নষ্ট করাকে 'বাজে সেন্টিমেন্ট' মনে করে। দুটো বাঁশ আর কিছু দড়ি পয়সা দিয়ে না কিনে 'সামন্তদের বাঁশঝাড় থেকে দুখানা কেটে নিয়ে' আসবে। আর খোঁটায় বাঁধা গরুকে খুলে দিয়ে দড়ি নিয়ে আসবে। অন্যদিকে সবার জন্য কিছু করার 'চিরকেলে সেই চেষ্টার চাঞ্চল্যে ভরা সন্তোষ চেয়েছিল মৃতদেহের সৎকারের জন্য খাটুলি, দড়ি, কাঠ, কলসী অন্তত একটা গামছার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু 'যারা এখনও মরেনি তাদের সৎকার করব'- নারায়ণের এই অদম্য ইচ্ছার কাছে তার পরোলৌকিক কাজের ইচ্ছেটি চুপসে যায়। কারণ, দুর্ভিক্ষে অনাহারী মানুষ গুলো যখন ধুকঁছে তখন আয়োজন করে সৎকার করাটা নিতান্ত বাহুল্য। তাই 'যে আগেই মরেছে তার চেয়ে যে এখুনি মরবে তার ব্যবস্থাটাই আগে।' কর্তৃত্বের দ্বন্দ্বে পরাজিত সন্তোষ লক্ষ করে চাঁদা তোলা পয়সায় কিনে আনা এক ধামা মুড়িতে 'ক্ষুধার্তের দল হাউ-মাউ-খাউ করে উঠল।' কিন্তু এত ক্ষুধার মাঝেও প্রাণভরা মায়া একেবারে উবে যায়নি। অনাহারী একজন বৃদ্ধ মৃত ছেলেটিকে বাঁশ, দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে চায়নি। বরং পরম মমতায় কোলে আগলে রেখেছে। স্নেহভরা কণ্ঠে বলে ওঠে- 'রোদ্দুরে বাছার মুখ কেমন আমলে গিয়েছে। কতদিন খায়নি। আর ও খায়নি বলেই তো আমরা আজ সবাই খেতে পেলাম'। অত্যন্ত আবেগধর্মী ও গুরুত্বপূর্ণ এ সংলাপের ভেতর রূপায়িত হয়েছে বৃদ্ধের যন্ত্রণাগাথা। নিরন্ন, ক্ষুধার্ত মানুষের মানবিক জীবনানুভূতি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েছে এ গল্পে। বুভুক্ষু, অনাহারী মানুষের প্রতি নারায়ণের জীবনভাবনা ও মৃত মানুষের প্রতি সন্তোষের দায়িত্বশীলতা আপাতদৃষ্টিতে বিপরীতধর্মী মনে হলেও মানুষের প্রতি তাদের সহানুভূতিশীলতা তাদেরকে নিয়ে গেছে অনেক উঁচু স্তরে। অসহায় বৃদ্ধের মৃতের প্রতি ভালোবাসা প্রমাণ করেছে দুর্ভিক্ষের ভিড়েও স্নেহ ভালোবাসার অবস্থান অটুট ও অম্লান।

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয় তার মনুষ্যত্ববোধ, মোহমুক্তি, মননশীল চিন্তা, বুদ্ধি আর আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'চিতা' গল্পে কদাকার দারিদ্র্যের বেড়াজালে আবদ্ধ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর মানুষের মনুষ্যত্ববোধের প্রতি আলোকপাত করেছেন। মনুষ্যত্বলোকে সত্য ও সুন্দরের স্বাচ্ছন্দ্য বিচরণ। সেখানে স্নেহ ও মমতাবোধে মানুষ উজ্জীবিত হয়। এ গল্পে এমনই বাৎসল্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়েছে অনাহারক্লিষ্ট জীর্ণ বস্ত্রধারী সেই বুড়ো ভিখারী।

এক অজানা বালকের মৃতদেহ সৎকার নিয়ে প্রগতিপন্থী নারায়ণ বা নারন ও সনাতনপন্থী সন্তোষের মধ্যে তৈরি হয় মতবৈষম্য। সন্তোষ শবদেহের সৎকার করার জন্য খাটুলি দড়ি, কাঠ, কলসী, গামছা ইত্যাদি কেনার জন্য সবার কাছে হাত বাড়ায়। প্রায় সাড়ে চারটাকা জোগাড় হয়ে এলে রায় সাহেবের ছেলে অগ্রপন্থী নারায়ণ সেই টাকা প্রায় ছোঁ মেরে পয়সাগুলো নিয়ে যায়। তার চিন্তা-চেতনা, ভাবধারা ও জীবনবাসনার সবটা জুড়ে রয়েছে ইহকাল। তার উদ্ধৃতি গুলো সে বিষয়েরই ইঙ্গিত বহন করে। যেমন–'শবের আবার শোভাযাত্রা! পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ি। আপনাদের যত সব বাজে সেন্টিমেন্ট।... যে মরে গেছে তার জন্যে আবার মায়া কিসের?' (এ.এ.গ./৫৮২)

পার্থিব জীবনবোধের প্রতিনিধি নারায়ণ জীবনকে ক্ষুধা, অনাহার থেকে বিমুক্ত করতে চায়। মৃত মানুষের সৎকার করার টাকায় ক্ষুধার্ত মানুষের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ সে অনুভব করে। ক্ষুধার্ত মানুষ মৃত মানুষের চেয়ে অনেক বেশি অসহায় ও বিপদগ্রস্ত। মানবিক জীবনসীমা থেকে যোজন দূরে তার অবস্থান। বেঁচে থাকার জন্য যে সামান্য মূল্যবোধটুকুর প্রয়োজন সেটাও তাদের কাছে অনুপস্থিত। এই জীবনবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে সন্তোষকে বলে–'তাই যারা ভিখিরি, হাঁপাচ্ছে বসে-বসে, তাদেরকে খাওয়াব। বেলের শুকনো খোলাটা নোখ দিয়ে কেমন আঁচড়াচ্ছে ঐ বুড়ো, দেখছেন? ঐ মেয়েটা কেমন পাতা চিবিয়ে খাচ্ছে?' (এ.এ.গ/৫৮২)এ দৃশ্য দেখে হোঁচট খেয়ে সন্তোষের কাছে 'মৃতের চেয়ে মুমূর্ষুকেই যেন বেশি অসহায় মনে হল।' সনাতনী জীবনবোধে উজ্জীবিত সন্তোষ চেয়েছে মৃতদেহের প্রতি সম্মান দেখাতে।

শবদেহের প্রতি করণীয় রীতিনীতি ঐতিহ্যগতভাবে স্বীকৃত। তাই সন্তোষের মানবিকবোধ তাড়িত হয়েছে অজানা অচেনা বালকের মৃতদেহের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে চিতায় তুলতে। কিন্তু যেখানে ক্ষুধার চিতায় জ্বলে পুড়ে যায় নিরন্ন বিপন্ন মানুষ সেখানে মৃতদেহের প্রতি এই লৌকিকতা প্রদর্শন অনেকটা বেমানান। নারন বোঁদের ছিটে দিয়ে মুড়ি আনার সঙ্গে সঙ্গে 'ক্ষুধার্তের দল হাউ-মাউ-খাউ করে উঠল। সন্তোষ করুণ চোখে লক্ষ করে 'যাদের পরণে কানি-নেকড়া আছে, অতি কষ্টে তারই এক প্রান্ত খুলে মুড়ি নিচ্ছে দু'মুঠো। যাদের তাও নেই বা টেনে খুলতে গেলে ফেঁসে যাবে, তারা নিচ্ছে আঁজলা করে। কেউ বা কচু বা কলার পাতায়।' (এ.এ.গ./৫৮৩)

মনুষ্যত্ববোধে উজ্জীবিত সেই বুড়োর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় অপরিসীম স্নেহসিক্ত বাৎসল্যচেতনা। ক্ষুধার মত জৈবিক প্রবৃত্তি যার জীবনবোধকে স্থূল করতে পারেনি। ক্ষুধার্ত, অনাহারী মানুষের কাছে পার্থিব সমাজের

সৌজন্যবোধ প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র। সেখানে ক্ষুধাক্লিষ্ট দুর্বল বুড়োর উদ্ধৃতিগুলো হৃদয়ের খুব গভীরে আঁচড় কাটে-‘ভূষণ ছেলেটাকে নামিয়ে রাখছিল মাটির উপর, পিছন থেকে কে একজন বলে উঠল ব্যস্ত হয়ে, ‘না না, বাঁধতে হবে না। ওকে এবার আমার কাছে দে। বাকি পথটুকু আমি নিয়ে যেতে পারব।...গায়ে এখন আমার অনেক জোর হয়েছে। খেয়ে নিয়েছি এক পেট। দে, বাছাকে দে এবার আমার কোলে।’ (এ.এ.গ/৫৮৪)

জৈবিক প্রাপ্তি মানুষের দেহগত বিকাশ সাধন করে আর মনুষ্যত্ববোধ মূল্যবোধের মাধ্যমে আত্মার বিকাশ সাধন করে। এ গল্পের তিনটি চরিত্রই (নারন, সন্তোষ, জনৈক বুড়ো) বৈচিত্র্যময় জীবনালোকে প্রদীপ্ত। এরা প্রত্যেকে তিনটি অবস্থানে দাঁড়িয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। নারন পার্থিব কর্তব্য করে, সন্তোষ অপার্থিব পুণ্যের আশায় কর্তব্য করে আর সেই বৃদ্ধ লোকটি কোন কিছুর প্রত্যাশায় নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে অতল স্নেহের জলে অবগাহন করে নিজেকে প্রতীয়মান করেছে মমতা ও ভালবাসার পরিপূর্ণ প্রতীক হিসেবে। ‘চিতা’ গল্পে অনাহারের বীভৎসতার মধ্যেও মানবিক জীবনবোধের লালিত্য সুকুমার বৃত্তি নিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে। তীব্র ক্ষুধা মানুষের জীবনকে মমত্বহীন করে আর অন্তরাত্মাকে আবেগহীনতায় ভরিয়ে দেয়। তা সত্ত্বেও অনাহারী, ক্ষুধার্ত বৃদ্ধ বালকের মৃতদেহের প্রতি এতটুকু অমর্যাদা হতে দেয়নি। দু’হাতে আগলে বয়ে নিয়ে গেছে। অনাহারী বুবুক্ষু মানুষের অপরিচিত বালকের মৃতদেহের প্রতি এই শ্রদ্ধাবোধ গল্পটিকে অনন্য শিল্প মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

‘সারেঙ’ গল্পে দেখা যায় পিতৃহীন ছেলে নাসিম মায়ের দ্বিতীয় বিয়ের পর অভিমানে ও দুঃখে ঘর ছেড়ে বাইরের জগতে পা রাখে। মায়ের দ্বিতীয় স্বামী নিষ্ঠুর গহরালির হাতে মার খেয়ে বাবার কথা মনে পড়ে হৃদয়টা হু হু করে তার। নির্মম গহরালির ভাতে থাকবে একথা ভাবতেই ‘বুকের ভেতরটা জ্বলতে থাকে’ নাসিমের। কিশোর নাসিমের কৈশোর কাটে অবহেলা, অনাদরের মধ্যে। মমতা বঞ্চিত এই কিশোর দরিয়ার ডাকে ছুটে যায়। ইস্টিমারের সারেঙ-এর দয়ায় ঠাঁই হলো জাহাজের এক কোণে। কিন্তু প্রথম রাতেই প্রচণ্ড মার খেল সারেঙের হাতে। অসহায় নাসিম তার মত অন্যদের দেখে ভাবে ‘এরা সবাই বুঝি তারমত নিরাশ্রয়, মা-বাপ মরা।’ সহায় সম্বলহীন অনাথ নাসিমের মনে হয় -‘নদী এত ছোট, তার স্রোত এত দুর্বল’। নিজের দুর্বলতার সাথে যেন মিল খুঁজে দুর্বল স্রোতের। মায়ের কোনো মমতার স্মৃতি জাগে না তার হৃদয়ের অভ্যন্তরে। সমুদ্রের কালো জলে যে জ্যোৎস্না পড়ে সেটাকে তার মায়ের মরা মুখের মত মনে হয়। মায়ের হাসিভরা মুখে যে স্নেহ খেলা করে নাসিমের হৃদয়ের ঘরে তার উপস্থিতি একেবারে নেই। কোন কাজের প্রশংসা না পাওয়া কিশোর চুরিতে হাত পাকিয়ে নতুন বিয়ে করা মায়ের হার ছিনিয়ে নিতে যেয়ে ধরা পড়ে। গণপিটুনি খাওয়ার সময় অত্যাচারী সারেঙ-এর-সংলাপে যেন বিস্ফোরণ ঘটে যাত্রীদের মধ্যে। ‘কে মারছে আমার ছেলেকে’ বলে সারেঙ এগিয়ে এসে নাসিমকে বাঁচায়। ‘আমার মা হারা সন্তান’ এই সংলাপের মধ্য দিয়ে সারেঙের কঠিন আবরণের ভেতর থেকে নরম পিতৃহৃদয় জেগে উঠে। মা গোলবানুর ‘ঘুমের বেহোঁসে গলা থেকে খসে পড়েছে বিছানায়’ কথাটির মধ্যে ছেলেকে বাঁচানোর কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। এর বেশি কি-ই বা করার থাকতে পারে তার। নিম্নবিত্ত দরিদ্র অসহায় বিধবা নারীর আগের

ঘরের ছেলের জন্য হয়তো আর কিছুই করার থাকে না। আর সে জন্যই নাসিম 'পাড়ের কাছে কার ঘোলাটে জলের ছায়ায় দেখতে লাগল তার মায়ের মরা মুখ।' তার কাছে অন্নদাতা সারেঙকেই 'সূয্যি'র মত বিশাল আর মহান মনে হয়।

বয়োসন্ধিকালের বিভিন্ন সংকটে ভারাক্রান্ত নাসিম চরিত্রের আশ্রয়হীনতা এবং মাতৃস্নেহ বিবর্জিত নিষ্ঠুর পরিবেশে তার দুর্ভোগ ও পরিণতিতে বিশাল স্নেহের ছায়া সারেঙের কাছে আশ্রয় লাভ 'সারেঙ' গল্পের মূল উপজীব্য। বিধবা মায়ের ছন্নছাড়া কিশোর পুত্র নাসিম বয়সসুলভ মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা নিয়ে উদ্বাস্তুর মত আশ্রয়হীনতার মধ্যেও কোনরকমে বেঁচে থাকে। কিন্তু মায়ের নতুন স্বামী গহরালির রূঢ় আচরণ, নির্দয় পরিবেশ, মায়ের মমতাহীন সংকীর্ণতায় নাসিমের জীবনে নেমে আসে অশেষ দুর্ভোগ।

মানব জীবনের কৈশোর কালটি এমনিতেই এক গভীর সংকটকাল। পরিবার ও সমাজের অনাদর, দয়া-মায়াহীনতা এই বয়সেই মানুষকে বিপর্যস্ত করে তোলে। নাসিমের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পটভূমিতে লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এ সত্যকেই নির্মোহ বাস্তবতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর বস্তুনিষ্ঠ লেখনীর সাবলীল পারদর্শিতায় নাসিম চরিত্রটি জীবন ঘনিষ্ঠতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। বয়োসন্ধিক্ষণের যাবতীয় মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কট এ চরিত্রটিকে যেমন একদিকে জর্জরিত করেছে তেমনি তার কল্পনা, অন্তর্দৃষ্টি, মানবীয় গুণাবলী, হৃদয়ানুভূতি ইত্যাদি অজস্র সম্ভাবনা চরিত্রটিকে অসাধারণ হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে।

গল্পের প্রথম দিকে লক্ষ করা যায় নাসিমের মায়ের নিষ্ঠুর অমানবিক আচরণ, যা কোন সন্তানের কাছে প্রত্যাশিত হতে পারে না। শুধু তা-ই নয়, তার নতুন স্বামী গহরালির পাশবিক অত্যাচার নাসিমকে প্রিয় বাবার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভাবে 'বাপজান বেঁচে থাকলে এমন করে কেউ মারতে পারত না তাকে। মাঠে যাবার জন্যে তাকে ঠেলাঠেলি করত না। সে জাল নিয়ে বিলে-বাওড়ে বেরিয়ে পড়ত মাছ ধরতে। বাপজান বলত, 'হাটে তোকে কাটা-কাপড়ের দোকান করে দেব একখানা'? 'তার চেয়ে আমাকে একটা নৌকা কিনে দাও,' বলত নাসিম, 'মাটির চেয়ে দরিয়ার পানি আমার বেশি ভাল লাগে।' (এ.এ.গ./৫৪৭) নিষ্ঠুর অনাত্মীয় পরিবেশে মুক্তির জন্য নাসিম ছটফট করেছে। তাই প্রতিকূল পরিবেশে এই নিরুপায় কিশোর জলের টানে অজানা পথে পা বাড়ায়। অবশেষে নিজের অবস্থান ঠিক করে নেয় এক ইস্টিমারে। এখানেও সারেঙ নামের লোকটির নির্দয় আচরণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে সে। প্রতিবার সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে তার জীবনবোধ হতে থাকে নিষ্পেষিত ও বিপন্ন। দয়া-মায়া কি কারো কাছ থেকে পাবে না এই অনাথ কিশোর? তবুও মনকে বোঝায় 'জাহাজে যে জায়গা পেয়েছে এই নাসিমের বেশি। বাপ নয়, চাচা নয়, মুনিব নয়, মালেক নয়, উটকো বাজে লোকের যে মার খেতে হবে না মুখ বুজে, এই তার অনেক। অজানার টানে যে ভাসতে পেরেছে অকূলে এই তার মহাসুখ।' (এ.এ.গ./৫৪৯) কিন্তু সারেঙের অসহনীয় দুর্ব্যবহারে ভূপাতিত হয় নাসিমের জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলি। 'প্রথম দিনই রাত্রে নাসিম মার খেল সারেঙের হাতে। বেখেয়ালে ভেঙে ফেলেছিল একখানা কাঁচের

বাসন। আর যায় কোথা! বলা-কওয়া নেই, মুখে মাথায় ঘাড়ে পিঠে পড়তে লাগল চাঁটির পর চাঁটি। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল নাসিম। ...কেঁদে কিছু লাভ হবে না।' পাশ থেকে বললে মকবুল, এমনি অনেক মার খেতে হবে। মার খেতে খেতে তবে প্রমোশন।' (এ.এ.গ./৫৪৯– ৫৫০) নাসিম তার বিড়ম্বিত জীবনে পেয়েছে কেবল স্নেহহীন, দয়াহীন, মায়াহীন, নিষ্করুণ নিষ্ঠুরতা, যা তার স্নেহ বুবুক্ষু হৃদয়কে নির্মমভাবে বিধ্বস্ত করেছে। সে তার বয়:সন্ধির দুঃসহ সময়ের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কেউ তাকে বুঝতে পারে নি, তার কিশোর কোমল হৃদয়কে কেউ বোঝার চেষ্টাও করেনি। তাই পড়ে পড়ে মার খেয়েছে আর কপালে জুটেছে ধিক্কার, ভৎর্সনা, বিদ্রূপ এবং অকথ্য অশ্রাব্য গালাগাল। তাই সারেঙের চোখে সে যেন একটা দুর্গ্রহের মত প্রতীয়মান হয়েছে। অসহনীয় প্রহার সহ্য করে নাসিমের উপলব্ধি 'এই এখানকার রেওয়াজ। সবাইকেই মার খেতে হয় সারেঙের হাতে।... কাজের এতটুকু গলতি বা গাফিলতি হলেই শুবু হয় মারধোর।...ভুল করেছে কেউ, এক কল ঘোরাতে আরেক কল ঘুরিয়ে দিয়েছে, এক ডাণ্ডা টানতে আরেক ডাণ্ডা টেনেছে, তা হলে আর রক্ষে নেই। লাথি-চড়, জাত-বেজাতের গালাগালি, জুতা-পিট্টি পর্যন্ত। তাতেও না শানায়, চাকরি থেকে বরখাস্ত।' (এ.এ.গ./৫৪৯)

খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে অনুধাবন করা যায়, মায়ের প্রতি নাসিমের প্রচ্ছন্ন বিতৃষ্ণাবোধ। মায়ের জীবনতৃষ্ণার তারতম্য কিশোর নাসিমকে করেছে একাকী,নিঃসঙ্গ,অবহেলিত। স্নেহমমতার বদলে মায়ের নির্মম মানসিকতার পরিচয় তাকে মুখোমুখি করেছে নিষ্ঠুর বাস্তবতার। যে 'মা' শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে পরম শান্তিতে মন প্রাণ আপ্লুত হয়, মায়ের স্নেহের পরশে মুহূর্তে দূর হয়ে যায় সকল দুঃখ-যন্ত্রণা সে-ই মা সম্পর্কে নাসিমের অস্তিত্বে জড়িয়ে আছে কষ্টের মেঘমালা। মা তার কাছে দুঃস্বপ্নের রাত, অমাবস্যার অন্ধকার। নাসিমের হৃদয়ে মায়ের অবস্থান নির্দিষ্ট হয় এভাবে–'চোখের জলে আবার মার কথা মনে পড়ে নাসিমের। মরে গেলে মার মুখ কেমন দেখাবে তাই সে অন্ধকারে জলের দিকে চেয়ে ভাবতে চেষ্টা করে। মার মরা মুখের কথা ভেবে মনে সে জোর পায়। জোর পায় এই মার সহ্য করতে। ... নিরালায় অন্ধকারে নদীর দিকে চেয়ে কখনও একলাটি এসে বসে নাসিম। ঘন কালো জলে জুনিরাত ঝিলমিল করছে। আজ কনকদিয়া এসেছে মাঝরাতে। বাড়ি-ঘরের কথা মনে পড়ে নাসিমের। ভাবে, কোথায় তার বাড়ি-ঘর। তার বাড়ি-ঘর নেই, সেখানে ভূতের আস্তানা। মনে পড়ে মার কথা। মার মরা মুখের মতোই মনে হয় এই কালো জলের জ্যোৎস্না।' (এ.এ.গ./৫৫১ – ৫৫২)

অদ্ভুত ধরনের এক চমক রয়েছে শেষে। ইস্টিমারের সারেঙ যার ভেতরে কোন করুণার আভাস পাওয়া যায়নি, যে তুচ্ছ ভুলত্রুটিতে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে জাহাজের অন্য কর্মচারীদের, সে-ই হঠাৎ আর্বিভূত হল একরাশ মমতা আর দায়িত্ববোধ নিয়ে। অন্যের ছেলে ও জাহাজের সামান্য কর্মচারীকে এক মুহূর্তে নিজের ছেলে বলে সন্তান বাৎসল্যের মূর্তমান প্রতীক হিসেবে নিজেকে প্রতীয়মান করে। যে ছেলে জীবনে কোনদিন কোন মানুষের মুখে করুণার লেশ প্রত্যক্ষ করে নি সে এ ব্যক্তির মুখে সূর্যের তেজ প্রত্যক্ষ করে। তার কাছে হৃদয়হীন

'মায়ের মরা মুখ'–এর চেয়ে অনেক বেশি প্রাণবন্ত উজ্জ্বল, স্নেহশীল, দায়িত্বশীল আর সূর্যের মত তেজোদীপ্ত এই সারেঙের মুখ।

'সারেঙ' গল্পে দ্বিতীয় বার বিবাহিত মায়ের নির্দয় আচরণে যন্ত্রণাক্লিষ্ট নাসিম সুদূরের পথ ধরে চলে যায়। সাগরের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজে চড়ে মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। কিন্তু এখানেও অত্যাচারী, নিষ্ঠুর সারেঙের নির্দয় হাতে মার খেয়ে মনে পড়ে অতীতের গহরালি ও মায়ের নিপীড়নের কথা। স্নেহময় বাবার কথা মনে পড়তেই আবেগ ভালোবাসায় সজল হয়ে যায় দুটি চোখ। প্রশ্নেরা ভিড় করে ছোট্ট বুকের গভীরে। পৃথিবী এত নিষ্ঠুর কেন? শেষ পর্যন্ত সত্যিকারের মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সারেঙের ছেলের মর্যাদায় ভূষিত হয় নাসিম। বদলে যায় জীবনের রূপ। হাহাকারে ভরা জীবনবোধ পরিতৃপ্ত হয় মায়াবী ভালোবাসায়।

'সারেঙ' গল্পে লেখক অচিন্ত্যকুমারের আত্মসংযম, বিষয়নিষ্ঠা, বাগভঙ্গির ঋজুতা ও নিয়মানুবর্তিতার গুণে প্লটের অবয়বে এক ক্লাসিক্যাল প্রগাঢ়তা যুক্ত হয়েছে। জীবনানুরাগের তন্ময়তায় তাঁর শিল্পিচেতনা আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তায় অনন্য স্বতন্ত্র। তাইতো তাঁর সৃষ্টিতে রয়েছে অখণ্ড জীবনসাধনা এবং জীবন-জিজ্ঞাসারই অভিব্যক্তি।

অন্যান্য

ছোটগল্পের চিরাচরিত রূপ ও রীতি, আকার ও আয়তন, কাহিনী, চরিত্র, নাটকীয়তা,লিরিক বৈশিষ্ট্য, একমুখিনতা- সবকিছুকে অতিক্রম করে সংকেত,স্বপ্ন, নিজস্ব জীবন দর্শন, অস্তিত্ববাদের যন্ত্রণা-এগুলোকে সামনে রেখে নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একের পর এক ছোটগল্প অচিন্ত্যকুমার রচনা করেছেন। এগুলো সুধী মহলে বেশ সমাদৃত হয়েছে। বিষয় বৈচিত্র্যে গল্পগুলো শতধারায় বিকশিত। তাঁর গল্পগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা গেলেও এমন কতগুলো গল্প আছে যে গুলোকে নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এ গল্পগুলোতে লেখকের নিজস্ব জীবনদর্শনের উজ্জ্বল ও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

জীবনের প্রথম দিকে 'কল্লোল'-এর উদ্ধতযৌবনের ফেনিল উচ্ছ্বাসে যেমন অচিন্ত্যকুমার নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন তেমনি পরবর্তী জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যাদুস্পর্শে পরিপূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক জগতে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষকরে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এই বিষয়বৈচিত্র্য বেশি লক্ষ করা যায়। তিনি যেমন সমাজ মনস্কতা, বাস্তবতা, মানবিকতা নিয়ে গল্প লিখেছেন তেমনি অতিপ্রাকৃত বিষয়ও তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে।

অস্বাভাবিক ঘটনার অবয়বে **'সহমরণ'** গল্পের কাহিনী গঠিত। ক্ষিতীশ ও ভবানী নব-দম্পতি। শৈশব থেকেই রোগাক্রান্ত ক্ষিতীশকে বিভিন্ন চিকিৎসা করে মা সন্তানকে রক্ষা করেছে পরম স্নেহে। হাতে ও গলায় তাকে পরতে হয়েছে বাহান্নটা মাদুলি। বিয়ের পর পতিগৃহে এসে শাশুড়ির আঁচলের চাবি নিজের আঁচলে বেঁধেছে ভবানী, সকালে আটটার আগে তার ঘুম ভাঙত না, সামান্য সিঁদুর দিত আঁকা-বাঁকা সিঁথিতে। আকস্মিকভাবে ক্ষিতীশ মৃত্যুবরণ করে। স্বামীর মৃত্যুর পর ভবানী কান্নায় ভেঙে

পড়েনি, নির্বাক হয়ে বসেছিল, তার অবস্থা দেখে পাড়ার নারীরা মুগ্ধ হয়ে যায়। স্বামীর মৃত্যুতে এতখানি শোকতপ্তা স্ত্রী তারা এর আগে দেখেনি। বাগচি গিন্নি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'তুই সাক্ষাৎ সাবিত্রী মা, আমরা তোকে চিনতে পারিনি কেউ।' কুমারীরা তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে শুরু করে, বাইশ বছরের ভবানী তখন চিন্তা করে নিজের ভবিষ্যতের কথা। তার নামে সে স্বামীকে দিয়ে দু হাজার টাকার জীবনবীমা করিয়ে নিয়েছিল। তার কুড়ি ভরি গহনার দামও কম নয়, সংসারের খরচ থেকে বত্রিশ টাকা বাঁচিয়ে রেখেছে। কোথাও মাস্টারি বা নার্সের চাকরি, সুযোগ পেলে অভিনয় করারও চেষ্টা করতে পারে, অথবা কলেজে পড়ে অনেক উপরে ওঠার চেষ্টা করবে। সে এখন মুক্ত, সম্পূর্ণ মূলচ্যুত বলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানা ভাবনায় বিভোর হয়ে থাকে। অন্যদিকে নারীদের চোখে সে দেবী হয়ে ওঠে।

'তোমার মাহাত্ম্য আমরা বুঝতে পারিনি, মা' (য.বি/১৪৮) বলে গয়লাদের বৌ এসে লুটিয়ে পড়লো পায়ের উপর। 'মা যে দেবী, জানতো আগে থেকে। তাই তো চোখের জল ফেলে অমঙ্গল ডেকে আনেনি। কে আরেকজন বলল।' গল্পের প্রথমাংশ ভবানী ও ক্ষিতীশকে কেন্দ্র করে ভবানীর আচরণ ও ক্ষিতীশের মুত্যু। গল্পের দ্বিতীয় অংশ নির্মিত হয়েছে মৃত্যুর পর ক্ষিতীশের আকস্মিক জীবনলাভ ও গৃহে প্রত্যাবর্তন। মৃত ক্ষিতীশকে দাহ করার জন্য প্রতিবেশীরা তাকে শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ তার দেহ নড়ে ওঠে এবং তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নেবার কথা বলে। শব বহনকারীরা বিস্মিত হয়ে ক্ষিতীশকে জীবিত দেখে তাকে বাড়িতে নিয়ে যায়। বাড়ির সবাই ক্ষিতীশকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। ডাক্তার কবিরাজ তাকে পরীক্ষা করে মৃতের জীবন ফিরে পাওয়ার কোন কারণ বুঝতে পারেন না। মেয়ে পুরুষ সবাই একবাক্যে বলে ওঠে : 'এ শুধু স্ত্রীর জোরে, স্ত্রীর সতীত্বের জোরে।' প্রকৃতপক্ষে ক্ষিতীশের মৃত্যু হয়নি, সে ছিল গভীরভাবে নিদ্রিত। ক্ষিতীশের মৃত্যু ও জীবিত হওয়ার ঘটনায় জমকালো সতীতের্ব গৌরব অর্জন করে ভবানী।

গল্পের তৃতীয় অংশ অনেকটা অস্বাভাবিক কাহিনীতে আবৃত। রাতে স্বামীর ঘরে প্রবেশের পর দৃশ্যপট পাল্টে যায়। ভবানীর পূর্ব প্রেমিক বিজয় ক্ষিতীশের জায়গা দখল করে আবির্ভূত হয়ে যেভাবে দুবছর আগে তার মৃত্যু হয় তার বিবরণ দেয়। সকালে দরজা ভাঙার পর আবিষ্কৃত হয় ক্ষিতীশ ও ভবানীর মৃতদেহ। ক্ষিতীশ মরে আছে খাটের ওপর আর ভবানী মেঝেতে। সবাই বলতে লাগল, 'বৈধব্য যন্ত্রণা এক মুহূর্তের জন্যও সইবে না বলেই তো স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছিলো। আজ একসঙ্গে চলে গেলেন বৈকুণ্ঠে।' পাশাপাশি চিতায় দাহ করা হলো স্বামী-স্ত্রীকে। সুনাম বহন করে ভবানীর দেহ বিলীন হয়ে গেল।

'সহমরণ' গল্পটি অস্বাভাবিক প্রকৃতির এবং লেখক ভবানী ও ক্ষিতীশের মৃত্যুজনিত ঘটনা বাস্তব পরিস্থিতির মাধ্যমে বর্ণনা করেননি, একটা অস্পষ্টতা গল্পের শেষাংশে কুয়াশা সৃষ্টি করেছে। 'বিদিশা' ও 'সহমরণ' গল্পের কাহিনী বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্য দিয়ে আবর্তিত।

প্রায় অতি প্রাকৃত একটি আবহ নিয়ে রচিত **'প্রাসাদ শিখর'** গল্পটি। মাধ্যম গুরু সুপ্রিয় প্রেতলোক সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক তথ্য সুচারুরূপে উপস্থাপন করেছেন এখানে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তার মুখে শোনা যায় এক ব্যতিক্রমধর্মী উচ্চারণ 'ঈশ্বরকে পাবার মানে কি? কত লোকে, কত রকম প্রশ্ন করে। চাকরি পাওয়া বুঝি, বাড়ি পাওয়া বুঝি, বিষয় পাওয়া বুঝি–

ঠিক ঠিক। ও সব তো আছেই, তার উপরে এই একটু সুর পাওয়া, স্পর্শ পাওয়া। সেই মা আছেন অনেক সংসারে, অন্নজল পরিবেশন করছেন সবাইকে, কে আর মায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ করে সচেতন? এরই মধ্যে এক ছেলে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল, মার মুখের কথা শুনল। অন্নজলের সংসারে একটু অতিরিক্ত সুর, অতিরিক্ত স্পর্শ আদায় করে নিল। সেই অতিরিক্তটুকুই ঈশ্বর।' (প্রে.গ.১৯২)

অন্যপ্রসঙ্গে আত্মা বা স্পিরিট আনার বিষয় সম্পর্কেও মাধ্যমগুরু সুপ্রিয় চমৎকার উদাহরণ দিয়েছে। কথা প্রসঙ্গে গুরুদাসকে বলেছে, 'এই স্পিরিট আনার ব্যাপারটা তোমাকে একটু বুঝিয়ে বলি। ঠিক রেডিওর কাণ্ড। এক পারে একটা ট্র্যানসমিটিং স্টেশন, আরেক পারে একটা রিসিভিং সেট। একটা পাঠাবার যন্ত্র, আরেকটা ধরবার। দুটোই নিখুঁত হওয়া চাই। যে আসবে তারও চাই ব্যাকুলতা আর যে আনবে তারও চাই তেমনি সুরবাঁধা দেহ। এপারের দেহ যদি শুধু কাঠ হয় ধ্বনি শোনা যাবে না, তেমনি ওপারের বিদেহ যদি উৎসুক না হন তা হলে অবস্থা হবে বাজনা আছে বাজিয়ে নেই। সুতরাং দুয়ের যোগ হলেই শুভযোগ। যদি কোথাও দেখ ফল হয়নি জানবে যন্ত্রের গোলমাল। যন্ত্র যত জোরালো ততই নির্ভুল সাড়াশব্দ।' (প্রে.গ./১৯৪)

তার জীবনচেতনায় 'মন' ধারণাটি এসেছে একটু বিচিত্রধর্মী মনোভাবনায়। তার কাছে মন ভীষণভাবে দুর্জ্ঞেয়। তাকে বলতে শোনা যায় 'বেশ তো, দেখই না পরীক্ষা করে। কতটুকু অবচেতন মন কতটুকুই বা অলৌকিক। কতটুকু বিজ্ঞান, কতটুকু বা অবিজ্ঞেয়। তাছাড়া মনের মত অলৌকিক আর কি আছে। তারই বা একটু হদিস নাও।' (প্রে.গ./১৯৬)

গল্পটির প্রথম দিকে আধিভৌতিক আবহ বিরাজ করলেও এর অন্তর্নিহিত ভাবে রয়েছে জীবনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। আধ্যাত্মিক গুরু আর ক্ষণিকা দু'জনই সঙ্গীহারা। জীবনের নানা বর্ণিল আয়োজন থেকে তারা নিজেদের গুটিয়ে রেখেছে অত্যন্ত সচেতন ভাবে। ক্ষণিকা প্ল্যানচ্যাট বা প্রেতচর্চার মাধ্যমে মৃত স্বামীর সাথে সংযোগ স্থাপনে প্রয়াসী আর সুপ্রিয়র আকাঙ্ক্ষী মন প্রিয়তমা স্ত্রীর কপালে এক চিলতে সিঁদুর পরাবার প্রত্যাশায় উন্মুখ। ছায়াময়ী রূপে তার কাছে এলেও ব্যাকুল চিত্ত অশরীরী অধরাকে বৃথা স্পর্শের জন্য মন আকুল হয়। দুজনের এই জীবনপিপাসা প্রাচুর্যময় জীবনের প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়ায়। অনুভব করে ছায়াময় জগৎ মৃত্যুপুরীর চেয়ে আলোক

উজ্জ্বল স্পর্শের জগৎ অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। আর তাইতো জীবনের জয়গান গেয়ে আলোকের পথ ধরে স্পর্শের চেতনায় সুপ্রিয় সিঁদুর পরিয়ে দেয় ক্ষণিকার কপালে। লেখকের বর্ণনার বিন্যাসে তা স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে –'ঘরে মৃদু নীল আলোটি জ্বলছে। চাঁদের আলোও মিশে গেছে নীল হয়ে। এস, আজ দিনটি তো জানো, তোমাকে পরিয়ে দি সিঁদুর। আর-আর দিন নড়ে-চড়ে ওঠে। আজ স্থির হয়ে বসে রইল। ছোঁয়ার ভয়ে পালিয়ে যায়, আজ যেন ছায়ারই প্রাণ নেই। রূপোর কৌটো খুলে আঙুলে করে সিঁদুর নিয়ে পরিয়ে দিল কপালে। একি স্পষ্ট ছোঁয়া যায় যে। কঠিন মাংসল কপাল। স্পষ্ট চুল,স্পষ্ট সিঁথি। তাড়াতাড়ি সুইচ টিপে ঝাঁজালো আলোটা জ্বালাল সুপ্রিয়। চেঁচিয়ে উঠল নারীমূর্তি: একি, স্বপ্ন তো আমিও দেখেছিলাম। কিন্তু আমি তো শাশ্বতী নই, আমি ক্ষণিকা।

কেন এ রকম হল কে জানে। আচ্ছন্নের মত বলল সুপ্রিয়, তবে চিরকালই আজ যা ক্ষণিকা কাল তা শাশ্বতী।' (প্রে.গ.২০১-২০২)

ভিন্ন ধাঁচের গল্প 'প্রাসাদ শিখরে' প্রেমচেতনা এসেছে জীবন প্রবাহের ওপর ভর করে ভিন্ন আঙ্গিকে। লেখক এখানে জীবনের ধর্মকে বিশেষভাবে দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন। মৃত্যু নয় বরং বেঁচে থাকার মধ্যেই রয়েছে জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। আর এই জীবনানুভূতির মধ্যেই বিরাজিত প্রেমের চিরকালীন মাহাত্ম্য।

'মাটি' গল্পের মধ্য দিয়ে জন্মভূমি মাটির প্রতি লেখকের সীমাহীন আবেগ ও হৃদ্যতা প্রকাশ পেয়েছে। মাটি ও প্রকৃতির প্রতি গভীর মুগ্ধতা মূর্তি লাভ করেছে এ গল্পে। মাটির মানুষ কৃষাণ ও কৃষাণী। মাটির বদৌলতেই মাটির মানুষের সুখ দুঃখ বিরাজমান। অবস্থাপন্ন চাষী আমানতের সত্তর বিঘে জমি নিঃশেষ হয়ে যায় উচ্চাভিলাষী একমাত্র পুত্র আজিজের পড়ার খরচ যোগাতে গিয়ে। তবু ছেলের কাছে তার একটাই আশা বিয়ে করে তাকে অনেক ছেলে সন্তান এনে দেবে। নাতি আর ঠাকুরদা মিলে কষ্ট করে গড়ে তুলবে তার বাড়বাড়ন্ত ক্ষেতখামার। কিন্তু শিক্ষিত পুত্র তার সে আশা পূরণ না করে সামান্য চাকরি পেয়ে শহরে নিয়ে যায়। আমানতের বুড়ি বৌ এখনো শতকষ্টেও তাকে আঁকড়ে ধরে আছে। কিন্তু তার কাছে নারীর চেয়ে মাটির মূল্য অনেক বেশি। স্ত্রী কাঙ্ক্ষিত সন্তান এনে দেয়, আর সেই সন্তানদের সাহায্যে মাটির বুকে সোনা ফলে বলেই না স্ত্রীর মূল্য এত বেশী! তাই সন্তান জন্মদানে অক্ষম অসমর্থ বৃদ্ধা স্ত্রীর ভালবাসা ও পাতিব্রত্য আমানতের কাছে অর্থহীন 'একেক সময় ইচ্ছে করে আমানতের, তাকে দিন তালাক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে আবার তার মাটির আকর্ষণে-কাঁচা-সোনা-গা নয়লী যৌবনী কাউকে সাদি করে ফের বুড়ো বয়সে, এক ফৌজ সৃষ্টি করে সে মাটির উপর, দিগন্ত পর্যন্ত সে সবুজের তরঙ্গ তুলে দেয়।' (এ.এ.গ./৬৪১) ছেলে সেলাই এর কল উপহার দিয়ে, চাষা আমানতকে খলিফায় পরিণত করে। স্তব্ধ, নির্বাক আমানতের বুকের পাঁজর ব্যথায় টনটন করে ওঠে এ পরিবর্তনকে মেনে নিতে। মাটির সোঁদা গন্ধ অনুভব করে হৃদয়ের খুব গভীরে।

'যেদিন আকাশ কালো করে টিনের চালের পরে বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম করে, আমানতের পা-কল কেমন আপনা থেকেই থেমে যায়-বৃষ্টিটা মনে হয় যেন কান্নার শব্দ, আর সেই শব্দে ভেসে আসে তার মাটির ডাক। তার মাটি তাকে ডাকে- ডাকে- অনেক দূর পর্যন্ত ডাকে। বলে, আমানত, চলে আয়।' (এ.এ.গ./৬৪১)

অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্প সম্পর্কে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণীয়- 'জীবনের বিচিত্র রহস্য দেখেছেন, দেখিয়েছেন গল্পকার অচিন্ত্যকুমার।...'অনাবশ্যক বিস্তার নেই, আছে প্রান্ত নির্ধারিত পরিণতির প্রতি অভ্রান্ত লক্ষ্য। আছে নিটোল সংহত রূপ।... অনিবার্যগতি গল্পে আছে আকার বা ফর্মচেতনা; সমগ্রতা সম্পর্কে বোধ; সৌষ্ঠব, শৃঙ্খলা আর কেন্দ্রনিষ্ঠা। আর আছে ভাষার কারুকৃতি। সেই সঙ্গে স্থানিক রঙ (লোকাল কালার) সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত শব্দের ব্যবহার। সবটা মিলে সামগ্রিক সৃষ্টি।'[২৭]

তবু 'মাটি' গল্পে আমানতের জীবনবোধে আসক্তির হাহাকারই মূর্ত হয়ে উঠেছে কিন্তু **'জমি'** গল্পে কৃষাণবধূ আমিরন আত্মবিক্রয় করেও সেই আসক্তিকেই জয়যুক্ত করেছে প্রাণপণ প্রচেষ্টায়। হুকুমালির কাছ থেকে সোনামদ্দি যে জমি কিনেছিল তার ওপর লোভের দৃষ্টি পড়ে জলিল মুন্সির। হুকুমালিকে কিছু টাকা দিয়ে নকল কাবালা করিয়ে জমির স্বত্ব নিয়ে মামলা বাধায় কুচক্রী জলিল মুন্সি। কিন্তু এত ষড়যন্ত্র করেও তার তঞ্চকী মামলা বেফাঁস হয়ে যায় আদালতে আর জোর করে জমি দখলের অপচেষ্টাও ভীষণভাবে ব্যর্থ হয় সোনামদ্দির স্ত্রী আমিরনের কঠোর প্রতিরোধে। তবু শেষ রক্ষা হয় না তাদের। ধূর্ত জলিল মুন্সির কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে ভিটে-মাটি সব হারিয়ে শিশুপুত্রের হাত ধরে রাস্তায় দাঁড়াতে হয় তাদের। শুধু তাই নয়, ভাগ্যের নির্মমতায় শেষে আশ্রয় নিতে হয় প্রতারক জলিল মুন্সির কাছে। জমিতে সোনামদ্দি হালিয়া খাটবে আর বাড়িতে আমিরন দাসী-বাঁদি হয়ে কাজ করে যায়। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস এখানেই পরিশেষ হয় না। সোনামুদ্দিকে তার নিজের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তে আমিরন জলিল মুন্সীকে বিয়ে করে। হতবুদ্ধি, নির্বাক সোনামুদ্দিকে সে বলে 'আমার জন্যে মন খারাপ করো না। আমার চেয়ে তোমার জমির দাম অনেক বেশি। আমি গেলে কি হয়? কিন্তু জমি তো তোমার ফিরে এল। তোমার জমির গায়ে ত কেউ হাত দিতে পারল না।' জমিতে খেটে খাওয়া কৃষাণ জীবনগাথার এ গল্পটি এক নতুন দিক, নতুন উপলব্ধি।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন -'তাঁর কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে গ্রাম বাংলার মানুষের সুখদুঃখের জীবনালেখ্য রচনায়। নীচু তলার মানুষের দু মুঠো ভাতের জন্য কী পরিশ্রম আর কী লড়াই!' তাঁর ছোটগল্পের শিল্পবক্তব্যের মধ্যে রয়েছে যথার্থ আঙ্গিক, লিখনশৈলী, পরিশীলিত ও সমীচীন ভাষা। কাব্যধর্মী এবং বুদ্ধিপ্রধান রোমান্টিক আবেগনির্ভর লেখক অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পে আছে মর্তমমতার গভীর স্বাক্ষর। তাঁর জীবনচেতনার অন্যতম মূলসুর ভালোবাসার সুর, মমতার সুর।'ছোটগল্পে অচিন্ত্যকুমারের শিল্পরীতি স্পর্শ করেছে সাফল্যের উচ্চতম শৃঙ্গকে। গ্রামের গরিব চাষী

আর মধ্যবিত্ত মফঃস্বলী আমলার জীবনের যে বাস্তব রুক্ষ করুণ কৌতুককর ছবি তিনি এঁকেছেন,তা বাংলা ছোটগল্পে তুলনারহিত।'[২৮]

'রুদ্রের আবির্ভাব' গল্পটি একটু ভিন্ন অনুভূতির ওপর ভিত্তি করেই রচিত। এ গল্পের মূল বিষয় হল কুলগ্রাসী নদীর ভাঙ্গন। এই নদীরই তীরে নিভৃত পল্লীর কোলে স্বপ্ননীড় রচনা করতে চেয়েছিল এক আদর্শবাদী তরুন দম্পতি। নারী তার সমস্ত শক্তিতে সৃষ্টির কাজে নিমগ্ন, আর নদী তার সংহার মূর্তিতে ধ্বংসের তাণ্ডবে উন্মত্ত। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধ্বংসের কাছে সৃষ্টি পরাজিত হয়। নারী পরাজিত হয় নদীর কাছে। তার অনেক প্রত্যাশার আশ্রয় নদীগর্ভে হয় বিলীন। গতিবেগের সঙ্গে বস্তুর যুদ্ধ আর দুর্নিবার কাল স্রোতের সঙ্গে মানুষের টিকে থাকার সংগ্রাম তো একই। তাই নদীর করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেলেও কালের গ্রাস থেকে রক্ষা নেই- এই উপলব্ধির মধ্যেই গল্পটি শেষ হয়েছে। বিজ্ঞান-বিধৃত আধুনিক যুগের যে জীবন অনুভূতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে গতিবাদের সৃষ্টি করেছে, তারই শিল্প সার্থক গল্পরূপ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'রুদ্রের আবির্ভাব'। এ গল্পে কাব্যশিল্প ও কথাশিল্পের অপূর্ব রাখিবন্ধনে জীবন-রহস্য বাণীমূর্তি লাভ করেছে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের দৃষ্টিভঙ্গীতে যে ঐকান্তিক নিষ্ঠার নিজস্বতা আছে, একেবারে মাটির গভীরেও তার নিঃসংশয় দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর জীবনবোধ ও শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী মধ্যবিত্ত জীবনধারাকে শুধু স্পর্শ করেনি, তাকে বর্ণিল আলোয় আলোকিতও করেছে স্নিগ্ধতার নতুন মাত্রায়।

'স্বাদু স্বাদু পদে পদে' গল্পগ্রন্থের **'ঘুষ'** গল্পে নীতি বিপর্যয়ের কিছু খণ্ড খণ্ড অংশ তুলে ধরা হয়েছে। জেলাধিপতি হিমাদ্রির কাছে বীরেশ বসুর ঘুষের অভিযোগ উপানন্দ সম্পর্কে এবং শেষে ঘুষ হিসেবে বোনের সঙ্গে অভিযোগকারীর বিয়ের মাধ্যমে 'ঘুষ' গল্পের পরিসমাপ্তি দেখানো হয়েছে।

লেখক গল্পের সর্বত্র ঘুষের সপক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন সংলাপ ক্ষেপণের মাধ্যমে অফিস আদালতে এই বিষয়ের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। আর সে সঙ্গে একটি নাটকীয়তার মধ্যে গল্পের সমাপ্তি নির্দেশিত হয়েছে। অভিযোগকারী বীরেশ নানা তর্জন গর্জনের পর হিমাদ্রির পরামর্শে উপানন্দ কে ঘুষের ফাঁদে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এভাবে –'শুনুন- কণ্ঠস্বরে একটু ঘনিষ্ঠ হল হিমাদ্রি। যদি কিছু ফল চান, তা হলে ওকে সত্যি সত্যি টাকাটা দিন।'

'দেব'?

'বেশ সাক্ষী রেখে দিন, স্বার্থহীন সাক্ষী। পুলিশ-টুলিস মুহুরি-ফুহুরি না হয়। যদি পারেন নোটটা মার্ক করে সাক্ষীদের দেখিয়ে নিয়ে গুঁজে দিন। তারপর ওর পকেটস্থ হবার পর ওকে চ্যালেঞ্জ করুন। সবাই মিলে হামলা করে পড়ুন ওর ঘাড়ের উপর। যদি নোটটা সারেন্ডার করে করুক, অফেন্স আগেই হয়ে গিয়েছে, নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে গিয়েছে। সারেন্ডার না করে বা ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেললে, কিছু এসে যায় না। আপনার সাক্ষী আছে ওর চাওয়ার আর আপনার দেওয়ার। তাতেই হবে। সাক্ষীর জোরেই মামলার জোর।' (স্বা.স্বা.প.প./৯৫)

কিন্তু পরক্ষণেই যারা ফাঁদ পেতে উপানন্দকে ধরে ফেলল তারা আবার মানবিক জীবনবোধে উজ্জীবিত হলো। বললে, 'ডিসমিসই যথেষ্ট। সঙ্গে আর জেলের দরকার কী? মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘায়ের দরকার নেই।

পিছন থেকে একজন সাক্ষী বললে, 'নিচের পোস্টে নামিয়ে দিলেও যথেষ্ট শাস্তি।'

'কপিইং ডিপার্টমেন্টে কিংবা রেকর্ড রুমে আরেকজন কে পরামর্শ দিল।

'কিংবা কয়েকদিন সাসপেন্ড করে রাখলেই সমুচিত শিক্ষা পাবে।'

হ্যাঁ, সার্ভিস বুকে একটা কালো দাগ পড়লেই এনাফ-'

এখন একে একে সকলেই উপানন্দের প্রতি সহানুভূতিতে নরম হচ্ছে। যতক্ষণ সে ঘুষখোর ততক্ষণ সে অত্যাচারী, আর যেই সে আসামীর পর্যায়ে তখনই তার প্রতি সমবেদনার ঢেউ।

যে ছিল সর্বমারা সেই আবার এখন সর্বহারা।' (স্বা.স্বা.প.প./৯৭)

জেলাধিপতি হিমাদ্রির কাছে ঘুষ সম্পর্কে তেমন নেতিবাচক কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না। তার মতে 'যা পরে দিলে বকশিশ তা আগে দিলেই ঘুষ। চুমু পরে দিলে আদর, আগে দিলে বলাৎকার।' গল্পের শেষ দিকে একটু অন্যরকম ঘটনার প্রবাহ দেখা যায় উপানন্দের বোন উর্মিলার আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। 'ঋদ্ধিতে-বৃদ্ধিতে সমুজ্জ্বল একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে। ঘনপীন লাবণ্যের উচ্ছ্বাস। সাম্যে স্বাস্থ্যে সুস্থিরশ্রী' উর্মিলা এসেছিল ভাই উপানন্দকে ঘুষের মামলা থেকে অব্যাহতি দেবার সুপারিশ নিয়ে। এরপর থেকে ঘটনায় যুক্ত হয় মানবিকতা যা হিমাদ্রি আর উর্মিলার মধ্যে তৈরি করে কিছু সুন্দর মুহূর্তের নিঃস্বার্থ ভালোলাগা। 'বাঁধা বরাদ্দের বাইরে মহান উপরি পাওনা' তার কাছে ঘুষের সমতুল্য। পারস্পরিক সৌহার্দ্যের রোমান্টিকতায় হিমাদ্রি ও উর্মিলা প্রাণবন্ত জীবনচেতনার উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। উর্মিলার পেশা-পরিচ্ছদ সম্পর্কে হিমাদ্রির অন্যরকম মন্তব্য 'দাঁড়াবে তোমার সেই পাখামেলা ফণাতোলা পোশাকে। ভারি রোমান্টিক লাগে আমার ওই পোশাকটা। আর ওই খুটখুট জুতোর আওয়াজ'। (স্বা.স্বা.প.প./১০১)

আবার নিজের ভেতরের যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করেন এভাবে 'পোশাকের নিচেই নগ্নতা, কবরের নিচেই কঙ্কাল, সাফল্যের নিচেই দারিদ্র্য।' (স্বা.স্বা.প.প./১০২)

'তবু এই পোশাক আছেই মুক্ত হবার জন্যে' উর্মিলার এই প্রত্যুত্তরে হিমাদ্রির কণ্ঠে ঝরে আবার ক্লান্তির সুর। 'কবর শূন্য হবার জন্যে। আর সাফল্য সুনাম সব খরচ হয়ে যাবার জন্যে।'

গল্পের শেষে দেখা যায় ঘুষখোর উপানন্দ আর ঘুষ নেয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী বীরেশের অন্তর্দ্বন্দ্বের নিস্পত্তি হয়ে দাঁড়ায় উর্মিলা। ঘটনাকে যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় তবে বলা যায় দরিদ্র উপানন্দ ঘুষের মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য নিজের বোন উর্মিলাকে ঘুষ দিয়েছে বীরেশের কাছে।

ঘুষ নেওয়ার বিরুদ্ধে অবস্থানকারী বীরেশ তার তর্জন গর্জনকে অসার প্রমাণ করে দিয়ে নিজেই যুক্ত হলো ঘুষ নেয়ার দলে। ফৌজদারির মামলা তুলে নিয়ে নিষ্প্রাণ অর্থের চেয়ে প্রাণযুক্ত উর্মিলাকে গ্রহণ করে সে।

দরিদ্র ঘরের মেয়ে উর্মিলা ভাবে ‘দাদার যদি চাকরি যায়, মাথা গোঁজার ঠাঁই উঠে যাবে। সব ছন্ন হয়ে যাবে। পথে এসে দাঁড়াবো।’ তাই ‘শেষে শেষ সলতে চাকরিটাও চলে যাবার ভয়ে নিজেকে ঘুষ হিসেবে প্রতিপন্ন করে সমর্পণ করে বীরেশের হাতে। ঘুষের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগকারী বীরেশ নিজেও আবর্তিত হয়েছে ঘুষের ঘূর্ণাবর্তে। ঘুষের কাছে পরাজিত হয় প্রণয়, ভালবাসা, মধুময় সকল স্বপ্ন ও আবেগ। মানুষের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের নির্মম বিপর্যয় সাধিত হয় এ গল্পে।

মানবচরিত্রের প্রবৃত্তি উদঘাটনে উৎসাহী অচিন্ত্যকুমারের পক্ষেই এ জাতীয় গল্পরচনা করা সম্ভবপর। কারণ, তিনি সবসময় নিরপেক্ষ ও নির্মোহ লেখকসত্তার পরিচয় দিয়েছেন স্বতন্ত্র শিল্প-অভিজ্ঞানের অঙ্গীকারে।

বনফুল অথবা পরশুরাম যে অর্থে বাংলাসাহিত্যে হাস্যরসিক শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে সেই অর্থে হাস্যরসধর্মী লেখক নন। তাঁর রচিত গল্পগুলোর মধ্যে কোন হিউমার বা স্যাটায়ারকে খুঁজে পাওয়া যায়না। হাসির গল্প বলতে যা বোঝায়, একটি গল্পকেও হাস্যরসধর্মী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়না। তাহলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগতে পারে মনে ‘হাস্যরসধর্মী’ পর্যায়ভুক্ত করে কয়েকটি গল্পকে একত্র করা হলো কেন? এক্ষেত্রে বলা যায়, গল্পকার নিজেই ‘একশ এক গল্প’-এর ভূমিকায় লিখেছেন, ‘তারপর আছে হাসির গল্প। উকিল হাকিম হয়ে দেখতে পাচ্ছে অন্য প্রান্ত, শেষ পর্যন্ত কুকুরের গলায় ‘সেকেন্ড মুন্সেফ’ প্ল্যাকার্ড ঝোলানো। ‘পিক-আপ’-এ সভাপতির পলায়ন।‘এতটুকু বাসা’-য় বাসা না পাওয়ার সরকারি প্রহসন। ‘ইনি আর উনি’-তে তো তুমুল ব্যাপার-এক মুন্সেফের সঙ্গে এক সার্কেল-অফিসারের ঝগড়া-হাঁটু-ঢাকার সঙ্গে হাঁটু কাটার-এক সপরিসর সপরিবার ঝগড়া, আর পরিণামে কী রমণীয় মিতালি! ‘আর্টিস্ট’ -ও কি ব্যঙ্গ গল্প? এক ব্যর্থ লেখক নিজের মৃত্যু রটিয়ে দিয়ে কী করে কিছু পয়সা কামালো তারই কাহিনী।‘ফুট নোট’-এর আর এক লেখকের কথা, সিনেমায় যার বই হচ্ছে তার নিমন্ত্রণ নেই। ‘সারপ্রাইজ ভিজিট’- এ হাকিম অফিসে সারপ্রাইজ ভিজিট দিতে গিয়ে দেখল তার বদলিতে খুশি হয়ে আমলারা ফিস্টি লাগিয়েছে। ‘কই আমার প্লেট কই?’ হাকিম গিয়ে দাঁড়ালো মাঝখানে। ত্রাসে ও লজ্জায় আমলারা ছত্রখান হয়ে গেল। হাকিম বদলির অর্ডার রদ করালো, তারপর আরেকবার সারপ্রাইজ ভিজিট দিল অফিসে!’[২৯] কিছু কিছু গল্পেরও তিনি উল্লেখ করেছেন। সেই পথ ধরেই ‘হাস্যরসধর্মী’ পর্যায়ভুক্তকরে গল্পগুলোকে আনা হয়েছে। তবে গল্প গুলো একেবরেই সাদামাটা ও পানসে। হাস্যরসের জন্ম মূলত অসঙ্গতিতে। এই অসঙ্গতিই সূক্ষ্ম শ্লেষের অবতারণা করে। কথা ও কাজের অসঙ্গতি, চরিত্রে-চরিত্রে অসঙ্গতি, একই মানুষের বাইরের রূপ ও ভিতরের রূপের মধ্যে অসঙ্গতি হাস্যরসের পরিবেশ তৈরি করে। কিন্তু এর কোনটিই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্পগুলোতে সামান্য পরিমাণেও পরিলক্ষিত হয়না। তার গল্পগুলোতে এমন কোন সংলাপ নেই যা হাস্যরসের প্রবাহ ছোটায়। তিনি যেভাবে গল্পগুলো ভেবেছিলেন অথবা বিষয়বস্তুর মধ্যে যেভাবে হাস্যরসকে খুঁজে পেয়েছিলেন ; পরিবেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু সেভাবে সাবলীল হতে পারেননি। এক্ষেত্রে এটা লেখকের লেখার একটা বিশেষ ত্রুটি বলেই মনে করা যায়।

'পিক-আপ' এ সভাপতির পলায়ন পর্ব সংঘটনের মধ্য দিয়ে হাসির সামান্য খোরাক যোগাবার চেষ্টা করা হয়েছে।'এক গুলি এক চিড়িয়া' 'এক বক্তা এক গাড়ি' রামেন্দ্র নিষ্ঠুর মুখেই গঙ্গাধরকে বললেন। গঙ্গাধর তাতে রাজি হলে রামেন্দ্র গোবিন্দপুরে বক্তৃতা দিতে যেতে রাজি হলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে একের পর এক বিভিন্ন স্টপেজ থেকে লোক তুলতে তুলতে রামেন্দ্র শেষপর্যন্ত ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলেন। তারপর আবার যখন গঙ্গাধর নিজের মেসোমশাইকে তুলতে শ্যামবাজারে নামলেন তখন মেসোমশায়ের বসার কথা চিন্তা করতে গিয়ে রামেন্দ্র নিজেই গাড়ি থেকে নেমে পলায়ন করলেন। বাড়িতে এসেও দেখলেন দু'জন দাঁড়িয়ে, আগামি রবিবারের সভায় প্রধান অতিথি হতে হবে রামেন্দ্রকে। গাড়ি করে তারাই নিতে আসবে, তবে পথে আরো দুই তিনজন উঠবে। গল্পটিতে হাসির চমক নেই বললেই চলে, বেশ একটু সুড়সুড়ি দিয়েই হাসাবার চেষ্টা করেছেন গল্পকার। সভাপতির গাড়ি থেকে নেমে পালিয়ে যাওয়া ও দ্রুত অন্য গাড়িতে উঠার চিত্রাঙ্কণে গল্পকার খানিকটা হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। তার দু'একটা লাইনে হাস্যরসধর্মিতার ছোঁয়া পাওয়া যায় মাত্র। 'স্ত্রী? স্ত্রীলোক?

'ভয় কি? বক্তা নন'। গঙ্গাধর মৃদু হাসল: 'গৃহে হলেও সভায় নন।' ...

'স্টার্ট দিয়ে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে,'কোথায়?

রামেন্দ্র বললে, 'এলোমেলো'

'সে আবার কোথায়?'

'জায়গা জিজ্ঞেস করা অন্যায়। যতক্ষণ কিছু না বলব সিধে চলবেন, তারপর ডাইনে বললে ডাইনে, বাঁয়ে বললে বাঁয়ে। আর ওসব নিয়ম যদি না মানেন, এলোমেলো।' (এ.এ.গ./১০৭)

তাঁর হাসির গল্পগুলো প্রায় একই ধরনের। দম ফাটানো হাসির ছোঁয়া কোন গল্পে নেই বললেই চলে। দু'একটি উটকো হাসির সংলাপ ছাড়া গল্পগুলোতে আর কিছুই প্রায় খুঁজে পাওয়া যায়না। তাতেও আবার পুনরাবৃত্তির পরিচয় পরিলক্ষিত হয়।

'যতন বিবি' গল্পগ্রন্থের অন্যান্য গল্পের তুলনায় **'বিদিশা'** গল্প সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ে রচিত। গল্পের বিষয়বস্তু অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং এই অস্পষ্টতার আলোকে তিনি এক প্রাক্তন রাজনৈতিক কর্মীর মানস বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন। দীর্ঘদিন জেল খাটার পর মুক্তি পেয়ে বাসব নিজের ঘরে ফিরে আসে। জেলে থাকার সময় জীবনের সব স্পৃহা হারিয়ে ফেলে সে। তাকে পুরোনো পথে ফেরানোর জন্যে আর্য প্রচেষ্টা করতে থাকে। নিস্প্রাণ প্রাণে প্রাণ সঞ্চারের প্রয়োজনীতায় পাশে এসে দাঁড়ায়। তার দিকে তাকিয়ে আর্যর মনে হয়, 'সেই নিঃসঙ্গ বনস্পতির মতো দেখায় না আর বাসব দা'কে। যে, হোক পুষ্পহীন কিন্তু ফলদ।' অবন্তী মৃত্যুর আগে তার ছোট বোন বিদিশাকে দিয়ে গিয়েছিল বাসবের কাছে দেখাশোনার জন্যে। বাসব সেকথা বিস্মৃত না হয়ে বিদিশাকে নিয়ে এসেছিল নিজের বাড়িতে। বাসবের জেলে থাকার কয়েক বছরে বিদিশা কিশোরী থেকে পরিণত হয়েছে তরুণীতে। আর্য বিদিশাকে দেখার

পর মনে করেছিল সে বাসবকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে। লেখকের এই অংশের বর্ণনা নিম্নরূপ:

'এত চুল থাকতে পারে, পিঠ ছেয়ে কোমর ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে প্রায় পায়ের গোছার উপর এ না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। বিপুল বিপর্যাস। এত যার চুল সে নিশ্চয়ই নিয়ে আসতে পারবে ঝড়। নিশ্চয়ই জাগাতে পারবে বাসব দাকে।' (য.বি./১২০) বিদিশার দৈহিক সৌন্দর্য বাসবের হৃদয়ে কোন ঝড় তোলেনি। 'দল বড়ো না দেশ বড়ো' এই দিক চিন্তা করেও বাসব কোন সদুত্তর পায়নি। বিদিশা মেঝেতে শোয়ার পর বাসব তাকে চৌকিতে শোয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজে মেঝেতে শুয়েছে। চাকরিতে যোগ দিয়েও আবার ছেড়ে দিয়েছে। বাসবের সারা দেহ মনে একটা বিপর্যস্ত ভাব। শেষে আবার জেলে যাবার পর বিদিশা তার সম্পর্কে বলেছে:

'কিছুই ওঁর কাছে বড়ো নয়। কিছুই নয়। নয়, কিছুই নয়। শুধু নিজের সুনাম। নিজের লজ্জামোচন। উটপাখির মতো বালিতে মুখ লুকিয়ে থাকা।' (য.বি./১২৬) বাসব কেন দ্বিতীয়বার জেলে গেছে গল্পে এই দিকটি একান্তই অস্পষ্ট। 'জেল' অর্থ যদি স্বেচ্ছা নির্বাসন হয় তাহলে এক্ষেত্রে গল্পের কাহিনী পর্যবেক্ষণে কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু লেখক অস্পষ্টতার আলোকে কাহিনী বিন্যাস করায় কাহিনীর গতি ও পরিণতি অনুধাবনে পাঠকের পক্ষে কষ্ট হয়।

'বৃত্তশেষ' (১৩৫০) গল্পে মফস্বল জীবনের মাৎস্যন্যায় পরিপূর্ণতা পেয়েছে। ক্ষেত্রদুয়ারী আর মনোরথ এক কালে শরিক ছিল। কিন্তু মনোরথ যেদিন আদালতের পেয়াদা বাবু হয়ে ক্ষেত্রর নামে ডিক্রি জারিতে এল সেদিন সে যেন নবাব-নাজিম রূপে নিজেকে প্রকাশ করল। ক্ষেত্রর কাকুতি মিনতি সে কানেই তোলে না। নাজিম বাবুর কাছে এই মনোরথই আবার কেঁচো। উজির ভূতনাথ দেবনাথ এক কালে উকিল ছিলেন। একবার দস্তিদার তাঁকে তাঁর কোর্ট থেকে বের করে দিয়েছিলেন। এখন ভূতনাথ দস্তিদারকে চোখ রাঙিয়ে তারই প্রতিশোধ নিচ্ছেন। কিন্তু চক্র পরিক্রমা এখানেই শেষ হয়নি। যেখানেই শুরু সেখানেই বৃত্ত শেষ হল। জীবনের পরিক্রমায় ক্ষেত্র দুয়ারীর দ্বারে গিয়ে ভূতনাথ দেবনাথকে ধরনা দিতে হল। এ গল্পের জীবনবোধ অচিন্ত্যকুমারের শিল্পীজীবনকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্য সাধনা জনসাধারণের দ্বারপ্রান্তে এসে বৃহত্তর জীবনোপলব্ধির আনন্দে মুক্তির আস্বাদ গ্রহণ করেছে। ব্যক্তি জীবনচেতনার মনের গহীনেই তাঁর শিল্পের সীমাহীন সাম্রাজ্য। তাই তাঁর গল্পগুলো দরিদ্র অসহায় মানুষের তীব্র দুঃখের কথা বলতে গিয়েও প্রাণ প্রাচুর্যে চিরসঞ্জীবিত।

তথ্যসূত্র

১। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *শতবার্ষিকী সংকলন, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১০, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, এস.এন.রায় কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, পৃঃ ২৬২*

২। ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, পুনর্মুদ্রণ-১৯৯৯, মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩৩১*

৩। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *একশ এক গল্প*, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪১০, কলকাতা-৭৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ এস.এন.রায় কর্তৃক প্রকাশিত, লেখক-কৃত ভূমিকা, পৃ, ৪

৪। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ-১৩৮০, প্রকাশক: সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-২০১*

৫। সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী , প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪০৫/এপ্রিল ১৯৯৮ পৃ.-৭৭

৬। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ-১৩৮০, প্রকাশক: সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-২০১*

৭। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,প্রাগুক্ত, *পৃ. ৪৬৭*

৮। ভূদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৮

৯। শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী, *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী*, পৃ. ৬২১-৬২২ উদ্ধৃত মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০

১০। শ্রীভূদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৬

১১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৬

১২। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৮-২১০

১৩। গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২০১

১৪। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *একশ এক গল্প*, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪১০, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, এস.এন.রায় কর্তৃক প্রকাশিত, ভূমিকা অংশ, পৃ.৬

১৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলা গল্প বিচিত্রা, কলকাতা প্রকাশ*: ১৩৬৪ (১৯৫৮), পৃ.১৫৫ উদ্ধৃত সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প, সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ ১৪০৫/এপ্রিল ১৯৯৮, বাংলা একাডেমী- ঢাকা ১০০০, পৃ.১৩৬

১৬। সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প, সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ ১৪০৫/এপ্রিল ১৯৯৮, বাংলা একাডেমী- ঢাকা ১০০০, পৃ.১৩৭

১৭। হরপ্রসাদ মিত্র, *সাহিত্য পাঠকের ডায়েরী, (দ্বিতীয় পর্যায়) গুপ্ত প্রকাশনী, প্রকাশক: শ্রীসুনীলকৃষ্ণ গুপ্ত ,প্রথম সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ, ৯৩ রবীন্দ্রাব্দ,জুন, ১৯৫৩, পৃ. ১০৭।*

১৮। হরপ্রসাদ মিত্র, *সাহিত্য পাঠকের ডায়েরী, (দ্বিতীয় পর্যায়) গুপ্ত প্রকাশনী, প্রকাশক: শ্রীসুনীলকৃষ্ণ গুপ্ত ,প্রথম সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ, ৯৩ রবীন্দ্রাব্দ,জুন, ১৯৫৩, পৃ. ১০৯।*

১৯। মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢাকা পৃঃ ১৩৪*

২০। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, প্রকাশক : শ্রীদেবনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা:লি:,কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রিত নতুন সংস্করণ–১৯৯৪, পৃ: ১০৭*

২১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যয়,*বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, প্রকাশক : শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, পুনর্মুদ্রণ - ১৯৯৭-১৯৯৮, কলকাতা-৭৩, পৃ:৪৬৭

২২। শ্রীভূদেব চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ:৩৫২

২৩। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা*, প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১১, পৃ: ২০৯

২৪। গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,প্রথম প্রকাশ:১৩৮০ ,পৃ.১৯৪*

২৫। ভূদেব চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৪৮

২৬। জীবেন্দ্র সিংহরায়, *কল্লোলের কাল, প্রকাশক : শ্রীসুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা*-৭৩, পৃষ্ঠা- ১৫৫

২৭। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪

২৮। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১০

২৯। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *একশ এক গল্প, প্রাগুক্ত, ভূমিকা অংশ, পৃ: ১৫*

চতুর্থ অধ্যায়

জীবনচেতনার রূপ-রূপান্তর

সাহিত্য সমাজের দর্পণ স্বরূপ বলে তাতে বিশেষ দেশকালবদ্ধ সমাজের মুখ খুব সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন, বেদব্যাসের 'মহাভারত', কালিদাসের 'শকুন্তলা,' টলস্টয়ের 'ওয়ার এন্ড পীস', গোর্কির 'মাদার' এবং রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'। সাহিত্যের প্রত্যক্ষ উপকরণ দেশকালবদ্ধ সমাজ ও সামাজিক জীবন। কিন্তু সাহিত্য দেশকালবদ্ধতার সীমাবেষ্টনীর মধ্যেই নিঃশেষিত হয় না। তা রচয়িতার রচনাপ্রকৌশলের অপরূপ শিল্প-সৌন্দর্যে সমকালীনতার সীমাবন্ধন অতিক্রম করে চিরকালের জগতে উত্তীর্ণ হয়। গল্পস্রষ্টার শিল্প-প্রতিভার অনুপম রূপসৃষ্টির চিরন্তনতার জয়টিকা ললাটে নিয়ে তা হয়ে ওঠে সর্বজনীন সর্বকালীন। যা ছিল ক্ষণকালের তা হয়ে যায় চিরকালের। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজবোধ ও সমসাময়িকতার রূপচ্ছবি তাতে থাকে মুদ্রিত। সেখানে পরিবর্তনশীল সমাজও নিশ্চুপ সময়ে হয়ে ওঠে মুখর ও বাঙ্ময়।

সাহিত্য রচয়িতার মধ্যে সাহিত্যের নব-নব রূপ আত্মপ্রকাশের জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে। সমাজের অনিবার্য জীবন স্রোতে তাকেই গতিসঞ্চার করতে হয়। পৃথিবীর নানা ঘটনা-তরঙ্গ, সমাজের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া গল্পকারের অনুভূতিলোকে সৃষ্টি করে এক প্রবল আবর্ত। সেই আবর্তের দ্বারা সৃষ্ট এক অনির্বচনীয় ভাবরস সঞ্চিত হয় তাঁর চেতনালোকে। প্রকৃতপক্ষে সমাজই যেন কান্না-হাসির, সুখ-দুঃখের, আনন্দ-বেদনার এক আশ্চর্য মনোরম গঙ্গা-যমুনা। গল্পকার তাতে অবগাহন করেন, ঘড়া ভরেন এবং তোলা জলে ফলিয়ে তোলেন সৃষ্টির অভিনব শস্য। তবে সমাজ মানে তো কেবল স্থান, কাল এবং মানুষ নয়, সমাজ মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আচার-সংস্কার, বিচার-অবিচার, মহত্ত্ব-নীচতা, অমৃত-গরল, আকাঙ্ক্ষা-প্রাপ্তি-সমস্ত কিছুরই সমাহৃত সমষ্টি। সেখানে যেমন রাজনীতির প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত আছে তেমনি আছে অর্থনীতির নানাক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সেখানে যেমন দুর্বলের ওপর প্রবলের অত্যাচার আছে, তেমনি আছে মানুষের আকাশের মত উদার মানবিকতা। শিল্পী-সাহিত্যিক সমাজের সেই বৈচিত্র্য থেকে আহরণ করেন তাঁর সৃষ্টির বিচিত্র ও অভিনব উপকরণ।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত একজন সাহিত্যিক ও সমাজ অনুধাবক। এই প্রথিতযশা শিল্পীও সমাজ সরোবরের বহু বিচিত্র উৎপলসম্ভার থেকে তিলতিল করে সুরভি-সৌন্দর্য আহরণ করে তাঁর নিজের পরিকল্পনানুযায়ী সেগুলির প্রকাশ ঘটিয়েছেন বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে, বিশেষ করে ছোটগল্পে। সাধারণের চোখে যা সামান্য তা তাঁর সৃজনকর্মে হয়ে উঠেছে অসামান্য; যা ক্ষণকালের তা-ই হয়েছে সর্বজনীন। তিনি অতি সাধারণ চরিত্র ও জীবনকে তাঁর রচনায় পল্লবিত করেছেন। যে জীবন সাধারণ মানুষের কাছে ঘৃণ্য ও নগণ্য বলে মনে হয়–তাদেরকে সহানুভূতি ও সহৃদয়তায় সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন। শুধু সমাজের উঁচুতলার স্বরূপ উদঘাটনে তিনি তাঁর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ

রাখেন নি, তিনি সুদূর পল্লীর অতি সাধারণ জীবনেও যে দরিদ্রতার অভিশাপে অনেক ক্ষতের সৃষ্টি হয় সেগুলোও সাহিত্যের উপজীব্য করে বাংলাসাহিত্যে এক নতুন দিগন্তের প্রসারণ ঘটিয়েছেন।

তবে 'কল্লোলগোষ্ঠী'তে অচিন্ত্যকুমারের মতো আর কোন লেখক সাহিত্যের পথে এত পালাবদল করেন নি, এত রূপান্তর ঘটান নি। 'টুটাফুটা', 'ইতি','স্বাদু স্বাদু পদে পদে' 'এক অঙ্গে এত রূপ' -এর লেখক যে শেষপর্যন্ত রামকৃষ্ণ, সারদা, বিজয়কৃষ্ণ জীবনীর মাহাত্ম্যকীর্তনে তন্ময় হবেন, সে কথা কেউই ভাবতে পারেন নি। তাঁর রচনায় 'মিথুন প্রবৃত্তির' 'পৌনঃপুন্য' নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্যকে অস্বীকার করা যায় না। বারে বারে কেবল এই বিষয়টিই রচনার মধ্যে টেনে এনে অচিন্ত্যকুমার 'দুর্বলতাজনিত প্রমত্ততার' দিকটি স্পষ্ট করেন। যে কোন বিষয় অবলম্বনই যে বিষয়-রূপায়ণে সার্থকতা আনে না, সেকথা তাঁর গল্প থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়। বাস্তবজীবনের গতিকে তিনি লক্ষ করে যত্নশীল অধ্যয়নের মাধ্যমে তাকে রূপদান করতে অপারগ ছিলেন। এ ক্ষেত্রে ভূদেব চৌধুরীর মন্তব্য স্মরণযোগ্য-' মধুস্যন্দী ভাষায় তাঁর গল্পের প্লটকে বর্ণনা করে গেছেন অচিন্ত্যকুমার। ফলে কথার ঝোঁকে কথার ফুলঝুরি খেলা জমে উঠেছে কখনো হয়তো বা অজান্তেই; গল্পের রস ছড়িয়ে পড়েছে -গল্প-শরীরেও অনেক সময়ে রেখায়িত হয়ে ওঠে নি সুঠাম রূপের গড়ন।'[১]

১৩৩৫ সালে অচিন্ত্যকুমারের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'টুটাফুটা' প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের গল্পগুলোর মধ্যে প্রেম না পাওয়ার হাহাকার ও সমস্ত বিশ্বাসের প্রতি বিদ্রুপের সুর অনুরণিত হয়েছে। 'টুটাফুটা' 'অচল টাকা' ও 'দুইবার রাজা' গল্প প্রসঙ্গে বলা হয়েছে -'গল্প তিনটি একই ছাঁচের- প্রায় একই গল্পের বিভিন্ন version. সেই অর্থকষ্ট, সাংসারিক উপদ্রব, প্রেমের অপমান, নারীর মূর্খ হৃদয় হীনতা, বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পতিতের প্রতি স্নেহ, স্থূল বৈষয়িকতাকে সুতীক্ষ্ণ বিদ্রুপ-আর এর মাঝখানে অবস্থার নিষ্ঠুর প্রতিকূলতার সঙ্গে ব্যর্থ সংগ্রাম করছে এক স্বাস্থ্য ও সহায়সম্বলহীন যুবক। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের এই রূঢ় অসামঞ্জস্যই অচিন্ত্যবাবু তীব্রভাবে বারবার প্রকাশ করতে চেয়েছেন।'[২] 'দুইবার রাজা' (১৩৩৪) গল্পের নায়ক অমর 'অনশনক্লিষ্ট intellectual'দের প্রতিনিধি,অন্যকথায় অচিন্ত্যকুমারদের কালের যুবকদের প্রতিভূ। 'নিষ্ঠুর প্রতিকূলতায়' তার অসুস্থ শরীরের চিকিৎসা হয়না, কলেজের বেতন দেওয়া হয়না। কবিতাকে আঁকড়ে ধরে, কল্পনাকে আশ্রয় করে সে বাঁচতে চায় অথচ কবিতার এই সত্যাশ্রয়িতার কোন পরিচয় এ গল্পে নেই। অনেক কষ্টে পাওয়া টিউশন ছাত্রের কবিতা শোনার অপরাধে চলে যায়। এ অবস্থায় চাকুরির চেষ্টা না করে যে কোন মেয়েকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত অদ্ভুত বাস্তবতার পরিচয় বহন করে। রাস্তায় হঠাৎ হাঁপানির টান সামলাতে না পেরে মৃত্যুবরণ করে অমর। বিবাহযাত্রা আর মৃত্যুযাত্রা- এ দুই যাত্রাই তাকে রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করে। এমন সম্মানিত ছেলের মৃত্যুতে বোহেমিয়ান বন্ধু সরোজের বোন 'লুসীর চোখে একবিন্দু অশ্রু' দেখা যায়। 'তারুণ্যের অপচয়ে' সহজ সহানুভূতি পাওয়ার অন্তরুদ্ধ আকুতি এ গল্পে লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত অচিন্ত্যকুমার-realism-এর অন্তরালে অত্যন্ত রোমান্টিক।

'রুদ্রের আবির্ভাব' গল্পে নায়ক তার স্ত্রীকে নিয়ে শহর ছেড়ে নিঝুম গ্রামের স্নিগ্ধ প্রকৃতির মধ্যে যায়। জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিলনা, তবুও বন্যার আবির্ভাবে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে কলকাতার সংকীর্ণ শহরে আসতে হয়। সেখানে আর্থিক দীনতা, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় উপকরণের অপ্রতুলতা, পারিবারিক অসুস্থতা, কর্মস্থলে ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা ইত্যাদি দুর্যোগ একের পর এক রুদ্র মূর্তিতে এসে আবির্ভূত হয়। লেখকের অভিপ্রায় পাঠকের বুঝতে কষ্ট হয়না, কিন্তু রুদ্রের আবির্ভাব বিষয়ে একনিষ্ঠ না হয়ে লেখক পূর্ব পর্যায়কে অতিরিক্ত প্রসারিত করায় গল্পের গুরুত্ব ও ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে।

'আর্টিস্ট' গল্পের নায়ক একজন দরিদ্রতায় জর্জরিত গল্প লেখক। এক বন্ধুর কাছে তার মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছালে তার নিন্দুকরাও প্রশংসা শুরু করে, প্রচুর দাম দিয়ে তার গল্প কেনে, প্রশস্তিমূলক প্রবন্ধও লেখে। গল্পের শেষদিকে লেখক তার বন্ধুর কাছে একদিন হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে বলে যে, মানসিক দিক দিয়ে তার মৃত্যুই হয়েছে। কারণ, লেখা ছেড়ে দিয়ে সে কাঠের ব্যবসায় নেমেছে। লেখকের পুনরাবির্ভাব গল্পটির সৌন্দর্যকে নষ্ট করে ভাবগাম্ভীর্যের হানি ঘটায়।

'অমর কবিতা' গল্পে অস্বাভাবিক মানসিকতার পরিচয় রয়েছে যা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পরীতির ধরনকে মনে করিয়ে দেয়। 'মানিকের কাছে শিক্ষিত-ভদ্রলোক-মধ্যবিত্তস্তরের জীবন নানাভাবে কলুষতাদীর্ণ, ক্লেদযুক্ত, প্রতারণপূর্ণ ও বিকারগ্রস্ত।'[৩] কন্যার মৃত্যুতে নির্মলা শোকার্ত হয়ে উচ্ছ্বাসসর্বস্ব কবিতা লেখে, মূর্তি বানায়, পুতুল মেয়ের লালনপালন করে এবং শেষ পর্যন্ত মানসিক সুস্থতা হারায়। সে সময়ে অনেকেই অস্বাভাবিক মনোবিকার নিয়ে গল্প লেখার প্রেরণা অনুভব করেছিলেন, অচিন্ত্যকুমার খুব সম্ভবত তাতেই প্রভাবিত হয়েছিলেন বলা যায়, নয়তো এ ধরনের গল্পরচনা তার স্বাভাবিক প্রবণতা নয়।

'কেরোসিন' গল্পের দরিদ্র চাষী রমজান বিয়ে করে হাস্যবিবিকে। তখন গ্রামে কেরোসিনের অভাব আর তেলের এজেন্ট ও ডিপোর বাবুদের যোগসাজসে বাজারে চড়াদর। এদিকে হাস্যবিবি খিদের জ্বালায় কাঁচা বিচেকলা ও কাঁচা তেঁতুল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কেরোসিন না পেয়ে স্থানীয় বিক্রেতা হাতেম শার গুড়ের আড়তে আগুন লাগিয়ে দেয়। গুড়ের হাঁড়ির মধ্যে আছে লাল কেরোসিন। প্রতিশোধ নিতে পেরে তৃপ্ত রমজান এবার তাঁর বিবিকে আলোয় দেখতে পারবে। পুরো ব্যাপারটা খুবই ভাবালু। কেরোসিনের অভাব যখন সর্বব্যাপী তখন মধ্যবিত্ত মানসের রমজান ভাবে 'রাত্রে হাসি কখনো দেখিনি, কিন্তু কান্নাটাকে দেখব' কিংবা 'এবার দেখবে সে হাস্যকে। যে হাস্য এখন ঘুমে, যার মুখ এখন অন্ধকার।'[৪] এ ধরনের কাব্যিকতা 'কেরোসিন' গল্পে অচল।'এই প্রসঙ্গকে উপলক্ষ করে অচিন্ত্যকুমারের রচনায় গণচেতনার আভাসও সন্ধান করা হয়েছিল একদা। কিন্তু আসলে তার শিল্পী-মানস ভাবালু আত্মলীন কবি কল্পনায় বিভোর। গল্পের প্লটের চেয়ে ঝংকৃত কথকতাময় বর্ণনা আর চমকপ্রদ শব্দের বিন্যাস তাঁর মনকে আকর্ষণ করেছিল। তাছাড়াও চিরকালই অচিন্ত্যকুমারের কৌতূহল জীবনের

খুঁটিনাটির প্রতি-কথা, শব্দ এবং বাচনভঙ্গির খুঁটিনাটির প্রতিও। সেই একই প্রসঙ্গের অনুসরণে একান্ত অন্তরঙ্গ গ্রামীণ শব্দ, কখনো বা পরিবেশোচিত মুসলমানি শব্দ ও বাক্‌রীতি, ঘনিষ্ঠ আকার পেয়েছে গল্পের শরীরে।'[৫]

'বস্ত্র' গল্পে দেখা যায়, বস্ত্র সংকটে মানুষ শ্মশানে যায় ন্যাকড়ার ফালি, চটের টুকরো, বালিশের খোল খুঁজতে। এই রকম এক গরিব লোককে গল্পের বক্তা ব্যথিত হয়ে রেশনে পাওয়া কাপড়টা দিয়ে দেয়। এই পর্যন্ত গল্পটি সমকালীন বাস্তবতাকে ছুঁয়েছে, সহানুভূতির দ্বারা উদ্দীপিত হয়েছে কিন্তু তারপর দেখা যায় সেই কাপড়টা লোকটার ফাঁস হয়। তার লাশটা চালান করে দেওয়ার আগে সেই কাপড়টা স্ত্রী আর পুত্রবধূ দু'টুকরো করে গায়ে জড়িয়ে নেয়। 'সেই কাপড়ে সসম্মান তিন অংশ বোধহয় হতে পারতো না। আর আগেই শাশুড়িতে-বৌয়ে ভাগ করে নিলে ছাদেম ফকির মরত কি করে?'[৬] গল্পের শেষ অংশটুকু মর্মান্তিক কিন্তু মনুষ্যত্ববোধের প্রেরণায় সঞ্জীবিত নয়। 'সাহেবের মা' গল্পের সাহেবের মাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, 'কিন্তু আল্লা গেল কোথায়?' তার উত্তরে সে বলেছে 'সে গেছে তোমাদের পকেটে। কোঠাবাড়িতে।' পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরূপ উক্তি এখানে স্মর্তব্য, যেমন- 'ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা।' কিন্তু আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ও বঞ্চনাপ্রসূত এই নাস্তিকতার কোন কার্যকারণ নেই বলে এখানে গভীরতর কোন তাৎপর্য অনুপস্থিত। 'দাঙ্গা' গল্পে জমি বা চর দখলের তীব্র সমস্যাকে উপেক্ষা করে লেখক জিন্নাত ও মমিনার কাহিনীকে নিছক রোমান্টিক প্রেমকাহিনী রূপে বর্ণনা করেছেন। এতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, তিনি পারিবারিক জীবনের চিত্র আঁকতে যতটা বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন ততোটা কিন্তু সামাজিক পরিবেশের ক্ষেত্রে রক্ষা করতে পারেন নি। পারিবারিক সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ 'কেরামত' গল্পে দেখা যায়, গরিব কেরামতের সুন্দরী বৌ-কে মিথ্যে তালাকনামা দাখিল করিয়ে গ্রামের হাওলাদার সাহেব নিকে করে। কেরামত কোর্ট কাছারি করেও এর সুবিধা পায়না। মোক্তারবাবু বলে, 'লেখাপড়া শেখ্, বুঝলি লেখাপড়া শেখ। লেখাপড়া না শিখলে সব যাবে, জমিজিরাত গেছে, জরু গেছে, সমস্ত দেশ যাবে রসাতলে।'[৭] কিন্তু অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শ্রেণীগত বঞ্চনা কি শুধু লেখাপড়া শিখলেই সমাধান হয়? হয়ত অচিন্ত্যকুমার এদিকে দৃষ্টি দেয়ার অবকাশ পান নি।

'সারেঙ' গল্পটি ম্যাক্সিম গোর্কির আত্মজীবনীমূলক রচনা 'আমার ছেলেবেলা' বা 'পৃথিবীর কথা' মনে করিয়ে দেয়। স্টিমারে নাসিম সারেঙের চাকরের কাজ নেয়। তার দিকে কিছু প্রগতি ও সাহসী সংলাপ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে যা খুবই দৃষ্টিকটু। যেমন-'তবু এই অত্যাচারিতের দল একত্র হয়না। খোদ উপরআলা ছাড়া আর কারু কাছে তাদের নালিশ নেই। মুক্তিও নেই এই জাহাজের খোল থেকে। কবে কে সিঁড়ি পাবে, কবে কে পাটাতন, দড়িকাছি। নোঙর-লাইট বা মেস্তরির ইলাকা-তারই আশায় সবাই দিন গোনে। কে কী ভাবে সারেঙের খাতির কাড়তে পারবে। সুদ দিয়ে, ঘুষ দিয়ে, চুরি করে, মার খেয়ে। চমৎকার গভর্নমেন্ট চালাচ্ছে সারেঙ সাহেব।'[৮] নাসিম তারই মায়ের গলার হার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে প্রচণ্ড মার খাওয়ার সময় সারেঙ তাকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দিয়ে রক্ষা করে। গল্পটিতে তেমন কোন তাৎপর্য পরিলক্ষিত হয়না। 'ধান' গল্পে কৃষক

ও মহাজনের সাথে উত্তপ্ত সংঘর্ষের পটভূমিকা থাকলেও লেখক সেদিকে মনোনিবেশ করেন নি। গ্রাম্য মহাজন যোগেশ সিঙ্গি প্রজাদের ধান রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার প্রধান কারণ ছিল সরকারি প্রাপ্য ফাঁকি দেওয়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রজারাই সরকার পক্ষের হয়ে ধান নিতে এল। এটা নাকি তারা 'ভাঙবার মহড়া' দিয়ে রাখছে। লেখক তাঁর লেখায় মাঝে মাঝে বাস্তব পরিস্থিতির বিপরীতে যেয়ে অবাস্তব মনোভঙ্গির পরিচয় দেন। একই ধরনের মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় 'অপরাধ' গল্পে। ডেটিনিউ অজয় তার বন্ধু দারিদ্র্য-নিপীড়িত, ঋণগ্রস্ত দীনেশের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসে। এরই মধ্যে পাওনাদার এসে পাওনা চাওয়াতে অজয় তার বন্ধুকে কথা শিখিয়ে দিয়ে বলে ' যেই মুহূর্তে স্বচ্ছলতা আসবে সেই মুহূর্তে দিয়ে দেবে। এর মধ্যে কোন পাপ নেই, কোন লজ্জা, কোন ভীরুতার লেশমাত্র নেই। ওদের বেশি ছিল ওরা দিয়েছে, তোমার অল্পতমও নেই, তুমি দিতে পাচ্ছ না। এর মধ্যে এতটুকু অন্যায় নেই।'[৯] একথা শুনেই পাওনাদারেরা মন্ত্রমুগ্ধ ও ভীত হয়ে বাড়ি ফিরে যায়। একদিনের মধ্যে দীনেশের হঠাৎ করে শ্রেণীসচেতন ও দেশপ্রেমিক হয়ে ওঠা কিংবা অসীমার আকস্মিক রূপান্তরে পাঠক হতচকিত হয়ে যায়। গান্ধীজীর প্রতি গভীর অনুরাগের কথা বর্ণিত হয়েছে 'সূর্যদেব' গল্পে। গান্ধীজী গ্রামের পাশ দিয়ে যাবেন, একথা শুনে গ্রামের সবাই তাঁকে দেখতে চলেছে। কারণ, তাদের বিশ্বাস করানো হয়েছে যে, 'দেখতে-দেখতেই দিনরাতের বদলে যাবে চেহারা। আর দুর্ভিক্ষ হবেনা। দুর্ভাগ্য থাকবে না আর কারুর।'[১০] গ্রামের একজন সরল বালককে দিয়ে বলানো হলো 'যে অন্ধ, যার চোখ নেই, সেও তাঁকে দেখতে পায়।' তিনি হলেন 'ঠিক সূর্যের মতো। যেই এসে দাঁড়ান, অমনি চারদিক আলো হয়ে ওঠে। ভয়ের, দুঃখের, বিবাদ-কলহের লেশমাত্র থাকে না।' গান্ধীজী সম্পর্কে গ্রামীণ সহজ সরল মানুষের প্রগাঢ় ভক্তির বাহুল্য এ গল্পের গল্পত্বকে নষ্ট করেছে। 'ছুরি' গল্পে গ্রামীণ, অশিক্ষিত এক মুদি দোকানীর মুখে ভিন্নমাত্রার সংলাপ নিছক ব্যতিক্রম। কল্লোলীয়রা অনেকেই শিক্ষিতসুলভ ও গাম্ভীর্যপূর্ণ সংলাপ অন্য চরিত্রে বসিয়ে চরিত্র প্রকাশে বিভ্রান্তি তৈরি করেছেন। যেমন- 'কিন্তু গরিবের ঘরে মুক্তোর হার দেখলে লোকে তা চোরাই মাল বলেই সন্দেহ করে , বাবুসাহেব !... তাতে গরিব আরো গরিব হয়, আর, তাতে মুক্তোরও সেই দাম থাকে না।'

প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতি এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষা ব্যবহার কল্লোলের তরুণ লেখকদের একসময় ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। অচিন্ত্যকুমারের লেখায় এধরনের উদাহরণ দেখা যায়, যেমন- ক) 'কিন্তু গ্রামে যাইবার কী যে গোঁ ধরিয়া বসিলাম, মনে হইল, ত্রেতা যুগে রাম হইয়া অবতীর্ণ হইলে সেই জোরে অনায়াসে হরধনু চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারিতাম।' (রুদ্রের আবির্ভাব)

খ)'গোড়ায় গোড়ায় দুঃখটা তারও লেগেছিল প্রচণ্ড, কিন্তু যা পুরুষের ধর্ম, ক্ষতিকে সে বুদ্ধি দিয়ে মীমাংসা করে, হৃদয় দিয়ে নিষ্পরিমাণ করে তোলে না।' (অমর কবিতা) আলোচ্য উদাহরণদ্বয়ের একটি গল্পগুচ্ছ প্রথম পর্যায়ের ভাষা ব্যবহার এবং শেষোক্তটি রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর শাণিত, ব্যঙ্গপ্রাণ, ও সংযত সরস বাকভঙ্গী মনে করিয়ে দেয়। অবশ্য, চার দশক থেকে অচিন্ত্যকুমারের গল্পে এ ধরনের ব্যবহার নেই বললেই চলে। এ সময়ে

তাঁর মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হয়। মুসলমান চাষী বা মজুরদের মধ্যে ব্যবহৃত অজস্র আরবী-ফারসী শব্দের সহযোগিতায় তিনি সংলাপ রচনা করেন। সেগুলি চরিত্রকে যেমন বিকশিত করে তেমনি স্থানিক-পরিবেশ চিত্রণেও সহায়ক হয়। ধীরে ধীরে অচিন্ত্যকুমারের গল্পধারা বদলে যায়, সংলাপের এই অভাবনীয় বৈচিত্র্যও বিলুপ্ত হয়। তবে, এখন গল্পে বর্ণনা অনেকক্ষেত্রে একেবারেই নেই। গল্প প্রধানত সংলাপনির্ভর থাকায় বর্ণনা যেটুকু আছে তার ভঙ্গিও সংলাপসুলভ। সংলাপকে শব্দালঙ্কারাশ্রিত ক'রে তোলা তাঁর বহুকালের প্রবণতা। তাইতো পরে যখন তিনি মধ্যবিত্ত জীবন বা আধ্যাত্মমহিমা বর্ণনে উদ্যোগী হয়েছেন তখন পূর্বোক্ত শব্দালঙ্কার চাতুর্য, কথকতার ভঙ্গী, ভিন্ন মাপের বাক্য ব্যবহার, বর্ণনা অপেক্ষা সংলাপে তাঁর অতিরিক্ত মনোযোগ চোখে পড়ে।

অচিন্ত্যকুমার মূলত রোমান্টিক লেখক হলেও তাঁর লেখায় জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আর্থ-সামাজিক সমস্যার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এবং চরিত্র নির্বাচনে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও নিঃস্ব মানুষের ভিড় দেখা গেছে। বুদ্ধদেবের মতই অচিন্ত্যকুমারের লেখার একটি মুখ্য বিষয় হলো প্রেম। বিভিন্ন পরিবেশে, কখনো সরস নাটকীয়তায়, কখনো বা সীমাহীন উচ্ছ্বাসে তা অচিন্ত্যসাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে। একসময় তিনি মনে করতেন, বিবাহের চেয়ে প্রেম বড়। পরে কল্লোলের উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে এলে তিনি প্রেমের মধ্যে শান্তি খুঁজে পেয়েছেন। দেহকামনার বিশদ বর্ণনা ত্যাগ করে তিনি উৎসুক হয়েছেন আত্মার আবিষ্কারে। যদিও প্রায়ই 'রূপ বর্ণনায় দেহরূপের আরতি অচিন্ত্যকুমারের রচনার বৈশিষ্ট্য।'[১১] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অচিন্ত্যকুমারের সমালোচনা করে বলেন, 'মধ্যবিত্ত জীবন একদিন ছিল তাঁর (অচিন্ত্যকুমারের) সাহিত্যের অবলম্বন। তারপর চাকরী জীবনে চাষীর জীবন, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের মুসলমান চাষীর জীবন, একভাবে তাঁর সামনে এল, একদিকের উলঙ্গ বাস্তবরূপে।' 'চাষীর রিক্ততা তাঁর চোখে মূল্য পেল মধ্যবিত্তের ব্যর্থতায়।' তার মূল কারণ- 'চাষী জীবন তাঁর কাছে শুধু দর্শনীয় ও বুদ্ধি-মননীয় ব্যাপার।' 'সমাজ ভাঙাজর্জর বাংলার চাষী জীবনের আসল বাস্তবতা', তাদের 'বাঁচার সংগ্রাম' যেমন তাদের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ, নীতি-দুর্নীতি, কলহ-বিবাদ, একতা-প্রতিরোধ' অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যে তেমনভাবে প্রতিফলিত হয়নি। তাই এসব 'চাষাভূষো নিয়ে গল্প' 'বাবুদের মনোরঞ্জন' করলেও 'আসল বাস্তবতা' পায় নি।"[১২] প্রকৃতপক্ষে বিষয় অবলম্বনই যে বিষয় রূপায়ণে সার্থকতা আনে না, অচিন্ত্যকুমারের লেখাই সেকথা প্রমাণ করে। কল্লোলীয়দের 'শিল্পের জন্য শিল্প' দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চতুর্থ দশকের সমাজকেন্দ্রিক সংঘাত রূপায়ণ করতে যাওয়ায় অসফলতার পরিমাণ তাই এত বেশি। আবার রবিন পাল একটু ভিন্ন মতও পোষণ করেছেন, ' অচিন্ত্যবাবুর গল্প বলার রীতি হল তিনি শুরুতে নিতান্ত সাধারণ, একেবারেই চমকবর্জিত কোন প্রসঙ্গ দিয়ে গল্পের উত্থাপন করেন। তারপর গল্প কখনও নিরুত্তাপ বর্ণনায়, কখনও কথকতার নাট্য-প্রবণ উক্তি প্রত্যুক্তি ধরণের ভাষার সঙ্গে গল্পের নায়ক-নায়িকার সংলাপ মিশিয়ে এক অপরূপ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে তোলেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নিরুত্তাপ গল্পের গতি সমাপ্তিতে আকস্মিক মোড় ঘোরায় উল্কার মতই জ্বলে উঠে গল্প শেষ হয়ে যায়। সব মিলিয়ে অচিন্ত্যকুমারের ভাষাভঙ্গিমা বাংলা গল্পসাহিত্যে নবস্বাদের সংযোজন করেছে, সন্দেহ নেই।'[১৩]

অচিন্ত্যকুমারের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবনে একটা ব্যাপক ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায় ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের কিছু আগে। এ সময় তাঁর মধ্যে ঈশ্বরভাবনা ও অধ্যাত্মপ্রীতির প্রাবল্য লক্ষ করা যায়। চিন্তা ও মননে রোমান্টিক জীবনবাদী লেখক হলেও উত্তরকালে তাঁর জীবনগতির রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত তাঁর মনোজগতে এই অধ্যাত্মচেতনা বীজাকারে গোপন ছিল যা পরবর্তীকালে তাঁর জীবনবোধের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে প্রকট হয়ে পড়ে। ভারতীয় ধর্মগুরুদের নিয়ে জীবনী লেখায় উৎসাহী অচিন্ত্যকুমারই যে 'যতন বিবি' বা 'এক অঙ্গে এত রূপ'-এর লেখক এই হিসেবে মিলিয়ে নেয়া সাধারণভাবে সহজ নয়। এর আগে রামকৃষ্ণ বা অন্য কোনো ধর্মগুরু বা ধর্মগ্রন্থ বিষয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তবে প্রায় সন্ধ্যারাতে সস্ত্রীক প্ল্যানচেটে বসতেন। প্ল্যানচেটে আগ্রহী ও রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ বা ধর্মগ্রন্থ বিষয়ে অনুৎসাহী অচিন্ত্যকুমার আসানসোলে সাবজজ থাকাকালীন একদিন সন্ধ্যাবেলা স্ত্রী নীহারকণা দেবীকে নিয়ে বেড়াতে বের হন। পথে তাঁর স্ত্রীকে সাপ ছোবল দেয়। অনেক চেষ্টায় একটা প্রাইভেট মোটর গাড়ি থামিয়ে মুমূর্ষু স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে যান। যে ভদ্রলোক অচিন্ত্য ও তাঁর স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন তিনি যাবার সময় দুটি বই পড়ার জন্য দিয়ে যান। বই দুটি হলো-স্বামী সারদানন্দের লেখা 'শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ' ১ম ও ২য় খণ্ড। অচিন্ত্যকুমার বই দুটো পড়েন এবং রামকৃষ্ণের জীবন সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করেন।

শ্রী রামকৃষ্ণের অলৌকিক জীবন-কাহিনী তাঁর দৃষ্টিতে যেন এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিল। এই ঘটনার পরে এক সন্ধ্যায় তাঁরা প্ল্যানচেটে বসেছেন। আহুত অশরীরী আত্মা জানালেন, তাঁদের ঘরে ঠাকুরের আসন নেই, আসতে ইচ্ছে করে না। নতুন বাড়িতে লক্ষ্মীর পট ছিল কিন্তু ঠাকুর ঘর ছিল না। পরের দিন বিকেলে কোর্ট থেকে ফেরবার পথে অচিন্ত্যকুমারকে একজন একটি ক্যালেন্ডার উপহার দেন। বাড়িতে এসে দেখলেন ক্যালেন্ডারে রামকৃষ্ণদেবের ছবি রয়েছে। তাঁরা শোওয়ার ঘরে ছোট্ট ঠাকুরের আসন পেতে ওপরে টাঙ্গিয়ে দিলেন রামকৃষ্ণদেবের ছবি। সন্ধ্যাবেলায় ধূপধুনো দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলেন আসনের পাশে। বসার ঘরে প্লানচেট করতে গিয়ে বিস্ময়ে তাঁরা দুজন নির্বাক হয়ে গেলেন– প্লানচেটের ছোট্ট টেবিলটিকে ধরে রাখা যাচ্ছে না, সেটি কেবল ছুটে ছুটে শোওয়ার ঘরে ঠাকুরের আসনের কাছে যাচ্ছে।'[14] শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী, আধ্যাত্মিক চেতনা, বাণী বিষয়ে অনেক গ্রন্থ পাঠে অচিন্ত্যকুমার নিজেকে গভীরভাবে নিয়োজিত করেন। তাঁর এই ভক্তি ও অধ্যয়নের ফল হলো 'পরমপুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ'। শ্রী রামকৃষ্ণের জন্মদিনে ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে এই বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশ পায়। পরে দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৫৯, তৃতীয় খণ্ড ১৩৬১, চতুর্থ খণ্ড ১৩৬৩। প্রথম খণ্ড নিয়ে ভক্তিপূর্ণ পাঠকমহলে দারুন হৈচৈ। এমনি সময়ে একদিন সকালে অচিন্ত্যকুমার বসে আছেন কাগজপত্র নিয়ে, কিছু লিখবার আশায়। সেই সময় পিওনের দিয়ে যাওয়া ডাকের চিঠি খুলে দেখেন, ১৯৫১ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি' বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। বিষয় নির্বাচনের দায়িত্ব তাঁর ওপরে থাকায় তখুনি তিনি নির্বাচন করলেন, 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' ! প্রথমে তাঁর সংশয় ছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বোধহয় এই বিষয় গ্রহণে

অনিচ্ছুক হবে। কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যে সেখান থেকে সম্মতিসূচক সাড়া পাওয়া যায়। এক সাক্ষাৎকারে অচিন্ত্যকুমার বলেছেন-'প্রথম দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হল-এ এই বক্তৃতামালার বন্দোবস্ত করা হয়। সেদিন অসামান্য জনসমাগমে হল ভরতি হয়েও উপচে পড়ে। পরে বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হল-এ। সেইখানেও জনসমাগম উপচে পড়ে। তৃতীয় এবং শেষদিনে তাই হলের বাইরে মাইকের বন্দোবস্ত করা হয়। শোনা যায়, সেদিন ঐ বক্তৃতা শোনবার জন্য এতো জনসমাগম হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখের রাস্তায় যানবাহন চলাচল পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়।[১৫] অচিন্ত্যকুমার বলেছেন, "শুধু কথা আর কথা। ঈশ্বর অশেষ বলে তাঁর বিষয়ে কথাও অন্তহীন। 'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?' শেষ কথা বলা যায় না বলেই এত কথা, এত কান্না। ঈশ্বর যে অনির্বচনীয়, অবাঙমানসগোচর, সেটুকু বোঝবার জন্যেও বা কত কথার আড়ম্বর। যে কাঁদে কথাই তাঁর একমাত্র উপায়। তার একমাত্র আনন্দ।...শিল্পী যেমন তার প্রতিমাকে সুন্দর করে নানা লাবণ্যসম্ভারে তেমনি ঈশ্বর প্রসঙ্গকেও সুন্দর করি বাক্যের প্রসাধনে, ভাবের রূপৈশ্বর্যে। আর এ বাক্য যত গাঁথি তত মাতি। যত ভজি তত মজি। আর-সব কথা ক্লান্ত করে ঈশ্বরকথা করে না। আর-সব অন্বেষণ অবসাদ আনে ঈশ্বরসাধন অর্নিবেয়। যত পান তত পিপাসা, যত পথ তত পাথেয়। কাজলের ঘরে গেলে যেমন কালি লাগে আতরের ঘরে এলে তেমনি সুগন্ধ। সাধুসঙ্গ দুর্লভ হয় সৎকথাকে সুলভ করি।"[১৬] অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের জীবনী গ্রন্থগুলোর শিল্পমূল্য বিচার প্রসঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ মন্তব্য করেছেন-

"বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের একটা সমগ্র একমুখিতা গড়ে উঠেছিল জাতীয় সংগ্রামের উন্মেষের যুগে। আমাদের কালী অথবা দুর্গা দেশের জন্য খড়গ ধারণ করেছেন, আমাদের কৃষ্ণের সুদর্শন চক্রও জাতীয় সংগ্রামে সৈনিকদেরই প্রেরণা জুগিয়েছে। রামকৃষ্ণের ভক্তি সাধনা থেকেও নৈতিক মর্যাদায় সন্ত্রাসবাদীদের কাছে অধিক দীপ্যমান ছিল বিবেকানন্দের ভাষ্য 'নায়মাত্ম বলহীনেন লভ্য'। সুতরাং আমাদের ধর্মপ্রাণতায় ও মুক্তিপ্রাণতায় কোনো দুস্তর বিরোধ ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ পরবর্তীকালে, স্বাধীনতার পর সে সমগ্র একমুখিতা হারিয়ে গেল। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য' কিংবা 'হে রুদ্র নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা' প্রভৃতি মনোভাবের উপযুক্ত মধ্যবিত্ত জীবনভিত্তিক আধার গেল ভেঙে। নানা 'ঠাকুর' নানা স্বামী ও নানা অলৌকিক শক্তিময় লামা অথবা বাবাদের জন্য অনেক ছোট-বড় আসন তখন দিকে দিকে প্রস্তুত। ব্যাঙ্কমালিক এবং চাকুরিহারা ও ব্যাঙ্ক-ফেলে সর্বস্বহারা ছা-পোষা মানুষের আশ্চর্য তীর্থ-সঙ্গম গড়ে ওঠেছে এই সমস্ত আসনের পাদপীঠে। জীবনে যখন এবম্প্রকার ক্লীবের ভক্তি সামাজিক কারণেই প্রবল হয়ে ওঠে, তখন স্বভাবতই সাহিত্যেও তার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী। আতুর ও পীড়িত মধ্যবিত্তের সান্ত্বনার জন্য সে ব্যবস্থা সাহিত্যে করলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর পরমপুরুষ 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ' গ্রন্থে। বেদের লেখকের এবম্বিধ ভক্তির সাপ্লুতি প্রায় জগাই-মাধাই উদ্ধারের আদর্শ স্থাপন করল। কিন্তু ব্যবধানটা এবার হল দুরতিক্রম্য। বারো ঘর এক উঠোনে প্রতিফলিত সামাজিক পরিস্থিতি ও পরম পুরুষের জন্য তদ্গতচিত্ততাকে মেলানো কবি অমিয় চক্রবর্তীর সেই মহামিলনের দেবতার পক্ষেও অসম্ভব। উভয় দিকেই যখন

নেতির বোধ প্রবল, তখন সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য আসলে রাষ্ট্রিক নৈরাজ্যেরই সন্তান ; সামাজিক স্থিরাদর্শহীনতারই ফল।"[১৭] 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ' গ্রন্থটি যদি তাঁর একনিষ্ঠ অধ্যয়ন ও ভক্তির পরিণাম হয়, তাহলে 'কবি রামকৃষ্ণ' গ্রন্থটি তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে গভীর চিন্তন ও মননের একটি পরিণত দৃষ্টান্ত। পূর্বোক্ত গ্রন্থটি যদি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী হয়, তাহলে 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, তাঁর জীবনদর্শন। অচিন্ত্যকুমার এই গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখেছেন-'রসে গাঢ় বশে দৃঢ় - শ্রী রামকৃষ্ণ কবি। রসে সিক্ত বশে শক্ত -কবি শ্রীরামকৃষ্ণ।' আরো বলেছেন–'যতক্ষণ পর্যন্ত 'আমি' ততক্ষণ পর্যন্ত গদ্য। যেই 'তুমি' এলে অমনি হল কবিতার জন্ম। যতক্ষণ পর্যন্ত 'আমি' ততক্ষণ বন্ধ। যেই 'তুমি' এলে অমনি ছন্দ বেজে উঠল। আমি তোমার 'সহিত' হলাম।' ১৯৭৬ সালের ২৯ শে জানুয়ারি অর্থাৎ আজ থেকে সাতাশ বছর আগে অচিন্ত্যকুমার আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন নিয়ে বা তাঁর প্রদত্ত উপদেশাবলী নিয়ে এমন মনোরম আলোচনাগ্রন্থ আর দ্বিতীয় প্রকাশিত হয় নি।

সবিতেন্দ্রনাথ রায় একদিন অচিন্ত্যকুমারকে বলেছিলেন-'আপনার এককালের রবীন্দ্র-বিরোধিতা অথবা ঈশ্বর-নিস্পৃহতা খুব আলোচিত হত, এখন কিন্তু উল্টোটা নিয়ে আলোচনা হয়।' অচিন্ত্যকুমার হেসে বলেছিলেন-'দ্যাখো মানুষ তো কিছু নিয়ে থাকবেই। তবে আমি যে রবীন্দ্রনাথে, শ্রীরামকৃষ্ণে বা ঈশ্বর-বিশ্বাসে ফিরলাম, এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। সব মানুষের মধ্যেই বিরোধিতা ও পূজা সমানভাবে বর্তমান। ছেলে মায়ের কোল ছেড়ে বড় হয়ে মাঠে খেলে বেড়াচ্ছে। মায়ের সম্বন্ধে ছেলের কোন খেয়ালই নেই। কিন্তু মায়ের খেয়াল আছে। মা নিজে না খেয়ে ছেলের ভাত বেড়ে ঢাকা দিয়ে রেখেছেন। আমার ক্ষেত্রেও ভাত বাড়া ছিল। তাই ফিরেছি রবীন্দ্রনাথে, ঈশ্বরে, ঠাকুরে আর শ্রীশ্রী মায়ের কোলে।'[১৮]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত জীবনীগ্রন্থগুলো গভীরভাবে গীতিকাব্যধর্মী। এসব রচনার শেষপ্রান্তে যে রেশ আমাদের অনুভূতিতে আলোড়িত হয় তা গীতিকাব্যের। তিনি যত বেশি ঈশ্বরমুখি হয়েছেন ততোবেশি তা ভক্তির রসে সিক্ত হয়েছে। পরিণাম সার্থক হয় নি। হয়ত অসামান্য শব্দশিল্পী ছিলেন বলে কোন কোন রচনায় শব্দের যথাযথ ব্যবহারে অর্থের গভীরতা সহজেই ফুটেছে কিন্তু উপন্যাসের প্রকরণ এতে যুক্ত হওয়ায় এসব রচনার শিল্পমূল্য অনেকাংশে ক্ষুণ্ন হয়েছে, শিল্পরূপও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভক্তির আতিশয্য ও ভাষা শৈথিল্য লেখার গুরুত্বকে অনেকখানি ম্রিয়মান করেছে। গল্পের আবেগ ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বিশ্বাসের প্রবল জোয়ারে। শিল্পের নির্মোহ বিচার তাঁর অনুকূলে যায় নি। আর সে কারণেই 'কল্লোল' থেকে সরে গিয়ে ভক্তিমুখি রচনায় মনোনিবেশ করার কারণে অনিবার্যভাবেই তিনি 'কল্লোলগোষ্ঠী' থেকে দূরবর্তী ও নিঃসঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন। তবুও বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর 'প্রতিভা' ও 'শক্তির বিশিষ্টতা' সাহিত্যচর্চা জীবনের শুরুতেই স্বীকৃতি পেয়েছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে। তাঁর প্রাতিস্বিক শিল্পবোধ, কল্পনার প্রশস্ত ক্ষেত্র, অজস্র কাহিনী বৈচিত্র্য, নানা ধাঁচের গল্প উপন্যাস এবং কবিতাগুচ্ছ যেমন বাংলাসাহিত্যের অঙ্গনে বিস্ময় ও প্রেরণার উপাদান জুগিয়েছিল তেমনি

সূচনা করেছিল এক সামাজিক বিদ্রোহের। শাণিত সাহিত্যবাচনভঙ্গি, ক্ষুরধার শ্লেষ ও বক্রোক্তির দ্বারা তিনি অনুজ সাহিত্যব্রতীদের নতুন কালের লেখার ধাঁচ গড়তে সহায়তা করেছেন। জীবনী সাহিত্যকে এমন যুগোপযোগী, আস্বাদ্য, শতজনমুখী করে তোলার অন্তরালে তাঁর অবদান যথেষ্ট। তাঁর দৃপ্ত বাচনপ্রিয়তা, আবৃত্তি মাধুর্য, পরিমিত রসিকতা ভঙ্গি সতীর্থদের যেমন তৃপ্ত করেছে তেমনি তাঁর সাহিত্যসত্তা নানাসময়ে সাহিত্যপ্রেমিকদের উচ্ছ্বসিত, উল্লসিত ও আবেগআপ্লুত করেছে। সাহিত্যের এই তেজস্বী সৈনিক, জীবনদৃষ্টি ও মানবিক অনুভবের এই নির্মাতা কোন কালে নিন্দিত হয়েছেন কিছুটা, আবার নন্দিতও হয়েছেন সঙ্গত কারণেই।

তথ্যসূত্র

১. ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, পুনর্মুদ্রণ-১৯৯৯, পৃ.৩৪৫

২. রবিন পাল, *কল্লোলিত ছোটগল্প, প্রথম বুক ট্রাস্ট সংস্করণ/ আগস্ট ১৯৮৮, কলেজ রোড- কলিকাতা, প্রকাশক : বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৮৬*

৩. সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ, বাংলা একাডেমী , প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪০৫/এপ্রিল ১৯৯৮ পৃ.-৩৫*

৪. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *একশ এক গল্প, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮৫*

৫. ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, পুনর্মুদ্রণ-১৯৯৯, মডার্ন বুক এজেন্সী, পৃষ্ঠা-৩৫৩*

৬. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *একশ এক গল্প, পৃ.৫৩২*

৭. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত,প্রাগুক্ত পৃ.*৪৮১*

৮. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত,*প্রাগুক্ত পৃ.৫৫৩*

৯. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত,*প্রাগুক্ত পৃ.৪৬৫*

১০. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত,*প্রাগুক্ত পৃ.৪৫৫*

১১. বিজিতকুমার দত্তের প্রবন্ধ, *'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন*, ১৩৭৭ *উদ্ধৃত রবিন পাল, কল্লোলিত ছোটগল্প, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৯*

১২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *লেখকের কথা, পৃ. ১০৪-১১৫* রবিন পাল, *কল্লোলিত ছোটগল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ.১০০

১৩. রবিন পাল, *কল্লোলিত ছোটগল্প, প্রথম বুক ট্রাস্ট সংস্করণ/ আগস্ট ১৯৮৮, প্রকাশক- বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়,কলিকাতা*, পৃ.১০৫।

১৪. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত , *শতবার্ষিকী সংকলন, প্রথম প্রকাশ, মাঘ-১৪১০, কলকাতা*, পৃ. ৫৫৫

১৫. নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী-৬, গ্রন্থাগার প্রাঃলিঃ, কলকাতা, পৃ. ৫৪-৫৫* উদ্ধৃত মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

১৬. *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ভূমিকা 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'* উদ্ধৃত মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

১৭. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ.৩৩৮-৩৩৯* উদ্ধৃত মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮

১৮. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *শতবার্ষিকী সংকলন, মাঘ ১৪১০, কলকাতা, পৃ.০৬*

পঞ্চম অধ্যায়

ছোটগল্পে জীবনচেতনা: প্রাসঙ্গিক পরিপ্রেক্ষিত

বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিতে ছোটগল্প অতি আধুনিককালের শিল্প প্রকরণ। বিষয়-ভাবনা, বর্ণনার সরসভঙ্গি, প্রাঞ্জল ভাষাপ্রবাহ, সজীব চরিত্র-চিত্রণ ইত্যাদি উপকরণ মিলে ছোটগল্পে পরিলক্ষিত হয় বস্তুনিষ্ঠ প্রাণধর্মিতা। উপন্যাস পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যে অতলান্ত অন্তহীন জীবনকে প্রতিফলিত করে। সেক্ষেত্রে ছোটগল্প একটি পূর্ণাঙ্গ মানবজীবনের যে কোন একটি মুহূর্তের বিহ্বলতার গহনে অখণ্ড পূর্ণজীবনকে করে তোলে বিম্বিত। অর্থাৎ কল্লোলমুখর সাগরে শতবিন্যস্ত জীবনের উত্তাল-ক্ষুব্ধ রূপটিকে প্রতিফলিত করবার শিল্প-মুকুর উপন্যাস। আর ছোটগল্পে পূর্ণ চাঁদের আলোক দোলায় নিজের অফুরন্ত রূপৈশ্বর্যকে যেন বিম্বিত করে দেখেন জীবন-শিল্পী পদ্মদীঘির স্ফটিক জলে।

ঊনবিংশ শতকে বাংলাসাহিত্যের বিচিত্রমুখী বিস্তার ঘটে অত্যন্ত ক্ষিপ্র-গতিতে। প্রেম-মিলন-বিরহের বহুল উচ্চারিত আবেগায়িত কথামালার বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে রাজনীতি ও সমাজনীতির বহুমুখী প্রেক্ষাপটে। মানুষের নানাধরণের উপজীবিকাগুলি গল্পের আলোকফলকে ভাস্বর হয় বাঙালি লেখকের হাতে। বিভূতিভূষণ-মানিক-তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সূচিত সাহিত্যের গতিশীল প্রবহমানতার তরঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্র-বুদ্ধদেব বসু-শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়-অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও দোলায়িত হয়েছেন নিত্যনতুন ছন্দবৈভবে। নতুন জীবনের গল্প এবং জীবনের নতুন গল্প নিয়ে শুরু হয় নতুন করে বাংলা ছোটগল্পের পথচলা। গল্পের এলাকা ছড়িয়ে পড়ে নদী থেকে সমুদ্রে। দেশান্তরে, দূরে, দুর্গমে, অরণ্যের নির্জনতায়। বৈশ্বিক সীমানার রোদ্দুরে ছায়া ফেলতে ফেলতে তেজস্বী পদক্ষেপে বাংলা ছোট গল্প প্রাগ্রসর হয়।

'ভারতী' পত্রিকাতে বাংলা ছোটগল্পের সার্থক পরিণতি ও পালাবদল ঘটেছিল। কল্পনাপ্রবণতা অপেক্ষা বস্তুনিষ্ঠ ভাবনার প্রতি 'ভারতী' পত্রিকার কোন কোন তরুণ লেখক আগ্রহ দেখান। তাঁরা হঠাৎ ডেমোক্রেসির প্রেরণা অনুভব করেন। জীবনের বহু অপরিচিত, স্বল্প পরিচিত কিংবা অনালোকিত অংশের ওপর আলো ফেলে ফেলে নিবিড় নিরীক্ষণ করতে উৎসাহী হয়েছেন এঁরা। জীবনের নানান ক্ষেত্র থেকে সৃষ্টির জন্য নানা উপকরণ জোগাড় করে এনেছেন। সেই বহুর উপকরণ দিয়ে বিচিত্র ধরনের কাহিনী, চরিত্র ও পরিবেশ গড়ে উঠেছে, যার পরিচয় এর আগে বাংলা কথাসাহিত্যে আর এমন স্পষ্ট করে পাওয়া যায়নি। এঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এঁরা গতানুগতিক-পন্থী নন, রক্ষণশীলতার অনুরাগী নন, প্রচলিত সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ ও প্রথাগত বিশ্বাসের অন্ধ সমর্থক নন। এঁরা সাহিত্যে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত বাস্তবমুখী আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সমাজ নিষিদ্ধ দেহসচেতন কামনা-বাসনাকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু এই 'ভারতী'র আসর যখন প্রায় প্রাণহীন হয়ে যায় তখন কয়েকজন তরুণ মিলে 'কল্লোল'

পত্রিকা প্রকাশ করেন। অচিন্ত্যকুমার এই নতুন উদ্যোগে যোগ দিলেন। তিনি বলেছেন -‘কল্লোল’ মানেই ‘উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধাবন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।’[১]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছোটগল্পগুলো পর্যালোচনা করলে লক্ষ করা যায় যে, সেখানে রয়েছে জীবনবোধের শূন্যতা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, রোমান্টিক প্রণয়াবেগ, অবচেতন মনের যৌবনাবেগ, প্রেমের মধ্যেই পরম মুক্তির স্বাদ। সমাজের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত বা ব্রাত্যসমাজের চরিত্রের মধ্যেও তিনি এই একই সুরের ধ্বনিব্যঞ্জনা শুনতে পেয়েছেন। প্রত্যেকটি গল্প অভিজ্ঞতার উষ্ণস্পর্শে জারিত। ছোটগল্পের যে যে বৈশিষ্ট্য আঙ্গিক ও ভাবগতভাবে থাকা উচিত যেমন ব্যঞ্জনা, বৃত্তরচনা, বিস্ময়, একমুখী গতি ইত্যাদি -তার প্রায় প্রত্যেকটি উপাদানই অচিন্ত্যকুমারের প্রতিটি গল্পে বিদ্যমান। ঋজু, তীক্ষ্ণ ও সমাজ সচেতন গল্পগুলোতে রূঢ় বাস্তবতার প্রতিফলনের আধিক্যও যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর তির্যক ও বক্তব্যপ্রধান গদ্যরীতি তাঁকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে। প্রতিভার বহুমুখী সৃষ্টিবৈচিত্র্য তাঁকে অনন্যসাধারণ করে তুলেছে। তিনি একক ও ইউনিক। অচিন্ত্য নির্মিত প্রতিমা নিছক মৃন্ময়ী মূর্তি নয়, প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা দেবী স্বরূপিনী। নিত্য নতুন স্বচ্ছ ক্যানভাসে, হরেক রঙের ট্রিটমেন্টে তাঁর গল্পের চরিত্র ও ঘটনাগুলি শুধু তথ্য নয় একেবারে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত।

লেখকের নিজের ভাষাতে- ‘ছোটগল্প সেই লিখতে জানে যে লেখার মাঝে থাকতে পারে না লিখে। স্তব্ধতা অনেক সময় বাক্যের চেয়ে মুখর, সংযম অনেক সময় সংগ্রামের চেয়ে প্রবল, তেমনই ছোটগল্পের বেলায় অল্পতাই হচ্ছে বহুলতা, নির্ভূষণতাই অলঙ্কার। তার প্রয়োগফল সামান্য কিন্তু যোগফল বৃহৎ।...পদ্মপাতায় নিটোল যে সম্পূর্ণ শিশিরবিন্দু, আপনার বৃত্তের মধ্যে সে সংহত, তেমনই হবে ছোটগল্প আপনার বৃত্তের মধ্যে বিধৃত পরিমিত: অকিঞ্চিৎকর চাঞ্চল্যে তার ভারকেন্দ্র যাবে টলে, সে তার ধর্ম হারিয়ে হয়ে উঠবে হয়ত উপন্যাসের অংশবিশেষ। এই পরিমাণবোধ হচ্ছে ছোটগল্পের নিরিখ।’[২]

সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাজের উঁচু তলা থেকে শুরু করে নিচুতলা পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্র তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে।

দুর্ভিক্ষ, দাঙা, মন্বন্তর, মহামারীর মত আরও অনেক ক্ষত আছে, সমাজে সেগুলো প্রকাশ্যে না হোক ফল্গুধারার মতো অন্তরালে প্রবাহিত। সমাজের বুকে দগদগে ঘা সৃষ্টিকারী এ বিষয়গুলোকে তিনি সাহিত্যের উপজীব্য করে তুলেছেন নির্দ্বিধায়। ‘যতনবিবি’, ‘সরজমিন’, ‘কালনাগ’, ‘পাপ’, ‘সিঁড়ি’, ‘ঘুষ’ প্রভৃতি গল্পগুলোতে পারিবারিক ও সমাজজীবনের যন্ত্রণাদগ্ধ, অন্ধকার জীবনের বিশেষ দিকগুলোকে তুলে ধরেছেন, যেখানে ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির বিশ্বাস, স্বামী-স্ত্রীর অন্তর্গত বোঝাপড়া, মানবিক সম্পর্ক সবকিছুই কালোমেঘের আস্তরণে ঢাকা পড়ে যায়।

সমাজে যারা অন্ত্যজ শ্রেণির বা নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ সাধারণত তারা অপাংক্তেয় হিসেবেই বিবেচিত হয়। উপেক্ষিত, অবহেলিত এই শ্রেণির জীবনগাথা সাহিত্যে যুক্ত হবার বিষয় নয়। কিন্তু লেখকরা হলেন মহাশিল্পী, জীবনের রূপভাষ্যকার। তাই সাহিত্যের অক্ষয়পাত্রে অতি সামান্য মানুষ বা শ্রেণিও অমৃত সাহিত্যসম্পদ রূপে সংরক্ষিত হয় এক অনুপম শৈল্পিক কৌশলে। অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পের মধ্যেও অন্যান্য অতি সাধারণ বিষয়ের মধ্যে নিম্নবিত্ত মানুষেরাও বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। তাদের জীবন যাপন প্রক্রিয়া, দরিদ্রতা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের টানাপোড়নে দাম্পত্য দ্বন্দ্ব, কলহ প্রত্যেকটি বিষয়কেই তিনি দক্ষতার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির মহামন্ত্রে অসামান্য করে তুলেছেন। 'জাত-বেজাত', 'মুচি-বায়েন', 'হাড়ি হাজরা', 'মেথর ধাঙড়', 'খেলাওয়ালী' গল্পগুলোতে এই শ্রেণির করুণ যন্ত্রণাক্লিষ্ট অবয়ব পরিলক্ষিত হয়। আশিসকুমার দে অচিন্ত্যকুমারের রচনাকে মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন এভাবে -

'যদি বলি কল্লোলীয়দের মত অচিন্ত্য দেহবাদী তাহলে ভুল হবে। রবীন্দ্র-উপন্যাসের কামনার তপ্তশ্বাস মাঝে মাঝে থাকলেও তাকে নানাভাবে বিপথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সামাজিক অঙ্গুলি হেলনে অথচ বাংলা উপন্যাসের এই সমস্যাটি অচিন্ত্যকুমার বুঝেছিলেন। হয়তো এই সমস্যার মূল আরও গভীরে, সেখানে সমাজই এর কারণ। দেহক্ষুধা ও মানসিক ক্ষুধার অতৃপ্তিবোধের চিত্র শুধু না এঁকে একে অস্তিত্বের সংকটরূপে হাজির করেছেন। ...নিজের বক্তব্য সপ্রমাণে তিনি ঘটনা চরিত্র নাটকীয়তার মাঝখানে একটি ভাবনার জাল তৈরি করেন। সেখানে তিনি একক নন, তিনি স্বতন্ত্রচারী ভাবুক।'[৩]

মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ বা ধর্ম হল মনুষ্যত্ববোধ বা মানবতাবোধ। প্রাণিজগতে সবচেয়ে উন্নত বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী মানুষ সমস্ত সংকীর্ণতার, সমস্ত বিভেদের সীমা অতিক্রম করে নশ্বর এই ধরণীতলে শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত স্থান করে নেয় যে গুণের দ্বারা, তা-ই হ'ল মানবতা–যা অবিনশ্বর, চিরন্তন ও চিরভাস্বর। মানুষ যখন স্বীয় স্বার্থ বিস্মৃত হয়ে পরের মঙ্গলসাধনে ব্রতী হয়, তখন তার হৃদয়নিঃসৃত সেই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাই হ'ল মানবিকতার আহ্বানজাত। আর এই মানবিকতার মধ্যেই বিরাজিত সমাজ, দেশ তথা আন্তর্জাতিক কল্যাণের মূলমন্ত্র। কলা-সংস্কৃতি-সাহিত্য জীবনসম্পৃক্ত না হলে তা নিতান্ত মূল্যহীন ও নিরর্থক হয়ে পড়ে।

জীবনকে সাহিত্যের দর্পণে প্রতিফলিত করা সাহিত্যিকের কাজ। কিন্তু জীবনের বাস্তবতা রূপায়ণ করতে গিয়ে সাহিত্যিক যদি তার অনুপুঙ্ক্ষ মালিন্যকে তুলে নেন, তার গভীরতার তাৎপর্যকে অবহেলা করেন, তবে সেই সৃষ্টিকে মহৎসাহিত্য বলা যৌক্তিক নয়। শতছিন্ন ও ধূলিমলিন বাস্তবের মাঝখানে যখন মানবীয় দীপ্তির উদ্ভাসন হয়, মানুষের চেতনা-মন-মননের দীপশিখা জ্বলে উঠতে দেখা যায়-তখনই কালজয়ী লক্ষণে চিহ্নিত হয় সাহিত্যের রূপরেখা। গল্পকার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যে বিশেষ যুগ পরিবেশে সাহিত্যরচনায় ব্রতী হয়েছেন সেই কালটা ছিল সময় সচেতনতার। নানামুখী সংঘাত সংকটে বিপর্যস্ত মানুষকে দেখতে পাওয়ার সূত্রে মানবসত্তার অপমান-অবক্ষয় এবং সেখান থেকে তার উত্তরণ– এ সব কিছুই নিবিড় দৃষ্টিভঙ্গীতে পর্যবেক্ষণ করেছেন অচিন্ত্যকুমার। রচনা

করেছেন মনুষ্যত্ববোধের নির্যাসস্নিগ্ধ মানবগাথা। উপন্যাসে ও কবিতায় সে সবের যেমন প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি তাঁর ছোটগল্পের মধ্যেও মানবতার সুরভিত উপস্থাপনা লক্ষ করা যায়। 'হাড়ি হাজরা', 'চিতা', 'রং নাম্বার', 'ছুরি' প্রভৃতি গল্পগুলো মনুষ্যত্ববোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে।

শ্রেষ্ঠগল্প, সেরাগল্প, স্বনির্বাচিত গল্প, প্রেমের গল্প, শতগল্প প্রভৃতি সংকলন ছাড়াও অচিন্ত্যকুমারের গল্পগ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশটি। এগুলোর মধ্যে প্রথম সংকলন 'টুটাফুটা' বেরিয়েছিল পৌষ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে। আর সর্বশেষ সংকলন 'একরাত্রি' বেরিয়েছিল অগ্রহায়ণ মাসের ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে। হিসেব করলে দেখা যায়, প্রায় ৪৪ বছর তাঁর গল্পপ্রকাশের কালসীমা। 'প্রগতি' (পৌষ-মাঘ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় বলা হয়েছিল 'কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের এই রূঢ় অসামঞ্জস্যই অচিন্ত্যবাবু তীব্রভাবে বারবার প্রকাশ করতে চেয়েছেন।' শতগল্প সংকলনের ভূমিকায় 'দুইবার রাজা' গল্পটিকে লেখক তাঁর প্রথম সাড়া জাগানো গল্প বলেছেন। 'কল্লোল' পত্রিকাতেই বলা হয়েছিল অচিন্ত্যকুমারের গল্পে আছে কবিপ্রতিভা এবং খুঁটিনাটি সাধারণ প্রসঙ্গকে গল্পে আনার দক্ষতা। সুকুমার সেন এ পর্যায়ের গল্পে দেখেছেন 'যৌন বিষয়ে উৎকট বে-আব্রু মনোভাব',[৪] ভূদেব চৌধুরী পেয়েছেন ' জীবন সংযোগ রহিত অদম্য যৌবন পিপাসা' এবং 'বিলাসী ভাবালুতা' যার থেকে ক্রমশ শক্ত মাটিতে পদক্ষেপ।[৫] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় পেয়েছেন - 'চরিত্র সৃষ্টি বৈচিত্র্য ও পরিস্থিতি সৃষ্টি বৈচিত্র্য'।[৬]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছোটগল্পের দ্বিতীয় পর্যায় বলা যেতে পারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকে। 'যতনবিবি'(১৩৫০), 'সারেঙ'(১৩৫৪), 'হাড়ি মুচি ডোম'(১৩৫৫) প্রভৃতি ছোট গল্পগ্রন্থ সেই সময়েরই উদাহরণ বহন করে। বিশ ও ত্রিশ দশকে তাঁর গল্পে ছিল শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের ও নিম্নবিত্তের আশাভঙ্গের দীর্ঘশ্বাস, দারিদ্র্যের কশাঘাত আর রোমান্টিকতার সহাবস্থান। আবার চল্লিশে দৃশ্যপট বদলে এল কাছারি আদালত, মফঃস্বলী মানুষ ও মামলা- মোকাদ্দমায় সর্বস্বান্ত মানুষের জীবনযাত্রা। এ জীবন 'রুক্ষ করুণ এবং কৌতুক' মিশ্রিত। যুদ্ধ, দাঙা, মন্বন্তরের প্রসঙ্গ এসেছে তাঁর অনেক গল্পে, বিশেষ করে কলকাতা আর মফস্বল বাংলার যাপিত জীবনে। দুর্ভিক্ষ বা দাঙ্গার গল্পে তিনি যতটা ব্যক্তিক ট্র্যাজেডী নির্মাণে নিপুণ ঠিক ততোটা সামাজিক তাৎপর্য অন্বেষণে ব্যগ্র নন। জ্ঞাতব্য বিষয় হিসেবে স্মরণীয় 'সারেঙ' গল্পগ্রন্থটি বিষ্ণু দে কে উৎসর্গ করা হয়। বিষ্ণু দে -ও প্রবন্ধ লিখে বলেন, বাংলা উপন্যাস সাবালক হয়ে উঠছে অচিন্ত্যর মতো লেখকদের হাতে। তিনি অচিন্ত্যকে তুলনা করেন হেমিংওয়ের সঙ্গে।'[৭]

বুদ্ধদেব বসু 'একটি খোলা চিঠি' নামক রচনায় (৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪) অচিন্ত্য সাহিত্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন ' উপন্যাসের রোমান্টিক ধারায় যেমন 'ঘরে বাইরে'র বিমলা, তেমনি মণীন্দ্র বসুর 'রমলা'-র পরের সবচেয়ে সার্থক রচনা তোমার 'বেদে'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন গল্প সম্পর্কে বলেন – 'তোমার কৃতিত্ব এই, তুমি ঠিক মতো দেখেছিলে তাদের, ফুটিয়ে তুলেছিলে বিনা পক্ষপাতে, যথোচিত মাত্রায় করুণা ও ব্যঙ্গ মিশিয়ে,

সংলাপে প্রয়োজনমতো চমৎকার উপভাষা ব্যবহার করে... ।' বুদ্ধদেব এটাও বলেন 'তোমার অভ্যস্ত শব্দ প্রয়োগের দক্ষতা ও শ্লেষ যমকের চাতুর্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গভীরতর একটি জীবনদর্শন। আমি পড়ে আনন্দ পাচ্ছি।'[৮]

প্রাঞ্জল ভাষাপ্রবাহ, বিষয়ভাবনা, বর্ণনার সরসভঙ্গী, সজীব চরিত্র-চিত্রণ ইত্যাদি উপকরণ মিলে ছোটগল্পে পরিলক্ষিত হয় বস্তুনিষ্ঠ প্রাণধর্মিতা। তাই রচনাশৈলী, কাহিনীবিন্যাস ও চিত্রকল্প নির্মাণের ওপর ছোটগল্পের সার্থকতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছোটগল্পের মূল্যায়ন করার প্রারম্ভিক পর্যায়ে ছোটগল্পের প্রকৃতি সম্বন্ধে লেখক নিজেই তাঁর 'একশ এক গল্প' এর ভূমিকায় বলেছেন–

'ছোটগল্পের যদি কোন জ্যামিতিক চেহারা থাকত তবে সে সরলরেখা হত না, হত বৃত্তরেখা। গল্প যদি খালি সোজা চলে তবে হয় সে শুধু বৃত্তান্ত, কিন্তু যদি চলে বৃত্তরেখায়, তার বৃত্তের অন্তে সে হয়ে ওঠে সত্যিকারের ছোটগল্প। যেখানে বৃত্ত যত বেশি সম্পূর্ণ সেখানে ছোটগল্প তত বেশি সার্থক। যতদূর সোজা যাক, এক সময়ে গল্পকে মোড় ঘুরতে হবে, নিতে হবে তির্যক বাঁক, উড্ডীন বিহঙ্গের বঙ্কিম ও ত্বরিত প্রত্যাবর্তনের আকারে; সোজাপথটা যে পরিমাণে মন্থর ছিল, ফিরতি পথটা হতে হবে ততোধিক ত্বরান্বিত। প্রতিক্ষেপ বা প্রতিঘাতের এই বেগবলটাই হচ্ছে ছোটগল্পের প্রাণশক্তি। অর্থাৎ কাহিনী যেখানে এসে বাঁক নেবে, যেখানে প্রতিঘাত যত বেশি প্রবল হবে ও যত বেশি দ্রুত সে ফিরে আসবে তার পরিক্রমা শেষ করে তার প্রথম প্রারম্ভবিন্দুতে, তত বেশি সে রসোত্তীর্ণ হবে। এক কথায়, গল্প যদি না ঘুরল তবে সে বেঘোরে পড়ল, যদি চলতে চায় সে সিধে তবেই সে অসিদ্ধ।'[৯]

গল্পকার তাঁর প্রতিটি গল্পের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলো রক্ষা করতে ঠিক সার্থক হতে পারেন নি। কারণ স্বতঃউৎসারিত লেখার এই বিধিবদ্ধ নিয়মগুলো প্রায়শই খাটে না বললেই চলে। তবুও লেখক অনেক গল্পের ক্ষেত্রেই তাঁর এই নিজস্ব ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। নানারকম তুলনা-উপমা দিয়ে এ বৃত্তের স্বরূপ বুঝিয়েছেন। তাঁর ছোটগল্প সম্পর্কে সমালোচকগন ভিন্ন ভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। প্রথম দিকের রচনায় তিনি যুক্তির চেয়ে আবেগকে প্রশ্রয় দিয়েছেন বেশি। আত্মপ্রকাশের প্রাথমিক আবেগ কেটে গেলে মধ্যপর্বের রচনায় তিনি হয়ে ওঠেন কিছুটা যুক্তিপ্রবণ ও নিরীক্ষাপ্রবণ। এই নিরীক্ষা যেমন ছিল বিষয় ও আঙ্গিকগত তেমনি ছিল শব্দ, ভাষা ও রচনারীতিগত। বিচিত্র বিষয়, প্লট, বিন্যাসরীতি ও রচনারীতির মিথস্ক্রিয়ায় তাঁর ছোটগল্পগুলো অল্প-বিস্তর সাফল্য অর্জন করেছে। তবে এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অচিন্ত্যকুমারের ব্যবহৃত ভাষা তাঁর ছোটগল্পের বিষয়ের সঙ্গে যথাযথভাবে অন্বিত হয়না। ভাষার দিকে মনোযোগের প্রাবল্য থাকায় তাঁর ছোটগল্পের শিল্পগুণ প্রায়ই ব্যাহত হয়েছে। তাছাড়া তাঁর ছোটগল্পের রচনাশৈলী ও গদ্যভাষায় রয়েছে কবিতার নিগূঢ় অনুভূতি ও লালিত্য। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য এক্ষেত্রে স্মর্তব্য-

'যদিও বুদ্ধদেব বসুর ব্যক্তিগত রচনার গদ্যের আমি রীতিমতো ভক্ত এবং অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পের ক্ষুরধার গদ্য বহুবার আমাকে মুগ্ধ করেছে তথাপি দেখেছি উভয়েরই ভাষা উপন্যাস- নিরপেক্ষভাবে শাণিত ও উজ্জ্বল। লেখকের

উপন্যাস সম্বন্ধে ধারণার অসঙ্গতি থেকে এগুলো জন্মায়। আর আশ্চর্য, ছোটগল্পের গদ্যের চাল যে উপন্যাসে অচল অচিন্ত্যকুমারের শেষতম উপন্যাস পড়ে মনে হলো সেটা তিনি স্বীকার করেন না।'[১০]

গল্পের সূচনা বিলম্বিত কিন্তু বাঁক ফেরার পর তার গতি দ্রুত। 'দুইবার রাজা' গল্পে বোহেমিয়ান জীবনের ছক এগিয়েছে কিন্তু বিয়ের পর নায়কের দ্রুত মৃত্যু ঘটিয়ে গল্পের গতিকে লেখক বৃত্তের বিন্দুতে মিলিয়েছেন। 'অরণ্য' গল্পে বড় বাড়ির কল্লোল-কোলাহলের বর্ণনায় লেখক অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন, কিন্তু বুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যখন বাড়ির সমস্ত মানুষগুলোর নিঃসঙ্গ জীবনকে ঘুচিয়ে দিলেন তখনই বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। পুত্রশোকাতুর মা সরবানু ও পুত্রশোকাতুর পিতা রোস্তম পুত্রস্নেহে একত্র হয়েছে। এখানেও সেই বৃত্তের তাৎপর্য। 'রং নাম্বার' গল্পের প্রারম্ভ চটুল ও উপভোগ্য। হালকা সাবলীল গতিতে গল্প এগিয়ে যায়। কিন্তু বাঁক নেবার পর যখন গল্পরস ঘনীভূত হয় তখন 'শুধু মনে রেখো। মনে স্থান দিয়ো'- এই মর্মান্তিক বাক্যদ্বয়ে সে গল্প শেষ হয়ে বৃত্ত সমাপ্ত হয়। ছোটগল্পের এই বৈশিষ্ট্য অচিন্ত্যকুমারের অনেক গল্পেই সহজলভ্য। 'রুদ্রের আবির্ভাব' গল্পের পটভূমিকায় ভয়াবহতা গল্পের রসকে ঘনীভূত করেছে। তবে নদীর বর্ণনার অংশে তিনি আরো সংযমী হতে পারতেন। এক্ষেত্রে মনে হয়, গল্পকার গল্পের আদি এবং অন্ত যেমন ভেবেছেন, তেমনি কোন কোন গল্পে চরিত্র চিত্রণ অপেক্ষা কোন একটি বক্তব্যকে পরিস্ফুট করবার জন্য গল্পের অবতারণা করেছেন। ফলে চিত্র সৌন্দর্য অপরূপ হওয়া সত্ত্বেও মানুষগুলির আচার-আচরণ কখনও দুর্বোধ্য, কখনও বা আকস্মিক। আবার কোন কোন গল্পে উদ্দেশ্যমূলক প্রবণতা গল্পের সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যেমন 'মৃত্যুদণ্ড' গল্পটি। কোন কোন গল্প এই কারণে চিত্রসৌন্দর্যে উজ্জ্বল, কাব্যভাষায় গাঢ় কিন্তু গল্পরসে ত্রুটিযুক্ত। অচিন্ত্যকুমার গল্পে বিস্ময় উৎপাদনের কথা বলেছেন। এ বিস্ময়কে তিনি আকস্মিক চমকের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। 'ডাকাত' গল্পে দর্জন আলির রূপান্তর, কুরমানের নুরবানুকে অস্বীকার, যতনবিবির সাহেবের নৌকায় যাত্রা, বুষের মৃত্যু, আকস্মিক কিন্তু অস্বাভাবিক নয়।

অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পে একদিকে যেমন কল্লোল-কোলাহল, আনন্দ-উদ্বেলতা দেখা যায় তেমনি অন্যদিকে গভীরতা সন্ধানে একনিষ্ঠ আত্মনিয়োগ লক্ষণীয়। তিনি বিশেষ কোনো মতবাদের দ্বারা চালিত হন নি, আবার অন্য কোন মতবাদকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞাও করেন নি। এই সাবলীল চলিষ্ণুতা ও সর্বত্রগামিতা অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য। তিনি কখনো স্বীয় অভিজ্ঞতার বাইরে বিচরণ করেন নি আবার এমন কোন সমস্যারও অবতারণা করেন নি যা আরোপিত। তাঁর গদ্যশৈলী সম্পর্কে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা যায়, যেখানে তাঁর নিজস্ব চিন্তা-চেতনার স্ফূরণ প্রতিভাত হয়।

ক. 'ভদ্র প্রেম, বৈধ প্রেম, শুদ্ধ প্রেম, এমন কিছু আছে নাকি সংসারে? ভদ্র প্রেম না সোনার পাথরবাটি। বৈধ প্রেম না কাঁঠালের আমস্বত্ত্ব। আর শুদ্ধ প্রেম, কি বলব, অশ্বডিম্ব। প্রেম প্রেম। প্রেমের কোনও বিশেষ্য-বিশেষণ নেই। ... হৃদয়ে প্রেমের সমুদ্র নিয়ে জাগব অথচ স্তব্ধ থাকব, উত্তাল হব অথচ উদ্বেল হব না, এ পারব না

সইতে।... ঢিমে তেতালা ঢোঁড়া সাপ হব না, ফণাতোলা ছোবল মারা কেউটে হব। দংশন না হলে গরল নেই। সজীব সংযোগ না হলে সিদ্ধি নেই।' (পাশা)

খ. 'সংসারে ঐ দুই জাতই আছে। তা হিঁদু-মুছলমান নয়। তা গরিব আর বড়লোক। খাতক আর মহাজন। মক্কেল আর উকিল। প্রজা আর মুনিব। দুব্বল আর জোরদার। মুই বোজছি এতদিনে। এক জাত যে খায়, আরেক জাত যে খাওয়ায়। এক জাত যে মারে আরেক জাত যে মরে। কও তুমি, ঠিক কইনা? একজাত মোরা, আরেক জাত হ্যারা' (জাত বেজাত)।

গ. 'চুনীলালের মৃত্যুতে দামিনীভূষণ উদারতার চমৎকার একটা সুযোগ পেয়েছেন বটে। ভাগ্যিস সে মরেছিল, নইলে তাঁকে এমন মহৎ বলে হয়ত আমরা দেখতে পেতুন না। ... যতদিন চুনীলাল বেঁচে ছিল কেউ তাকে চিনত না, আজ তার মৃত্যু সমস্ত দেশের কাছে একটা অনপচেয় ঐশ্বর্য। জীবনে সে ছিল নির্বাক, নির্বাপিত, কিন্তু মৃত্যুতে সে আজ মুখর, অন্ধকারে সে আজ দীপ্যমান। মৃত্যুই আজ তার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন, শ্রেষ্ঠ রচনা।' (আর্টিস্ট)

ঘ. 'এতো সামান্য চুরি। কখনও কখনও আবার তেন্নাথের মেলা হয়। ড্রাইভার, গার্ড আর ক্যাবিন-ম্যান-ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর-ত্রিনাথের যোগাযোগ। সে সব পুকুর চুরি না বলে বলতে পারে গুদোমচুরি। ক্যাবিনম্যান আউটার সিগন্যাল খারাপ করিয়ে রাখে। সিগন্যাল যদি কাজ না করে, তবে গাড়ি চলে কি করে? ড্রাইভারকে তাই আউটার সিগন্যালের কাছে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়। জি.টি.আর.–এ ভাল করে কৈফিয়ত লেখে গার্ড। ডিসট্যান্ট সিগন্যাল আউট অফ একশন। সিগন্যাল সরিয়ে ফের চালু করতে কম-সে-কম দশ পনেরো মিনিট লাগে। আর সেই দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই চিচিংফাঁক-যাকে বলে গুদোম সাবাড়।' (গার্ডসাহেব)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছোটগল্প প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- 'অচিন্ত্যকুমারের ব্যক্তিজীবনলব্ধ অভিজ্ঞতার বিপুল প্রসার ও সজীব প্রত্যক্ষতাই আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। ...তিনি বাঙলার প্রায় প্রতিটি পল্লী ও শহর অঞ্চলে ঘুরেছেন।...আইনের নাগপাশে বদ্ধ মানুষের মনে যে নব নব জটিলতা ফাঁস পাকায়, যে অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া নাটকীয় সংঘাত ঘনীভূত করে... অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পে তার অপূর্ব রসরূপ দানা বেঁধে উঠেছে।' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যটিও মূল্যবান–'অচিন্ত্যকুমারের গল্পভাণ্ডার যেমন ব্যাপ্ত, তেমনি বিচিত্র। মধ্যবিত্ত মননের তিনি নির্মম ব্যাখ্যাতা, রোমান্টিক সৌন্দর্য চেতনায় তিনি উদ্ভাসিত, আবার বাংলাদেশের একান্ত গ্রামীণ জীবনের সুখ-দুঃখ প্রেমে বেদনার তিনি আশ্চর্য দ্রষ্টা।... মন্বন্তরের গ্রাম-গ্রামান্তকে ক'জন চেনাতে পেরেছেন অচিন্ত্যকুমারের মতো?'[১১]

কবিত্বময় ভাবুকতা, শিল্পী মানসিকতা ও সাহিত্যের ঋতুবদলের অগ্রদূত হিসেবে তাঁর জীবনবোধের আরম্ভ। তিনি জীবনের ব্যাখ্যাকার নন, তিনি জীবনের রূপকার। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিকোণ নিয়ে কোন নির্দিষ্ট সীমানায় দাঁড়িয়ে জীবনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তাঁর ধর্ম নয়, অন্তর্ভেদী কবিদৃষ্টি দিয়ে জীবনকে প্রত্যক্ষ করে শিল্পীর সাধনায়

তাকে রূপায়িত করে তোলাই তাঁর প্রকৃতি। জীবনব্যাপী স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার অসামান্য রূপকার হিসেবে বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে তিনি তাঁর শিল্পীচৈতন্যের স্বাতন্ত্র্য নির্মাণ করেছেন সহজেই।

তাঁর গল্পশৈলী কথিকাধর্মী, কথোপকথনের স্বচ্ছতা তার পদে পদে। তাঁর গল্পপ্রকরণের মুখ্য বিষয় হলো, কথা–গল্পকে ছাপিয়ে ওঠে 'কথকতার ঝঙ্কার।' গল্পের প্লটের চেয়ে ঝংকৃত ও ব্যঞ্জনাধর্মী কথকতাময় বর্ণনা, আর চমকপ্রদ শব্দবিন্যাস তাঁর মনকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করেছিল। জীবন প্রাসঙ্গিক কথা, শব্দ ও বাচনভঙ্গীর খুঁটিনাটির প্রতি তিনি ছিলেন খুবই কৌতূহলী। সে কারণেই একান্ত অন্তরঙ্গ গ্রামীণ শব্দ, কখনো পরিবেশ উপযোগী চরিত্রানুগ শব্দ ও বাক্‌রীতি ঘনিষ্ঠ আকার পেয়েছে গল্পের শরীরে। তিনি ছিলেন চিরনবীনতার সঙ্গী। তাঁর সাহিত্য রচনায় সুনির্বাচিত শব্দের ছন্দ-স্পন্দন লক্ষ্য করা যায়। ভাষা ও শব্দের বিন্যাসে এবং আঙ্গিকের পরীক্ষায় তিনি সবসময়ই অক্লান্ত ও নিরীক্ষাধর্মী। প্রবোধকুমার সান্যাল -এর মন্তব্য এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য -'শব্দ যেন নেচে বেড়ায় তাঁর আঙুলের ডগায়। অনুপ্রাস ব্যবহারের এমন তির্যক ভঙ্গি অপর কারও আছে কিনা আজও খুঁজি। এই অনুপ্রাসের সমারোহ তাঁর যে কোনও বইয়ে সুস্পষ্ট, কিন্তু সুদক্ষ শিল্পীর লিপি কৌশলের গুণে কোথাও সেগুলি বিরক্তিকর হয়ে ওঠে নি। অলঙ্কার প্রয়োগেও তিনি সিদ্ধহস্ত।'[১২] তিনি দীর্ঘজীবনব্যাপী অসংখ্য গল্প রচনা করেছেন। তাঁর 'কালো রক্ত','ডবলডেকার', 'ঊর্ণনাভ', 'মন্দাক্রান্তা', 'যে যাই বলুক','অন্তরঙ্গ' বেশ জনপ্রিয় রচনা। জনপ্রিয়তা কখনোই সাহিত্য সফলতার মাপকাঠি নয়। তাই তাঁর গল্পের কাহিনী প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও গল্পের বিষয়বস্তু, আবেগ-কল্পনা, দুঃখ-যন্ত্রণা, বাস্তবতা এবং ভাষাশৈলী একটি সামগ্রিক ঐক্যসূত্রে সর্বত্র সমন্বিত হয়ে উঠতে পারে নি। অচিন্ত্যকুমারের গল্পরীতি কোথাও কোথাও আলাদাভাবে শিল্পগুণসম্পন্ন হয়ে উঠলেও গল্পরীতির সামগ্রিকতা কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ন হয়েছে। আর সে কারণেই তাঁর গদ্যরীতি জনপ্রিয় হয়েও সার্থক সাহিত্যের মর্যাদা-বঞ্চিত। তিনি তাঁর গদ্যরীতিতে কবিতার আবেগ সঞ্চার করায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাসকে 'কাব্যধর্মী' আখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, 'উপন্যাসের শেষে যে রেশ আমাদের অনুভূতিতে স্থায়ী হয় তাহা গীতিকাব্যের।...মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ যেন কাব্যের সোনালি কাপড়ের সীমান্তে একটু ছোট পাড়; কবিতার তরঙ্গিত উচ্ছ্বাসকে ধরিয়া রাখিবার জন্য একটু উচ্চ তটভূমি মাত্র।'[১৩]

গল্পের ভাষানৈপুণ্য ও বিষয়ে সামগ্রিক সচেতনতা তাঁর মধ্যে অল্পই ছিল বলা যায়। 'চোখের চাতক', 'সন্ধ্যারাগ,' 'অরণ্য', 'বেদে', 'আকস্মিক', 'টুটাফুটা', 'কাকজ্যোৎস্না' অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকের রোমান্টিক রচনা। এসব রচনার মধ্যে বাস্তবতার স্পর্শ থাকলেও রোমান্টিক স্বপ্ন-কল্পনার আতিশয্য এদের শিল্পমান ও গাম্ভীর্যকে ক্ষুণ্ন করেছে।

প্রকৃত সমালোচক শুধু বিষয়ের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন না, তিনি বিশ্লেষণ করে দেখেন বিষয় শিল্পসম্মতরূপে গল্পপ্রকরণের সঙ্গে সমন্বিত ও সম্পৃক্ত হয়েছে কিনা। তাঁর বিচার বিবেচনার বিষয় কাহিনীর শিল্পগুণ। 'গার্ড সাহেব', 'ঘুষ', 'থার্ডক্লাস' 'পিকআপ', 'খাখ্'- গল্পগুলোর শিল্পমূল্য খুব উল্লেখযোগ্য নয়।

'অধিবাস' (১৯৩২) গল্পগ্রন্থে বাঁধনহারা ও অসংযত আবেগ তুলনামূলকভাবে কম দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ভাষাশৈলী হয়েছে প্রাসঙ্গিক, যৌক্তিক এবং শিল্পসফল।

প্রকৃতপক্ষে অচিন্ত্যকুমার কল্লোলপর্বে জীবনের ব্যাপক ও গভীর অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন নি। তারুণ্যের চঞ্চল উদ্দীপনার প্রচলিত বন্ধনসীমা চূর্ণ করে ব্যক্তির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার উত্তেজনাই তখন তরুণ লেখকের মধ্যে প্রবল। তার মধ্যে সর্বত্র শিল্পসৃষ্টির উপযোগী ধৈর্য-সংযম, স্থিরতা, ভাবসংহতি ও বিন্যাসনৈপুণ্য নেই। কৃত্রিম আকস্মিকতা, অস্বাভাবিক ও অসংযত উন্মাদনা এবং অস্থিরতা লেখকের এ সময়ের অনেক গল্পরচনাতেই লক্ষ করা যায়। তাঁর গদ্যশৈলীতে কাব্যরসের মাত্রাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা কথাসাহিত্যের তটবন্ধনকে প্রায় ভেঙ্গেই ফেলেছে। তাঁর এই কাব্যসৌরভ জীবনকে আবেগ-রঞ্জিত বর্ণিল দৃষ্টিতে অবলোকনের মধ্যে সঞ্চারিত। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানবমনের নিগূঢ় রহস্যময়তা কবিদৃষ্টির মোহমদিরতায় উন্মোচিত। ভাষা, শব্দ ও উপমা প্রয়োগের অনুপুঙ্খ সৌন্দর্য সেই কাব্যচেতনারই স্বতন্ত্র প্রকাশ। অচিন্ত্যকুমার নিজেই বলেছেন-

'কল্লোলকে নিয়ে যে প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস এসেছিল, তা শুধু ভাবের দেউলে নয়, ভাষারও নাটমন্দিরে। অর্থাৎ কল্লোলের বিবুদ্ধতা শুধু বিষয়ের ক্ষেত্রেই ছিল না, ছিল বর্ণনার ক্ষেত্রে। ভঙ্গি ও আঙ্গিকের চেহারায়। রীতি ও পদ্ধতির প্রকৃতিতে। ভাষাকে গতি ও ভাবকে দ্যুতি দেবার জন্যে ছিল শব্দসৃজনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। রচনাশৈলীর বিচিত্রতা। এমন কি, বানানের সংস্করণ।'[১৪] তিনি সুদক্ষ ও নিপুণ কারুশিল্পীর মত কথন-কৌশলকে আয়ত্ত করেছেন। কাহিনী ও চরিত্রসৃষ্টি গল্পের মধ্যে অনেক সময়েই গৌণ হয়ে গেছে। মুখ্য হয়ে উঠেছে কথামালার অজস্র বর্ণাঢ্য ফোয়ারা। ভাষার এই অতিরঞ্জন ও বর্ণবিলাস 'কল্লোলে'র ভাব উচ্ছ্বসিত যৌবনধর্মেরই বহিঃপ্রকাশ। রচনারীতির শব্দ ও উপমার ক্ষেত্রে এই বাহুল্য ও উচ্ছ্বাসকে রবীন্দ্রনাথ লেখকের 'আত্মপ্রতিষ্ঠ পরিণতির' অভাব বলে মন্তব্য করেছেন। অচিন্ত্যকুমারকে লেখা পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- 'তোমার শক্তি এখনো যে আত্মপ্রতিষ্ঠ পরিণতিতে পৌঁছায়নি তার প্রমাণ তোমার ভাষায় উপমার সদাসচেষ্ট প্রয়াস। তোমার উপমা অনেক স্থলেই খুব ভালো, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় তারা স্বস্থানে এসে পৌঁছতে যেন হাঁপিয়ে পড়েচে। তাদের অনেক সময়েই তুমি টেনে এনেচ।'[১৫]

তবে একথা সত্য যে, এই ভাষা, শব্দ ও উপমার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি, মোহগ্রস্ততা ও সচেতনতার ফলে গল্পের কাহিনীর অভ্যন্তরে জীবনের যে প্রবহমান স্রোত প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, তা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হয়েছে, দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।

তবে শেষকথায় এটুকু বলা যায় যে, নিত্যবর্তমান কালের প্রয়োগে রচনাশৈলীকে স্রোতময় করে তুলতে এবং বাংলা গদ্যরীতিকে অলঙ্কারমণ্ডিত করার শিল্পকর্মে তাঁর কবিত্বশক্তি সদাজাগ্রত ছিল। তিনি ভাষার একটি সর্বসাধারণ রূপ আবিষ্কার করে তাকে সর্বশ্রেণির মানুষের কণ্ঠে বসিয়েছেন। তাতে হয়তো বাগভঙ্গির বিশুদ্ধতা

সর্বদা রক্ষিত হয়নি কিন্তু তা যে বাংলা সাহিত্যকথাকে অতুলনীয় ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়- এর অভিমত স্মরণযোগ্য–

‘ভাষার দিক থেকে অচিন্ত্যকুমারের মৌলিক দান অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাঁর সুষ্ঠু, সাবলীল লিখনভঙ্গি তাঁর একমাত্রিক বিশেষণের প্রাচুর্য ও প্রাখর্য তাঁর শব্দসম্পদের লালিত্য ও অপরিমেয়তা তাঁকে দিয়েছে বঙ্গবাণীর দরবারে স্থায়ী অধিকার।’[১৬]

জীবনবোধ ও জগৎ সম্পর্কিত বস্তু-অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞান একজন লেখকের মানস-সংগঠনের মৌলিক উপাদান। সংশ্লিষ্ট লেখকের জীবনদৃষ্টির ক্রমাগত অগ্রযাত্রায় অপরিহার্যভাবে যুক্ত হয় পারিবারিক পরিপ্রেক্ষিত, পারিপার্শ্বিকতা, পর্যবেক্ষণক্ষমতা, কল্পনা ও চিন্তার বৈচিত্র্য এবং সমাজ ও মানুষ সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান। অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পসমূহে মানববৈচিত্র্য, কল্পনাবৈচিত্র্য, রসবৈচিত্র্য, আঙ্গিকবৈচিত্র্য প্রভৃতি অনুষঙ্গ তাঁর লেখার শিল্পকে দিয়েছে ব্যতিক্রমী মাত্রা। আর তাই তাঁর গল্পশিল্প অনায়াসে অর্জন করেছে হীরক দ্যুতিময় অনন্য মহিমা। সাহিত্যশিল্পসৃষ্টির অকল্পনীয় কৌশলে অজানা মহাবিশ্বকে তিনি পাঠকের সামনে দাঁড় করান। সমাজকে পর্যবেক্ষণ করার এক বিশেষ ভঙ্গি এবং অন্তর্জগতের অসীম সৃজনক্ষমতা ও সৃষ্টি-অনুভবের গভীরতা তাঁর ছোটগল্পসমূহের অন্য এক প্রাণশক্তি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কল্লোলযুগের লেখক। তিনি মূলত কবি, গদ্যলেখার ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টি সবসময় কবিতাকে আশ্রয় করেই প্লাবিত হয়। আবার সাহিত্যের জগতেও সৃজনশীল ধারাতে তিনি অবারিত, অজস্র, বৈচিত্র্যময় গল্প–উপন্যাসে অবিশ্রান্ত। তাঁর গল্প-শৈলী বর্ণনাভঙ্গি কথিকাধর্মী। অভিজ্ঞতার প্রগাঢ়তা, বিচিত্রময়তা, সুললিত বাণীরচনা তাঁর গল্পে গভীরতার সৃষ্টি করেছে। অচিন্ত্য প্রতিভার রয়েছে পার্থিবজীবনকে সূক্ষ্মভাবে দেখার বস্তুভেদী বাস্তব দৃষ্টি। তিনি ছিলেন স্বপ্নবিলাসী। দেশকালের সীমাভেদী জীবনসন্ধিৎসু। তাঁর গল্পের পরবর্তী পরিণতি সুধী মহলে কিছুটা মনোযোগ এড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়। কারণ, ভাবাবেগের আতিশয্যে তাঁর লেখনী উদ্দাত যৌবনের ভোগলিপ্সায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে গল্পের অবয়বকে আবৃত করে ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন ‘মিথুন বৃত্তির পৌনঃপুন্য।’ এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য–‘অচিন্ত্যকুমারের লেখায় আধুনিকতা অত্যন্ত প্রবল এবং প্রায় কনভেনশনের মত। গোড়ার দিকে রচনায় যৌনবিষয়ে যে উৎকট বে-আব্রু মনোভাব দেখা যায় তাহা এই কনভেনশনেরই দায়ে।’[১৭]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্প রচনার পটভূমিতে বিশাল প্রভাব বিস্তার করেছে। সমকালীন জীবনের তীরে দাঁড়িয়ে জীবনবোধকে তিনি যেভাবে উপলব্ধি করেছেন ঠিক সেভাবেই তিনি সে রূপকে নিজস্ব মনের মাধুরী মিশিয়ে গল্পের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছেন। যুদ্ধ আর মন্বন্তরের বিষাক্ত অন্ধকারে ছেয়ে যায় তাঁর গল্পের উপাদান আর প্লট। যেমন-‘যতনবিবি’, ‘শেষ চিঠি’, ‘কালনাগ’, ‘সরজমিন’-গল্পগুলো দুর্ভিক্ষ পীড়িত অসহায় মানুষের আর্তনাদের প্রামাণ্য দলিল।

ছোটগল্পের সমগ্র জীবনচেতনায় লেখক বিভিন্ন দিকের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। জীবনের কুৎসিত দারিদ্র্যপিষ্ট, ক্ষুধাপীড়িত, অনাহারক্লিষ্ট, বিদ্রোহক্ষুব্ধ, পাপপিচ্ছিল দিকের প্রতি তিনি মনোযোগ প্রসারিত করেছেন।

তাঁর কাব্যধর্মিতা ছোটগল্পের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরাজমান। জীবনের বিশেষ মুহূর্তগুলোর বিশ্লেষণ প্রণালী একান্তভাবে কবিতাধর্মী। তার গল্পে যে সমস্ত প্রকৃতি-বন্দনা, ঘাত-প্রতিঘাত, চিত্ত বিশ্লেষণ ও মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা আছে তাতে মনস্তাত্ত্বিক সংকট বিশ্লেষণের পরিবর্তে গীতিকাব্যের ঝংকার অনুরণিত। জীবনের সর্বব্যাপী দ্বন্দ্ব-সংঘাত, যন্ত্রণা-হতাশা, দুঃখ-প্রীতি, প্রেম-বেদনার যে ছায়াবৃত রহস্য রয়েছে তিনি সেখানে সমব্যথী হয়ে অবগুণ্ঠন-মোচনে প্রয়াসী হয়েছেন।

তিনি 'কল্লোল' এর অন্যতম প্রতিনিধিস্থানীয় বিশিষ্ট লেখক। তাঁর গল্প-উপন্যাসে কল্লোলচেতনার কতগুলো মুখ্য সুর গীতময় হয়ে উঠেছে। কাজী নজরুল ইসলাম, মনীন্দ্রলাল, দীনেশরঞ্জন, কিংবা গোকুলচন্দ্রের প্রাক-কল্লোল পর্বের রচনায় যে প্রবণতাগুলো প্রচ্ছন্ন ছিল, তাদের বেশির ভাগ উগ্রভাবে বিকাশ লাভ করে অচিন্ত্যকুমারের রচনায়। বৈচিত্র্যময় চেতনারও সঞ্চার হয় তাঁর কথাসাহিত্যে। সব মিলিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে অচিন্ত্যকুমারের মধ্য দিয়ে একটি প্রবল তীক্ষ্ণ তির্যক বেপরোয়া 'বিদ্রোহী' ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে।

তৎকালীন তরুণচিত্তের হতাশা, নিষ্ফলতা ও অবক্ষয় কল্লোলপর্বের সাহিত্য সৃষ্টির প্রবণতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। যে সংশয়, হতাশা ও অবক্ষয় সে যুগের যুবমানসকে ক্লান্ত বিষণ্ন বিধ্বস্ত করে তুলেছিল তা থেকে নিস্তার পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল তদানীন্তন যুব সমাজ। সে যুগের সমাজ ও প্রচলিত মূল্যবোধ ও আদর্শবোধের বিরুদ্ধে স্পর্ধিত শির তুলে সমস্ত কিছুকে সংশয়ের সুতীক্ষ্ণ শলাকায় আমূল বিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তরুণদল। সমাজ ও পরিবারের সমস্ত বন্ধনকে অস্বীকার করে চিন্তায় ও মননে যাযাবর জীবনের নিরুদ্দেশ পথিক হয়ে উঠেছিলেন এঁরা। অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যের প্রধান সুর এই যাযাবর চেতনার। তাঁর সাহিত্যে এই যাযাবর মনোভাব কার্য-কারণ সূত্রে সে যুগের সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সময়ে উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চেতনাবোধের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। এর সঙ্গে একাত্ম হয়েছিল তাঁর কবিমনের দূরচারী বন্ধনহীন রোমান্টিক কল্পনা।

জীবনবোধের ব্যাপক ও গভীর অভিজ্ঞতা কল্লোলপর্বে অচিন্ত্যকুমার অর্জন করতে পারেন নি। যৌবনের সহজ উন্মাদনায় প্রচলিত সামাজিক অনুশাসন ভেঙ্গে ব্যক্তির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই তখন তরুণ লেখকের মধ্যে প্রবল। তাঁর মধ্যে প্রতিটি স্তরে শিল্পসৃষ্টির উপযোগী সংযম স্থিরতা, সুসংহত ভাবের পরিমিতিবোধ ও বিন্যাস নৈপুণ্য নেই। উৎকট অস্বাভাবিকতা ও উদ্ভট আকস্মিকতা এবং অসংযত উচ্ছ্বাস ও অস্থিরতা লেখকের অনেক রচনাতেই চোখে পড়ে। 'কল্লোল' চেতনার মধ্যেই এই হতাশা ও অসংযম এবং জীবন অভিজ্ঞতার অভাব বর্তমান ছিল। ব্যক্তির দুঃখ-যন্ত্রণা, ব্যথা-ব্যর্থতা, আত্মানুসন্ধান, আশা-আকাঙ্ক্ষা, নরনারীর মনস্তাত্ত্বিক অনেক রহস্য মোচন করতে চেয়েছেন এই শক্তিমান শিল্পী। কিন্তু তাঁর রচনায় কাব্যরসের অতিশায়িত ব্যঞ্জনা,

কথাসাহিত্যের বন্ধন শৃঙ্খলকে প্রায়শই ভেঙ্গে ফেলেছে। গল্পে জীবনের যে 'বাস্তব' রূপ ফুটে ওঠে, তাঁর সর্বব্যাপী কবিদৃষ্টির ফলে সেই 'বাস্তবতা' অনেক ক্ষেত্রেই অস্বীকৃত ও অগৃহিত হয়েছে। তার ফলে জীবন-সমস্যামূলক, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক যথার্থ গল্প তাঁর হাতে অল্পই রচিত হয়েছে সে পর্বে। তিনি যৌবনের স্বপ্নবিলাসী দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সে দৃষ্টিতে, তাঁরই ভাষায়, 'রোমান্টিসিজমের মোহ মাখানো।' তারই প্রভাবে তাঁর গল্পে এত নিবিড় কাব্যসৌরভ। কাব্যসুরভিত গল্পগুলিতে লেখক কোথাও নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে জীবনবোধকে প্রকাশ করতে পারেন নি। কল্লোলচেতনার শিল্পীর পক্ষে তা প্রায় সম্ভব ছিল না। সর্বত্রই তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ নিজেকে সঞ্চারিত করেছে, প্রক্ষেপ করেছে নানা পরিবেশ-প্রতিবেশে, নানা চরিত্রে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, তাঁর একান্ত আত্মনিষ্ঠ কবিদৃষ্টির ফলে এবং জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে তাঁর কল্লোলযুগের রচনায় বৈচিত্র্যের অভাব চোখে পড়ে। প্রায় একই ধরনের প্রেমবোধ, যৌনজীবনের চিত্র ও নর-নারীর সম্পর্কের জটিল সমস্যা ঘুরে ফিরে এসেছে তাঁর রচনায়। আর সেই সব চিত্র, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণকে আচ্ছন্ন করেছে গীতিকাব্যের মোহনীয় মদির সুরভি উচ্ছ্বাস। তাঁর অসংখ্য গল্প এই সৌরভে আচ্ছন্ন।

তিনি বাঙালি জীবনের যে স্তরকে জেনেছিলেন, তা হল কলকাতা শহরবাসী মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত স্তর। এই সমাজের যন্ত্রণা, হতাশা, ব্যর্থতা, হাহাকার, দীর্ঘশ্বাস ও দারিদ্র্যের ছবি তাঁর রচনায় প্রতিফলিত। অবশ্য রোমান্টিক তারুণ্যের স্বপ্নবিলাসী কবির দৃষ্টিতে সেই দুঃখ-কষ্ট তার বাস্তব স্বাভাবিক বর্ণবিন্যাস লাভ করেনি, কোথাও সেই যন্ত্রণার কৃষ্ণবর্ণের গাঢ়তা অতিশায়িত, কোথাও বা বাস্তব দুঃখের পরিবর্তে রোমান্টিক 'দুঃখ বিলাস'ই বড় হয়ে উঠেছে। তাঁর ছোটগল্পে এ ছবি উজ্জ্বল ভাবে প্রতিভাত হয়েছে।''দুইবার রাজা', 'যে কে সে' গল্পে নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের সেই গভীর হতাশা, রূঢ় বাস্তবের আঘাতে তারুণ্যের স্বপ্ন-কল্পনা ও নৈতিকআদর্শ ভঙ্গের ছবি অচিন্ত্যকুমারের বাস্তব সচেতন মনকে উদ্দীপ্ত করেছে। 'দুইবার রাজা' গল্পের নামকরণের মধ্যে যে ধারালো ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ হাসি ফুটে উঠেছে তাতে তাঁর গল্পের পরিসমাপ্তি কান্নার চেয়েও করুণ বলে মনে হয়–

'আরো একবার রাজা। সবাইর কাঁধের ওপর। ওর জন্যই ত আজকের সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ওর জন্যই ত লুসীর চোখে একবিন্দু অশ্রু।' 'ধন্বন্তরি' গল্পেও ওই একই সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এ গল্প কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত দরিদ্র রেবতী ও তার স্ত্রী শিপ্রার জীবনের কারুণ্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু অচিন্ত্যকুমার এখানে শুধু যন্ত্রণাময় অভাবের কান্নাই শোনান নি। ব্যাধি ও দীনতার বীভৎস ও উৎকট চিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ডাক্তারের সম্পদ ও স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যের বৈপরীত্যে। সমাজের বেড়াজালে বন্দি জীবনবোধের এই বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য লেখকের চোখে নিতান্ত নিষ্ঠুর বলে প্রতীয়মান হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যদিও কল্লোল লেখকগোষ্ঠীর দুটি মুখ্য প্রবণতাকে নিন্দা করে বলেছিলেন 'লালসার অসংযম ও দারিদ্র্যের আস্ফালন' তবুও একথাও ঠিক যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত একজন প্রতিভাবান শিল্পী। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, 'তোমার প্রতিভা আমি স্বীকার করি।' ৩১শে আশ্বিন, ১৩৩৫ সালে তিনি অচিন্ত্যকুমারকে পত্র লিখলেন- 'তোমার কল্পনার প্রশস্ত ক্ষেত্র ও অজস্র বৈচিত্র্য

দেখে আমি মনে মনে তোমার প্রশংসা করেছি। সেই কারণে এই দুঃখবোধ করেছি যে, কোন কোন বিষয়ে তোমার পৌনঃপুন্য আছে - বুঝতে পারি সেইখানে তোমার মনের বন্ধন। সে হচ্ছে মিথুন প্রবৃত্তি। সে প্রবৃত্তি মানুষের নেই, বা তা প্রবল নয় এমন কথা কেউ বলে না। কিন্তু সাহিত্যে সকল বিষয়েই যেমন সংযম আবশ্যক এক্ষেত্রেও। ঘুরে ফিরে কেবলই একটা জিনিসকেই প্রকাশ করার দ্বারা দুর্বলতাজনিত প্রমত্ততার প্রমাণ হয়- তাতে রচনার সামঞ্জস্য নষ্ট হয়।'[১৮] 'নানা উদভ্রান্তি অতিরেক অস্থিরতা ও অসংযম সত্ত্বেও তাঁর স্বকীয়তা, অনন্যতা ও প্রগতিপন্থাকে অস্বীকার করা যায় না।'[১৯]

ছোটগল্পের শিল্পসাফল্যের প্রধান বিষয় চরিত্র সৃষ্টি। শিল্পভাবনার অভিজ্ঞতা প্রয়োগের মূল উপাদানই হল চরিত্র। কাহিনীবৃত্ত বা প্লট চরিত্রকে দেয় দুর্বার স্রোতের বেগ। চরিত্রের সঙ্কট, উত্থান-পতন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সংশয় সৃষ্টির মধ্য দিয়ে গল্প এগিয়ে চলে সাবলীলভাবে, কাহিনীর মধ্যে সঞ্চারিত হয় প্রাণময় গতি। সেই কারণে চরিত্র যত বেশি বাস্তবানুগ ও প্রাণবন্তভাবে সৃজিত হবে, গল্পরসও ততো বেশি ঘনীভূত হবে। চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ না হলে গল্প পাঠক চিত্তের সহানুভূতি অর্জনে ব্যর্থ হয়। তাঁর গল্পের শিল্পরীতি কাহিনী বা ঘটনার মধ্যে নিবিড় করে আবদ্ধ রাখে না পাঠককে, তা মুহূর্তে পৌঁছে দেয় জীবনের গূঢ় অন্তর্লোকে।

শুধু ভাষা বা গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, ভঙ্গি, আঙ্গিকরীতি এবং পদ্ধতির প্রকৃতিতেও অচিন্ত্যকুমার রেখেছেন প্রাতিস্বিকতার স্বাক্ষর। প্রতিটি গল্পই যে আঙ্গিক বা ভাষাগত ছন্দে সাবলীল হয়েছে, তা বলা না গেলেও শুধু এইটুকু বললে অত্যুক্তি হয় না যে তাঁর লেখা ছোটগল্পগুলি বাংলা কথাসাহিত্যের যে ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধু রচনা বৈচিত্র্য বা আকার আয়তনের জন্য নয়, একটা বিশেষ যুগ অর্থাৎ রবীন্দ্র পরবর্তী যুগকে তিনি যথাযথভাবে মেলে ধরেছেন তাঁর বিভিন্ন গল্পে। বিংশ শতাব্দীর জটিল আবর্তময় সমস্যা জর্জরিত সময়ের অন্তঃসারকে অন্তরে ধারণ করেই গড়ে উঠেছে তাঁর স্বতন্ত্র জীবনবোধ। আধুনিক মানবচৈতন্যের বিস্তৃত বিন্যাস, চলমান জীবন ও ক্রমভঙ্গুর মূল্যবোধ, সভ্যতার অযাচিত তাণ্ডব, জাগতিক বিপন্নতা- এসব প্রবণতা লক্ষ্য করে তিনি স্বাধীন দৃষ্টিতে জীবন ও জগৎ পর্যবেক্ষণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। দুই মহাযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর আলোড়নের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে তাঁর জীবন। তাই তিনি অনিবার্যভাবেই যুদ্ধপীড়িত পৃথিবীর পরিবর্তিত মূল্যবোধে আকৃষ্ট হয়েছেন। যুদ্ধোত্তর সামাজিক পটভূমিতে আবির্ভূত তাঁর জীবনবোধ ছিল আর্ত ও পীড়িত, যার প্রভাব পড়েছে তাঁর সাহিত্যচিন্তায় ও শিল্পভাবনায়। রবীন্দ্রনাথের দর্শন থেকে সরে এসে তিনি তাঁর রচনায় জীবনবাস্তবতার শিল্পরূপ অঙ্কন করেছেন। তাঁর গল্পে প্রতিভাসিত হয়েছে মধ্যবিত্ত জীবনের বহুমাত্রিক যন্ত্রণা, আধুনিক মানব চৈতন্যের নিষ্পেষিত সত্তার সঙ্কট, মানুষের মনোজাগতিক বিপন্নতা, দ্বন্দ্বপীড়িত মধ্যবিত্ত মানুষের দুর্ভর বেদনা, দরিদ্রতার দুর্মর আর্তনাদ। ১৯৪৭ সালের পরবর্তীতে বাংলা গল্প-উপন্যাসের পালাবদল ঘটার সাথে সাথে অচিন্ত্যকুমারের গল্পের আঙ্গিকেরও পালাবদল ঘটে। এ সময়ের গল্পের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে প্রেম ও আইন ব্যবসায়ীদের জীবনযাত্রা। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ের গল্পের ভিত্তিভূমি বাস্তবতার ছোঁয়ায় সজীব হয়ে ওঠে।

কিন্তু এ গল্পগুলোর প্রেক্ষাপট যতটা বাস্তবচিত্র হিসেবে মূল্যবান ততোটা শিল্প আবেদনময় ছোটগল্প হিসেবে বহুপাঠ্য হয় না। জীবনের বৈচিত্র্যময়তা এর সম্পদ। কিন্তু জীবনের এই শিল্পায়ন পাঠকচিত্তকে বহু ভাবিত করে তুলতে সমর্থ হয় না। তবু বলতে দ্বিধা নেই যে, তিনি বরাবরই পরিস্নাত জীবন প্রতীতির অনুগামী ছিলেন। এ কারণে তাঁর ছোটগল্পের অভিজ্ঞান ও অন্তর্নিহিত অভিব্যঞ্জনা জীবনের সমগ্রতাকে স্পর্শ করে।

তথ্যসূত্র

১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ, পৃ: ১৮* উদ্ধৃত মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯

২. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *একশ এক গল্প, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ.২*

৩. আশিসকুমার দে, *অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : বিস্মৃতপ্রায় কথাশিল্পী*, *প্রসঙ্গ : বাংলা উপন্যাস সম্পাদনা - অরুণ সান্যাল।* উদ্ধৃত সুদীপ্তা চক্রবর্তী, *অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কবি ও কথাশিল্পী*, প্রকাশক : দেবাশিস ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, পৃ.১২৯

৪. ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ৫ম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৬-২০০৭, পৃ.৩৩৮।* উদ্ধৃত রবিন পাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *ভারতীয় সাহিত্যকার গ্রন্থমালা, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ : ২০১০, রবীন্দ্র ভবন, নতুন দিল্লি,পৃ. ৩১*

৫. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা, ডি.এম. লাইব্রেরি, প্রথম প্রকাশ -আশ্বিন ১৩৮৯, পৃ.২৬৪।* উদ্ধৃত রবিন পাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *ভারতীয় সাহিত্যকার গ্রন্থমালা, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ : ২০১০, রবীন্দ্র ভবন, নতুন দিল্লি,পৃ. ৩১*

৬. সম্পাদক: বিপ্লব চন্দ, *অচিন্ত্যনীয়, 'দেউটি' (সাহিত্য পত্র) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সংখ্যায় উদ্ধৃত, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।* উদ্ধৃত রবিন পাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *ভারতীয় সাহিত্যকার গ্রন্থমালা, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ : ২০১০, রবীন্দ্র ভবন, নতুন দিল্লি,পৃ. ৩১*

৭. A challenging Decade, pp.117-118 উদ্ধৃত রবিন পাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *ভারতীয় সাহিত্যকার গ্রন্থমালা, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ : ২০১০, রবীন্দ্র ভবন, নতুন দিল্লি,পৃ. ৩৪*

৮. বিষ্ণু দে, *গল্পে উপন্যাসে সাবালক বাংলা, পরিচয় শারদীয় ১৩৫৪, বঙ্গাব্দ।* উদ্ধৃত রবিন পাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *ভারতীয় সাহিত্যকার গ্রন্থমালা, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ : ২০১০, রবীন্দ্র ভবন, নতুন দিল্লি,পৃ. ৩৪*

৯. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *একশ এক গল্প, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ.১*

১০. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ.৫২* উদ্ধৃত *মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯*

১১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *শতবার্ষিকী সংকলন, প্রাগুক্ত, পৃ.০৪*

১২. প্রবোধকুমার সান্যাল, *অনন্য অচিন্ত্যকুমার, দ্রঃ 'কথাসাহিত্য' শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সংবর্ধনা সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩৭৫, পৃ.১৪৫৩*। উদ্ধৃত সুদীপ্তা চক্রবর্ত্তী, *অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কবি ও কথাশিল্পী*, প্রকাশক : দেবাশিস ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, পৃ.১২

১৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত পৃ.৪৫১*

১৪. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *শতবার্ষিকী সংকলন, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৫*

১৫. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *প্রাগুক্ত, পৃ.২০০*

১৬. *বিচিত্রা (শ্রাবণ-পৌষ সংখ্যা, ১৩৪০)-শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়*, উদ্ধৃত সুদীপ্তা চক্রবর্ত্তী, *অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কবি ও কথাশিল্পী*, প্রকাশক : দেবাশিস ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, পৃ.১১০

১৭. সুকুমার সেন, '*বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'৪র্থ খণ্ড। উদ্ধৃত ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃলি, কলিকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ-১৯৯৯, পৃ. ৩৪৮*

১৮. মাহবুব সাদিক, *অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত*, জীবনী গ্রন্থমালা, প্রথম প্রকাশ- জুন ১৯৯৫, বাএ ৩১৮২, পৃ. ২৫

১৯. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৩৮০, পৃ. ২০২*

উপসংহার

উপসংহার

অচিন্ত্যকুমারের জীবনচেতনা গঠনের প্রধান উপাদান মানুষ ও প্রকৃতিলোক। তাঁর ছোটগল্পসমূহের পাঠ পর্যালোচনায় এ সত্যে পৌঁছানো যায় যে, তিনি জীবনদৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর সাহিত্যকর্মে। জীবনচেতনার শিল্পিত প্রকাশে বাংলাসাহিত্যে এনেছেন নতুনত্ব। গল্পবস্তুর বৈচিত্র্য নির্মাণসূত্রে আঙ্গিককলার বর্ণিল সৃজনপ্রয়াস অচিন্ত্যকুমারের শিল্প অঙ্গীকারের শুরুর কথা। চিত্রশিল্পীর মতো অল্প তুলির টানে গল্পকার সৃজন করেন গল্পের ব্যঞ্জনাদীপ্ত কথামালা। এখানে পাঠকের চিন্তন ক্রিয়ায় গল্প উপাদানের উদ্ভাসন ত্বরান্বিত হয় খুব সূক্ষ্মভাবে। কাঠামো পরিকল্পনা, নাট্যআবহ, সংলাপধর্মিতা, ব্যঙ্গ-কটাক্ষ সৃষ্টি, গল্প সমাপ্তির আকস্মিকতা, বিবিধ বৈপরীত্য সৃষ্টি তাঁর ছোটগল্পকে শিল্পসাফল্যে স্বতন্ত্র করেছে। গল্পবস্তুর চমৎকারিত্ব ও গল্পশেষের আকস্মিকতা সৃজন লেখক অচিন্ত্যকুমারের গল্পরীতির একটি বৈশিষ্ট্য। আত্ম-অন্বেষণ ও আত্ম-উপলব্ধির প্রকাশ তাঁর জীবনচেতনারই এক উল্লেখযোগ্য দিক। জীবনবৈচিত্র্যের প্রতি অমোঘ আসক্তি তাঁর শিল্পদৃষ্টির বহুমাত্রিকতাকেই পরিচিহ্নিত করে। জীবনকে বাদ দিয়ে যেমন শিল্পকে গ্রহণ করা যায় না তেমনি জীবনেরও বাইরে নয় শিল্পরীতি। তাঁর ছোটগল্পের জীবনচেতনা তাই অনাদি ও অকৃত্রিম। বিচিত্র গল্প বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনচেতনার ক্ষেত্রেও তিনি প্রয়োগ করেছেন অনিবার্য মাত্রা প্রযুক্তি।

জীবন যে শুধু নীতিগ্রস্ত কিংবা নীতিদুষ্ট নয়, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার সমন্বয়েই যে মানবজীবনের সমগ্রতা- সেই উপলব্ধি তাঁর একান্তই নিজস্ব। সাহিত্যের বিষয় নির্বাচন, শিল্পানুভব, উপকরণ-সংগ্রহ কিংবা মনোভঙ্গি- সর্বত্রই তাঁর আধুনিক জীবনচেতনার লক্ষণ অতি স্পষ্ট। মানব মনের চেতন-অবচেতনের দ্বন্দ্বময় জটিল মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, নিপীড়িত ও অভাবী মানুষের দুর্দশার করুণচিত্র রচনা, আর্থ-সামাজিক সমস্যা-সংকট প্রভৃতি অচিন্ত্যসাহিত্যে আধুনিকতার উপাদান। এই আধুনিকতাবোধ তাঁর ছোটগল্পকে করেছে তাৎপর্যদীপ্ত ও বিকশিত।

জীবন প্রবাহের সমগ্রতাকে লেখনীতে ধারণ করবার আশ্চর্য এক ক্ষমতা ছিল অচিন্ত্যকুমারের। জীবনের সহজ সাধারণ ও সাবলীল রূপই তাঁর পরম প্রার্থিত ছিল। তাঁর শিল্পিসত্তার কাছে সবচেয়ে যা আকর্ষণীয়, যা মুখ্যতম তা হল জীবন, প্রাণোজ্জ্বল জীবন। জীবনকে তিনি অনুভব করেছেন প্রবল স্রোতের প্রবাহ রূপে। এ কারণেই তাঁর জীবনচেতনার বিশিষ্টতায় অন্বিত হয়ে আছে ভাবনা, অনুভাবনা, সূক্ষ্ম কল্পনা, ক্ষুদ্র অনুভূতি ইত্যাদি অনুষঙ্গ। খণ্ডিত চিন্তার অন্তরাল থেকে তিনি অবলোকন করেছেন অখণ্ড জীবন প্রতীতির এক প্রতিচিত্র। বিচিত্র খেয়াল ও কল্পনার শিল্পভাষ্য রচনাসূত্রে তিনি তাঁর প্রাণময় জীবনানুভবের স্বাক্ষর রেখেছেন। স্থান-কাল-পাত্র সমন্বয়ে ঘটনার ব্যাপ্তি বা কাহিনী বিস্তারের বিপরীতে কেবল পাত্র-পাত্রীর মুহূর্তের অনুভব ও উদ্ভাসনে তাঁর

ছোটগল্পগুলো অসাধারণ ব্যঞ্জনাদীপ্তি লাভ করেছে। জীবনচিত্র প্রকাশে লঘু পদ্ধতিই অচিন্ত্যকুমারের শিল্পচেতনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ কারণে তাঁর ছোটগল্পে গদ্যভঙ্গির আপাত বর্ণনার আড়ালে জীবনচেতনার বিচিত্র ও ব্যতিক্রমী উদ্ভাসন মহিমময় হয়ে ওঠে। বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতার সূত্রে বিচিত্র জীবনবোধের সৃজন তাঁর শিল্পমহিমার সম্ভবনাকে অনুকূল করেছে। ব্যক্তিত্বের অভূতপূর্ব বিশিষ্টতায় তিনি তাঁর গল্পের প্যাটার্নকে প্রভাবিত করেছেন। একেবারেই দৈনন্দিন জীবনের নানাকিছু যে শিল্পের সীমা লঙ্ঘন না করেও অনায়াসে সাহিত্যের বিষয় হতে পারে তারও পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ছোটগল্পে। উপমার অভিনবত্ব ও কাব্যময় শব্দের ঐকতানে তাঁর বক্তব্য যেমন সমকালীন সাহিত্যিকদের চমক লাগিয়েছিল তেমনি তাঁর বলার ভঙ্গি পাঠককে করেছিল মুগ্ধ।

ব্যক্তির জীবন অভিজ্ঞতা ও জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে বিচিত্র ঘটনা ও সমস্যার রূপায়ণের মাধ্যমে তিনি ছোটগল্পকে সত্যাশ্রয়ী, জীবনধর্মী ও বাস্তবসম্মত করে তুলেছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সমন্বয়ে চরিত্র ও কাহিনীর মধ্যে তৎকালীন সমাজজীবনকে বিধৃত করেছেন। অতীত সত্যের বাস্তবতাকে লালন করে বাস্তব সত্যের প্রেক্ষিতে তিনি সাহিত্যের রূপ তৈরি করেছেন। তাঁর ছোটগল্পগুলো জীবন সত্যের গূঢ় রহস্যের ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত। গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে তাঁর ছোটগল্পের কাঠামোতে কাব্যধর্মিতার অবয়ব খুঁজে পাওয়া যায়। কবিতার অবিচ্ছেদ্য অপরিহার্য প্রাণবীজ যে সঙ্কেতধর্মিতা ও ইঙ্গিতময়তা- তা তাঁর গল্পে প্রকাশিত। প্রথাগত বর্ণনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশ্লেষণ ও বহির্মুখিতার সঙ্গে অন্তর্মুখিতার দ্বন্দ্ব। পরাবাস্তবচেতনা, অভিব্যক্তিবাদ, চেতনাপ্রবাহরীতির পরিশীলিত ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তির মনোজাগতিক ও আত্মিক সঙ্কটের স্বরূপ রূপায়িত হয়েছে গল্পগুলোতে। গল্পের কৃৎকৌশল, গদ্যভাষা, বয়নরীতির মতো গল্পের বিষয় ও প্রকাশ ভঙ্গির ক্ষেত্রেও তিনি নতুনত্বের অনুসন্ধান করেছেন। অনুভব ও অনুষঙ্গ যুক্ত করে তিনি তাঁর কাহিনী বৃত্তকে সম্প্রসারিত করেছেন। বিষয় বিন্যাস ও বৈচিত্র্যের তাগিদে চরিত্র সমূহ হয়ে উঠেছে অন্তঃসংলাপধর্মী ও স্বগতকথনমুখ্য যা তাঁর শৈল্পিক সূক্ষ্মতা ও বহুমাত্রিকতার পরিচয় বহন করে। বিষয়ভাবনা ও প্রকরণ বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে তাঁর ছোটগল্পের ঋদ্ধি অসাধারণ। ক্ষুদ্র, সামান্য, উপেক্ষিত-সব কিছুই তাঁর ছোটগল্পে স্থান পেয়েছে চমৎকারভাবে। দর্শক না, মুগ্ধ পর্যবেক্ষক হয়ে তিনি জীবনকে অবলোকন করেছেন নিখুঁত ভাবে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা তাঁকে টেনে নিয়ে যায় মাটি ও মানুষের কাছাকাছি। নিত্য দেখা সেই জীবনকে, স্বোপার্জিত বোধকে, জগতকে, চিরচেনা মানুষকে ঠাঁই দিয়েছেন তাঁর ছোটগল্পে। সামান্যের মাঝে অসামান্যকে খুঁজে পেয়েছেন বলেই তাঁর গল্পের বিষয় এত বর্ণিল, এত বিচিত্র। খণ্ড খণ্ড বিশেষকে ঘিরে সারাজীবন তাঁর যে অভিজ্ঞতা, যে মুগ্ধতা, যে সহানুভূতি, যে মর্মবেদনা, যে যন্ত্রণা, যে জীবন জিজ্ঞাসা - তাকে তিনি অবলীলায়, শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে গেঁথে গেঁথেই স্পর্শ করেছেন সাহিত্যিক উৎকর্ষের পরিসীমাকে। জীবনের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিসঞ্জাত নির্যাসকেই তিনি পরমমমতায় ঠাঁই দিয়েছেন ছোটগল্পে। তাঁর মৌল দৃষ্টিভঙ্গির প্রিজমেই বিচিত্র বিষয় বহু বর্ণে বিচ্ছুরিত। তাঁর জীবনচেতনার আলো নানা উপকরণের মধ্য দিয়ে ছোটগল্পে বিকীর্ণ। জীবনের যে বিচিত্র গভীর রস ও রহস্য তাঁর চেতনায় ধরা দিয়েছে

তা-ই শৈল্পিক রূপ পেয়েছে তাঁর অজস্র ছোটগল্পের নানা খণ্ড আয়তনে। প্রতিদিনের পথের ধুলোয় ছড়িয়ে থাকা বর্ণবিরল ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ জীবনের টুকরো ছবির মুক্তোয় যেন তিনি ছোটগল্পের মালা গেঁথে তুলেছেন। সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বিচিত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও মনোজাগতিক বিকার-বিকৃতি তাঁর ছোটগল্পে নিগূঢ় জীবন-জিজ্ঞাসা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। মধ্যবিত্ত মানুষের সংগ্রামকে তিনি ঐকান্তিক বিশ্বাসের সাথে আঁকতে চেষ্টা করেছেন। মানুষের জটিল জীবনপ্রবাহ এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল প্রবণতা। শব্দের বহুমুখি দ্যোতনা ও চিত্রধর্মিতা তাঁর ছোটগল্পকে করেছে নন্দনশোভন। তাঁর ছোটগল্প আরও বেশি করে পাঠ ও গভীরতর বিশ্লেষণ, আলোচনা-পর্যালোচনার প্রয়োজন, ব্যাপকভাবে প্রয়োজন নবতর মূল্যায়নের। তাঁর বিপুল সাহিত্যসম্ভার এবং অজস্র ছোটগল্প বাংলাসাহিত্য ভাণ্ডারকে যেমন সমৃদ্ধি দান করেছে তেমনি দিয়েছে নবশিল্পপ্রকৌশল ও নবতর পথের সন্ধান।

মানুষের পরম সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক প্রান্ত সমূহ উন্মোচনেও তাঁর রয়েছে নিপুণ ও গভীর দক্ষতা। তাঁর শিল্পীমানসের মৌলবৈশিষ্ট্যই হলো মানবতা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা। জীবনকে নিবিড়ভাবে অবলোকন করা এবং বিচিত্র জীবনপ্রবাহকে শিল্পায়ব প্রদান তাঁর সাহিত্যভাবনার মূল প্রবণতা। মুক্তবুদ্ধি, প্রগতিশীলতা, বক্তব্যের সাবলীল উপস্থাপন তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। তাঁর সাহিত্যকর্ম তাঁরই প্রবল সমাজ সচেতনতা ও আধুনিক ভাবধারার শৈল্পিক ফসল। মানুষের মনোজগৎ তথা অন্তর্জীবনের রূপকার অচিন্ত্যকুমারের রচনায় বিচিত্র জীবনপ্রবাহের নানা অনুষঙ্গ গভীর ও স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয়ে বিধৃত।

পরিশেষে বলা যায়, সংস্কারমুক্ত মানবতাবাদী জীবনচেতনার অধিকারী ছোটগল্পের কথাশিল্পী অচিন্ত্যকুমার। গল্পের অবয়বে আঙ্গিক কলায় তিনি দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য স্রোতধারায় তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র, নিজস্ব পথেই বিচরণশীল। স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত প্রকরণেই পরিবেশিত হয় তাঁর দ্রষ্টাচৈতন্যের অভিজ্ঞতা ও সংহত এক জীবনদৃষ্টির সমন্বয়। তিনি কাহিনীনির্ভরতাকে বর্জন করে ছোটগল্পে ব্যক্তিজীবনের অন্তর্ময়তাকে চেতনাপ্রবাহের কৌশলে বিন্যস্ত করেছেন। জীবন-উদ্ভূত শিল্পরীতির যথার্থ সম্প্রকাশ তাঁর ছোটগল্প। চরিত্রকে ভাব-প্রতিভূতে পরিণত করা, আত্মচরিতের পূর্বাপর অবভাস, আন্তরক্রিয়ার প্রাধান্য, শীর্ষস্পর্শ বা প্রতিশীর্ষস্পর্শহীন কাহিনীবিন্যাসে অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্প অর্জন করেছে অনন্যসাধারণ এক শৈলী-স্বাতন্ত্র্য। জীবন-সর্বস্বতার রূপায়ণে তিনি সবসময় নির্বাচিত করেছেন নিজস্ব ও স্বাধীন প্রকাশভঙ্গি। সাবলীল এই বর্ণনাভঙ্গির জন্যই তাঁর ছোটগল্পসমূহ পাঠকের অনুভূতিতে ভিন্ন জায়গা তৈরি করে নেয় আর অসামান্য ব্যঞ্জনাগূঢ়তায় নির্মাণ করে স্বতন্ত্র শিল্পসৌধ।

---০০০---

পরিশিষ্ট

ক. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প গ্রন্থের তালিকা:

১। টুটাফুটা।

প্রকাশক: এম.সি. সরকার এন্ড সন্স, কলকাতা

প্রকাশকাল: পৌষ, ১৩৩৫

উৎসর্গ: ‘প্রথম সাহিত্যিকসাথী শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র করকমলেষু’

রচনাকাল: ১৩৩০ – ১৩৩৪।

গল্পসূচি: টুটাফুটা, চোখের চাতক, খাখ্, সন্ধ্যারাগ, অচল টাকা, এবং দুইবার রাজা।

২। ইতি।

প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা। প্রকাশকাল: ফাল্গুন ১৩৩৮ উৎসর্গপত্র:‘শ্রী বিষ্ণু দে, প্রিয় বন্ধুবরেষু -শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ।

গল্পসূচি: অরণ্য, ধন্বন্তরি, যে-কে-সে, দিনের পর দিন এবং ইতি।

৩। অধিবাস।

প্রকাশক: বরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বরেন্দ্র লাইব্রেরি, কলকাতা

প্রকাশকাল: ১৩৩৯

উৎসর্গ পত্র: মনোজ বসু, প্রিয়বরেষু শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ১.৫.৩২

গল্পসূচি: অধিবাস, পুনর্মূষিক, অচিরদ্যুতি, তারপর, বটতলা, অসম্পূর্ণ, হোমশিখা, মাঠ ও বাজার।

৪। অকাল বসন্ত।

প্রকাশকাল: আশ্বিন ১৩৩৯ সাল।

৫। কালের রক্ত।

প্রকাশক: গোপাল দাস মজুমদার ডি. এম লাইব্রেরি, কলকাতা।চৈত্র ১৩৫২ সাল।

গল্প সূচি: কালো রক্ত, বাঁশবাজি, বৃত্তশেষ, সাহেবের মা, ফেরা-ফিরতি, চাল, আঙ্গিক, একেই বলে প্রেম।

৬। যতনবিবি।

প্রকাশক: সিগনেট প্রেস, কলকাতা, দ্বিতীয় সিগনেট সংস্করণ-১৩৫৩। প্রচ্ছদ: মাখন দত্তগুপ্ত।

গল্পসূচি: যতনবিবি, সরজমিন, ধরা বিয়ে, কালনাগ, দোলনা, শেষ চিঠি, ম্যাজিক, বিদিশা, শাঁখা, সহমরণ।

৭। হাড়ি মুচি ডোম।

প্রকাশক: দি বুক এমপোরিয়াম লিমিটেড, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ: চৈত্র ১৩৫৫।

রচনা কাল: ১৩৫৩ – ১৩৫৪।

গল্পসূচি: মেথর-ধাঙড়, হাড়ি হাজরা, মুচি বায়েন, হাটবাজার, জাত-বেজাত, মুচি হয়ে শুচি হয়, ধনধান্য।

৮। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শ্রেষ্ঠগল্প।

প্রথম সংস্করণ: ১৩৫৭

প্রকাশক: বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা

সম্পাদক: জগদীশ ভট্টাচার্য।

গল্পসূচি: দুইবার রাজা, অরণ্য, ধন্বন্তরি, বুদ্রের আবির্ভাব, অমর কবিতা, তিরশ্চী, ন যযৌ ন তস্থৌ, ছুরি, অকারণ, হরেন্দ্র, সাক্ষী, মাটি, কালনাগ, বাঁশবাজি, সাহেবের মা, বৃত্তশেষ, বস্ত্র, জনমত, দাঙ্গা, জমি, নূরবানু।

৯। ডবল ডেকার।

প্রকাশক: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েট পাবলিশিং কো: লি: কলকাতা।

নতুন সংস্করণ: জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ সাল।

উৎসর্গ: প্রবোধচন্দ্র সান্যাল বন্ধুবরেষু।

গল্পসূচি: মা নিষাদ, অপূর্ণ, সময়, উপান্ত, পাপ, ছুরি, পুষ্পরাণী দে, ডিসক, দুপুর দুটো, ডবল ডেকার।

১০। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের স্বনির্বাচিত গল্প

প্রকাশক: জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রা. লি. কলকাতা।

প্রকাশকাল: ভাদ্র ১৩৬১।

সংকলিত গল্পের নাম: ইতি, ডাউন দিল্লি এক্সপ্রেস, দোলনা, সারেঙ, গার্ড সাহেব, খেলাওয়ালী, ক্লোজআপ, মুচিবায়েন, যশোমতী, সরবানু ও রোস্তম, গঙ্গাযাত্রা, নিস্কর, হাড়ি-হাজরা।

১১। এক অঙ্গে এত রূপ।

প্রকাশক: নাভানা, কলকাতা

প্রথম প্রকাশ: চৈত্র ১৩৬৫, মার্চ ১৯৫৯।

দ্বিতীয় সংস্করণ: কার্তিক, ১৩৬৭।

প্রচ্ছদ: বিনয় সাহা।

গল্পসূচি: দর, শোধ, শ্রেয়সী, সিঁড়ি, ঘৃণা, আঘ্রাণ, জন্মান্ধ।

১২। স্বাদু স্বাদু পদে পদে।

প্রকাশক: ত্রিবেণী প্রকাশন, কলকাতা

প্রথম সংস্করণ: ফাল্গুন ১৩৬৬

প্রচ্ছদ: অন্নদা মুন্সী

গল্পসূচি: কাঁটার মুকুট, পাশা, রং নাম্বার, জানালা, রাতের পর রাত, ঘুষ, একমাত্র।

১৩। প্রেমের গল্প।

প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা

প্রথম সংস্কর: ভাদ্র ১৩৬৬

প্রচ্ছদ: পূর্ণেন্দু পত্রী

গল্পসূচি: একরাত্রি, মগের মুলুক, ধরা বিয়ে, খিল, দোলনা, যশোমতী, ঘৃণা, সরবানু ও রোস্তম, জমি, নূরবানু, তিরশ্চী, হুইস্‌ল, প্রাসাদ শিখর।

১৪। গৃহদীপ্তি।

প্রকাশক: রবীন্দ্র লাইব্রেরি, কলকাতা। প্রকাশকাল উল্লেখ নেই। প্রচ্ছদ: শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

গল্পসূচি: অনাবৃষ্টি, আস্বাদ, ধ্রুপদ, পিক আপ, ত্রাণ, গৃহদীপ্তি, থার্ডক্লাশ।

খ. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের অন্যান্য রচনা ও প্রকাশকাল

[কবিতা=ক, গল্প=গ, নাটক=না, উপন্যাস=উ, প্রবন্ধ=প্র, অনুবাদ গল্প=অ গ]

নায়ক-নায়িকা [গ]	প্রবাসী	চৈত্র	১৩২৯
বাদলপ্রিয়া [ক]	প্রবাসী	চৈত্র	১৩৩১
অনাগত কবি [ক]	কল্লোল	ফাল্গুন	১৩৩১
বাঁকালেখা [উ]	মহিলা	–	-
বাদলবাতাস [গ]	ভারতী	আশ্বিন	১৩৩০
আলতার দাগ [গ]	ভারতী	পৌষ	১৩৩০
কারসাজি [গ]	ভারতী	মাঘ	১৩৩০
কড়া নাড়া [গ]	ভারতী	ফাল্গুন	১৩৩০
বন্দিনী [গ]	ভারতী	বৈশাখ	১৩৩০
আমরা [ক]	স্বদেশ	আশ্বিন	১৩৩১
সাগর দোলা [গ]	মহিলা	শ্রাবণ	১৩৩১
গুমোট [গ]	কল্লোল	শ্রাবণ	১৩৩১
মাটির ব্যথা [গ]	মহিলা	আশ্বিন	১৩৩১
চাষা [ক]	কল্লোল	অগ্রহায়ণ	১৩৩১
ধরাতে চরণ রাখি আকাশেরে লইব মাথায় [ক]	কল্লোল	চৈত্র	১৩৩১
ভুখা [গ]	বাঁশরী	অগ্রহায়ণ	১৩৩১
অন্ধকারের কান্না [গ]	উপাসনা	অগ্রহায়ণ	১৩৩১
লগ্ন [গ]	নায়ক	-	-
ঋতু মঙ্গল [ক]	পঞ্চপ্রদীপ	জ্যৈষ্ঠ	১৩৩২
মালার জ্বালা [গ]	আত্মশক্তি	আশ্বিন	১৩৩২
তিমির রাত্রি [গ]	তরুণলিপি	বৈশাখ	১৩৩৩
মুক্তি [না]	কল্লোল	মাঘ	১৩৩১
কেয়ার কাঁটা [না]	কল্লোল	বৈশাখ	১৩৩২

মরুভূমি [ক]	কল্লোল	ফাল্গুন	১৩৩২
স্রষ্টা [ক]	প্রবাসী	ফাল্গুন	১৩৩২
বিরহ [ক]	কল্লোল	আষাঢ়	১৩৩২
সূর্য [ক]	কল্লোল	জ্যৈষ্ঠ	১৩৩২
বাসর রাত্রি [ক]	কল্লোল	ফাল্গুন	১৩৩২
ঝটিকা [ক]	কল্লোল	কার্তিক	১৩৩২
সুদূর [ক]	কল্লোল	শ্রাবণ	১৩৩২
প্রেমপত্র [ক]	উত্তরা	-	১৩৩২
চিত্তরঞ্জন [ক]	কল্লোল	ভাদ্র	১৩৩২
রম্যা রলাঁ [ক]	কল্লোল	পৌষ	১৩৩২
রবীন্দ্রনাথ [ক]	সবুজপত্র	-	১৩৩২
শিশিরকুমার ভাদুড়ি [ক]	বিজলী	চৈত্র	১৩৩২
গাব আজ আনন্দের গান[ক]কল্লোল		আষাঢ়	১৩৩৩
কে মোরে চিনিতে পারে [ক] ভারতবর্ষ		-	১৩৩৩
রবীন্দ্রনাথ [ক]	কল্লোল	মাঘ	১৩৩৩
আগুন [ক]	বিজলী	-	১৩৩৩
নববর্ষ [ক]	বিজলী	-	১৩৩৩
বিধাতার মত ভাই [ক]	কল্লোল	আশ্বিন	১৩৩৪
আমারে ভুলিও ভাই [ক]	কল্লোল	বৈশাখ	১৩৩৪
সকলি যে ভুলিয়াছি [ক]	কল্লোল	শ্রাবণ	১৩৩৪
সব পুড়ে হল ছাই [ক]	কল্লোল	অগ্রহায়ণ	১৩৩৪
আমার মেঘনা নদী [ক]	কল্লোল	ফাল্গুন	১৩৩৪
রোগশয্যায় শুয়ে আছি একা[ক]কল্লোল		চৈত্র	১৩৩৪
ধর্মঘট [ক]	কল্লোল	জ্যৈষ্ঠ	১৩৩৪
বেদে [উ]আহলাদি	”	আশ্বিন	১৩৩৩
বেদে [উ]আসমানী	”	অগ্রহায়ণ	১৩৩৩
বেদে [উ] বাতাসী	”	পৌষ	১৩৩৩
বেদে [উ] মুক্তা	”	ফাল্গুন	১৩৩৩

বেদে [উ] বনজ্যোৎস্না	”	আষাঢ়	১৩৩৪
বেদে [উ] মৈত্রেয়ী	”	ভাদ্র	১৩৩৪
আমার পরাণ মুখর হয়েছে [ক]	প্রগতি	আষাঢ়	১৩৩৪
মৃত্যুর সাথে বিয়া [ক]	”	আষাঢ়	১৩৩৪
তোমার হাসির পিছে [ক]	”	শ্রাবণ	১৩৩৪
ভৃঙ্গার ভরে মদ রেখেছিনু[ক]	”	ভাদ্র	১৩৩৪
বসে আছি নিরালায় [ক]	”	কার্তিক	১৩৩৪
হেরিনু চমৎকার [ক]	”	অগ্রহায়ণ	১৩৩৪
বলিতে পারো কি পাখী	”	পৌষ	১৩৩৪
তাই ভেবে শিরে সিন্দুর দিও[ক]	”	মাঘ	১৩৩৪
ওগো ও অপরিচিতা [ক]	”	ফাল্গুন	১৩৩৪
তবুও কাটিবে দিন [ক]	”	ফাল্গুন	১৩৩৪
কোথায় তোমারে দেখেছি বল তো[ক]	”	চৈত্র	১৩৩৪
এই মোর অপরাধ [ক]	”	চৈত্র	১৩৩৪
ওগো মোর নবাগতা [ক]	”	আষাঢ়	১৩৩৪
কেন ঘুমাইলে [ক]	”	কার্তিক	১৩৩৪
তারে নিয়ে তবু ভালোবাসা	”	ভাদ্র	১৩৩৫
নারী [ক]	কল্লোল	শ্রাবণ	১৩৩৫
তোমারে ভুলিয়া গেছি [ক]	”	অগ্রহায়ণ	১৩৩৫
সার্থক [ক]	প্রগতি	শ্রাবণ	১৩৩৫
লীলাবধূ ও আত্মবধূ [ক]	”	অগ্রহায়ণ	১৩৩৫
প্রিয়া ও পৃথিবী [ক]	”	পৌষ-মাঘ	১৩৩৫
যদি কোন দিন [ক]	কল্লোল	বৈশাখ	১৩৩৫
তখন তুমি আসো নাই ভাই[ক]	”	ফাল্গুন	১৩৩৫
তবু [ক]	প্রগতি	কার্তিক	১৩৩৬
পরবর্ত্তিণী [ক]	”	কার্তিক	১৩৩৬
সংকেতময়ী [ক]	কল্লোল	পৌষ	১৩৩৬
আবিষ্কার [ক]	”	কার্তিক	১৩৩৬

টুটাফুটা [গ]	উত্তরা	–	–
চোখের চাতক [গ]	কল্লোল	ভাদ্র	১৩৩১
সন্ধ্যারাগ [গ]	”	পৌষ	১৩৩২
খাখ্ [গ]	”	চৈত্র	১৩৩৩
অচল টাকা	উত্তরা	-	–
দুইবার রাজা	প্রবাসী	–	–
অরণ্য [গ]	বিচিত্রা	–	–
যে-কে-সে [গ]	”	–	-
দিনের পর দিন [গ]	”	–	–
ধন্বন্তরি [গ]	ভারতবর্ষ	–	–
ইতি [গ]	”	–	–
সাত খুন মাপ [গ]	ধুপছায়া	–	–
কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত [প্র]	কল্লোল	ভাদ্র	১৩৩২
কাকের বাসা [গ]	বলাকা	শ্রাবণ	১৩৩৩
পারে যাবার আর কে আছে [অ গ]	বঙ্গবাণী	জ্যৈষ্ঠ	১৩৩৩
সবচেয়ে সে আপনার [অ গ]	”	মাঘ	১৩৩৩
ডোরা [অ গ]	কল্লোল	আষাঢ়	১৩৩৪
দুটি সরাই [অ গ]	বঙ্গবাণী	ফাল্গুন	১৩৩৫
বিয়ের মিছিল [অ গ]	সংহতি	–	–
গার্ড সাহেব [গ]	শারদীয়া দেশ	–	১৩৫৭
শীতের নিঃশ্বাস [গ]	কল্লোল	আশ্বিন	১৩৩১
অন্ধকূপ [গ]	বিজলী	–	–
জন্ম জন্ম [গ]	জয়তী	শ্রাবণ	–
গান [গ]	উত্তরা	–	১৩৩৯
আট বৎসর [গ]	উত্তরা	–	১৩৩৯
ডাকনাম [গ]	পুষ্পপাত্র	বৈশাখ	১৩৩৯

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ‘নীহারিকা দেবী’ ছদ্মনামে বেশ কিছু কবিতা লেখেন। পত্র-পত্রিকায় সেগুলোর

প্রকাশ-তথ্য নিম্নরূপ:[১]

প্রভাতে [ক]	প্রবাসী	আশ্বিন	১৩২৮
ষড়্ঋতু [ক]	”	অগ্রহায়ণ	১৩২৮
নিমন্ত্রণ [ক]	”	ফাল্গুন	১৩২৮
রূপক [ক]	বঙ্গবাণী	চৈত্র	১৩২৮
বাংলা মেয়ে [ক]	প্রবাসী	বৈশাখ	১৩২৯
তরুণী [ক]	”	ভাদ্র	১৩২৯
সুখদুঃখ [ক]	”	মাঘ	১৩২৯
নূতনবধূ [ক]	–	পৌষ	১৩৩০
রজনীগন্ধা [ক]	–	শ্রাবণ	১৩৩১
রাত্রি [ক]	বিজলী	মাঘ	১৩৩১
নর্দ্দমা [গ]	প্রাচী	১ম বর্ষ ১ম খণ্ড	৬ষ্ঠ সংখ্যা

তথ্য নির্দেশ

১. সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনাসমূহের তালিকা অচিন্ত্যকুমার রচনাবলীর সম্পাদক নিরঞ্জন চক্রবর্তী লিখিত তথ্যপঞ্জি ও গ্রন্থ পরিচয় অংশের তথ্য অবলম্বনে লিখিত। উদ্ধৃত মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪ ।

গ. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের জীবনী সাহিত্য

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (প্রথম খণ্ড)	প্র.সং.	৬ ফাল্গুন, ১৩৫৮	মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (দ্বিতীয় খণ্ড)	প্র.সং.	৬ ফাল্গুন, ১৩৫৯	মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (তৃতীয় খণ্ড)	প্র.সং.	৬ ফাল্গুন, ১৩৬১	সিগনেট প্রেস, কলকাতা
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (চতুর্থ খণ্ড)	প্র.সং.	৬ ফাল্গুন, ১৩৬৩	সিগনেট প্রেস, কলকাতা
কবি শ্রীরামকৃষ্ণ	প্র.সং.	১৩৬০	সিগনেট প্রেস, কলকাতা
পরমপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি	প্র.সং.	৬ ফাল্গুন, ১৩৬০	সিগনেট প্রেস, কলকাতা
বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (প্রথম খণ্ড)	প্র.সং.	শ্রাবণ, ১৩৬৫	এম.সি.সরকার এন্ড সন্স, ”
বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (দ্বিতীয় খণ্ড)	প্র.সং.	ভাদ্র, ১৩৬৮	”
বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (তৃতীয় খণ্ড)	প্র.সং.	বৈশাখ, ১৩৭৬	”
ভক্ত বিবেকানন্দ	প্র.সং.	চৈত্র, ১৩৭০	মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা
রত্নাকর গিরিশচন্দ্র	প্র.সং.	১৩৭১	আনন্দধারা, কলকাতা
জগদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ	প্র.সং.	১৩৭৩	ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা
গরীয়সী গৌরী	প্র.সং.	ভাদ্র, ১৩৬৯	বাক সাহিত্য, কলকাতা

ঘ. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাস

বাঁকালেখা	১৩২৯	বরদা এজেন্সি প্রকাশন।
বেদে	১৩৩৫	এম.সি সরকার এন্ড সন্স, কলকাতা।
আকস্মিক	১৩৩৭	ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা।
কাকজ্যোৎস্না	১৩৩৮	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা।
বিবাহের চেয়ে বড়	১৩৩৮	ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা।
প্রাচীর ও প্রান্তর	১৩৩৯	এম.সি.সরকার এন্ড সন্স, কলকাতা।
প্রথম প্রেম	১৩৩৯	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা।
দিগন্ত	১৩৩৯	ন্যাশনাল পাবলিশার্স, কলকাতা।
মুখোমুখি	১৩৩৯	প্রকাশক, সুধাকৃষ্ণ বাগচি।
জননী জন্মভূমিশ্চ	১৩৩৯	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা।
ইন্দ্রানী	১৩৪০	প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।
তৃতীয় নয়ন	১৩৪০	জি.সি. সোম, কলকাতা।
ছিনিমিনি	১৩৩৮	দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা।
তুমি আর আমি	১৩৪০	কাত্যায়নী বুক স্টল, কলকাতা।
আসমুদ্র	১৩৪১	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা।
হুইসল	১৯৫৫(১৩৬২)	নবভারতী, কলকাতা।
যায় যদি যাক	১৩৫৫	ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা।
যে যাই বলুক	১৩৫৫	দি বুক এমপোরিয়াম, করকাতা।
পাখনা	১৩৫৭	ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা।
মগের মুলুক	১৩৫৮	নিউ এজ, কলকাতা।
ঊর্ণনাভ	১৩৫৯	ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা।
ঢল ঢল কাঁচা	প্রকাশের তারিখ নেই	মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।
নবনীতা	১৩৬১	সিগনেট প্রেস কলকাতা।
অনন্যা	১৩৬১	সিগনেট প্রেস, কলকাতা।

অন্তরঙ্গ	১৩৬৩	সিগনেট প্রেস, কলকাতা।
প্রচ্ছদপট	১৩৬৬	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, কলকাতা।
প্রথম কদম ফুল	১৯৬১(১৩৬৮)	নাভানা, কলকাতা
রূপসী রাত্রি	১৩৬৮	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ
অনিমিত্তা	১৩৭০	এম.সি.সরকার এন্ড সন্স প্রাঃলিঃ
মন্দাক্রান্তা	১৩৭৭	প্রকাশভবন, কলকাতা।
চতুষ্ক	১৩৭৯	শ্রী অমিতাভ মজুমদার শঙ্খ প্রকাশন।

ঙ. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছোটগল্পের তালিকা (প্রকাশকাল ক্রমানুসারে)

দুইবার রাজা	১৩৩৪	চোর	১৩৩৬
তিরশ্চী	১৩৩৭	ছুরি	১৩৪৩
হরেন্দ্র	১৩৪৪	ডিস্‌ক	১৩৪৫
অপূর্ণ	১৩৪৫	সাক্ষী	১৩৪৬
মাটি	১৩৪৬	খিল	১৩৪৬
শিলেকর ব্যান্ডেজ	১৩৪৭	বৃত্তশেষ	১৩৫০
পরাজয়	১৩৫০	হাড়	১৩৫১
সরবানু ও রোস্তম	১৩৫১	যতনবিবি	১৩৫১
বাঁশবাজি	১৩৫১	দস্তখৎ	১৩৫১
চিতা	১৩৫১	কালনাগ	১৩৫১
কাঠ	১৩৫১	ইনি আর উনি	১৩৫১
সারেঙ	১৩৫২	যশোমতী	১৩৫২
বেদখল	১৩৫২	বস্ত্র	১৩৫২
নুরবানু	১৩৫২	দাঙ্গা	১৩৫২
ডাকাত	১৩৫২	টান	১৩৫২
জনমত	১৩৫২	ঘোড়া	১৩৫২
খেলাওয়ালী	১৩৫২	কেরাসিন	১৩৫২
কেরামত	১৩৫২	কালোরক্ত	১৩৫২
ওষুধ	১৩৫২	অপরাধ	১৩৫২
স্বাক্ষর	১৩৫৩	সূর্যদেব	১৩৫৩
মেথর ধাঙড়	১৩৫৩	মুন্সি	১৩৫৩
বিড়ি	১৩৫৩	নতুন দিন	১৩৫৩
ধান	১৩৫৩	তসবির	১৩৫৩
জমি	১৩৫৩	কাক	১৩৫৩
হাড়ি-হাজরা	১৩৫৪	মুচি-বায়েন	১৩৫৪
জাত-বেজাত	১৩৫৪	সাহেবের মা	১৩৫৫

ভক্ত	১৩৫৫	গঙ্গাযাত্রা	১৩৫৫
গার্ডসাহেব	১৩৫৬	পাপ	১৩৬০
একরাত্রি	১৩৬০	প্রাসাদশিখর	১৩৬১
ঘর কইনু বাহির	১৩৬১	ঘর	১৩৬১
আর্টিস্ট	১৩৬২	সিঁড়ি	১৩৬৩
ঘুষ	১৩৬৩	রং নাম্বার	১৩৬৫
পাশা	১৩৬৫	ছেলে	১৩৬৫
বৈজ্ঞানিক	১৩৬৬	জানলা	১৩৬৬
ছাত্রী	১৩৬৬	জারিজুরি	১৩৬৭
ওভারটাইম	১৩৬৭	মণিব্রজ	১৩৬৮
দিন	১৩৬৮	কুমারী	১৩৬৮
এতটুকু বাসা	১৩৬৮	আরোগ্য	১৩৬৮
আর্দালি নেই	১৩৬৮	লক্ষ্মী	১৩৬৯
মা নিষাদ	১৩৬৯	তাজমহল	১৩৬৯
কলঙ্ক	১৩৬৯	তদবির	১৩৭০
ত্রাণ	১৩৭০	থার্ডক্লাস	১৩৭০
দুর্মদ	১৩৭০	পরাবিদ্যা	১৩৭০
পিকআপ	১৩৭০	বিন্দু	১৩৭০
রক্তের ফোঁটা	১৩৭০	সারপ্রাইজ ভিজিট	১৩৭০
জ্যাম	১৩৭০	আপোস	১৩৭০
মৃত্যুদণ্ড	১৩৭১	ফুটনোট	১৩৭১
গাছ	১৩৭১	অন্যপ্রান্ত	১৩৭১
অদৃশ্য নাটক	১৩৭১	প্রতিমা	১৩৭২
দ্বিতীয় জীবন	১৩৭২	একটি আত্মহত্যা	১৩৭২
কালের ললাট	১৩৭২		

চ. সহায়ক গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : *কল্লোল যুগ*, *এম.সি* সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, সপ্তম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৯৫/১৯৮৮(প্র.প্র.আশ্বিন ১৩৫৭/ ১৯৫০)

অচ্যুত গোস্বামী : *বাংলা উপন্যাসের ধারা*, পাঠভবন, কলকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৬৮ (প্র.প্র.১৯৫৭)

অতুল সুর : *বাঙলার সামাজিক ইতিহাস*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৬

অমলেন্দু সেনগুপ্ত : *উত্তাল চল্লিশ - অসমাপ্ত বিপ্লব*, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৯

অরবিন্দ পোদ্দার : *আধুনিক উপন্যাসে মানব প্রত্যয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ইন্ডিয়ানা, কলকাতা, ১৯৬২

: *মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যবিচার*, উচ্চারণ, কলকাতা, ১৯৮৫

অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় : *গল্পগুচ্ছ (বিশেষ রবীন্দ্র সংকলন)*, গল্পগুচ্ছ প্রকাশনী, কলকাতা, ২২ শ্রাবণ ১৩৯৪/১৯৮৭

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : *কালের প্রতিমা* (বাংলা উপন্যাসের ষাট বছর :১৯২৩-১৯৮২), দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯১ (প্র.প্র. এপ্রিল ১৯৭৪)

: *কালের পুত্তলিকা (*বাংলা ছোটগল্পের নব্বুই বছর : ১৮৯১-১৯৮০), ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৮২

অরুণকুমার রায়চৌধুরী : *অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ - এপ্রিল ১৯৯১ (প্র.প্র.অক্টোবর ১৯৮৪)

অশ্রুকুমার সিকদার : *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, জুলাই ১৯৮৮।

আনোয়ার পাশা : *রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা* (ইস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ঢাকা, কার্তিক ১৩৭০/১৯৬৩), *আনোয়ার পাশা রচনাবলী* দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৮৩

আবদুল হাফিজ : *আধুনিক সাহিত্য চর্চা*, মুক্তধারা, ঢাকা, বৈশাখ ১৩৮২/ ১৯৭৫

আবু সয়ীদ আইয়ুব : *পথের শেষ কোথায়*, *দে'জ পাবলিশিং*, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ (প্র.প্র. জুলাই ১৯৭৭)

আবু হেনা মোস্তফা কামাল : *শিল্পীর রূপান্তর*, বর্ণমিছিল, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৭৫

কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী : *বাংলা উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ*, বর্ণালী, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

ক্ষেত্র গুপ্ত : *রবীন্দ্রনাথ : ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব, পুস্তক বিপণি, কলকাতা,* ২৬ মার্চ ১৯৮৬

গোপাল হালদার : *তেরশ'পঞ্চাশ*, পুঁথিঘর, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ : মে ১৯৪৬ (প্র.প্র. জানুয়ারি ১৯৪৫)

: *বাঙলা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি*, ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৬৩/১৯৫৬

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : *বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিমার্জিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৭৮ (প্র.প্র. ১৯৫৯)

: *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ (প্র.প্র.১৩৮০/১৯৭৩)*

: *বাংলা কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ* , অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৭৭

জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) : *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, কার্তিক* ১৩৬২/১৯৫৫ (প্র.প্র. অগ্রহায়ণ১৩৬১/১৯৫৪)

জীবেন্দ্র সিংহরায় : *কল্লোলের কাল, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,* প্রথম দে'জ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৮৭ (প্র.প্র.১৯৭৩)

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *বাংলাগল্প বিচিত্রা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ,* কলকাতা, মাঘ ১৩৬৪/১৯৫৮

: সাহিত্যে ছোটগল্প, ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৭৪ / ১৯৬৭ (প্র. প্র.১৯৫৬)

বিনয় ঘোষ : *শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ,* অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংযোজিত সংস্করন, ১৯৮০ (প্র.প্র. ১৯৪০)

বীরেন্দ্র দত্ত : *বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ,* ইন্ডিয়ান বুক মার্ট, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত প্রথম সংস্করণ, ১৫ এপ্রিল ১৯৮৯ (রচনাকাল :জুন-আগস্ট)

ভাস্বতী লাহিড়ী : *সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ছোটগল্প* (১৯৪০-৫০), শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯১

ভূদেব চৌধুরী : *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার,* মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্থ প্রকাশ (পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত) ১৯৮৯ (প্র.প্র. ১৯৬২)

মুহম্মদ রেজাউল হক : *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৮৯

রথীন্দ্রনাথ রায় : *ছোটগল্পের কথা,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পুস্তক বিপণি সংস্করণ : জুন ১৯৮৮ (প্র.প্র. সেপ্টেম্বর ১৯৫৯)

রবিন পাল : *কল্লোলিত ছোটগল্প,* বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, প্রথম বুক ট্রাস্ট সংস্করণ : আগস্ট ১৯৮৮ (প্র.প্র. 'কল্লোলেরকোলাহল ও অন্যান্য প্রবন্ধ' : ১৯৮০)

: '*অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত*', সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি ১১০০০১। প্রথম প্রকাশ: ২০১০

শিশিরকুমার দাশ : *বাংলা ছোটগল্প* (১৮৭৩-১৯২৩), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম পরিমার্জিত দে'জ সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৩ (প্র.প্র. অক্টোবর ১৯৬৩)

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : *পরিচয়-এর আড্ডা*, মুখবন্ধ : হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১ জুন ১৯৯০

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : *পঞ্চাশের মন্বন্তর, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৫১/১৯৪৪ (প্র.প্র. পৌষ ১৩৫০/১৯৪৪)*

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, অষ্টম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ : ১৯৮৮ (প্র.প্র.১৯৩৯)

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ : জুন ১৯৮০ (প্র.প্র.১৯৬২)

: *উত্তর প্রসঙ্গ, দে'জ পাবলিশিং*, কলকাতা, আগস্ট ১৯৮৬

সরোজমোহন মিত্র :*ছোটগল্পের বিচিত্র কথা*, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : নববর্ষ ১৩৮৬/১৯৭৯ (প্র.প্র. সেপ্টেম্বর ১৯৬৪)

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) : *আন্তর্জাতিক ছোটগল্প ও সমাজ জিজ্ঞাসা*, প্রতিভাস, কলকাতা, জুন ১৯৯০

হরপ্রসাদ মিত্র : 'সাহিত্য পাঠকের ডায়রি' (দ্বিতীয় পর্যায়)। গুপ্ত প্রকাশনী ৮ গুপ্ত সংস্করণঃ জ্যৈষ্ঠ, ৯৩ রবীন্দ্রাব্দ জুন ১৯৫৩

সুদীপ্তা চক্রবর্ত্তী : *অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কবি ও কথাশিল্পী*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১ বৈশাখ ১৪২০।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : '*অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শতবার্ষিকী সংকলন*', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা -৭৩। প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১০।

ছ. জীবনপঞ্জী

১৯০৩ বাংলাদেশের নোয়াখালি শহরে ২৯শে সেপ্টেম্বর (২রা আশ্বিন ১৩১০) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- রাজকুমারসেনগুপ্ত, মাতা- হেমলতা দেবী।

১৯১৬ রাজকুমার সেনগুপ্ত মৃত্যুবরণ করেন। অচিন্ত্যকুমার তখন নোয়াখালি জেলা স্কুলের ছাত্র।

১৯১৮ সপরিবারে কলকাতায় জ্যেষ্ঠভ্রাতার কাছে চলে আসেন। সাউথ সুবার্বান স্কুলের নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন। সাহিত্যচর্চার সূচনা ঘটে এ স্কুলে পড়ার সময় থেকেই।

১৯২০ সহপাঠী হিসেবে পান প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। সাউথ সুবার্বান স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সাউথ সুবার্বান কলেজে, বর্তমানে আশুতোষ কলেজ, আই.এ ক্লাসে ভর্তি হন। শুরু হয় কবিতা লেখা।

১৯২১ 'প্রবাসী'তে (১৩২৮)'প্রভাতে' কবিতা প্রকাশিত হয় নীহারিকা দেবী ছদ্মনামে। কাব্যচর্চার প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়।

১৯২২ প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে যুগ্মভাবে লেখা উপন্যাস 'বাঁকালেখা'র প্রকাশ। সাফল্যের সঙ্গে প্রথম বিভাগে আই.এ পাশ। সাউথ সুবার্বান কলেজে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ ক্লাসে ভর্তি।

১৯২৪ চারবন্ধুর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 'আভ্যুদয়িক' সংঘের প্রতিষ্ঠা। 'কল্লোল' পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ইংরেজি সাহিত্যে অনার্সসহ কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ পাশ।

১৯২৫ 'কল্লোল' পত্রিকার সহ-সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগ লোকান্তরিত (১৩৩২) হওয়ার পর 'কল্লোল' সম্পাদনার অলিখিত দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯২৬ কৃতিত্বের সাথে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ পাশ। 'কল্লোলে' ধারাবাহিকভাবে 'বেদে' (১৯৩৩) উপন্যাস এবং পত্র-পত্রিকায় একাধিক গল্প, কবিতা প্রকাশ।

১৯২৮ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'বেদে' উপন্যাস (১৩৩৫)।

১৯২৯ আইন পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। 'অমাবস্যা' (১৩৩৬) কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৩০ সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন 'বিচিত্রা' পত্রিকার। নীহারকণা দেবীর সঙ্গে পরিণয়। 'আকস্মিক' (১৩৩৭) উপন্যাস প্রকাশ।

১৯৩১ অস্থায়ী মুনসেফ হিসেবে চাকরি গ্রহণ। 'কাকজ্যোৎস্না' (১৩৩৮) ও 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' (১৩৩৮) উপন্যাস দুটির প্রকাশ।

১৯৩২ অশ্লীলতার দায়ে বাজেয়াপ্ত হয় 'প্রাচীর ও প্রান্তর' (১৩৩৯) উপন্যাস।

১৯৩৪ আমতায় অস্থায়ী মুনসেফ হিসেবে যোগদান করেন। চাকরিজীবনে আর কখনো ছেদ পড়ে নি। রংপুরের কুড়িগ্রামে বদলি। ১৯৩২-১৯৩৪ সময়কালে ছাব্বিশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৯৩৫ স্থায়ী মুনসেফ হিসেবে ময়মনসিংহের নেত্রকোণায় বদলি। অবিরত সাহিত্যচর্চা।

১৯৪৫ পটুয়াখালিতে মুনসেফ। বিগত দশ বছরে অনেক গল্প-উপন্যাস প্রকাশ।

১৯৪৭ মুর্শিদাবাদের কান্দিতে মুনসেফ।

১৯৫১ 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' (১৩৫৮) গ্রন্থের প্রকাশ। পাঠক সমাজে ব্যাপক আলোড়ন। একাধিক সংস্করণ প্রকাশ। 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি' বক্তৃতা প্রদান।

১৯৫২ 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' (১৩৫৯) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ।

১৯৫৭ আলিপুরে জেলা-জজ হিসেবে যোগদান।

১৯৫৯ ল' কমিশন স্পেশাল অফিসার।

১৯৬০ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ।

১৯৬১ 'প্রথম কদম ফুল' উপন্যাস প্রকাশ।

১৯৭৪ 'অচিন্ত্যকুমারের সমগ্র কবিতা' গ্রন্থ প্রকাশ। 'উত্তরায়ণ' কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয় এ সময়ে।

১৯৭৫ 'উত্তরায়ণ' গ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্তি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্তি।

১৯৭৬ ২৯শে জানুয়ারি কলকাতার রজনী সেন রোডের নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন।